ফাতিমা ভুট্টো

জুলফিকার আলী ভুট্টো (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৯৭৯)-র পৌত্রী তিনি,
ভ্রাতুষ্পুত্রী তিনি শাহনাওয়াজ ভুট্টোর, যাকে হত্যা করা হয় ১৯৮৫-তে।
পিতা মীর মুর্তজা ভুট্টোকে আততায়ীরা হত্যা করে ১৯৯৬-এ।
ফুপু বেনজির ভুট্টো গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন ২০০৭-এ।

সংস অব ব্লাড অ্যান্ড সোর্ড

এক কন্যার স্মৃতিকথা

"কেউ যদি এই আখ্যান লেখার জন্য জন্মগ্রহণ করে থাকেন
তিনি ফাতিমা ভুট্টো"
– উইলিয়াম ড্যালরিম্পল

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সালে যখন করাচিতে বাড়ির বাইরে রাস্তায় গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল তখন ১৪ বছর বয়সের ফাতিমা ভুট্টো একটি বন্ধ ড্রেসিংরুমে শিশুভাইকে আগলে ধরে লুকিয়ে ছিলেন। এটি সেই সন্ধ্যা যখন তার বাবা মুর্তজাকে ছয় সহযোগীসহ হত্যা করা হয়েছিল।

ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে বেনজির ভুট্টো, ফাতিমার ফুপু, যাকে ফাতিমা তার পিতৃহত্যার নির্দেশ প্রদানকারী হিসেবে জনসম্মুখে দোষারোপ করেছিলেন, রাওয়ালপিন্ডিতে নিহত হন। এটি পৃথিবীর একটি সুপরিচিত রাজনৈতিক পরিবারের অনেক বিয়োগান্ত ঘটনার সর্বশেষ ঘটনা।

'সংস অব ব্লাড অ্যান্ড সোর্ড' ভুট্টো পরিবারের বর্ণনা, যারা ধনী সামন্তবাদী জমিদার এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ক্ষমতার প্রভাবশালী শক্তি। এটি একটি পরিবারের চারপুরুষের মহাকাব্য যাদের ধ্বংস করেছে সহিংসতা। একটি পরিবার ও জাতির ইতিহাস যা খণ্ডিত হয়েছে হত্যা, দুর্নীতি, চক্রান্ত এবং বিভেদ দ্বারা। এই সকল ঝঞ্ঝার কেন্দ্রে বসবাস করা লেখক লিখেছেন এই বইটি।

এই অসাধারণ পরিবারের ইতিহাস খুঁজতে যা পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি এবং তার পিতাকে হত্যার পেছনে সত্যিকার রহস্য অনুসন্ধান করতে ফাতিমা পাকিস্তানের ভঙ্গুর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ভেতরে প্রবেশ করেছেন।

'সংস অব ব্ল্যাড অ্যান্ড সোর্ড' বইটি প্রকাশ করছে পিতার প্রতি এক কন্যার ভালোবাসা। পিতার জীবন বৃত্তান্তের শুধু বিশদ দলিলই নয় এই বই, গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত পিতার মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন বা মৃত্যুর নেপথ্য কারণসমূহ অনুসন্ধানের বিপুল প্রয়াসও এটি।

www.pathagar.com

ফাতিমা ভুট্টো ১৯৮২ সালে আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া করেছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ। বর্তমানে তিনি *দ্য ডেইলি বিস্ট*, *নিউ স্টেটসম্যান* এবং অন্যান্য প্রকাশনায় কলাম লিখছেন। তিনি পাকিস্তানের করাচিতে বসবাস করেন।

প্রচ্ছদ ফটোগ্রাফ : কেটি ওয়েনস
লেখক ফটোগ্রাফ : জে. আমীন
প্রচ্ছদ ডিজাইন : বেনা সারীন

ISBN : 984 464 279 5

www.pathagar.com

সংস অব ব্লাড অ্যান্ড সোর্ড

এক কন্যার স্মৃতিকথা

ফাতিমা ভুট্টো

অঙ্কুর প্রকাশনী

www.pathagar.com

Songs of Blood and Sword
A daughter's memoir
by FATIMA BHUTTO

অনুবাদ
জয়নাল আবেদিন
বাংলা অনুবাদ সম্পাদক
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ

গ্রন্থস্বত্ব : ফাতিমা ভুট্টো ২০১০
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব : অঙ্কুর প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ : ২০১০, গ্রেট ব্রিটেন

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : ২০১০

প্রচ্ছদ ডিজাইন : বেনা সারীন
লেখক ফটোগ্রাফ : জে আমীন
প্রচ্ছদ ফটোগ্রাফ : কেটি ওয়েনস

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রক
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউজ
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা ১২০৪
ফোন : ৭৪৪০৯৩৬

ISBN 984 464 279 5

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

সকল প্রকার স্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ, গ্রন্থের কোনো অংশ, প্রচ্ছদ, ছবি, অনুবাদ মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ, ইলেকট্রোনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি অথবা অন্য যেকোনো মাধ্যমে প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না।

www.pathagar.com

আমার প্রিয় জুনাম
আমার দাদীমা– নুসরাত-এর জন্য
এবং আমার মা ঘিনওয়ার জন্য
জন্মদাত্রী নয়
তবে, আমার এ জীবন তাঁরই জন্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

شعر بی نام

بر سینه ات نشست
زخم عمیق و کاری دشمن

اما
تو ایستاده نیفتادی
این رسم توست که ایستاده بمیری
در تو ترانه های خنجر و خون
در تو پرندگان مهاجر
در تو سرود فتح
این گونه
چشم های تو روشن
هرگز نبوده است

অনামা পদ্য

বক্ষে তোমার শত্রুর দেয়া তীব্র ক্ষতচিহ্ন
কিন্তু দাঁড়িয়ে আছো তারপরেও, অটল ঋজু
এক সাইপ্রাস বৃক্ষ–
কেননা এভাবেই মৃত্যুকে বরণ করার ধরণ তোমার!

তোমাতে বিরাজ করে রক্ত ও তরবারির সঙ্গীত
ভ্রাম্যমাণ পাখিরাও ঠাঁই নেয় তোমাতে
বিজয়ের ডাক ও আশ্বাস তুমি
তোমার চোখ এতো দীপ্তিশালী কখনো ছিলো না আগে!

খসরু গুলসুরখি (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৯৭২)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

১২ নভেম্বর ২০০৮

করাচিতে এখন রাত প্রায় এগারটা। ৭০ ক্লিফটনে আমার শয়ন কক্ষ থেকে দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচলের শব্দ শুনছি। এই শব্দে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; এখন এই শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে আমার লেখালেখি আর চিন্তা-ভাবনা। তবে এর সাথে থেমে থেমে সাইরেনের শব্দও আছে। অ্যাম্বুলেন্স বা রাজনীতিবিদদের গাড়ি গর্জন করে উঠছে, জানাচ্ছে তাদের আগমণ। কখনো কখনো অস্ত্রশস্ত্রসহ সজ্জিত নিরপত্তা বাহিনীর গাড়ি, তাদের সাথে থাকে শিকারী কুকুর। কখনো কখনো গুলির শব্দ। কখনো থেমে থেমে বা লাগাতার গুলির আওয়াজ এবং তা অনেক দূর পর্যন্ত পৌছে। করাচিতে এখন বিয়ের মৌসুম না যে আকাশে বুলেট ছড়ানো হবে বা পটকা ফোটানো হবে। এটি তো নিউইয়র্কের নববর্ষও নয় যে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচণ্ড শব্দ করে পটকা ফুটিয়ে নববর্ষের সূচনা করবে। এটি হলো নতুন করাচি। তবে আমরা জানি এই আওয়াজের অর্থ।

এই নগরীতে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ার কারণে চৌদ্দ বছর পূর্বে আমি কয়েক সপ্তাহ স্কুলে যেতে পারিনি। মনে পড়ে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে শুনতে পেতাম, কাছের কোথাও থেকে আওয়াজ আসছে। পরের দিন পত্রিকায় দেখা যেত মৃত্যুর সংখ্যা। করাচি তখন ছিল একটা ভয়ঙ্কর নগরী। সিন্ধুর পিপিপি তখন চালাচ্ছিল গণহত্যার অভিযান, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন ক্লিন-আপ'। এটি ছিল মোহাজির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান, যারা ছিল 'এমকিউএম' রাজনৈতিক দলের সদস্য। এমকিউএম বসে থাকল না। তারা জীবন বাজি রেখে পাল্টা আঘাত শুরু করল।

সেই ছোটবেলায় করাচির এই ঘরে বসে আমি এসব দেখে দেখে মানসিক ভাবে বেশ কষ্ট পেতাম। গ্রীষ্মকালে মধ্যরাতে আমি ভয়ে কাঁপতে থাকতাম, ঘুমাতে চেষ্টা করতাম, কামনা করতাম, এই নগরী ও আমার চারদিকে যে বর্বরতা চলছে, তার জন্য যেন আমার ভয় বিলুপ্ত হয়। একদিন ভোর পাঁচটায় শুনতে পেলাম, আমার ঘরের জানালার বাইরে ময়না পাখি ডাকছে। আমি তাদের ডাকে সাড়া দিলাম। এই কুচকুচে কাল পাখিদের গাওয়া মধুর সুরের গানে অবিভূত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর আমি শান্তি খুঁজে পেলাম এই ৭০ ক্লিফটন রোডের বাড়িটিতে, আর এই শহরে, কারণ দূরে কোথাও চলে গেলে আমি তো আর শুনতে পাব না এই ময়না পাখির ডাক।

www.pathagar.com

কিন্তু এসব ছিল অনেক দিন আগের কথা। গত এক যুগেরও বেশি সময় আমরা এরকম জীবনযাপন করিনি। দীর্ঘকাল আমরা এ ধরনের ভীত হইনি।

১৯৯৬ সালে পিপিপি সরকারের পতনের পর, আরও সহিংসতার সৃষ্টি হলো, তারপর একসময় করাচি শান্ত হয়ে পড়ল। নেওয়াজ শরীফের দ্বিতীয়বারের শাসনামলে পাকিস্তান মুসলিম লীগ মারাত্মক ভুল করে। এ সময় দেশ শান্ত ছিল। আমরা বিদ্যালয়ে যেতাম, পরীক্ষা দিতাম, সেখানকার রেস্তোরাঁয় খাবার খেতাম এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতাম। মোশাররফের অভ্যুত্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, আমরা দেখলাম যে হিংস্রতা আবার আমাদের এই মহানগরীতে মাথা উঁচু করল। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সন্ত্রাস হতে থাকল ভিন্ন পদ্ধতিতে; এর গতির পরিবর্তন ঘটতে লাগল, প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটতে লাগল। এ সময়ের সন্ত্রাসীরা বন্দুকধারী ছিল না। তারা ছিল আত্মঘাতী বোমারু, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বোমা হামলা চালাতে লাগল। এর পর তারা দূতাবাসগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করল। আমরা, যারা করাচির স্কুলে পড়াশুনা করি, বুঝতাম কোন রাস্তা পরিত্যাগ করে চলতে হবে। আমরা আমেরিকান কনস্যুলেটের পেছনের রাস্তা দিয়েও কখনো যেতাম না। ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাছে রাস্তা দিয়েও গাড়ি চালাতাম না। ক্ষুধার্ত হলে বাইরে রেস্তোরাঁয় খেতে যেতাম না বরং আমরা খাবার আনিয়ে নিতাম।

এইমাত্র বিদ্যুৎ গেল, এই শব্দগুলো টাইপ করার সময় মিটিমিটি আলো জ্বলছিল। আজকাল সবসময়ই আলো চলে যায়; আজ পঞ্চমবারের মতো এই বিদ্যুৎ চলে গেল। নগরের বাইরের অবস্থা আরও খারাপ। সম্প্রতি এক বন্ধু এসেছে মফঃস্বল থেকে। সে জানাল যে সিন্ধুর মধ্যাঞ্চলের লোকেরা দিনে দু'ঘণ্টা বিদ্যুৎ পেলে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করেন। সিন্ধু প্রদেশে শরৎকালে প্রচণ্ড গরম পড়ে। বন্ধু বলল, খুব কম ক্ষেত্রেই এ প্রদেশের গরিব লোকেরা বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে।

সৌভাগ্যবশত : আমাদের বাড়িতে একটি জেনারেটর আছে। আমি শুনছি করাচির বিভিন্ন যানবাহনের বিচিত্র শব্দ। আমি যখন লিখতে থাকি, মনে হয় কানের কাছে মশা গুনগুন করছে।

নতুন পিপিপি সরকারের আমলে বিদ্যুতের মূল্য অনেক বেড়েছে। করাচি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি দেশের অন্যতম বড় দুর্নীতিপরায়ণ সংস্থা, এটি একটি আতঙ্কজনক প্রতিষ্ঠান– আপনি ব্যবহার করেন বা না করেন, আপনার বিদ্যুৎ বিল একই হবে। এরূপ অদ্ভুত বিল পরিশোধ করার পরও আপনাকে বছরের বেশিরভাগ সময়ই অন্ধকারে থাকতে হবে। গরিবদের জেনারেটর নেই, তাই তাদের অন্ধকারেই বসবাস করতে হয়। সহস্রাব্দের যে লক্ষ্য পোলিও নিবারণ, পাকিস্তান সেখান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এর কারণ, এর প্রতিষেধক ওষুধ রিফ্রিজারেশনে রক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি। দুর্নীতি এখানে একটি সহজ ব্যাপার। এই শীতকালে করাচির ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা 'কেইএসসি'-এর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবে না। সর্বশেষ লোডশেডিং বৃদ্ধির কার্যক্রমের প্রতিবাদে তারা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করাচির বাণিজ্যিক কেন্দ্র সদরে তারা বিদ্যুৎ বিল পুড়িয়েছে, মালিরে টায়ার পুড়িয়েছে। বিমান বন্দরের নিকটতম এই স্থানে বেলুচিস্তানের গরিব মানুষদের বসবাস। তারা স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনে এবং বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রেও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। ভারত যেখানে চাঁদে যাওয়ার কথা ভাবছে, আমরা সেক্ষেত্রে রাস্তায়ও বাতি

www.pathagar.com

জ্বালাতে পারছি না। আমরা এমন এক পরমাণু অস্ত্র সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে বাস করি, যেখানে রিফ্রিজারেটর অচল!

আবার ফিরে আসি সহিংসতার বিষয়ে। আমাদের দেশে অতীতে রেকর্ড সংখ্যক আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইরাক ও আফগানিস্তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। আত্মঘাতী বোমারুরা এখন আরো বেপরোয়া।

তারা এখন পাশ্চত্য খাবারের প্রতিষ্ঠান বা বিদেশী দূতাবাসকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে না। তারা এখন আঘাত করে বড় রাস্তায়, অফিসের দালানের বাইরে, পুলিশ স্টেশনে এবং সেনানিবাসে; তারা এখন হিংস্রতা প্রদর্শন করছে সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই সমস্ত রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ, যারা ক্ষমতার লোভে বিদেশী শক্তির সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কয়েক মাস যাবত মানুষবিহীন মার্কিনী সামরিক বিমান প্রতিদিন পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে উড়ছে। স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এসব আক্রমণের ফলে মানুষ মরেছে, জীবিতদের মনোবল ভেঙেছে। তারা বলেন, অপারেশন 'সফল'। আমাদের সংবাদপত্র এখন ব্যাপকভাবে সেগুলোর দ্বারা আক্রান্ত। আমি পত্রিকার যে কলামটি দু'বছর ধরে লিখতাম, তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কারণ আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার সমালোচনা সহ্য করে না– বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো দ্ব্যর্থবোধক– তাদের 'সাফল্যজনক' মানুষবিহীন বিমান আক্রমণের অর্থ মানুষ নিহত হওয়া, অনেক ক্ষেত্রে তা ঘুমন্ত অবস্থায়। অনেক সময় বলা হয় যে, নিহত ঐ লোকেরা জঙ্গি ছিল। কখনো কখনো বলা হয় যে, তারা আল-কায়েদার লোক। তারা পাকিস্তানি তালেবান বলেও প্রচার করা হয়। বলা হয়, তারা বেসামরিক ব্যক্তি নয়। মানববিহীন বিমান নাকি কখনো মানুষের মতো ভুল করে না। এটি হলো সন্ত্রাস দমন, মার্কিনী কায়দায়। মৃত মহিলা এবং স্কুল ও মাঠের নিহত শিশুরা হলো 'মানব ঢাল', স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্র ছোট ছেলেটির অস্ত্র শুধুমাত্র একটি লেখার শ্লেট, যেহেতু তাদের জন্য কোনো সরকারি স্কুল নেই তাই তাদের স্থান মাদ্রাসায়, তারা হলো ভবিষ্যতের 'জিহাদি'; এমন অবাস্তব ঘটনা বিশ্বাস করা শুধু হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের দেশে উদ্দীপনার সাথে গত সাত বছর যাবত সন্ত্রাস দমনের নামে নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। কিন্তু এর আগে আমরা কখনো আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশকে আমাদের নিজের ভূখণ্ডে আঘাত করার অনুমতি দেইনি। আগে কখনো শোনা যায়নি যে, আমরা আমাদের আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মেশিনকে আমাদের দেশের নাগরিকদেরকে হত্যা করার অনুমতি দিতে পারি– যেন জীবনের কোনো দাম নেই, রাজনৈতিক ইচ্ছাই যথেষ্ট। বলা হয়ে থাকে এই যুদ্ধে পাকিস্তান তৃতীয় রণক্ষেত্র, এখানে প্রবেশ করা হয়েছে নিঃশব্দে, গোপনে; আফগানিস্তান আর ইরাকের পর এখন পাকিস্তান।

রবার্ট ফিস্ক আল-জাজিরায় এই কথা বলেছেন– এই টিভি চ্যানেলটি এখনও সরকারিভাবে পাকিস্তানে অঘোষিত নিষিদ্ধ, পাকিস্তান হলো পৃথিবীর নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীগণ তাদের বিতর্কের মধ্যে বলেছেন যে, পাকিস্তান

www.pathagar.com

ইরানের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বারাক ওবামা বলেছেন যে, প্রয়োজনে আমাদের উপর বোমা হামলা করবেন। ইতোমধ্যেই তা করা হয়েছে।

আজ রাতে যখন আমি এটি লিখছি, বিবিসি রিপোর্ট করছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি মিসাইল উত্তর ওয়াজিরস্তানে আঘাত হেনে আটজন স্কুলের শিশুকে হত্যা করেছে। চালকবিহীন বিমান থেকে মিসাইল দুটি স্কুলটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে আজ সকালে। স্কুলটির অবস্থান ছিল কথিত তালেবান কমান্ডারের বাড়ির নিকট। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গতানুগতিক পন্থায় সাড়া দিয়েছে, 'আমরা বিষয়টির তদন্ত করছি।' যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। এ জন্যই এখন যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি চালকবিহীন সামরিক বিমান চাচ্ছেন তার নিজের জন্য; তিনি পাকিস্তানের ভেতর যুদ্ধ করবেন। নতুন সংসদ আমেরিকা ও তার মিত্রদেরকে সাহায্য করা অব্যাহত রাখার শপথ নিয়েছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সন্ত্রাসীদের ওপর সার্থকভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাবে। পথে যেই পড়ুক, সে আল-কায়েদা হোক বা স্কুলের ছোট ছেলে, তার উপর আক্রমণ চালানো হবে।

পাটের বস্তার ভেতর নির্যাতনের চিহ্নসহ মৃতদেহ আবার পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে করাচি শহরের প্রান্তে। সংবাদপত্রে খবরগুলো প্রকাশ পাচ্ছে ধীরস্থিরভাবে। রাজপথে একটি মৃতদেহ বুলেটের দ্বারা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে, হত্যাকারী অজ্ঞাত– সংবাদের শেষ এখানেই। এটি নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি আমি জার্মান কনসাল জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি চাকরি থেকে অবসরে যাচ্ছেন এবং পাকিস্তান ত্যাগ করছেন। আমি বললাম যে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে মৃতদেহ রাস্তার পাশে রেখে যাওয়ার ঘটনা আবার দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন যে, তার অফিসে এরূপ ৬০টি মৃত্যুর খবর আছে। নতুন সরকার গত ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেয়ার পর এরূপ ৬০টি বস্তা দেখা গিয়েছে, সরকারের এক বছর পূর্তির পূর্বেই এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, সময়টা তার কাছে কেমন মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে শুধু বললেন, 'আমি তো বিদায় নিচ্ছি', বলে তিনি মলিন হাসলেন।

পিপিপি-র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যারা খুব একটা সক্রিয় নয় এবং যাদের রাজনীতিতে আগ্রহ কম তাদের অনেকে দেশ ত্যাগ করেছে। তারা সময় কাটাচ্ছেন দুবাই অথবা লন্ডনে। যারা দেশে আছেন, নির্বাসনে যাওয়ার সুযোগ পাননি, তাদেরকে নানা পন্থায় নির্যাতন করা হচ্ছে। লারকানার প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, যিনি একজন পিপিপি বিরোধী ব্যক্তি ও মোশাররফ পন্থী, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে জেলে আছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তিনি গৃহবধূ থেকে সদ্য রাজনীতিবিদ হওয়া প্রেসিডেন্টের বোনকে হত্যার চক্রান্ত করেছেন। তাঁর আইনজীবীরা একদম শান্ত। ভয়ে কেউ তার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দেবেন না। সম্প্রতি নির্বাচিত অপর একজন বিরোধী দলীয় সদস্য, যিনি সিন্ধুর সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং মোশাররফ পার্টিপন্থী ছিলেন, তাকে সংসদেই শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্টের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়ার কারণে একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ হয়েছেন, এখন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি সংসদে এসে পৈশাচিকভাবে বললেন, আমি একজন ডাক্তার, আমরা শুধুমাত্র একজন রোগীর চিকিৎসা করলাম। (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন ডাক্তার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, একবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্টের একজন পুরানো বন্ধু। তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও হত্যার অভিযোগ হয়েছে। তার স্ত্রীও একজন ডাক্তার, মহিলা ব্যবসায়ী এবং প্রেসিডেন্টের একজন পুরানো বন্ধু, বর্তমানে আইন পরিষদের স্পিকার।) তিনি আরও বললেন, সে যদি সতর্ক না হয়, তবে তাকে আরও ওষুধ দেয়া হবে। পিপিপি'র তথ্যমন্ত্রী নতুন প্রেসিডেন্টের প্রথম জনসম্মুখীন হওয়ার সময়, গত আগস্ট মাসে বললেন যে, তার দল কখনো প্রতিশোধের রাজনীতি করে না। এসব শুধু বলার জন্যই বলতে হয়। ভুক্তভোগীরাই শুধু আসল সত্য জানে, জানে কিভাবে এখন রাজনীতিতে ব্যবসা চলছে।

বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে অনেক কাহিনী আছে। আমাকে যেতে হবে অনেক পেছনে, আমার পিতা নিহত হওয়ার পূর্বের সময়ে।

* * *

গত চার বছর থেকে আমি শুরু করি আমার পিতার জীবন-কথা সংগ্রহ। তার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সংবাদপত্রের ক্লিপিং, চিঠি, ডায়েরি এবং সরকারি দলিলে ভর্তি ধুলায় আবরিত বাক্সগুলো আমি খুললাম। আমার পিতার বাক্সে পাওয়া গেল তার পুরানো স্কুল ব্যাগ ইত্যাদি। এভাবে আমার জানা হলো তার কলেজের বন্ধুদের নাম, তাঁর পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম-পরিচয় এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া দীর্ঘ চিঠি। আমার পিতার অতীতকে খুঁজতে যেয়ে আমি সারা পাকিস্তান চষে বেড়ালাম, করাচি থেকে সীমান্ত প্রদেশের পর্বতের শিখর, আর পাঞ্জাবের সমতল ভূমি। আমি ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘুরতে লাগলাম আমার পিতার ভালোবাসার এবং পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত সবকিছু খুঁজতে, তার যৌবনের স্মৃতির খোঁজে। অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, অনেকের সাথে যোগাযোগ করলাম ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে। ভুট্টো পরিবার, তার সদস্যদের চেনেন এমন অনেকের সাথে আমি কথা বললাম। শুধু তাই নয়, আমি কথা বললাম আমার দাদা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্যাবিনেট সদস্যদের সাথে, পাকিস্তান পিপল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, হাকিম, আইনজীবী, দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপকদের সাথে। অনেকেই বলেছেন যে, যেন তাদের পরিচয় ও সূত্র উল্লেখ না করা হয়, তাদের পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করা খুব কঠিন। অনেকেই তাদেন বাড়ির ভেতরে বাগিং রেকর্ডারের আশঙ্কায় সেখানে সাক্ষাৎকার দেন নাই, তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেছি জনবহুল সভা ও পথে। কেউ কেউ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন নিজেদের বন্ধ ঘরের ভেতর, কিন্তু রেকর্ড করা যায়নি, লিপিবদ্ধও করা যায়নি, শুধু স্মৃতিতে ধারণ করেছি। বাড়ি ফেরার পর আমি কাগজ-কলম নিয়ে সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। আমাদের পারিবারিক ভবন ৭০ ক্লিফটন আসলেই একটি মহাফেজখানা। এটি ভুট্টোদের জীবন সাক্ষী। এখনও ওয়াড্রোবে ভর্তি আছে আমার পিতামহের স্যুট এবং শেল্‌ফে আছে পিতামহের বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য। বইপত্র ও প্রধানমন্ত্রীর অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিলপত্র এখনও আমাদের বাড়িতে আছে। হাতে লেখা ও টাইপ করা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কালপঞ্জিও রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তির জীবনের কেলেঙ্কারি নিয়ে কিছু বলা খুব কঠিন কাজ। যে সমস্ত মানুষকে ভালোবেসেছি, মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে তাদেরকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি।

আমার অনুসন্ধান তৎপরতা একসময় খুব বিরক্তির ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কিন্তু এটি ছিল আমার জন্য কষ্টদায়ক কিন্তু প্রয়োজনীয় অন্বেষণ। লেখক মিলান কুন্দ্রেরা একবার বলেছেন, ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম হলো বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতি সংগ্রাম। এটি হলো আমার স্মৃতি ভ্রমণ।

www.pathagar.com

১

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬। ভোর তিনটার কাছাকাছি, আমরা নিচতলার বৈঠকখানায় বসে আছি, কামরাটি জানালাবিহীন, দেয়ালে মেরুন বর্ণের মখমল, আধুনিক পাকিস্তানি আর্ট দ্বারা সজ্জিত। আমরা মাত্র অ্যাভারি হোটেল থেকে রাতের খাবার খেয়ে আসলাম। আব্বার জন্মদিন ছিল আগের দিন রাতে। তার কিছু বন্ধু-বান্ধব আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে তা উদযাপনের জন্য। সে সময় তার বয়স ছিল বিয়াল্লিশ।

অ্যাভারি করাচির অন্যতম চমৎকার হোটেল। এটি নির্মাণ করেন এক পুরানো পার্শি পরিবারের কুলপতি দিন্‌শ অ্যাভারি। পাকিস্তানের প্রথা অনুযায়ী পরবর্তীতে তিনি এটিকে দান করেন তার পুত্র বৈরামকে। এটি একটি নিরাভরণ হোটেল, বাইরের রং নীল ও সাদা, খুব আকর্ষণীয় নয়, পার্শ্ববর্তী বিদেশী চেইন হোটেলগুলোর মত নয়। আগের দিনে আকাশচুম্বি এই হোটেলটি নগরীর স্থপতিদের কল্পনার বিষয় ছিল, অ্যাভারির বিজ্ঞাপনে বলা হতো এটি দেশের সর্বোচ্চ দালান। এখন ব্যাংকগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করে, নগরীর ধোঁয়া ও দারিদ্র্য থেকে দূরে অবস্থান করে। নব্বই-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে অ্যাভারি হোটেলে ছিল একমাত্র জাপানি রেস্তোরাঁ ফুজিয়াম। ওই রাতে আমরা সেখানেই খেয়েছিলাম।

ওই শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা আব্বা পরেছিলেন একটি নেভিব্লু স্যুট, এটি ছিল তার গায়ে ঠিকমত লাগার কয়েকটি স্যুটের মধ্যে একটি। তার পিতা জুলফিকার আলীর মতো তিনিও পোশাকের ব্যাপারে খুব পরিপাটি থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন রুচিসম্পন্ন মানুষ, লম্বায় ছিলেন ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, চুলের রং ছিল লবণ ও গোলমরিচের মিশ্রণের মতো এবং পরিষ্কার সুবিন্যস্ত; তিনি গোঁফ রাখতেন। শেষের দুই বছর, ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন মাসগুলোতে, যখন আমরা পাকিস্তানে ফিরে আসলাম, আব্বার ওজন বৃদ্ধি পেল, আমরা এই নিয়ে তাকে ক্ষ্যাপাতাম। তিনি এটিকে বেশ গুরুত্ব দিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে শিগগিরই তিনি খাবার নিয়ন্ত্রণ শুরু করবেন। মজা করার জন্য আমার ছোট ভাই জুলফি ও আমি তার পেটে চাপ দিতাম।

সেই রাতে আব্বা অ্যাভারি হোটেলের অতিথি বইয়ে সাক্ষর করলেন। রেস্টুরেন্টের কর্তব্যরত কর্মচারী তার সামনে বইটি রাখল অত্যন্ত সম্মানের সাথে এবং তারপর উন্মুক্ত করল সেই পৃষ্ঠাটি, যেখানে জেনারেল জিয়াউল হক একটি আবেগপূর্ণ বক্তব্যে স্বাক্ষর দান

www.pathagar.com

করেছেন। এই বাজে পৃষ্ঠাটি তারা ঢেকে রাখতে পারত। জেনারেল জিয়া সামরিক অভ্যুত্থান করেছিলেন, যার ফলে আমার পিতামহের সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। দুই বছর পর তাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয়, তারপর জেনারেল জিয়া তাকে হত্যা করেন। তারা বলেন যে, তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমার পরিবার কখনো তার মৃতদেহ দেখেনি। সেনাবাহিনী গোপনে তাকে কবরস্থ করে, এমনকি আমাদের পরিবার ও জনগণকে জানাবার আগে তাকে কবর দেয়া হয়। আব্বা জেনারেলের হাতের লেখার দিকে তাকালেন। আমার দিকে না তাকিয়ে তিনি ফুজিয়ামার চমৎকার পরিবেশে জেনারেলের লেখা পড়তে থাকলেন, জিহ্বায় কামড় দিয়ে এবং ভ্রূ-কুঁচকে কৌতুক করলেন, কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টালেন এবং তারপর লিখতে শুরু করলেন।

খাওয়ার সময় আব্বা একদম চুপচাপ ছিলেন। তিনি বসেছিলেন আমার বরাবর। তার বাহু ছিল সামনের দিকে, চিবুকে ছিল আঙুল । দৃশ্যটি দেখে আমি বিচলিত হলাম।

দু'দিন আগে আব্বা পেশোয়ার থেকে বেড়িয়ে এসে করাচি ফিরেছেন প্রফুল্ল মনে। দেরিতে ফেরার কারণে তিনি অনেক রাতে খেতে বসলেন এবং তার ভ্রমণ সম্পর্কে আম্মা ও আমার সাথে আলাপ করছিলেন। মধ্যরাতের পর হঠাৎ বৈঠকখানার ইন্টারকম বেজে উঠল। হয়তো রান্না ঘর কিংবা ৭১ ক্লিফটন রোডের সামনের ফটক থেকে কেউ ফোন করেছে। কিন্তু কেউ তো জেগে নেই। রান্না ঘর বন্ধ এবং আমাদের বেয়ারা আসগরের কিছু বলার থাকলেও তো এখানে এসেই বলতে পারত। তাহলে নিশ্চয়ই অফিস থেকে হবে। আব্বা প্রথম আওয়াজেই ফোনটি ধরলেন। তিনি নীরবে কয়েক মিনিট শুনলেন। তিনি দ্রুত গাড়ি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার শিথিল মেজাজ চলে গেল। ফোন রেখে আব্বা দরজার দিকে গেলেন, সেটি ছিল আমার পিতামাতার শয়নকক্ষ সংলগ্ন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?' জবাবে আব্বা বললেন, 'ওরা আলী সোনারাকে নিয়ে গেছে।' 'ওরা তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে নিয়ে গেছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' আম্মার হাত ছিল আমার পিঠে। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' আব্বা বৈঠকখানা থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, 'আমি ওকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

আলী সোনারা লেয়ারির লোক, এটি হলো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ স্থান, রাজনৈতিকভাবে চরমপন্থী এবং করাচির পার্শ্ববর্তী দরিদ্রতম অঞ্চল। সে কাচি মেনন নামক একটি ক্ষুদ্র সুন্নী সম্প্রদায়ের লোক, যার উৎস রান অব কুচ এবং সিন্ধুর মরুভূমি অঞ্চল। স্কুল জীবন থেকেই সে ভুট্টো পরিবারের অনুগত সমর্থক। ১৯৭৭ সালে জিয়ার সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান এবং ভুট্টোর পতন এবং কারাবন্দী হওয়ার পর সোনারা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে প্রবলভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়ে।

সে তার সম্প্রদায়ের ভুট্টো বাঁচাও কমিটিতে যোগ দেয় এবং অক্লান্তভাবে কাজ করে। জে. জিয়া কর্তৃক ১৯৭৭ সালের শাসনতন্ত্র বাতিলকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে সামরিক সরকার কর্তৃক জুলফিকার আলী ভুট্টো নিহত হওয়ার পর সোনারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সংগ্রামে (এমআরডি) যোগদান করেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে আমার ফুফু বেনজির ভুট্টোর সাথে কাজ করেন পরবর্তী দশ বছর। তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের

www.pathagar.com

করাচি কমিটির সদস্য এবং দিন-রাত কাজ করেছেন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে পুস্তিকা-লিফলেট বিতরণ করে। তিনি জনসভা-মিছিল করে রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণকে বোঝাতেন।

১৯৮৪ সালে, যখন জিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন ছিল তুঙ্গে, একটি বোমা পোঁতা হয়েছিল করাচির কেন্দ্রস্থলের জনপ্রিয় স্থান বড়িবাজারে। বড়িবাজার একটি বাজার, যার নামকরণ করা হয়েছিল বোহ্‌রি মুসলমান নামক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম অনুসারে। এদের মহিলারা পরিধান করে লম্বা পেটিকোট ও ব্লাউজ, মাথা ও উর্দ্ধাংশ ঢাকার জন্য হিজাব। যখন বোমা বিস্ফোরিত হলো, তখন সেখানে প্রচুর সংখ্যক মহিলা ও শিশু কেনা-কাটা করছিলেন। তারা অনেকেই আহত হলেন। এ সংবাদ শুনে আলী সোনারা তার বাড়ি লেয়ারির নিকটবর্তী ওই বাজারে দৌড়ে যান।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, বোমা পুঁতেছিল সামরিক বাহিনী, কিন্তু ভূট্টোর পক্ষের কর্মীরা প্রতিবাদ করলে এলাকাবাসীদের উপর অত্যাচার হবে। জেনারেল জিয়া যে কোনো প্রতিরোধকে কঠোরভাবে দমন করতেন-- হয় জেল আর না হয় স্টেডিয়ামে প্রকাশ্যে চাবুক মেরে। সোনারা কয়েকবার করাচি জেলে কাটিয়েছেন। সিন্ধুতে তার সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করার জন্য তার শাস্তি হয়েছে। তিনি জানেন যে লড়াই যত তীব্র হবে, শাস্তি তত কঠিন হবে।

সোনারা বড়িবাজারে এসে দৌড়াতে শুরু করলেন এ্যাম্বুলেন্স ও স্টেরে করে আহতদের সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য। তিনি আহতদের জন্য রক্তদান কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করছিলেন এবং আতঙ্কিত পরিবারগুলোকে সামলাচ্ছিলেন। সে সময় জিয়ার মুখ্যমন্ত্রী গওস আলী শাহ্ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে তখন ঘেরাও করলেন পি পি পি-র কর্মীরা এবং অনুরোধ করলেন বিষয়টির তদন্ত করতে।

আলী শাহ্ দাবি করলেন যে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সামরিক বাহিনীর বিরোধিতাকারীরা, যারা সন্ত্রাসী, তখনকার সরকার এরূপ বলত। তিনি বললেন, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। সোনারা আলী শাহকে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে মুখ বরাবর ঘুষি মারলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী তাকে বোমা পোঁতার অপরাধে গ্রেফতার করলেন।

পরবর্তীতে তাকে মুক্তি দেয়া হলেও দীর্ঘদিন তিনি জেলে ছিলেন কোনো বিচার ছাড়াই।

১৯৮৬ সালের মে মাসে বেনজির ভুট্টো যখন লন্ডনের স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে করাচি ফিরে আসলেন, সোনারা কিছুসংখ্যক খ্যাতনামা সক্রিয় রাজনীতিবিদদের নিয়ে নগরীতে তাকে অভ্যর্থনা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সে সময়ে জিয়ার সমর্থনে ছিল মোহাজের কওমী আন্দোলন পার্টি। এটির কর্মতৎপরতা করাচিতেও ছিল। পিপলস পার্টির বিকল্প হিসেবে সিন্ধুতে এদের ভিত্তি ছিল। এই দল অভ্যর্থনা উপলক্ষে জনগণকে ভয় দেখাতে লাগল। লেয়ারিকেই প্রথমে মোহাজের কওমী দল দখল করে নিল। তখনকার সময় দলের পরিচয় দেয়াটাই ছিল ভয়ানক বিষয়। কিন্তু সোনারা ঝুঁকি নিলেন। তিনি বেনজির ভুট্টোর জন্য লেয়ারির একটি বড় স্টেডিয়ামে সভার ব্যবস্থা করলেন। বেনজির তাঁকে এবং সমাবেশের সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। সোনারা বেনজিরের দেহরক্ষী হিসেবে তাঁর পিছনে অবস্থান করছিলেন। বেনজির তার পরিচয় দিলেন, 'এই হোল আমার ভাই।'

www.pathagar.com

বেনজির ছিলেন একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলে নবাগত। তার আকাঙ্খা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করা। এ ব্যাপারে তিনি নির্ভর করতে থাকলেন সোনারার উপর। তিনি ছিলেন সেই সকল যুব নেতাদের অন্যতম, যারা করাচি শহর এবং করাচির বাইরে ও সিন্ধুর অন্যান্য অঞ্চলে তাকে নিয়ে জনসভা করেছেন, তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছেন। করাচি কমিটির সদস্য হিসেবে সোনারা পিপিপি'র তৃণমূল পর্যায়েও সংগঠিত করেছেন, যার ফলে পরবর্তীতে নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু শিগগিরই সোনারা বিরাগভাজন হলেন। বেনজিরের ছোট ভাই আমার পিতা মুর্তজা তখন নির্বাসনে বিদেশে ছিলেন, তার প্রতি সোনারার আনুগত্য ছিল, এটি বেনজিরের জন্য ছিল অসুবিধাজনক। ১৯৮৮ সালে বেনজির প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, মন্ত্রিসভা গঠন করা হলো তার নববিবাহিত স্বামী আসিফ আলী জারদারী কর্তৃক দলে নিয়ে আসা লোকজনদের দ্বারা। খোলামেলা কথা বলার জন্য সোনারা অনেকের অপ্রিয় ছিলেন। ৭১ ক্লিফটনে দলের একটি সভায় সোনারার সাথে বেনজিরের বিতর্ক হয়। এর ফলেই তাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। সোনারা আপত্তি জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের ব্যবসায়ী ও সামন্ত প্রভুদের অতিরিক্ত সুবিধা দেয়ায়। সবাই জানে, বেনজির সামান্যতম সমালোচনাও সহ্য করতে পারতেন না। সোনারার এরূপ মন্তব্য শুনে তিনি গর্জে ওঠলেন, 'আলী, সঠিক আচরণ কর। আমি দলের চেয়ারপার্সন, আমার সামনে এভাবে কথা বলার অধিকার তোমার নেই।' সোনারা জবাব দিলেন, 'মোহতারেমা, আমার বলার অধিকার অবশ্যই আছে। আমি এই দলের একজন রাজনৈতিক কর্মী, তাই যে সমস্ত ভুল হচ্ছে আমাদের যেসব বিষয়ে আপনাকে বলার অধিকার আমার আছে।'

১৯৯০ সালে বেনজির সরকারের পতনের পর সোনারা আত্মগোপন করলেন। তিনি অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির শত্রু হয়েছিলেন, যারা তাকে দল থেকে বের করে দিয়েছিল ও যাদের তিনি সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি আবার আবির্ভূত হন ১৯৯৩ সালে যখন আবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা হলো। আমার পিতা যখন মনোনয়নপত্র জমা দিলেন, সোনারা তার প্রচারণা কাজে যোগদান করেন। এটিই ছিল বেনজিরের ভয়ের কারণ।

* * *

সেই রাতে সোনারা গিয়েছিলেন সীমা ও ইনায়েত হোসেনের কাছে; এরা দু'জনই পিপিপির পুরাতন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সীমা হোসেন ছিলেন প্রাক্তন শ্রমিক নেতা। তিনি জুলফিকার আলী ভূট্টোর সময়ে দলে যোগদান করেছিলেন। তিনি বেনজিরের সাথে অল্পদিন কাজ করেছেন, দল যখন ক্ষমতা ও অর্থের দিকে ধাবিত হলো, তিনি তখন দল থেকে ছিটকে পড়লেন। এরপর, সীমা আমার পিতার পক্ষে যোগ দিলেন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা হিসেবে কাজ করতে থাকলেন। (আব্বা এই দলের মাধ্যমে শহীদ ভূট্টোর নামে ১৯৯৫ সালে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন)।

লেয়ারিতে নির্যাতন তীব্র আকার ধারণ করল, বিশেষ করে যারা প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করতেন। পুলিশ তাকে খুঁজতে পারে, এই ভয়ে সোনারা তার স্ত্রী সাকিনা এবং

www.pathagar.com

দুটি বাচ্চাসহ হোসেনের বাড়িতে গেলেন। কিন্তু পুলিশ তাকে খুঁজে পেল। পুলিশ কোনো গ্রেফতারি পরওয়ানা দেখালো না। তারা সরাসরি বাড়ির ভেতরে ঢুকল, তারপর লক্ষ্যবস্তু তুলে নিয়ে চলে গেল। সাকিনা কয়েক মিনিট পর আমাদের ৭১ ক্লিফটনে ফোন করল। হোসেনের বাড়ি থেকে সোনারা কয়েকটি ফোন করেছিল, তার ফলেই হয়তো পুলিশ বুঝতে পেরেছিল যে, সে কাছেই কোথাও আছে। সাকিনা কেঁদে কেঁদে ফোনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে? সে কি অবস্থায় আছে এখন?'

আমার মনে আছে, আব্বা দ্রুত দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর আম্মা একদম স্থির হয়ে রইলেন সেই রাতে। রাত প্রায় একটা, আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়েছিল, আব্বাকে থামাতে চেষ্টা করলাম। আমি বৈঠকখানা পার হয়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকলাম, তার সাথে দরজা পর্যন্ত গেলাম, অনুরোধ করলাম বাড়ির বাইরে না যেতে। তিনি কি ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন না? আমি আব্বার বাহু ধরে টান দিলাম, তাকে থামাতে চেষ্টা করলাম। তিনি এমন করে ধেয়ে যাচ্ছেন কেন? আমি আবার তার বাহু খপ করে ধরলাম, তিনি আমার হাত সরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'ফাতি, আমাকে আমার লোকের কাছে যেতেই হবে।' আমার চোখে যন্ত্রণা হতে লাগল। তিনি তখন নরম সুরে বললেন, 'আমাকে যেতে দাও।' আমি আমার মায়ের বাহুর মধ্যে আবদ্ধ হলাম। আমরা উভয়েই একদম নীরব। আব্বা গাড়ি নিয়ে রাতের করাচির পথে বের হলেন।

* * *

করাচিকে বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম ভয়াবহ নগরী। ১৬ থেকে ১৮ মিলিয়ন লোকের বাসস্থান এটি। আমাদের এই নগরী অতি জনাকীর্ণ, অনুন্নত এবং দরিদ্র। এর পুলিশ বাহিনী সর্বদাই ভয়ঙ্কর ও দুর্নীতিপরায়ণ। এটিকে নগরবাসী অশুভশক্তি হিসেবেই জানে। ১৯৯০-এর দশকে, বেনজির ভুট্টোর দ্বিতীয় সরকারের আমলে এখানে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে প্রচুর সংখ্যক। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ছিল হত্যাকারী দল এবং ছিল তথাকথিত 'মুখোমুখি লড়াই' অথবা পুলিশের হত্যার জন্য লক্ষ্যবস্তুর উপর গুলিবর্ষণ ছিল সাধারণ ঘটনা। সোনারার সন্ধানে এরূপ একটি নগরীতে আমার পিতা বের হলেন সেই রাতে।

আব্বার প্রথম পদক্ষেপ হলো কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি কেন্দ্রে যাওয়া। এর অবস্থান করাচির গার্ডেন এরিয়ায়। এটি ছিল ব্যস্ততম লেয়ারি ও করাচির মধ্যবর্তী স্থানে। আমার পিতা থানার ভেতরে ঢুকলেন এবং কর্তব্যরত কর্মকর্তার কাছে গেলেন।

সে সময়ে যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে বুঝা গেল যে সোনারাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সিআইএ (কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি) থেকে আদেশ হওয়ার ফলে। গ্রেফতারটি যদি আইনসম্মত হতো, তবে এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র থাকত, তাতে উল্লেখ করা থাকত গ্রেফতার করার সময়, স্থান ও অভিযোগের তথ্য। কিন্তু আমার পিতার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ সত্ত্বেও, সোনারার কারারুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোনো তথ্যই সে রাতে দেয়া হলো না। আব্বা ও তার সাথে থাকা রক্ষীগণ, যারা করাচিতে সবসময় তার সাথে থাকেন, সিআইএ গার্ডেন ত্যাগ করলেন এবং এসএসপি দক্ষিণের দিকে গাড়ি চালাতে লাগলেন। এটি সিন্ধু গভর্নরের বাসস্থানের কাছে অবস্থিত– লি মার্কেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে। এসএসপি-এর উপরস্থ

www.pathagar.com

কর্মকর্তা ছিলেন কুখ্যাত সিনিয়র পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ওয়াজিদ দূরবানী।

এভাবে রাত প্রায় দুটো বাজল। আলী সোনারার গ্রেফতার সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। করাচির পুলিশ স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সুপরিচিত, তারা আইন অনুযায়ী কাজ করে না। পরওয়ানা না থাকার অর্থ কোনো দায়-দায়িত্ব না থাকা; নির্জন হাইওয়েতে মৃতদেহ পড়ে থাকা, অথবা বস্তাবন্দী হয়ে ময়লার স্তূপে পড়ে থাকা মৃতদেহ, অবাক হওয়ার মত কিছু নয়, সচরাচর ঘটেই থাকে। আমার পিতা এসএসপি দক্ষিণ স্টেশনে প্রবেশ করলেন সেখানেও সিআইএ কার্যালয়ের মতই অবস্থা দেখলেন। একজন পাঠান সহকারী সুপারকে দেখলেন বড় কাঠের ডেস্কের পেছনে, আব্বা ডেস্কের দিকে গেলেন। সংসদের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তার অধিকার আছে যেকোনো সরকারি অফিসে প্রবেশ করার; সেটি হাসপাতাল, স্কুল কিংবা মন্ত্রণালয় যা-ই হোক না কেন। আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, 'সোনারার গ্রেপ্তার হওয়ার রেকর্ড কোথায়?' সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট মাথা নেড়ে তার অসহায়ত্ব জানালেন, বললেন, 'আমি জানি না।' আব্বা তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু বৃথা।

সর্বশেষ তিনিও অফিসারকে বলে আসলেন যে তিনি যেন তার ঊর্ধ্বতন অফিসারদেরকে জানিয়ে দেন যে, যদি সোনারার কোনো বিপদ হয়, তবে তারা কেউ রেহাই পাবে না। তারা আরও একটি পুলিশ স্টেশনে গেলেন, সেটি নাপিয়ার রোডের সিআইএর কেন্দ্র। এরপর তারা বাড়ি ফিরে আসলেন, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দু'ঘণ্টা পর ; এর মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটেনি।

একটি ফাঁদ পাতা হয়েছিল। আমার পিতার দুর্দমনীয় ভাব দেখে তারা বুঝতে পারছিলেন, তিনি কী করবেন। পরদিন বিকেল বেলা আমরা প্রথম একটি ট্যাঙ্ক পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পেলাম আমাদের বাড়ির বাইরে ।

* * *

১৮ সেপ্টেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার, আব্বার বিয়াল্লিশতম জন্মদিন। আমি সকালে উঠেই তার কাছে দৌড়ে গেলাম। আমি আগের রাতে সামান্যই ঘুমুতে পেরেছিলাম। দুশ্চিন্তায় ছিলাম সোনারার গ্রেফতার এবং মধ্যরাতে আব্বার সোনারার অনুসন্ধান কাজের কারণে। আমার পিতা যে কয়েকটি পুলিশের কার্যালয়ে ঝড় উঠিয়েছেন সেই চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরদিনের পত্রিকাগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়। সোনারাকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার এবং তার সাথে পুলিশ বাহিনীর কর্তৃক তার অপহরণের ব্যাপারে যোগসাজশের কোনো উল্লেখ ছিল না সংবাদপত্রগুলোতে।

আমরা অপেক্ষায় দিন কাটালাম : আব্বা ছিলেন আলী সোনারার সংবাদের জন্য আর আমরা অপেক্ষা করছিলাম সন্ধ্যায় আব্বার বিয়াল্লিশতম জন্মদিবস উদযাপনের। ওইদিন বিকেল বেলা আব্বা তার কামরায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন সন্ধ্যার জন্য। তিনি তার জুতা পালিশ করছিলেন– কিছু ব্যাপারে তিনি খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন– যেমন বই সাজানো, কলম ঠিকমত রাখা, কাপ যথাস্থানে রাখা, সন্ধ্যা বেলার জুতা পালিশ ইত্যাদি। আমি বললাম, 'আব্বা, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?' কথাটি আমি শোবার ঘরের

www.pathagar.com

দরজায় হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং মুচকি হাসলেন; তারপর বললেন, 'কি ব্যাপার, ফাটুসকি?' তিনি আমার রাশান ডাক নাম ব্যবহার করলেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আম্মা কি আমার আইনসম্মত অভিভাবক?' আব্বা তখনও হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু একথা কেন তুমি জিজ্ঞেস করছ?' জানি না কেন জিজ্ঞেস করছিলাম। আগে কখনো আমার মনে অভিভাবকত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন আসে নাই। আমি শুধু জানতাম যে, আমার পিতার কিছু হলে আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন। 'আব্বা, আপনি নিশ্চিত; শতভাগ নিশ্চিত যে আপনার পর আম্মাই আমার আইনসম্মত অভিভাবক?' আমি চাপ দিলাম। আব্বা আমার কাছে আসলেন। তিনি হাত দিয়ে আমার চিবুক ধরলেন এবং আমার মুখ তার দিকে নিলেন। তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমি নিশ্চিত। তুমি চিন্তা করবে না।' এই বলে তিনি কপালে চুমু দিলেন।

আমরা উভয়েই জানি, কেন আমি তাকে এই প্রশ্ন করেছি। আমার জন্মদাত্রী মা আছেন আমেরিকার কোনও এক স্থানে। আমার বয়স যখন তিন বছর তখন আব্বা তাকে তালাক দেন। আমি বহু বছর তাকে দেখি নাই। শিশুকালে আব্বাই আমার দেখাশুনা করতেন। তিনি আমাকে খাবার খাওয়াতেন, চুল কেটে দিতেন, স্কুলে আনানেয়া করতেন। আমার চার বছর বয়স থেকে ঘিনওয়াকে আমার মা বলে জানি, এর আগে আমি 'মা' সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

'আমি জিজ্ঞেস কললাম, 'আব্বা, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার কথাটি সঠিক?' তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন এবং বললেন, 'হ্যাঁ'।

'ভালো, তবে এর প্রমাণস্বরূপ কোনো কাগজপত্র কি আমি দেখতে পারি?' আব্বা জোরে হেসে উঠলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি কিভাবে এরূপ সন্দিগ্ধমনা হলাম। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, কাগজপত্র আছে, তবে তুমি কি এখনই দেখতে চাও?' আমি বললাম, 'আমি শুধু জানতে চাই, আপনার কাছে সে সমস্ত আছে কি না?'

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হলো। বন্ধুরা মিষ্টি ও ফুলের তোড়া নিয়ে যোগ দিল। আমি সারা সন্ধ্যা আব্বার পাশেই কাটালাম। আমরা খাবার ঘরে বসে খেলাম। ঘরটি সাজিয়েছিলেন আম্মা। আমার প্রপিতামহ স্যার শাহনেওয়াজের সময় থেকে ঘরটি রূপা দিয়ে সজ্জিত ছিল। আমার মনে হলো যেন দামেস্কের বাড়িতে আছি, করাচির ভয়াবহতা আর সন্ত্রাস থেকে অনেক দূরে। আসলে আমরা বিপদের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, যদিও তখন তা অনুভব করিনি। আব্বা ফোনের মাধ্যমে আলী সোনারার অবস্থান জানতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আমাদের কাছে তা গোপন করছিলেন, যাতে আমরা ভয় না পাই বা মন খারাপ না করি। আমরা সারাদিন কিছুই শুনি নাই। আরও দুশ্চিন্তার বিষয়, মনে হচ্ছে রাষ্ট্র আব্বার বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করছে। নগরে ছোট ছোট কিছু বিস্ফোরণ ঘটল, বাণিজ্যকেন্দ্রের বাইরে ময়লার ভাণ্ডারে, কিছু সদরের সরকারি অফিসের কাছে। কেউ আঘাত পায়নি, কিন্তু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নগরের সংবাদপত্রগুলোর বিকেলের সংস্করণে লেখা হলো যে, কর্তৃপক্ষ এজন্য দোষারোপ করছে পিপিপি (এসবি) এবং আমার পিতাকে।

সন্ধ্যায় দেখা গেল, আগের ট্যাঙ্কটির পিছনে আর একটি ট্যাঙ্ক রাখা হয়েছে। পরের

www.pathagar.com

দিন সকালে আনা হলো তৃতীয় ট্যাঙ্কটি, বাড়ির ডানদিকে এটিকে রাখা হলো, ৭১ ক্লিফটনের অফিসের কোণার দিকে। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ, দু'দিন পর, আরও চারটি আর্মড গাড়ি রাখা হলো ৭০ ক্লিফটনের দিকে তাক করে। আমাদেরকে ঘেরাও করা হলো।

'আপনি কি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ?' অ্যাভারি হোটেল থেকে জন্মদিনের খাবার খেয়ে বাড়িতে ফেরার পর আমি আব্বাকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তার সবুজ চেয়ারে বসেছিলেন, তার গা ছিল আঁড়াআঁড়ি এবং তার কুনই ছিল চেয়ারের বাহুর উপর। তিনি এক মুহূর্ত নীরব থাকলেন, তারপর বললেন, 'না'। আব্বা আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। 'আমি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, যে সরকার আমার পিতা ও ভাইকে হত্যা করেছে, আমি এ জন্য গর্বিত। আমাদের ব্যর্থতা এসেছে, কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি। আমরা প্রতিরোধ করেছি। আমি বারবার তা করেছি। প্রয়োজনে আবার করোব।' তিনি চেয়ারের পেছন দিকে হেলান দিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমি, আমার পিতামাতা অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বললাম– কিছুক্ষণের জন্য আমরা সারাদিনের উন্মাদনা থেকে দূরে থাকছিলাম। আব্বা ও আম্মা পরস্পরের সাথে খুনসুটি ও হালকাভাবে হাসাহাসি করছিলেন। তারা অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন; আমার কথায় বাস্তবতায় ফিরে এলেন।

আমি আব্বাকে বললাম, 'আপনার একটি বই লেখা উচিত'। আব্বা হেসে উঠলেন; বললেন, 'জীবিত অবস্থায় আমার পক্ষে বই লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি যে সব কথা জানি, তারা তা প্রকাশ করতে দেবে না।' আমি বললাম, 'কি বলেন আব্বা, আপনাকে নিজের জীবন সম্পর্কে বই লিখতেই হবে। সে হবে খুব উপভোগ্য।' কিন্তু তিনি আবার হেসে উঠলেন, এবার খুব আস্তে। 'না, আমি পারবো না। তুমি আমার হয়ে এ কাজটি করবে, তুমি আমার জীবন নিয়ে বই লিখবে।' তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। আব্বার চেহারার মধ্যে একটা সুন্দর ভাব আছে, যা আমি আর কারো মধ্যে দেখিনা। তার জীবনে অনেক অপ্রীতিকর, অনিশ্চিত এবং ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে, তা সত্ত্বেও তিনি তার হাসিকে আড়াল করেননি। আমি টেবিল থেকে একটি কলম ও একটুকরো কাগজ নিলাম, প্রাথমিক নোট নেয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। আব্বা বললেন, 'এখন না, তুমি এসব লিখবে আমার মৃত্যুর পর।' আমি গত কয়েক দিনের ঘটনা স্মরণ করে আতকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন আপনার মৃত্যুর পর?' 'এর আগে এসব খুবই ভয়ঙ্কর।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। তার চোখ ছিল বিষণ্ন। জানি না, তিনি সামনের অনিশ্চয়তার কথাও মনে করেছেন কিনা। পরবর্তী দিনগুলোতে আমার মনের অবসাদ ক্রমেই বাড়তে থাকল।

* * *

২০ সেপ্টেম্বর এবং দিনটি ছিল শনিবার।
ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সকাল বেলা বাড়িতে আচমকা অনেক ব্যস্ততা দেখা গেল। পরদিন আমার ভাই জুলফিকারের ষষ্ঠ জন্মদিবস। সে উপলক্ষে বেয়ারারা অত্যন্ত ব্যস্ত, আম্মা নানা রকম পরিকল্পনা করছেন। আমরা ঠিক করেছি, ওর জন্মদিন পালন করব সিন্দাবাদ নামে এক শিশু

www.pathagar.com

বিনোদন পার্কে। আমাদের বাড়ি থেকে এটি দশ মিনিটের পথ, ১৯৭০-এর দশকে এটি নির্মিত হয়েছিল একটি ক্যাসিনো, জুয়াখানা হিসেবে, এটি বর্তমানে শিশু-বিনোদনের স্থান, ইসলাম ধর্মসম্মত ছোটদের খেলার স্থান।

আমার কামরাটি নতুনভাবে সাজানো হচ্ছিল। আমার পোশাক পরা শেষ হওয়ার পর আমরা সাজানোর বিষয়টি তাকিয়ে দেখলাম। আমার নতুন শোবার ঘর সাজানোর জন্য পিতামাতা দস্তুর মতো ছোটখাট যুদ্ধের অবতারণা করেছেন। সমস্যা হলো, ঘরদোর সাজাবার বিষয়ে আব্বার কোনো পছন্দ ছিল না। আসলে তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শোবার ঘরের মাঝখানে একটি ডিস্কো বলের ব্যবস্থা করবেন, সেটি করার চেষ্টা করছেন। কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, নতুবা তার পরিকল্পনা হতো সম্পূর্ণ অস্বস্তিকর। আম্মা অবশ্য জানতেন আমার পছন্দের রং ... হালকা সবুজ দেয়াল এবং তাতে ফুল আকা। আব্বা আমাকে আট বছরের বালিকাই ভাবছিলেন এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করছিলেন।

আমরা হেঁটে গেলাম আমার নতুন রং করা কামরায়। এটি ছিল তখন সম্পূর্ণ সাদা, প্রাথমিক রং, বেইস কালার। কামরা একেবারে খালি, রট কালারের খাট এক কোনায়, দুইটি সাইড টেবিল এক পাশে পড়ে আছে। কামরাটিকে একটি হাসপাতালের মতো দেখাল। আব্বা এই সজ্জিতকরণ দেখে কিছুক্ষণ কৌতুক করলেন। আমার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল একসেট সিন্দ্বিগ্লাস যুক্ত জানালা।

ওইদিন বেলা দুইটায় আব্বা একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। ৭১ ক্লিফটনে বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকা এবং টেলিভিশনের সাংবাদিক উপস্থিত হলেন। কামরাটি ছিল উন্মুক্ত, জানালা ছিল বাগানের দিকে। আব্বা কামরায় ঢুকলেন এবং সাংবাদিকদের দিকে মুখ রেখে একটি লম্বা কাঠের টেবিলের উপর বসলেন। তারপর বসলেন আসিক জাতই, যিনি দলের সিন্ধু প্রদেশের সভাপতি এবং পিপিপি (এসবি) এর করাচি বিভাগের সভাপতি, মালিক সারওয়ার বাগ। আব্বা সেদিন পরেছিলেন নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ, সেটি এত গাঢ় ছিল যে, কাল বলে মনে হয়েছিল, গলায় ঝুলিয়েছিলেন হযরত আলীর তরবারির অনুকরণে তৈরি একটি তরবারি, যা ছিল বীরত্বের প্রতীক। তরবারিটি ছিল ছোট এবং সোনার তৈরি, তাতে লেখা ছিল, 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহা, অর্থাৎ, 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।' তার বামহাতে ছিল তার পিতা প্রদত্ত হাতঘড়ি; এটা ছাড়া তার শরীরে আর কোনো অলঙ্কার ছিল না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পূর্বে আব্বা ইয়ার মোহাম্মদ ও সাজ্জাদকে ডাকলেন একান্তে কিছু কথাবার্তার উদ্দেশ্যে। এই যুবক দু'জন তার দেহরক্ষী। তারা রাজনৈতিক কর্মীও, তবে আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসার পর থেকে তারা সবসময়ই তার সাথে থাকছেন। তারা তাকে নিজেদের পিতার মতই রক্ষা করেছেন। কখনো তারা তাকে ছেড়ে দূরে থাকেননি। আব্বা ইয়ার মোহাম্মদও সাজ্জাদকে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি পুলিশের কাছ থেকে কিছু তথ্য পেয়েছেন, যার ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে করাচি ছেড়ে যেতে বললেন। তিনি বললেন, যেখানে ইচ্ছা দূরে চলে যাও, তোমরা এবং তোমাদের পরিবারবর্গ এখানে কোথাও থাকবে না।

www.pathagar.com

আমরা জানি না, সোনারাকে ওরা কী করেছে; তাকে না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিরাপদে থাক, এটাই আমি চাই। সাংবাদিক সম্মেলনের পর আব্বার সুরজানি টাউনের জনসভায় ইয়ার মোহাম্মদ ও সাজ্জাদ তার সাথে ছিলেন না। তিনি তাদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিতে দেননি। তারা কিন্তু সরে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তারা বিপদের ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন, জিজ্ঞেস করেছেন, তথ্যের সূত্র। কিন্তু আব্বা ছিলেন নাছোড়বান্দা। তাদেরকে ওই দিনই নগর ত্যাগ করতে হলো।

আব্বা যখন সংবাদ সম্মেলন শুরু করলেন, কামরায় তখন একটা ভারী নীরবতা বিরাজ করছিল। দুইদিন পূর্বে মধ্যরাতে আব্বার পুলিশের কার্যালয়ে যাওয়া নিয়ে পত্রিকাগুলোতে সত্য-মিথ্যা নানা কাহিনী লেখা হয়েছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর, জেনারেল নাসিরুল্লাহ বাবর, যিনি বেনজির এর ক্ষমতাবান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি আফগান তালিবানদেরকে 'আমার ছেলে' বলেন, তিনি ইসলামাবাদে জাতীয় সংসদে বললেন যে উচ্চ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সন্ত্রাসী সোনারার গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে করাচিতে দুটো বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। তিনি সংসদ সদস্যদেরকে জানালেন যে, এর নেপথ্যে আছে এমকিউএম দল অথবা শহীদ ভুট্টোর দল। বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং দ্রুত আমার পিতার দলকে দায়ী করা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকগণ মুর্তজা ভুট্টোর বক্তব্য কী তা জানতে আগ্রহী। জেনারেল বাবরের এ বিষয়ে দূরদর্শীতার খবর সকল পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছে।

আব্বা তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনা শুরু করলেন, 'পুলিশ বাহিনীর মধ্য থেকে আমার বিরুদ্ধে একটি গোপন চক্রান্ত চলছে, এর মধ্যে জড়িত ওয়াজিদ দুরবানী এবং শাহবেইগ সাডডল।' আব্বা যে দু'জন কুখ্যাত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করলেন, গুজব আছে যে, বেনজিরের স্বামী জারদারীর সাথে সখ্যতা থাকার কারণে তারা উচ্চ পদ পেয়েছেন। এরা ভয়ঙ্কর নির্যাতনকারী বলে পরিচিত। সাডডল ছিলেন করাচির জেলা ইন্‌সপেক্টর জেনারেল এবং ওয়াজিদ দূরবানী ছিলেন সিনিয়র পুলিশ সুপার, আমার পিতা ১৭ তারিখ রাতে যে সকল পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলেন, তার একটিতে তিনি ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু আব্বা একজনের নাম ভুল বলেছেন, শোয়েব সাডডল এর পরিবর্তে বলেছেন শাহবেইগ সাডডল। আমরা আর কখনো শোয়েব সাডডল-এর নাম ভুলবনা। আব্বা তার বক্তব্য চালিয়ে গেলেন।

এই লোকগুলো সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ শাহের তত্ত্বাবধানে আমাকে হত্যা করতে চায়। এখন আমার জীবন বিপদাপন্ন। আমি সরকারকে বলতে চাই যে, আমার ব্যাগ প্রস্তুত। যেকোনো অভিযোগ এলে আমি এবং আমার আর কর্মীদের বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি করুন, আমি আপনাদের গাড়িতে উঠে বসব।' বস্তুত আব্বার ভরা ব্রিফকেস ১৭ তারিখ রাত থেকে তার বিছানার পাশে প্রস্তুত।

'আমার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ যে, আমি কয়েকটি পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি, একজন এমপিএ, আমার অধিকার আছে সরকারি অফিসে প্রবেশ করার। এই পর্যায়ে আব্বা আলী সোনারার একটি ছবি উঠালেন। এটি বেনজিরের জনসভার একটি ছবি। তার রাজনৈতিক সমাবেশ। তিনি মাথা ও ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, জিপের মধ্য থেকে। তার চারপাশে মানুষের ভীড় জমেছিল। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে,

www.pathagar.com

তাকে রক্ষা করছে, এরা তার দেহরক্ষী। সোনারাও তাদের মধ্যে একজন। ছবিতে বৃত্তের মধ্যে তাকেও দেখা যাচ্ছে। এই লোককে সরকার উঠিয়ে নিয়েছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিরউল্লাহ্ বাবর জাতীয় সংসদে বললেন যে, সোনারার গ্রেফতারের পর বোমা বিস্ফোরিক হয়েছে; এর পিছনে আছে এমকিউএম অথবা এসবি। যদি সত্যিই তিনি এই তথ্য আগেই পেয়ে থাকেন, কি ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন প্রতিরোধের জন্য? কিছুই না। কিছুই করার নেই। এটি ছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (শহীদ ভূট্টো)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানতেন যে বোমা বিস্ফোরিত হবে কারণ তার অফিসই কাজটি সম্পন্ন করেছে। আমি সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের দল একটি রাজনৈতিক দল এবং আমরা বেআইনি, পরওয়ানাবিহীন গ্রেফতারের এবং বিনাবিচারে রাজনৈতিক হত্যার প্রতিবাদ করব। আমরা আত্মগোপন করব না। আমরা প্রস্তুত। এরূপ কৌশল আমি অবলম্বন করি না যে, কর্মীরা বিপদে পড়ার পর নিজে আত্মগোপন করব। আমি সামনের সারিতে আছি, তারা আছে আমার পেছনে।'

আমরা বাড়িতে, ৭০ ক্লিফটনে দুপুরের খাবার খেলাম। পাশের ঘরেই আব্বা যখন সংবাদ সম্মেলন করছিলেন তখন আমরা সিভিউ-এর পথে যাত্রা করলাম জুলফির পার্টির তদারকি করতে। আম্মা ও আমি যখন ফিরে এলাম আব্বা হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরোচ্ছিলেন সাংবাদিক সম্মেলন ততক্ষণে শেষ হয়েছে। আসিক জাতই গাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি দৌড়ে যেয়ে আব্বার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি খুব দ্রুত এগুচ্ছিলেন এবং তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। 'আমার দেরি হয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।' দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে তিনি বললেন। আমি বললাম, 'আব্বা, আমি কাপড় বদলিয়ে আসছি। আমি আপনার সাথে যাব।' আব্বা আস্তে আমার কনুইতে চাপ দিয়ে বললেন, 'ফাতি, তুমি আসবে না। পরিস্থিতি নিরাপদ নয়। আমি তাড়াতাড়ি ফিরব।' আমি সিঁড়িতে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে দরজার বাইরে হেঁটে চলে যেতে দেখলাম, তারপর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

আব্বা গাড়ির দিকে হেঁটে ইয়ার মোহাম্মদ ও সাজ্জাদকে থামালেন। তিনি হতাশার ভাব নিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের দু'জনকেই বলেছিলাম আজ আমাদের সাথে না আসতে।' এই দুই ব্যক্তির উপরে ভয়ানক হুমকি আছে। এরা আমার পিতার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তাদের উপর অনেকটা নির্ভর করেন। ইয়ার মোহাম্মদ বলনে, 'আমরা এখন আপনাকে কিভাবে ত্যাগ করব?'

'যদি বিষয়টি আপনি যেরূপ ভয়ঙ্কর বলে মনে করেন, সেরূপই হয়ে থাকে', সাজ্জাদ বললেন, 'তবে আমাদের স্থান বাড়িতে নয়, আপনার পাশে।' উপদেশ দ্বারা তাদেরকে বিরত করা যাবে না। আব্বা অন্যান্য রক্ষীদেরকে এগিয়ে যেতে বললেন। সেদিন ছিল সাতজন লোক। তিনি বললেন, 'যদি তারা সমাবেশে যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার করে, তবে প্রতিরোধ করবে না। শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে। আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না। আমি ঠিকই থাকব। তারা পরওয়ানা উপস্থিত করুক এবং আমরা তাদের সাথে যাব।' লোকগুলো মাথা নাড়ল, বুঝল।

চারটি গাড়ি ওই শুক্রবার ৭০ ক্লিফটন থেকে যাত্রা করল। আব্বা বসলেন আসিক জাতইর নীল রঙের ল্যান্ড-ক্রুজারে। ইয়ার মোহাম্মদ বসলেন আব্বার পিছনে, আসিক

www.pathagar.com

জাতইর সাথে, সে ছিল আসিকের পারিবারিক গাড়িচালক এবং বেয়ারা আসগরও ছিল, সে প্রায়ই ভ্রমণের সময় আব্বার সাথে থাকত। সামনে ছিল একটি লাল ডবল কেবিনযুক্ত পিক-আপ ট্রাক, তাতে ছিল ছয়জন লোক। এরা হলো কায়সার, সাত্তার রাজপার, রহিম ব্রোহী– এরা ছিল আমার পিতার রক্ষী এবং অন্য আরও দু'জন। একটি ছোট সাদা আল্টো গাড়ি, দেখতে দিশালাই বক্সের আকারের, আব্বার গাড়ির পাশ দিয়ে চলছিল। এতে ছিল তিনজন লোক, দু'জন ছিল সেদিনের সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রী এবং সাজ্জাদ। সাজ্জাদের অনুরোধেই আল্টো গাড়িটি নেয়া হয়েছিল এবং আব্বার গাড়ির পেছনে এটি চলছিল। এটি রাখা হয়েছিল বিকল্প হিসেবে। শেষের গাড়িটি ছিল একটি পাজেরো জিপ। এটির মালিক ছিলেন দলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষি, কর্মী নন। আব্বার সাতজন রক্ষীর মধ্যে সর্বশেষ জন যাচ্ছিলেন পাজেরোর মালিকের সাথে এবং সঙ্গে আরও একজন যাত্রী ছিলেন।

সুরজানি টাউন করাচির বাইরে একটি শহরতলী। করাচি থেকে অনেক দূর– এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু এই রুগ্ন শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অপূর্ব সুযোগ ঘটে সপ্তাহের শেষে। আব্বার ছোট পাহারা গাড়িটি সুরজানি টাউনের দিকে যাচ্ছিল বেলুচিস্তানের নামবেলা দিয়ে। ক্লিফটনকে পেছনে ফেলে, তারা তিন তলোয়ারের স্মৃতিসৌধ অথবা 'একতা, বিশ্বাস, শৃঙ্খলা', এই নীতিবাক্যগুলোকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলা। এর ওপর উঠানো আছে বড় মার্বেলে তলোয়ার– তা আকাশের দিকে উঠে আছে। তারা সদর ও আরও কিছু বাজারের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলেন– এর মধ্যে আছে জয়নাব মার্কেট। সেখানে মহিলা ও শিশুদের কাপড়-চোপড় বিক্রি হয়। এরপর আছে পুরুষদের দর্জি দোকান জেন্টিনা, এর কাছেই সমবায় মার্কেট ও করাচি কেন্দ্রীয় ডাকঘর, আর আছে ইলেকট্রনিক্স মার্কেট সেখানে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য কিছু জিনিস অর্ধেক দামে কেনা যায়। আমার পিতার সর্বশেষ ভ্রমণ ছিল সুন্দর। তার গাড়ি যাচ্ছিল কায়েদ-ই-আযম জিন্নাহর মাজারের পাশ দিয়ে, সেখানে তরুণ হকাররা ছিল তাদের পাখি বিক্রির উদ্দেশ্যে সুরজানির শিশু ও পর্যটক শিকারে ব্যস্ত। আরও উত্তর দিকে যাওয়ার পর তাদের পাহারায় নিযুক্ত গাড়ির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশটি।

প্রায় ছয়টার দিকে আব্বার গাড়িটি পৌঁছিল সুরজানি শহরের সূচনায় যেখানে আছে একটি বিলাশবহুল বিবাহ হল, তার লাগোয়া একটি পুলিশ চৌকি, যার চারদিকে নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। ছোট্ট শহরতলির বৃত্ত ঘুরে বড় শহরে যেতে হয়।

আব্বা যাচ্ছিলেন ইউসুফ গোথের কাছের একটি বস্তিতে। তিনি বক্তব্য রাখলেন এলাকার অত্যন্ত গরিব লোকদের কাছে। দলের অনেক কর্মী তাকে সেখানে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আগস্টে তিনি লেয়ারিতে একটি বড় জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। মালিক সারওয়ার বেগ বলেছিলেন যে প্রত্যেকেই তাকে সুরজানি টাউনের সভায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তার পিতার মতই তাকে বিরাট অভ্যর্থনা দেয়া হয়েছিল লেয়ারিতে। তাই, সুরজানির মতো ছোট একটি স্থানে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু আব্বা কর্মসূচি বাতিল করতে সম্মত হলেন না। সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য তিনি একটি দলীয় অফিস উদ্বোধন করলেন।

সেখানে ২,০০০ লোকের সমাবেশ ঘটল। আব্বা গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন যে, পুলিশ বাহিনীও এসেছে। পুলিশ বাহিনী এসেছে ত্রিশটি বড় ট্রাক সাথে নিয়ে। এরকম ট্রাক

www.pathagar.com

দিয়ে বন্দী পরিবহন করা হয়। সেই সন্ধ্যায় সুরজানিতে এসেছিল হাজারখানেক পুলিশ এবং সব স্থান জুড়েই তাদেরকে দেখা যাচ্ছিল। তারা জনতার পাশেই অস্ত্র ওয়াকি-টকি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, কিন্তু কিছুই করল না। পুলিশ শুধু দাঁড়িয়ে থাকল, যারা আমার পিতাকে দেখতে সেখানে এসেছে, তাদেরকে পরোক্ষভাবে ভয় দেখাতে।

আব্বা প্রথমে একজন খ্রিস্টান দলীয় কর্মীর সাথে হেঁটে চললেন। ওই কর্মীর নাম ইউসুফ গীল। তিনি তার সাথে বস্তিতে নতুন পার্টি অফিসে গেলেন। উৎসাহী সমর্থক শ্লোগান দিতে লাগল, 'এসেছেন, এসেছেন, ভুট্টো এসেছেন, গরিবের নেতা মুর্তজা এসেছেন।' 'হরিদের নেতা মুর্তজা গরিবদের নেতা মুর্তজা, কর্মীদের নেতা মুর্তজা এসেছেন।' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকল তারা। আরও উচ্চারিত হলো, 'কৃষকের নেতা, গরিবের নেতা, হরিদের নেতা মুর্তজা।' ফিতা কেটে অফিস উদ্বোধন করার পর এক কামরার অফিসটি তিনি ঘুরে দেখলেন, তারপর দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। আব্বা মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আজানের শব্দ আসল। আব্বা থামলেন, তবে তা আজানের জন্য নয়, সূর্য তখন ডুবছিল। তিনি সিদ্দিকী নামক একজন লোককে ডাকলেন। তিনি ছিলেন দলের আলোকচিত্র শিল্পী। তাকে তিনি বললেন, দিগন্ত বলয়ের একটি ছবি নিতে। এটি ছিল সুন্দর এবং তিনি এটি স্মরণে রাখতে চেয়েছিলেন। এরপর তিনি অপেক্ষমান জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলেন। তারপর তাকিয়ে দেখলেন জনতাকে। কিছু সংখ্যাক মহিলা তাকে গলায় মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিল। তাঁর পেছনে ছিলেন আসিক জাতই, সম্প্রতি তিনি দলের সিন্ধুর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে অভিনন্দন দিতে যে সমস্ত কর্মী এসেছে, তাদের সাথে তিনি করমর্দন করলেন।

কয়েকজন মহিলা আসলেন তাদের সন্তানদের নিয়ে আব্বার সাথে পরিচিত হতে। এক তরুণী খুব জমকালো পোশাকে এসে তার গলায় মালা পরিয়ে দিল। আব্বা ও আসিক জাতই বসে পড়ার পর ইয়ার মোহাম্মদ তাদেরকে পাহারা দেয়া শুরু করলেন। কাল পোশাক পরে তিনি তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রথমে বক্তব্য রাখলেন করাচি বিভাগের সভাপতি সারওয়ার বাগ। তিনি পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর করাচি প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন। তিনিও একটি গাঢ় কাল শালওয়ার কামিজ পরেছিলেন, গলায় ছিল মালা। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং 'পরম দয়াময় আল্লাহর নামে' বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহকে ধন্যবাদ'। এটি তার তৃতীয়বারের মতো ইউসুফ গোথের জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তিনি জনগণকে ধন্যবাদ জানালেন, অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য। তিনিও আলী সোনারার বেআইনী গ্রেফতারের প্রসঙ্গ উথাপন করলেন। বললেন, 'তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এখনও আমরা জানি না কার হাতে এখন তার জীবন আছে।' কথাগুলো তিনি জোর দিয়ে বললেন। তিনি খুব কঠিন ও জোরালোভাবে বলতে থাকলেন, 'পাকিস্তানের জনগণকে শাসন নেওয়াজ বা বেনজির করবে না'। জনতার দিকে চেয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে তিনি কথাগুলো বললেন। আসিক বেনজিরের সাথে কাজ করেছেন ১৯৮০-এর দশকে এমআরডির সময়কালে এবং জিয়াউল হক কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছেন।

বেনজিরের প্রথম সরকার গঠন করার পর থেকেই আসিকের আর বেনজিরের প্রতি আস্থা

www.pathagar.com

নেই। তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বেনজিরের ক্ষমতা জনগণের কল্যাণের জন্য নয়। তাই তিনি তার দল ত্যাগ করেন। তিনি বললেন 'শাসন করবে জনগণ, জনগণই হবে তাদের শাসক।' তিনি ছিলেন একজন ভদ্রলোক। আসিক শব্দের অর্থ, যিনি ভালোবাসেন বা প্রেমিক। তিনি মাথার উপরে হাত উঠিয়ে বলতে থাকলেন, 'আমাদের প্রতীক মক্কা, প্রথম, আমরা ওই দুজনকে দেখাব যে, এই মক্কার শক্তি আসে জনগণ থেকে– বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু থেকে। আপনারাই আমার শক্তি এবং আমরা একত্রিত হয়ে পাকিস্তানে আবার আনব সঠিক নেতৃত্ব– জনগণের নেতৃত্ব।' সন্ধ্যার শেষ বক্তা ছিলেন আব্বা। তিনি মঞ্চ থেকে উঠে সামান্য এগিয়ে আসতেই জোরে শ্লোগান উঠল 'ভুট্টো জীবিত আছেন।' তারা চিৎকার করে উঠলেন, 'ভুট্টো জীবিত আছেন।' 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন থাকবে, ভুট্টোর বংশধর ততদিন থাকবে।' জনগণ খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিল। তারা মঞ্চে গোলাপ ফুল নিক্ষেপ করে উল্লাস প্রকাশ করা শুরু করে।

আব্বা শ্রোতাদের ধন্যবাদ দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'প্রশাসনের চাপ থাকা সত্ত্বেও ইউসুফ গোথের এই সমাবেশ একটি গণভোট স্বরূপ। এটি আলী সোনারা এবং তার কর্মীদের পক্ষে গণরায়। এটি এই সরকারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণরায়। ইউসুফ গোথের জনগণ ভীতু নয়। আজ আপনারা আমাদের সাথে আছেন, সরকার আমাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আমরা ভীত নই। এই পর্যায়ে জনতা গর্জে উঠলে আব্বা একটু থামলেন। তারপর হাত উঠিয়ে বললেন, কথা শুনুন, 'ইতিহাসে দেখা যায় যে, শাসকের অত্যাচারের, অবিচারের বিরুদ্ধে যিনিই কথা বলেন, প্রতিবাদ করেন, তাকেই বলা হয় সন্ত্রাসী। আজকের পাকিস্তানে রাষ্ট্রই জনগণের রক্ত পান করছে। সরকারি পিপলস পার্টি আপনাদের দল নয়। এটি কোনো মর্যাদাসম্পন্ন দল নয়। আমাদের দল কায়েদে আযমের দল, এটিই আপনাদের দল, জনগণের দল, শহীদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল।' আব্বা শূন্যে হাত নাড়লেন।

তার কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হতে থাকল। তিনি ওয়াজিদ দূররাণী ও সোয়েব সাডডল-এর নাম উচ্চারণ করে তাদের সমালোচনা করতে থাকলেন। 'আমরা তোমাদের সিআইএ পুলিশ কেন্দ্র বা পুলিশ বাহিনীকে ভয় পাই না।' 'আমরা তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শাহকেও ভয় পাই না।' এ পর্যায়ে আব্বা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন; বললেন, 'আবদুল্লাহ শাহ, শুনে রাখুন, কুকুরের পক্ষে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তোমাদের দুর্নীতিবাজ পুলিশ বাহিনী, রাজনৈতিক বিবৃতিসহ কিছু কাগজপত্র তৈরি করেছে। এরূপ কাজ করার অধিকার তাদের নেই। তারা জনগণের রক্ষক, নিরপেক্ষ থাকবে। তারা আমার বাড়ির চারদিকে সাঁজোয়া বহর স্থাপন করেছে গত কয়েকদিন যাবত। 'আমরা মীর মুর্তজা ভুট্টোর গ্রেফতারের অনুমোদন চাচ্ছি;' ঔদ্ধত্যপূর্ণ্যভাবে এরূপ কথা তারা লিখেছে। তারা আরও লিখেছে, 'আমরা অপেক্ষা করছি কারণ তিনি একজন এমপিএ এবং উপর থেকে অনুমোদন পেতে হবে।' তিনি বললেন, 'আসুক অসভ্য লোকেরা, আমি প্রস্তুত, তোমার দুর্নীতিবাজ পুলিশ বাহিনীকে আমি মোটেই ভয় পাই না।'

আবারও সোনারার গ্রেফতারের প্রসঙ্গ আসল। সম্ভবত এটিই সমাবেশের সবচেয়ে জরুরি বিষয়। আমার পিতার উপর আসন্ন বিপদের চেয়ে এটি অগ্রাধিকার পেল। আব্বা বলে চললেন, 'মনে রাখুন আমরা একটি রাজনৈতিক দল। আমাদের কর্মীদের উপর এরূপ

www.pathagar.com

নির্যাতন, মোটেই ঠিক না। এরূপ করা চলবে না। আমরা জনগণের কাছে যাব, রাজনৈতিকভাবে লড়ে যাব, নীরব থাকব না– তিনি সুফি গীত থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, 'ধাম দামাদম মাস্ত কালান্দার।'

সভা শেষ হওয়ার পর মকবুল চান্না, যিনি সুরজানি শহরের এই সমাবেশের আয়োজন করেছে, তার বাড়িতে আব্বাকে এককাপ চা পান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মালিক সাওয়ার বেগ সাথে যেতে পারেননি, কারণ পরদিন প্রেসক্লাবে যাওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি বার বছর পর আমাকে বললেন, যদি আমি জানতাম, কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তবে আপনার পিতাকে রেখে আমি চলে যেতাম না।'

* * *

ওইদিন ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে– দিনটি ছিল বেদনাদায়ক। সময়টা ছিল সন্ধ্যা। আম্মা রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছিলেন, আমি গিয়েছিলাম পিতা-মাতার শোবার ঘরে, সাথে ছিল জুলফি, সে বিছানায় শুয়ে টিভি দেখছিল। তখন সে ছিল ছোটশিশু এবং সবাই তাকে যত্ন ও স্নেহ করত। আমরা মাঝেমধ্যে দেখতাম 'লস্ট ইন স্পেস', ১৯৬০-এর দশকের একটি সিনেমা, এতে আছে মহাকাশচারীদের হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। এরমধ্যে আর কিছু ছিল না। জুলফি তখন বিরাট বিছানায় শুয়ে আয়েস করে শো দেখছিল। তখন সময়টা ছিল আটটার কাছাকাছি। ইন্টারকম ফোন বেজে উঠল। আমার সহপাঠি নূরীর ফোন। সে করাচির মার্কিন স্কুলে নবম গ্রেডে আমার সাথে পড়ে। বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রকল্পের জন্য কাজ করার উদ্দেশে সপ্তাহ শেষে নিজেদের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল। আমি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায় ঝুঁকে কথা বলছিলাম। একটু পরে, কানে আসল গুলির আওয়াজ। একটি মাত্র গুলির আওয়াজই পাওয়া গেল। মনে হলো, খুব কাছে কোথাও গুলি হচ্ছে। আমি কান থেকে ফোন সরিয়ে নিলাম এবং অপেক্ষা করলাম জানতে, জুলফি কিছু শুনেছে কিনা।

কয়েক সেকেন্ড পরও আওয়াজটি আমার কানে বাজছিল। আবারো গুলির শব্দ, মনে হলো প্রথম গুলিটির পর আত্মরক্ষামূলক গুলি চালানো হচ্ছিল। আওয়াজ আসছিল জানালার বাইরে, ডানদিক থেকে; আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার মাথার উপর দিয়ে গুলি যাচ্ছে। আমি নূরীকে বললাম, 'আমি তোমাকে পরে ফোন করব।' আমি আর্তনাদ করে ফোন ছেড়ে লাফিয়ে বিছানায় যেয়ে জুলফিকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সে ছিল জানালার খুব কাছে। যদিও আমি স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তবু মনে হচ্ছিল যে, ভয়াবহ একটা কিছু ঘটছে। আমি জুলফিকে নিয়ে দ্রুত পোশাক বদলের ঘরে গেলাম। সেটি ছিল জানালাবিহীন একটি ছোট ঘর। আমি দরজা বন্ধ করলাম এবং গোছলখানার দরজায় গেলাম। গোছল খানায় জানালা আছে এবং সাজঘরের সাথে এর সংযোগ আছে। আমি ভালোভাবে জানালা বন্ধ করলাম এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। জুলফি ছিল ছোট ও শান্ত আর সারা মাথা জুড়ে ওর উজ্জ্বল কাল চুল। তার পাখির মতো চেহারা দেখে তার ভয়পাওয়া বুঝা যাচ্ছিল না। মিনিট পাঁচেক যাবত অবিরত চলছিল বুলেট ক্ষেপণ। সে সময় জুলফি আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিল। আমি তাকে নিজের বুকে আশ্রয়ে নিলাম, যেন শব্দ থেকে আমি তাকে রক্ষা

www.pathagar.com

করতে সক্ষম। 'আম্মা কোথায়?' আমি জানতাম না। আমি মনে করেছিলাম, তিনি রান্না ঘরেই আছেন; রান্নাঘরের মুখ বাড়ির অন্যদিকে, তাই গুলির আওয়াজ সেখানে ভালভাবে শোনা যায়নি।

আমরা কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলাম। এটি থেমে গেল। আমি জুলফিকে বললাম যে আম্মার খোঁজে যাচ্ছি, সে যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে। আমি উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই আম্মা শোবার ঘরে ঢুকলেন। 'আমরা এখানে।' এই বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তিনি পোশাক বদলের কামরার দিকের দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে দিলেন। এরপর জুলফি ও আমাকে আকড়িয়ে ধরলেন। এরপর আম্মা দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'চল, আমরা বৈঠকখানায় যাই।' সেখানেও কোনো জানালা নেই, তবে তা এত আবদ্ধ নয়।

আমরা বৈঠকখানায় বসে প্রায় আধাঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। গুলি চালনা বন্ধ হলো। আমরা পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম; বাইরে কী হচ্ছে জেনে আমাদেরকে অবহিত করতে। সে জানাল যে, এলাকায় পুলিশের ভীড়। তারা তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না। পুলিশ চৌকিদারকে বলেছে যে ডাকাতি হয়েছে এবং বাইরে ডাকাত আছে। আম্মা মুখে হাত রেখে বৈঠকখানার সোফায় বসে রইলেন। আমি কামরায় পায়চারি করতে লাগলাম। ওই সময় পাকিস্তানে কোনো মোবাইল ফোন ছিল না। গণতান্ত্রিক সরকার তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল (বাজার থেকে প্রত্যাহার করার পূর্বে তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কিছু রেখেছিল) আব্বার সাথে যোগাযোগ করার কোনো পথ তখন ছিল না। ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না।

রাত আটটা বেজে গেছে। ইতোমধ্যে আব্বার ফিরে আসার কথা। তবে আমরা চেষ্টা করলাম চিন্তিত না হতে। কিন্তু প্রতি মিনিটে আমি উত্তেজিত হতে শুরু করলাম। ভাবলাম এমনও হতে পারে যে, আব্বাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সেজন্য পুলিশ উল্লাস প্রকাশ করছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলাম– অনেক গুলি হয়েছে, করাচির ওই সময়ের সাধারণ গোলাগুলির চেয়ে অনেক বেশি। জুলফি আব্বার সবুজ আরাম কেদারার পেছন থেকে আমাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলল এগুলো আতসবাজি। এভাবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। সময় এখন প্রায় নয়টা। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। আম্মাকে বললাম যে আমি আমার ফুফু, প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাই। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, বেনজির আব্বাকে গ্রেফতার করেছে এবং আমার পিতা যখন জেলে যাচ্ছেন, আমি সেখানে বসে থাকতে পারিনা। আমি লাল ইন্টারকমটি হাতে নিলাম এবং অফিসের যে লোক সেটি ধরল, তাকে বললাম প্রধানমন্ত্রীর বাসা ইসলামাবাদে সংযোগ দিতে। আমি ফুফুর সাথে কথা বলতে চাই।

মিনিটখানেক পর ফোন বেজে উঠল। আমি যতটুকু সময় লাগবে বলে মনে করেছিলাম, তার চেয়ে কম সময়ই লাগল। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংযোগ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার, যদি তিনি ফুফু বা কোনো আত্মীয় হয়, তবু। আমি ফোন করলাম এবং সংযোগ পেলাম প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবের সাথে। আমি আব্বার আরাম কেদারায় বসেছিলাম। অপর প্রান্ত থেকে কথা শোনা গেল, 'হ্যালো, ওয়াদি, সব ঠিক আছে তো?' এডিসি কাঁপা কাঁপা গলায়

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলেন। আমার জানা ছিল না, কারসাথে আমি কথা বলছিলাম– অবশ্যই এই একান্ত সচিবের সাথে আমার কোনো আত্মীয়তা ছিল না। আমি বললাম, 'সবকিছু ঠিক। আমি কি ফুফুর সাথে কথা বলতে পারি?' আমি বিরক্ত বোধ করছিলাম, কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, 'আপনার পরিবারের সবাই ভাল আছে? সবকিছু ঠিকঠাক?' সব কিছু ঠিক আছে, এই খবর শুনে একান্ত সচিব আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

অপর প্রান্তে বাধা আসল ক্লিক শব্দে এবং তারপর নীরবতা।

'হ্যালো, ফুফু' বলে আমি তার কাছে যে নামে পরিচিত, সেই নাম বললাম। এরপর জবাব আসল, 'না, তিনি এখন ফোনের কাছে আসতে পারবেন না।' তিনি ছিলেন জারদারি। এটা গোপন নয়, আমাদের পরিবারের কেউ ফুফুর তেল তেলে স্বামী জারদারিকে পছন্দ করেন না। খুব কম অনুষ্ঠানে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং নিতান্ত দায়সারা গোছের হ্যালো, বা অনুরূপ ভদ্রতাসূচক শব্দ ব্যতীত তার সাথে আমার কখনো কোনো কথা হয়নি। 'আমার ফুফুর সাথে কথা বলা দরকার।' আমি ভদ্রভাবে জারদারিকে জানালাম যে, তার সাথে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না। 'তা, তুমি পার না'– জারদারি রূঢ়ভাবে বললেন। 'আমি বললাম, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, আমার তার সাথে কথা বলা প্রযোজন, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না। তার সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন।' আমি তাকে বারবার অনুরোধ করলাম। এই ফোনের কথাবার্তায় আমি ইতোমধ্যে অনেক সময় ব্যয় করেছি। জারদারি বললেন, 'তিনি কথা বলতে পারবেন না। তিনি অস্থির আছেন।' পেছন থেকে আর্তনাদের আওয়াজ শোনা গেল। ইতোপূর্বে একদম নীরব ছিল, জারদারির সাথে সেখানে কেউ ছিল বলে বুঝা যাচ্ছিল না; হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে চিৎকারের আওয়াজ আসতে লাগল। আমি জারদারিকে বললাম, 'কি বলছেন? আমার তার সাথে কথা বলতেই হবে। দয়া করে তাকে সংযোগ দিন।' আমাকে ফুফুর সঙ্গে কথা বলতে না দিয়ে এই নাটকীয়ভাবে তিনি নিজেই কথা বলে যাচ্ছিলেন দেখে আমি বিভ্রান্ত ও সন্দিগ্ধ হলাম। এরপর জারদারি বললেন, 'ও, তুমি জান না; তোমার পিতা তো গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।'

www.pathagar.com

২

কথিত আছে, ভূট্টো পরিবারের আদি বাসস্থান রাজস্থানের মরুভূমিতে এবং তারা সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদীর তীরে চলে আসেন। তারা প্রথমে বসতি স্থাপন করেন মিরপুর ও গহরি খোদাবক্সের মধ্যবর্তী মিথুজো মিকাম নামক ছোট একটি গ্রামে। গ্রামটি নামকরণ করা হয় এর আদি বসতিস্থাপনকারীদের মধ্য থেকে একজন রাজপুত যোদ্ধার নামানুসারে। রাজপুত শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ রাজপুত থেকে, যার অর্থ রাজার ছেলে। তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা। তারা বংশগতি খুঁজে পায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল মোঘল ও ব্রিটিশদের সাথে। মিথু জো মিকাম পারিবারিক শত্রুতার কারণে রাজস্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, পাকিস্তানে এসেও তারা দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাননি।

তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন সিন্ধু প্রদেশে। কিন্তু ভুট্টোরা ছড়িয়ে পড়লেন দক্ষিণে থাট্টা পর্যন্ত, অন্যরা গেলেন আরও উত্তরে পাঞ্জাবে। মিথু জো মিকাম ভূমি সমস্যার মীমাংসা করে নিজের নামে গোষ্ঠী গঠন করলেন। যখনই দু'জন ভূমি চাষীদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিত, একজন চলে যেত মিকামের কাছে; তিনি মীমাংসা করে দিতেন, তবে সাধারণত উপহার হিসেবে কিছু জমি নিতেন।

ক্ষুদ্র উপজাতি হওয়া সত্ত্বেও ভুট্টোরা জলের কারণে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মোঘল আমলের পর যখন ব্রিটিশ শাসন করছিল ভারত, প্রথমে শাসনভার ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে; তারা মনে করলেন যে জলবিহীন এই অঞ্চলকে কাজে লাগানোর জন্য সাহায্যের প্রয়োজন। জেকোবাদের বাগারি বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর উঁচু ভূমির মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সেখানে একটি বড় জলপথ ছিল, যা তখনও খালে পরিণত হয়নি। জল ছিল উন্মুক্ত এবং প্রচুর। সে সময়ে সিন্ধুতে কোনো বড় জমিদার ছিল না, তিনি এই জলভূমি দখল করেন এবং এর চারদিকে চাষাবাদ করেন। সরকারেরও এ বিষয়ে কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না, তবে যারা বড় জনশক্তি নিয়ে এটি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে স্বাগতম জানিয়েছেন।

দোদা খান এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি একজন রাজপুতও তখন থেকে থাকে, তবে তা তিনি নিজে। তার ছিল চার সক্ষম পুত্র এবং ছিল পূর্বপুরুষের যোদ্ধা-রক্ত, নির্বাসন জীবনেও তা বিলুপ্ত হয়নি। তিনি তার পুত্রদেরকে সাথে নিয়ে প্রদেশের সকল ভূট্টোকে সংগঠিত করলেন– বললেন, 'যদি তোমরা এই জমিতে আবাদ করতে পার, তবে এটির মালিক হবে তোমরা।' এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

তাই, ভূট্টোরা আসলেন। জমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গণ্ডগোলে অনেকেই আহত হলেন, তবে তারা সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। কাছেই ছিল বেলুচরা, তারাও বংশানুক্রমিক যোদ্ধা, তাই তারাও জমিগুলো সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন, তাই তারা যুদ্ধ করলেন।

ভূট্টোরা যুদ্ধ করেছেন এবং আহত বা নিহত হয়েছেন; আহত লোকেরা গ্রামে ফিরে আসলে তাদের পরিবর্তে অন্য এলাকা থেকে ভূট্টো বংশের লোক পাঠানো হতো যুদ্ধ করতে। তারা যুদ্ধ করতেন দোদা খানের নেতৃত্বে, যিনি তাদেরকে পরিচালন করতেন এবং প্রয়োজনীয় কৌশল ও মেধা প্রয়োগ করতেন। এর ফলে ভূট্টোরা লারকানার কাছে নওডেরো থেকে পঞ্চাশ থেকে আশি মাইল বিস্তৃত সিন্ধি-বেলুচ সীমান্তে জেকোবাদের গারহি খায়কো পর্যন্ত স্থান দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই সময়ে ভূট্টোরা বিশ্বাস করতেন যে, যে ভূমি দখল করার জন্য তারা এত যুদ্ধ করেছেন, তা বিক্রি করা হারাম। তাই, তাদের জমিজমা বাড়তেই থাকল। আসিক ভূট্টো নামের জুলফিকার আলী ভূট্টোর একজন আত্মীয়, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী ও সজ্জন, কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল, তিনি আমাকে দোদা খানের কাহিনী বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা এখন লারকানার ভূট্টো বলে পরিচিত, কিন্তু ভুল করবে না– ওই সময় ভুট্টোরা ছিল সর্বত্র এবং জুলফির ভূমি সংস্কারে পূর্ব পর্যন্ত জেকোবাবাদের বেশিরভাগ জমির মালিকই ছিল তারা। সর্বশেষ সময়ে এই উপজাতি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি অঞ্চলে বসবাস করা শুরু করল। গারহি খুদাবক্সে তোমরা লারকানার ভুট্টোরা আছ। গারহি ভুট্টোর লাইনে আছে ইলাহি বক্স থেকে আগত ভুট্টোরা, আসিকদের পরিবার ও তার ভাই মোমতাজ, যিনি বর্তমানে এই ভুট্টো গোত্রের সরদার।

নাওদেরুর তৃতীয় শহরের সম্পদশালী রসুল বক্সের একমাত্র ছেলে আহমেদ খান পরিচালনা করতেন স্থানীয় ভুট্টোদের । তিনটি শহর ছিল কাছাকাছি, কিন্তু ভুট্টোদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় ছিল না।

ক্লিফটনে আসিকের ঘরে ভুট্টো পূর্বপুরুষদের আলোকচিত্র ছিল। বারান্দার উভয় দিকের দেয়ালে গারহি ভুট্টোদের আলোকচিত্র সজ্জিত ছিল; এদের মধ্যে আলোকচিত্র ছিল ইলাহিবক্স, তার পুত্র পীর বক্স, তার পৌত্র ওয়াহিদ বক্স, যিনি পরবর্তীতে সরদার হয়েছিলেন এবং আসিকের পিতার। জুলফিকার আলী ভুট্টোর যুবক বয়সের আলোকচিত্র ছিল তার আত্মীয়ের সাথে, আমার পিতা মুর্তজা ভুট্টোর ছবিও আছে, একটি চামড়ার জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায়; আরও আছে আসিকের তিনটি সুন্দরী কন্যার ছবি।

বারান্দার শেষ প্রান্তে, দৃষ্টির বাইরে দোদা খানের একটি ছোট্ট ছবি আছে। আসিক আমাকে দেখিয়েছিলেন করাচির কোনো এক গ্রীষ্মের সকালে। এটি ছিল অনেক পুরানো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাগজের একটি সনদ। এতে লেখা আছে : 'মহামহিম ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল কর্তৃক এই সনদ প্রদান করা হলো, তিনি মহানুভব ভিক্টোরিয়া, ভারতের সম্রাজ্ঞী; তিনি দোদা খানকে ভূস্বামী হিসেবে আনুগত্য ও ভালো কাজের স্বীকৃতি দিচ্ছেন।' এতে স্বাক্ষর দান করেছেন ভাইসরয়, তারিখ ১ জানুয়ারি, ১৮৭৭। আসিক কাকা আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'আমি ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টিকে মোটেই পছন্দ করি না, তাই এটিকে আমি দৃষ্টির বাইরে রেখেছি।' এটি রক্ষিত হয়েছে একটি পাতাওয়ালা গাছের পেছনে।

www.pathagar.com

এইভাবে ভুট্টোরা সংখ্যায় বাড়তে থাকল সে সময়ের ক্ষমতাশালীদের সহায়তায়। তিন শাখার অসংখ্য ভুট্টো রাণীর কাছ থেকে উপাধী পেতে শুরু করলেন। নাওদেরুর ভুট্টোদের মধ্যে রাসুল বক্সের হিংস্র হিসেবে খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন শক্ত শরীর ও ছোট সাদা চুলের এবং তার দাঁড়ি ছিল সাদা, ছোট। আসিক কাকার দেয়ালে সাধারণ একটি চেয়ারে বসা অবস্থায় রাসুল বক্সের ছবি দেখা যাচ্ছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল, তার একহাতে আছে শিকারি রাইফেল, অন্যহাতে একটি মৃত হরিণ, যার গলা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। রাসুল বক্সের একমাত্র ছেলে আহমেদ খান ছিলেন খুব ধনী। রাসুল বক্সের একটা খুব খারাপ অভ্যাস ছিল যে, তিনি সব সময় পথচলা অবস্থায় সব কিছুকেই গালাগালি করতেন। একদিন তার মুন্সি বা ভূমি ব্যবস্থাপক, যিনি তার অধীনে বহু বছর যাবত চাকরি করছিলেন, বললেন, 'স্যার, রাগ করবেন না, আমি একটা অনুগ্রহ পেতে পারি?' রাসুল বক্স বিরক্তি প্রকাশ করলেন। মুন্সি তবু বলতে থাকলেন, 'আপনি কি একটি বিকেল গালাগালি না করে বা অভিশাপ না দিয়ে থাকতে পারেন? আপনি যদি তা পারেন, তবে আমি আল্লাহ ও পীর-দরবেশদের কাছে আপনার মঙ্গলের জন্য দোয়া করব।' রাসুল বক্স বললেন, 'যদি আমি গালাগালি করি?' তখন মুন্সি বললেন, 'সে ক্ষেত্রে আপনি আমাকে পাঁচ মাসের বেতন দিবেন, আর যদি আপনি কোনো গালাগালি না করেন, তবে আমার পাঁচমাসের বেতন কাটবেন।' রাসুল বক্স তার প্রিয় মুন্সির শর্ত মেনে নিলেন। তিনি সকালের চা পান করে গোসল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পাঁচ মিনিট পর যখন তিনি দাড়ি কাটছিলেন, তখন হঠাৎ তার মুখ থেকে গালি বের হওয়া শুরু করল, 'হারামজাদা! তাই আমার কাছ থেকে টাকা বের করার জন্য ফন্দি এটেছিস? তোর কত বড় সাহস? ঠিক আছে শুকর, এবারের মত তুমি তোমার টাকা নাও, তবে এরপর যদি আমার সাথে কোনো তামাসা কর, তবে তোকে আমি জানেই মেরে ফেলব।'

এরপর আসে গোলাম মীর মুর্তজা ভুট্টোর কথা; আমার পিতার প্রপিতামহ, যার নামানুসারে তার নাম রাখা হয়েছে। তিনি ছিলেন গারহি খোদাবক্স ভুট্টোদের পূর্বপুরুষ। বলা হয়, তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন, কর্মতৎপর এবং নিজের গুণাবলি প্রদর্শন করার ব্যাপারে অত্যন্ত পটু। কথিত আছে যে, তার সাথে এক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সাদা স্ত্রীর প্রণয় ছিল। ওই ভদ্রমহিলা আসল সাদা ছিলেন, না অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিলেন, সে বিষয়ে বিতর্ক ছিল। আমাদের পরিবার থেকে বলা হয় যে, মহিলার স্বামী এই অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পেরে গোলাম মুর্তজাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। গোলাম মুর্তজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, যদিও তিনি পরিকল্পনা করছিলেন তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। সন্দেহ করা হয়, সেখানে তার খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, কারণ তার অল্প-সময় পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভুট্টোরা সে সময়ও খুব কমই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। অনেকেই মারা যান হিংস্রতার মধ্য দিয়ে, মধ্য বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে। আমার পিতা একজন ক্ষমতাশালী স্থানীয় ভূ-স্বামী ভুট্টোর কথা বলতেন। তিনি মনে করছিলেন যে, যাদেরকে তিনি শাসন করছিলেন, তারা যথেষ্ট অনুগত নয়, কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন না, কারা তার অনুগত, আর কারা তা নয়। তাই, তিনি মৃত্যুর ভান করলেন। তার পরিবারের সদস্যদেরকে বাধ্য করলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

www.pathagar.com

সম্পন্ন করতে এবং তার তথাকথিত মৃতদেহের চারপাশে অবস্থান করে শোক প্রকাশ করতে। তিনি সেখানে ছোট চারপায়াতে শুয়ে রইলেন এবং মৃতের অভিনয় করতে থাকলেন। তিনি একজন চাকরকে দায়িত্ব দিলেন, কারা তাকে সম্মান দেখাতে সেখানে এসেছে এবং কারা আসে নাই, তা নোট করতে। যারা তাকে সম্মান দেখাতে আসেনি, তাদের প্রত্যেককে তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন। পরিশেষে যখন তিনি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেন, তখন সারা গ্রামের লোক সম্মান জানাতে এসেছিল, ঘটনা যদি আগের মতো হয়ে থাকে, সেই ভয়ে।

* * *

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ রাজত্বের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রদেশে পরিষদ গঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময়কালে সিন্ধুতে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, তাই এই নির্বাচনটি উন্মুক্ত ছিল শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তির জন্য– যারা ছিলেন ক্ষমতাশালী– অন্য কারো জন্য নয়। বিষ প্রয়োগে নিহত হন গোলাম মুর্তজার ছেলে স্যার শাহ্ নেওয়াজ ভুট্টো, যিনি বিতর্কিতভাবে ব্রিটিশ শাসকদের থেকে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি লারকানা থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। লারকানা তার নিজের শহর। তিনি ছিলেন বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু তিনি হেরে গেলেন।

শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি স্যার শাহনেওয়াজকে ভোটে পরাজিত করলেন। সিন্ধী ওই জেলার বাসিন্দাও ছিলেন না, তাঁর কোনো খ্যাতি ছিল না, যার ওপর নির্ভর করা যায়। গুজব ছিল যে ভুট্টোদের মধ্য থেকেই কিছুসংখ্যক লোক শাহনেওয়াজের প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তাকে দাঁড় করিয়েছেন। জুলফিকারের মনে আছে, তার পিতা তাকে বলেছেন, 'রাজনীতি হলো একটি মন্দির বা একটি বাড়ি নির্মাণের মতো' অথবা 'এটি গান কিংবা কবিতা লেখার মতো।' স্যার শাহনেওয়াজ ছিলেন পুরানো দিনের চিন্তা, চেতনার মানুষ। তিনি মনে করেছিলেন, যে, বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার যে ক্ষতি হয়েছে, তা আপনা থেকেই পূর্ণ হবে। তিনি এই ইস্যু নিয়ে আর অগ্রসর হননি। তিনি শুধুমাত্র পরিবারবর্গ নিয়ে সিন্ধু ত্যাগ করলেন।

১৯৩৮ সালের দিকে ভুট্টোরা ছিল বোম্বাই শহরে, সেখানে জুলফিকারও ছিলেন। তিনি তখন কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। স্যার শাহ নেওয়াজের ছিল তিন ছেলে, ইমদাদ, সিকান্দার এবং সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র জুলফিকার আলী। তার ছিল তিন কন্যা, বেনজির, যে ছোটকালেই মারা যায়, মান্না ও মোমতাজ। জুলফিকারের ভাইয়েরা তার চেয়ে অনেক বছরের বড় এবং লম্পট হিসেবে কুখ্যাত ছিলেন।

ইমদাদ ছিলেন খুব সুদর্শন। তিনি থ্রি-পিস স্যুট পরতেন এবং সর্বদা ফিটফাট থাকতেন। তার ছোটভাই সিকান্দার তার পোশাক ও আচার-ব্যবহারকে অনুসরণ করতেন। একবার সিকান্দারকে তার পিতা কঠোরভাবে তিরস্কার করেন তার লক্ষ্যহীন জীবনযাপনের জন্য। সিকান্দার তার ভাইয়ের মত একই ধরনের থ্রি-পিস স্যুটই পরতেন, কিন্তু তার চুল থাকত এলোমেলো। এজন্য পিতা তাকে ভৎর্সনা করলেন। তিনি সাহসের সাথে এর জবাবে

www.pathagar.com

বললেন যে, তিনি একজন শিল্পী। তিনি কবিতা লিখতেন এবং চুলগুলো কবিদের ধরনে রাখতেন। দেশভাগের পূর্বে ভারতের জমিদারের ছেলেরা সাধারনত শিল্পী হতেন না। তারা হতেন ভূস্বামী অথবা সামরিক কর্মকর্তা অথবা রাজনীতিবিদ। এমন কি ব্যবসায়ী হওয়ার প্রশ্নই আসে না, এটি হলো নিম্নবর্ণের কাজ, এটি হিন্দু ঋণব্যাবসায়িদের কাজ। তাদের পোশাকের পরিপাটি আর বড় রকমের পানাহার ছিল সমাজের যুবতি মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয়। তারা ছিলেন আমুদে যুবক এবং মুক্ত জীবনযাপন করতেন, সর্বদা একদল মোসাহেব নিয়ে চলতেন। ইমদাদ ও সিকান্দার উভয়েই অল্প বয়সে মারা যান। উশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপনের কারণে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তাদের বয়স হয়েছিল ত্রিশের মতো। তরুণ বয়সেই পরিবারকে ফেলে রেখে তারা চলে গেলেন। ইমদাদ ও সিকান্দার পৃথিবীতে যেমন সহজে এসেছিলেন, তেমনি সহজেই চলে গেলেন।

বোম্বাইতে স্যার শাহনেওয়াজ সিন্ধু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করলেন। তাকে চেয়ারম্যানের পদ প্রদান করেন সিন্ধুর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী আল্লাহ বক্স সুম্রো। স্থানীয় রাজনীতির চক্রে পড়ে স্থানীয় নির্বাচনে হেরে যাবার পর এই পদটি তার জন্য সময়োপযোগী হয়েছে। কয়েক বছর পর স্যার শাহনেওয়াজের এক বন্ধু, গুনাঘরের নবাব অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যান। প্রিন্সদের জন্য তখন ভারত ছিল রাজনৈতিকভাবে নিরাপত্তাহীন, তখন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে দেশ ছিল উত্তাল। তিনি চাচ্ছিলেন বিশ্বাসী কাউকে রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করে দেশ ত্যাগ করতে। তিনি তার বন্ধু শাহনেওয়াজকে গুনাঘরে এসে তার অনুপস্থিতিতে রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললেন। এই অবস্থায় দেশভাগ যখন দ্বারপ্রান্তে, তখন স্যার শাহনেওয়াজ তার পরিবারকে স্থানান্তর করলেন গুনাঘরে। ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। দেশ বিভক্তির পর তিনি নিজের এবং নবাব ও তার পরিবারবর্গসহ প্রিন্সের বিশটি পোষা কুকুর নিয়ে ফিরে আসলেন পাকিস্তান নামক দেশে।

জুলফিকার তার যৌবন কাটিয়েছেন সিন্ধুর দু'টো অঞ্চলে, লারকানা যা পরবর্তীতে পাকিস্তানের অংশ হয়েছে, আর বোম্বাই যা ছিল সিন্ধুর রাজধানী। তিনি ছিলেন একজন খেলোয়াড়, সময় কাটাতেন ক্রিকেট খেলে এবং বড় ভাইদের সাথে শিকার করে। তের বছর বয়সেই তিনি সামন্তবাদী প্রথায় জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। নাওদেরুর ভুট্টোদের মধ্যে আমেদ খান ছিলেন ভুট্টো উপজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় জমিদার। তিনি ছিলেন রাসুল ভুট্টোর একমাত্র পুত্র এবং দুর্ভাগ্যবশত তার ছিল তিনটি যুবতী কন্যা, কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিল না। কোনো এক বিকেলবেলা স্যার শাহনেওয়াজ ও আমেদ খান একত্রে বসে তাদের দুই পরিবারের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমেদ খান তার তিন মেয়েকেই বিয়ে দিয়ে তার উর্বর কৃষিজমিগুলো পরিবারের ভেতরই রাখতে চান। তার বড় মেয়েকে জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে প্রতিবেশী উপজাতি অপহরণ করেছিল। তার বিয়ে হয় স্থানীয় এক ভুট্টোর সাথে, যিনি একজন স্কুল শিক্ষক। তার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয় জুলফিকারের বড় ভাই ইমদাদের সাথে, যিনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং দেখতে ইররোনা ফ্লাইন্ন্-এর মতো।

আমেদ খানের তৃতীয় কন্যা, আমীর বা শিরীন ছিলেন বিয়ের সময় তেইশ বছর বয়স্ক।

www.pathagar.com

তার সাথে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয় জুলফিকারের। জুলফিকারের বয়স যখন তের বছর, তখন তেইশ বছর বয়স্ক কন্যার সাথে তার বিয়ের আয়োজন চলে। অবশ্য মতান্তরে জুলফিকারের বয়স তখন ষোল, যখন তাকে এই সামন্ততান্ত্রিক বিয়ের উৎকোচ প্রদান করা হয়। বিয়ে সম্পাদনের সময় তার পরিবার তাকে একটি নতুন ক্রিকেট ব্যাট উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জুলফিকার ছিলেন তখন এরকম নাবালক, অসম্মতি প্রকাশ করার সুযোগ ছিলনা। তিনি আমীরকে বিয়ে করলেন। কিছু বুঝবার মতো বয়সই তখন তার হয়নি। বেশ কয়েক বছর পার হওয়ার পর স্বামী হিসেবে তিনি আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জুলফিকার যে ক্রিকেট ব্যাট প্রাপ্তির বিষয় নিয়ে হাস্যকৌতুক করেছিল, সে বিষয়টি তার আত্মীয় আসিকের মনে আছে। কেউ কেউ বলেন, এই বিয়ে কখনো পূর্ণতা লাভ করেনি। অবশ্যই কোনো উত্তরাধিকারিত্ব জন্মে নাই। তবে এই সংযোগের ফলে নাওদেরুরতে এই পরিবারের বড় আকারের জমি প্রাপ্তি ঘটেছে, যা তারা আজও ভোগ করছেন। ভূমিই ভুট্টোদের ভাগ্য খুলে দিয়েছে এবং অনেক বছর পর্যন্ত এটি ছিল তাদের জন্য বিরাট এবং ঈর্ষাজনক সৌভাগ্য। সামন্ততান্ত্রিক উচ্চতার বিচারে ভুট্টোরা ছিল সিন্ধু প্রদেশের সবচেয়ে বড় ভূস্বামী, তারা পরিণত হচ্ছিলেন এই উন্নয়নশীল প্রদেশটির অন্যতম সম্পদশালী পরিবারে।

এই সময়ে ভুট্টোরা বোম্বাই গেলেন, জুলফিকার তার বন্ধুদের কাছে জানালেন যে, তিনি সোরায়া করিমভয় নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসেন এবং তার পরিবারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু সোরায়া ও তার পিতামাতা যখন জানতে পারলেন যে, তিনি বিবাহিত, তখন তারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। স্যার শাহনেওয়াজ কনিষ্ঠ ছেলের হৃদয়ের ব্যথার কোনো গুরুত্ব দিলেন না। জুলফিকার উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনকার দিনে এরূপ একটি সুযোগ পাওয়া ছিল গর্বের বিষয়। তাই, তার পিতা তাকে ভবিষ্যতের জন্য মনোযোগী হতে পরামর্শ দিলেন এবং বললেন যে, হারানো মেয়ে বন্ধুর জন্য বিষণ্ন হওয়ার কোনো সময় নেই।

জুলফিকার যখন স্নাতকপূর্ব অধ্যয়নের জন্য বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছেন, তখনও ভারতবর্ষ এক দেশই ছিল। পাকিস্তান বা দেশ ভাগের কোনো কথাই তখন হয় নাই। জুলফিকার ফিরে আসার পূর্বেই দেশ বিভক্ত হয়েছে, আর তার কিছু নিন্দুক জোর দিয়ে প্রচার করেছে যে, তিনি তখনও আইনত ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু জুলফিকারের পরিচিতি নির্ধারিত হয়েছে তাঁর সীমানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে। বোম্বাই থেকে ক্যালফোর্নিয়া যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি মার্কস্ পাঠ করেন। তার সুবিধাভোগী অস্তিত্ব প্রথম তাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। তিনি ছিলেন একজন সামন্ত প্রভু, এক বিরাট জমিদার কিন্তু তিনি নিজেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বলে ভাবতে পারেননি। তিনি পরবর্তীতে বলেছেন যে, মার্কসবাদ অধ্যয়নের কারণে সামন্তবাদের প্রতি তার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে। একদশক পর যখন তিনি সরকারের ভূমি সংস্কারের বিষয়ে বলছিলেন, জুলফিকার তখন তার নিজের জমি ত্যাগ করেছেন (মূলত জেকোবাবাদে, দোদা খান তা পেয়ে যান), তিনি বলেছেন যে তিনি আরও ত্যাগ করবেন, তার সন্তানেরা আরও। মার্কস পড়ার পর থেকে আমার আর হারাবার ভয় নেই'।

www.pathagar.com

বার্কলেতে তিনি বার্টান্ড রাসেল ও কার্ল ইয়ং পড়েছেন; তাছাড়া তার মা'র কাছ থেকে দারিদ্র্যের কথা বারবার শুনেছেন। তার মাতা খুরশিদ এসেছেন দরিদ্র পরিবার থেকে। এই কারণে একটি গুজব ছিল যে, তিনি ছিলেন হিন্দু এবং তার পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ছিল তার চেয়ে নিচু। অভিজাত জমিদার হওয়া সত্ত্বেও জুলফিকারের পিতা ভালোবেসে তাকে বিয়ে করেন। খুরশিদ সবসময় তার আদরের পুত্রকে বলতেন যে, রাজনীতির স্বর্গ থাকে জনগণের পায়ের নিচে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তার মনে প্রথমেই থাকতে হবে এই সত্য, অন্য কিছু নয়। তার সম্ভাবনা ছিল বিপুল– এমনকি শিশু অবস্থায়ও তিনি ছিলেন মেধাবী। কিন্তু মাতা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তারা গরিব দেশের লোক। যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনাবলি জুলফিকারের মধ্যে আমূল পরিবর্তনের সৃষ্টি করল। বার্কলে অবস্থানকালীন সময়ে সান্তিয়াগোর একটি হোটেলে গাত্রবর্ণের কারণে তাকে কামরা দেয়া হয়নি; অভ্যর্থনার দায়িত্বরত কর্মচারী বলল যে, তাকে মেক্সিকান বলে মনে হয়। জুলফিকার তখন আর জমিদার ছিলেন না। তিনি সিন্ধু প্রদেশের খ্যাতিমান আমলার ছেলেও ছিলেন না। ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি একজন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন, এই অনুভূতি তার সারা রাজনৈতিক জীবনকে তাড়া করেছে। সান্তিয়াগোর এই অপমানের পর জুলফিকার বার্কলে ত্যাগ করলেন এবং ম্যাক্সওয়াল স্ট্রিটে চলে গেলেন। সেখানে তিনি সাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন আফ্রিকান-আমেরিকানদের সাথে বাস করতে শুরু করলেন। কারণ, তাদেরকে তার খাঁটি বলে মনে হলো।

বিভিন্নভাবে তার মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল; প্রায়ই তিনি ক্যালিফোর্নিয়া, পরবর্তীতে অক্সফোর্ড ও ইংল্যান্ডের লিঙ্কন'স ইন অবস্থানের কথা বলতেন। তার মন ছিল পাশ্চাত্যের, কিন্তু আত্মা ছিল প্রাচ্যের। পরবর্তীকালে তিনি তার সন্তানদেরকে অনেকটা কৌতুক করে বলতেন, 'ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য আবেদন করো না, কারণ, এর সুন্দর আবহাওয়া লেখা-পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাবে। আসলে তিনি ভয় পেয়েছিলেন সেখানকার বিরূপ পরিবেশকে, যে পরিবেশের সাথে তার সন্তানগণ খাপখাওয়াতে পারবে না বলে তিনি মনে করেছেন। জুলফিকার মনে করেছেন যে, হার্ভাডে পড়াশুনা করাই হবে তার সন্তানদের জন্য যথাযোগ্য স্থান।

মুর্তজা যখন হার্ভাডে স্নাতক হতে যাচ্ছেন, জুলফিকার তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তখন তাকে লিখেছেন :

> 'তুমি এখন আছ তোমার শিক্ষা জীবনের মাঝপথে। আমি নিশ্চিত যে তোমার অপর অর্ধেক সময়কালও হবে একইরূপ উত্তেজক ও প্রেরণাদায়ক। স্মরণ রাখবে তোমার দেশবাসীর প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। আমেরিকা একটি বড় দেশ। এ দেশ জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক শক্তিশালী হয়েছে। মার্কিনীরা জীবনীশক্তিতে প্রবল। তাদের কৌতূহল বজায় থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এই জাতির আছে বিকাশ–– শিক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নির্মাণ। সে একটি বড় নির্মাতা। দেখ, একজন মার্কিনী তার দেশের জন্য কী করেছেন। গড়পড়তা মার্কিনীদের অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মন নেই, তারা প্রাচ্যের ধীরশক্তি সম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিদের মতো সংস্কৃতিবান নয়, তাদের মতো প্রাচীন সভ্যতার দিকে তারা চিন্তা ধাবিত করতে পারে না।

www.pathagar.com

তিনি চিঠিতে কিছু ব্যক্তিগত উপদেশও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

> আমি নিশ্চিত যে, তুমি অক্সফোর্ডে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে। আমি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে যাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলাম, তাদের কয়েকজন ব্যতিক্রম বাদে বাকিদের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। আমার বিশ্বাস, দেশের সাথে আবার সংযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে এই বিচ্ছিন্নতা বরং সহায়ক হয়। যখন আমি নাওদেরুর গ্রামে ফিরে আসি এরপর আমি আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের স্মৃতি রোমন্থন করতে ইচ্ছুক নই।'

জুলফিকারের ছেলেবেলার বন্ধু ইলাহি বক্স সুম্রো, যার পিতা স্যার শাহনেওয়াজকে বোম্বাইতে সরকারি পদটি দিয়েছিলেন, এখনো তার মনে আছে তিনি যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছিলেন, তখন জুলফিকার নিউইয়র্কে এসে তার সাথে দেখা করতেন। সুম্রো এখন আশি বছর বয়সেও প্রাণবন্ত। তার রাজনৈতিক জীবনকাল ভুট্টোর সমান। তিনি জুলফিকারকে বলতেন 'জুলফি', যা তার অন্যান্য বন্ধুরাও বলত।

জুলফিকার তাকে বলতেন ইললু। তিনি আরো বলেন, 'আমরা হারলেমের কাছে রিভার সাইড ড্রাইভের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে বিভন্ন আর্ন্তজাতিক বিষয়ে আলোচনা করতাম। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা থাকতো আলোচনায়, কিন্তু জুলফি ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। সে ছিল মেধাবী।' জুলফি ইংল্যান্ডে স্নাতক পর্যায়ের অধ্যায়নের সময় নিউইয়র্কে গেলে ইললুর সাথেই থাকতেন।

জুলফিকার নতুন দেশ পাকিস্তানে ফিরে আসলেন একজন ব্যারিস্টার হিসেবে। এদেশে তার কিছু বন্ধু ছিল, তার মধ্যে কিছু ছিল আত্মীয়, যেমন মোমতাজ ও আসিক। তাদের স্মরণ আছে যে জুলফিকার দুষ্টুমি করে মেয়েলি গলায় ফোনে আসিকের আম্মার কাছে 'আস্তেক'কে (আসিক) চাইতেন। তিনি কাজ শুরু করলেন ডিংগোমাল রামচন্দানির আইন ফার্মে। তার অফিস ছিল পুরাতন করাচির বন্দর রোডে, এখনকার স্পেন কোর্টের নিকট এবং প্যালেস হোটেলের সংলগ্ন, যেখানে ভুট্টোরা তাদের বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করছিলেন।

ব্যারিস্টার হিসেবে খ্যাতি লাভ করার পর জুলফিকার তার অফিস স্থানান্তরিত করে সিন্ধুর একজন সম্মানিত আইনজীবী এ, কে ব্রোহির অফিসে নেন। ইললুর স্মরণ আছে, একদিন জুলফি বললেন যে, ব্রোহি একদিন তাকে একটি আইনি খসড়া পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। ইললুর গাড়িতে চড়ে নগরে ভ্রমণের সময় জুলফি উল্লেখ করেছেন যে, এটি ছিল তার জীবনের একটি বড় পরীক্ষা; তিনি দলিলটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। পরের দিন, অন্যান্য দিনের মতই ইললু তাঁর বন্ধুকে অফিস থেকে উঠিয়ে নিলেন। অফিসটি ছিল জিন্নাহর মাজারের কাছে। গাড়িতে বসে তিনি জুলফিকারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খসড়াটি কেমন দেখলে?' জুলফিকার হেসে বললেন যে, 'আমি এর প্রতিটি লাইনই পরিবর্তন করেছি। আমি মনে করেছিলাম ব্রোহি ক্রুদ্ধ হবেন, কিন্তু তিনি এটি মেনে নিয়েছেন।' ইললুই শুধু তার বন্ধুকে ভালোভাবে জানতেন। ইললু তাকে সাবধান করে দিলেন, 'তুমি

www.pathagar.com

সচেতনভাবে এরূপ করো না।' জুলফি তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি তাকে জানাতে চাচ্ছিলাম যে, আমি তার চেয়ে বেশি জানি।' তার কথার মধ্যে একটুও কৌতুক ছিল না।

তার আইনি কর্মজীবনে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছিল এবং নতুন দেশে যখন তিনি ভালোভাবে মানিয়ে নিচ্ছিলেন, করাচির জীবনযাত্রা ছিল তখন কিছু নিরস। অনেক বছর বিদেশে, ক্যালিফোর্নিয়া এবং লন্ডনে অবস্থান করার কারণে জুলফিকার করাচিতে খুব বেশি লোককে চিনতেন না। তিনি রেস্টুরেন্ট ও নাইট ক্লাবে যেতে পছন্দ করতেন, কিন্তু সাহচর্য দেয়ার মতো উপযুক্ত কাউকে পেতেন না। সিন্ধি পরিবারগুলো রক্ষণশীলতার জন্য কুখ্যাত; পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে যান না। শুধু কন্যাদেরকে সাথে নেন। হঠাৎ কোনো এক সন্ধ্যায়, এক বিবাহ অনুষ্ঠানে, জুলফিকার সেখানে বোম্বাই থেকে করাচিতে আগত একজন সুন্দরী ইরানিকে দেখতে পেলেন তার পরিবারের সাথে। এরা দেশভাগের কারণে এখানে এসেছে। নুসরাত লম্বা, পাতলা, কালকেশী। নগরীতে একেবারেই নবাগত এবং মাত্র কিছুদিন থেকে ইংরেজি শিখেছেন। তার অনেকগুলো বোন ছিল, কিন্তু তার উপস্থিতিতে অন্য কেউ গুরুত্ব পেত না। নুসরাতের উপস্থিতিতে তাদেরকে মনে হতো ছায়া।

নুসরাত ও জুলফির মধ্যে আকর্ষণীয় জুটি তৈরি হলো। তারা ছিলেন চমৎকার ও জীবন্ত, উভয়েই অবাধ্য ও সুন্দর। অল্প সময়ের মধ্যেই জুলফিকার প্রেমে পড়লেন। তিনি তার পিতামাতার কাছে অনুমতি চাইলেন নুসরতের পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে, কিন্তু তারা তাদের পুত্রের এই প্রস্তাবে খুশি হলেন না। খুরশীদ বেগম তার পুত্রের বহিরাগত একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। নুসরাত সিন্ধী ছিলেন না; তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিদেশী। তিনি গোড়া শিয়া পরিবার থেকে এসেছেন, আর ভুট্টোর পরিবার সুন্নী। তিনি জমিদারের কন্যাও ছিলেন না। তার পিতা ছিলেন একজন সাবান প্রস্তুতকারী, তার কারখানা ছিল বোম্বাইতে– এমনকি তাদের নামের সাথেও এই পেশার নাম যুক্ত হয়েছে, সাবুনচি, যারা সাবান তৈরি করে। তাদের পেশা ব্যবসায়, যা ভুট্টোদের দৃষ্টিতে নিচু স্তরের কাজ। খুরশীদ বেগম বেঁকে বসলেন; তার পুত্র কিছুতেই নুসরাতকে বিয়ে করতে পারে না। তা ছাড়া, তিনি যুক্তি দেখালেন যে সে তো আগেই বিবাহিত।

তবে জুলফিকারও তার মায়ের মতই একগুঁয়ে। ১৯৫১ সালের প্রথম দিকের কোনো এক সন্ধ্যায় জুলফিকার গাড়ি নিয়ে তার বন্ধু ইললুর বাড়ি গেলেন। সেটি ছিল কায়েদে আযমের মাজারের কাছে। গাড়ি ইললুর বাড়ির কাছে থামল। ইললু যখন দরজা দিয়ে বের হলেন, তিনি তখন শান্তভাবে গাড়িতে বসেছিলেন। ইললু আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সাথে কি টাকা আছে? ইললু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। জুলফিকার বললেন, 'গাড়িতে আস, আমাদের এখন যেতে হবে।' ইললু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাব? তিনি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। জুলফিকার বললেন, 'আমি নুসরাতকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, আজই।' ইললু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ইসলামের রীতি অনুযায়ী দুইজন স্বাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু তিনি তো একা।' তিনি পরামর্শ দিলেন তার এক বন্ধু করিম দাদকে

www.pathagar.com

সাথে নিতে। তিনি সিন্ধুর এক বিশিষ্ট পরিবারের লোক। তারা গাড়ি নিয়ে করিম দাদের বাড়ি গেলেন এবং তাকে টেনে গাড়িতে উঠালেন। ইললু তাকে বললেন, 'জুলফি বিয়ে করতে যাচ্ছে।' করিম দাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে?' তিনি অবাক হলেন ভেবে যে, জুলফির গোপন বিয়েতে সাহায্য করার জন্য তাকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। করিম দাদ হাসতে থাকলেন, 'সেই লম্বা মেয়েটি? সে তো খুবই লম্বা!'

তারা তিন জন গাড়ি নিয়ে চললেন, নুসরাতকে উঠিয়ে নিতে। বাড়িটি ৭০ ক্লিফটনের খুব কাছেই। বাড়িতে একমাত্র পুরুষ ছিল তার অসুস্থ পিতা। তিনি ছিলেন প্রায় অন্ধ, এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কন্যাপক্ষের হয়ে নুসরাতের বোনেরা শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। এক বোন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি মৌলভী এনেছেন?' জানিয়ে দিলেন যে বিয়ে পড়াবার জন্য মৌলভীর প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিন বন্ধুর কোনো ধারণাই ছিল না।

সে সময় সবচেয়ে কাছের মসজিদ ছিল সিন্ধু ক্লাবের পেছনে, দশমিনিটের পথ। আমি পঞ্চাশ বছর পর ইললুর কাছ থেকে সরাসরি এই কাহিনী শুনলাম। ইললু বলতে থাকলেন, 'মৌলভী নিয়ে পৌঁছবার পর নুসরাতের বোনেরা বললেন যে, তিনি তো সুন্নী, আমাদের প্রয়োজন শিয়া মৌলভী।' তাকে ফেরত পাঠান। তাই, আমি তাকে মসজিদে পৌঁছে দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম তিনি কোনো শিয়া মৌলভীর সন্ধান দিতে পারেন কিনা। তিনি দরজা খুলে চলে যাওয়ার সময় আমাকে গালি দিয়ে গেলেন।' ইললু ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি অন্যান্য মসজিদেও সন্ধান করে যাচ্ছিলেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে আসর ও মাগরিবের নামাজ পড়লেন বড়িবাজারের কাছে নগরের মধ্যস্থলের একটি মসজিদে।

বিভিন্ন মসজিদে খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে একজন মুসলমান পরামর্শ দিলেন ইমাম বারঘা বা শিয়া মসজিদে খোঁজ করতে। ইমাম বারঘা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। ওই সময় আমরা সুন্নি ও শিয়া প্রভেদের কথা চিন্তা করতাম না। যা হোক, ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে, বলটন মার্কেটের কাছে শিয়া মসজিদ আছে। বলটন মার্কেটের কাছে একটি বন্ধুকে পেয়ে তার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। তিনি হেসে বললেন, 'এই মুহূর্তে শিয়া মৌলভী পাবার উপায় নেই, তাদের সাথে আগেই যোগাযোগ করতে হয়।' ইললু বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তার বন্ধুকে বলার পর তিনি পরামর্শ দিলেন সিন্ধু মাদ্রাসায় যেতে– সেখানে শিয়া ও সুন্নিদের স্বতন্ত্র স্কুল আছে; সেখানকার কোনো শিয়া মৌলভী হয়ত বিয়ে পড়াতে সম্মত হতে পারেন।

মাগরিবের সময় তখন ঘনিয়ে আসছিল, ইললু মাদ্রাসায় গেলেন, একজন মৌলভীর দেখা পেয়ে তাকে প্রস্তাব দিলেন তার সাথে ক্লিফটন যেয়ে বিয়ে পড়াতে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ সম্পন্ন করতে তিনি কত নিবেন। জবাবে তিনি জানালেন যে পঞ্চাশ টাকা নিবেন। আমি পকেট থেকে একটি একশত টাকার নোট বের করে তাকে দিয়ে বললাম যে, এটি তার অগ্রিম। তারপর তাকে গাড়িতে তুলে নিলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ইললু নবদম্পতি নিয়ে প্যালেস হোটেলে তুললেন। অবশেষে তারা হলেন বিবাহিত।

দুই দিন পর স্যার শাহনেওয়াজ তার পুত্র ও পুত্রবধূকে অভ্যর্থনার মাধ্যমে বাড়িতে বরণ করে নিলেন। কিন্তু সুখী হলেন না খুরশীদ বেগম। তার নতুন পুত্রবধূর প্রতি রইলেন

www.pathagar.com

শীতল। এক সপ্তাহ পর জুলফিকার ও নুসরাত মধুচন্দ্রিমার জন্য তুরস্কের পথে যাত্রা করলেন। সেখানে তারা থাকলেন তার বোন মোমতাজের সাথে। মোমতাজের বিয়ে হয়েছিল একজন সামরিক বাহিনীর অফিসারের সাথে, তিনি তখন সেখানে পাকিস্তান দূতাবাসে চাকরিরত ছিলেন। সেখানে তোলা সাদা-কালো আলোকচিত্রে দেখা যায় জুলফিকারের কোটের কলার পর্যন্ত চুল প্রসারিত, আর নুসরাত ওভার কোটের নিচে শাড়ি পরেছেন। আমার পিতামহসহ ও পিতামহিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, পুরানো দিনের সিনেমার তারকার মতো।

* * *

১৯৫০-এর দশকের দিকে অন্যান্য অনেক দেশের মতো পাকিস্তানও ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাদা-জলে পরিণত হলো। সামরিক শক্তির কাছে নিরপেক্ষতা বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, এমনকি পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত। নিরপেক্ষতা ছিল তখনকার পরিস্থিতিতে অবাস্তব, কারণ অদূর ভবিষ্যতে সমান শক্তিধর কোনো শক্তির আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। পাকিস্তান যোগ দিল যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির সাথে বিশ্বকে কমিউনিজম থেকে মুক্ত রাখতে।

তরুণ ছাত্র অবস্থাই জুলফিকারকে বিষয়টি ক্রুদ্ধ করে। তিনি বুঝতে পারেন সে দুই শিবিরে বিভক্তের নীতির আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র নিজের শক্তিকে সুসংহত করতে চাচ্ছে। এই নীতির আড়ালে পাকিস্তানকে ১৯৫৪ সালে সিয়াটোর অংশীদার হতে হয়, এটি ছিল ইউরোপের ন্যাটোর প্রস্তাবিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিরূপ । জুলফিকার বুঝতে পারলেন যে বৃহৎশক্তির সাথে এভাবে গাঁটছড়া বাঁধা পরিহাসের নামান্তর, কারণ কাশ্মীরে যখন রক্ত ঝরল, তখন জেফারসনের আমেরিকা নীরব থাকে, অথচ কমিউনিস্ট বেলায় মোটেও এরূপ ঘটত না।

ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় ভিন্ন মত পোষণের কারণে বিশ্ব তখন উত্তাল অবস্থায় ছিল। বিশ্ব রাজনীতির এই বিভাজনের অর্থ, একদিকে বিশ্ব নেতৃত্ব শান্তির পক্ষে প্রচারণা চালায় অপরদিকে আণবিক বোমার সাহায্যে সভ্যতার ধংস সাধন করে, পাকিস্তান প্রসঙ্গে জুলফিকার লিখেছেন, 'পাকিস্তান অত্যন্ত অস্থিতিশীল।' দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর জুলফিকারের মূল্যায়ন ভয়ানকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্ব পরিস্থিতির বিষয়ে জুলফিকারের মনে যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তার তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যের ও ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টির ধারণা। বার্কলেতে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের মৃতপ্রায় রাজনীতির ধারা বদলাতে হবে এবং আমাদের এই বিশ্বকে বৈপ্লবিকভাবে সাজাতে হবে।' তিনি মুসলমান জাতির ভাগ্যের সাথে নিজেকে জোরালোভাবে যুক্ত বলে অনুভব করেছেন। সে সময়ের বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে জুলফিকার প্রতিধ্বনি করেছেন, 'আমি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান নই, আমি নিয়মিত নামাজও পড়ি না আমি সবগুলো রোজা রাখিনা... কিন্তু আমার স্বার্থ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকারিত্ব রক্ষা করা।' বিশেষ করে সিন্ধীরা সুফি সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ, এর সাথে আছে হিন্দু উপকথা এবং উপজাতীয় বংশধরগণের

www.pathagar.com

কাহিনী, গোঁড়া মুসলমানদের কাছে যা অপরিচিত। ভুট্টোরা কখনো গোড়া মুসলমান ছিলেন না। একুশ বছর বয়সেই জুলফিকার নিজের কাছেই অঙ্গিকারবদ্ধ হলেন মুসলিম ভাতৃত্বের নবজাগরণের। তিনি বলেছেন, 'আমি মুসলমানদের কৃতিত্বকে নিজের কৃতিত্ব এবং সেরূপ মুসলিম বিশ্বের ব্যর্থতাকে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বলে মনে করি।' এটি একটি রোমাঞ্চকর ধারণা, এর ফলে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এশিয়ার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এরূপ বিশ্বাসের ফলে মানবজাতির মধ্যে বিশ্ব ভাতৃত্বের সৃষ্টি হতে পারে। এখনকার বিশ্বে শোষণের প্রচণ্ডতার দিকে তাকালে জুলফিকারের চিন্তাকে কল্প-বিলাস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জুলফিকারের স্বপ্ন ছিল সামনের দিনগুলোর জন্য। জুলফিকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর বড় ছেলে মুর্তজাকে বক্তৃতার আকারে দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। মুর্তজা ছিলেন তখন হার্ভাডের ছাত্র। তিনি সেই চিঠিতে পাকিস্তানে এবং বিশ্বে কী ঘটে চলেছে তা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। একটি চিঠিতে ভিয়েতনামে যুদ্ধ এবং তার পরিণতিতে জনগণের দুর্দশার কথা লিখতে যেয়ে তার ছেলেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আমি এসমস্ত বলছি এ জন্যে যে, তুমি একজন এশীয়। তুমি এ বিশ্বেরই একজন। তোমাকে তোমার দেশের জন্য কাজ করতে হবে। তুমি কখনো নিজ দেশ ত্যাগ করার কথা ভাববে না।'

* * *

বিদেশে অনেক বছর কাটাবার পর জুলফিকার যখন পাকিস্তানে ফিরে আসলেন, তার কাছে সবকিছু নতুন নতুন মনে হলো। তিনি বার্কলের পাঠ শেষ করেছেন, অক্সফোর্ড অধ্যয়ন করেছেন, এরপর লিঙ্কন'স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেছেন; জিন্নাহও এখানেই আইন অধ্যয়ন করেছেন। জুলফিকার তার সন্তানদের সবসময় বলতেন, শিক্ষাই একমাত্র জিনিস, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। শিক্ষার কোনো শেষ নেই, এটি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রহণ করার মতো বিষয়। শিক্ষা চলে জন্ম থেকে, যখন থেকে মানুষ, দেখে এবং বোঝে, অব্যাহত থাকে যতদিন সে সচল থাকে।'[৮]

১৯৫৩ সালে, ভুট্টোদের বাড়ি ৭০ ক্লিফটন ছিল সম্পূর্ণ হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে। বাড়ির দরজায় দুটো প্লেইট ছিল :

একটি ছিল অস্পষ্ট সোনালী, যাতে নাম অঙ্কিত ছিল স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর এবং অন্যটিতে, সরাসরি নিচের দিকে ব্রোঞ্জের এবং যাতে নাম ও পদবী ঘোষিত হয়েছে, প্রথম পেশাদার ভুট্টোর : জুলফিকার আলী ভুট্টো; বার-এ্যাট-ল। সে সময় জুলফিকার নুসরাতকে বিয়ে করেছেন এবং পিতা হয়েছেন। তাদের প্রথম সন্তান কন্যা বেনজির জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৩ সালের জুনমাসে, তার পিতার একবোন অল্পবয়সে মারা যান, তাঁর নামানুসারে এই মেয়ের নাম রাখা হয় বেনজির। তার জন্ম হয় করাচির একটি খ্রিস্টান হাসপাতালে। বিখ্যাত বেলুচ যোদ্ধা আকবর বাগতির বোন ও বেলুচ সাজারি উপজাতির সরদারের স্ত্রী বেগম মাজারি, স্মরণ আছে যে, তিনি নুসরাতকে তার প্রথম সন্তানের জন্মের সময় হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। বেগম মাজারি, তার বন্ধুদের কাছে বলেছেন, 'তার জন্য সময়টা ছিল

www.pathagar.com

কঠিন, চোখে ছিল তার জল।'

পরিবারের সবাই প্রত্যাশা করেছিলেন একটি পুত্র সন্তান, কন্যা সন্তানের জন্মদানের কারণে তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবত তাকে একঘরে করে রাখার প্রচেষ্টা চলছিল। এই সন্তান জন্মদানের জন্য কেউ তাকে অভিনন্দন জানাননি। এমনকি জুলফিকারও উৎফুল্ল হননি, যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং অনেক কুসংস্কার তিনি ভেঙেছেন। প্রথা ভঙ্গ করে তিনি নুসরাতকে নিয়ে সর্বত্র গিয়েছেন।

এক বছর পর ১৯৫৪ সালে বেগম মাজারি আবার নুসরাতকে দেখতে একই হাসপাতালে গিয়েছিল। এবার জন্মগ্রহণ করে পুত্র সন্তান, মীর মুর্তজা। তিনি দেখলেন মাতৃসদনের পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন। মীর জন্মাবার পর নুসরাতের শাশুড়ি নিজে খাবার রান্না করে হাসপাতালে পাঠালেন। তিনি তাকে স্বর্ণের জিনিস উপহার দিলেন এবং তার যত্ন নিতে লাগলেন, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা ব্যতিক্রমধর্মী নয়। আজকের দিনেও একটি মেয়ের জন্মের অর্থ যৌতুক, বিয়ের বন্দোবস্ত এবং আরো কিছু দুঃখের উপাদান। 'আমার মনে আছে আমি তাকে বলেছিলাম, নুসরাত, তুমি কি করছ? আমি কি বারবার তোমাকে দেখতে হাসপাতালে আসতে থাকব?' সে হাসতে থাকল, এবার সে অনেক সুখী এবং বলল, 'আমি কি করতে পারি? জুলফি সন্তান পছন্দ করে।' অল্প ব্যবধানে তার আরও দুটি সন্তানের জন্ম হলো।

সনাম নামে একটি মেয়ে এবং শাহনাওয়াজ নামের ছেলে জন্মাল। এই নামটি রাখা হয়েছিল তার পিতামহের নামানুসারে। এভাবে জুলফিকার ও নুসরাতের ছোট পরিবারটি পূর্ণতা লাভ করল।

পাকিস্তানে গুজব আর বাস্তবতার মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারা খুবই কঠিন, বিশেষ করে, তা যদি হয় রাজনীতির ক্ষেত্রে। সন্তানদের জন্মের অল্প কিছুদিন পরই জুলফিকার তার আইন ব্যবসা ত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করলেন। নুসরাতের একজন ইরানী বন্ধুর সাথে বিয়ে হয় ইস্কান্দার মির্জার, যিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তান সরকার তখন কিছু সঙ্কট ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে ছিল। ইস্কান্দার মির্জা তখন সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যোগ্য একজন সতেজ ব্যক্তি খুঁজছিলেন। ইস্কান্দার মির্জার স্ত্রী নাহিদ মির্জা ছিলেন নুসরাতের বন্ধু, তার স্বামীকে বললেন জুলফিকার আলী ভুট্টোকে রাজনীতিতে আমন্ত্রণ জানাতে। এভাবে সূচনা হলো জুলফিকারের রাজনীতিতে আগমণ।

৭ অক্টোবর ১৯৫৮, ইস্কান্দার মির্জার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন জেনারেল আইয়ুব খান। একজন নীল-চোখা সামরিক ব্যক্তির এই বেআইনী অভ্যুত্থান ঘটে এমন এক সময়, যখন দেশে প্রচণ্ড গোলযোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চলছিল এবং দেশের বেশিরভাগ লোক জেনারেলের ক্ষমতা দখলের সময় নীরব ছিলেন। অনেকে স্বস্তি পেল। ১৯৫০-এর দশকে সাতজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কিত করেন এবং তারা প্রত্যেকেই আইন অনুযায়ী পাঁচ বছর বহাল থাকার কথা! পুরো ব্যাপারটিই হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট মির্জা বাধ্য হলেন, শাসনতন্ত্র বাতিল করতে এবং তিনি গণপরিষদসহ সকল পরিষদ ও মন্ত্রণালয় রহিত করলেন। প্রেসিডেন্ট মির্জা জাতিকে

www.pathagar.com

নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিন মাসের ভেতর সামরিক শাসন উঠিয়ে নেয়া হবে (তারা সকলেই এরূপ করেন, এটি একটি অভ্যাস)। শিগগির একটি গণভোটের মাধ্যমে সামরিক শাসনকে যৌক্তিক হিসেবে দেখানো হলো। তিনি বললেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা এত নিচু স্তরে চলে গেছে যে, আমি মনে করি, নির্বাচনের ফলে বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটবে না। ১৯৫০-এর দশকে বিষয়টিকে কোনো প্রকারে যৌক্তিক বলে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু ষাটতম স্বাধীনতা দিবসেও একনায়কদের মুখের একই প্রকার বুলি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মির্জা মোটেই দূরদর্শী ছিলেন না। সামরিক আইন জারি করার বিশ দিন পর তিনি বিতাড়িত হলেন।

এই সময় জুলফিকারের কাছে প্রস্তাব আসল নতুন সরকারে যোগদানের। অনেক পাকিস্তানির মতো তিনিও প্রথমবারের মতো অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিগগিরই সামরিক শাসনের অবসান ঘটবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছিল তখন শৈশবকাল। হয়তো সামরিক বাহিনী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাবে, হয়তো তারা গণতন্ত্রের জন্য পথের সৃষ্টি করলেন। তাই, ত্রিশ বছর বয়সে জুলফিকার ওই সরকারে যোগদান করলেন। তিনি দায়িত্ব পেলেন জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের।

জুলফিকার রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন স্বচ্ছ স্লেটের মতো, কোনো কালো দাগবিহীন তাই তাকে ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছিল। তিনি ছিলেন তরুণ, উদ্যোগী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে স্থির লক্ষ্যের অধিকারী। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, আইয়ুবের শক্ত কর্তৃত্বের মধ্যে ভুট্টোর খ্যাতি ছিল নিজের মত প্রকাশ করার সাহস দেখানোর জন্য। তার কথা আইয়ুব শ্রদ্ধার সাথে শুনতেন। তিনি তরুণ হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব তাকে সূক্ষ্ম কাজের দায়িত্ব দিতেন।[২১] ১৯৬০ সালে জুলফিকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্পর্শকাতর তৈল চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অল্পদিনের কার্যকালের মধ্যেই জুলফিকার প্রকাশ্যভাবেই হতাশ হয়েছিলেন ক্রমাগত পাকিস্তান কর্তৃক বৃহৎশক্তির সাথে সকল বিষয়ে আপোষকামিতার জন্য। তিনি বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতেন। সে সময় পাকিস্তান ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক ছিল খুব জটিল। পাকিস্তানের সাথে তখন সুসম্পর্ক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের, আর সোভিয়েত রাশিয়া ছিল ভারতের পাশে। তা সত্ত্বেও জুলফিকারের যাত্রা সফল হয়েছে। তিনি সোভিয়েত কর্তৃক তেল উত্তোলনের জন্য আরও অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। তারা এই কর্মসূচির জন্য ১২০ মিলিয়ন রুবল ঋণ প্রদান এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জুলফিকার সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরে দেখলেন। তিনি সমরখন্দে একটি দিন অতিবাহিত করলেন, এর স্থাপত্য ও সংস্কৃতির উপর কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে তার আমন্ত্রণকারীকে তা জানালেন।[২২] যদিও জুলফিকার সরকারিভাবে বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বরত ছিলেন, তবু বিদেশে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলো তাকে ভাবিয়ে তুলছিল। জুলফিকার লিখেছেন, 'আমাদের মুক্তি শুধু যুদ্ধকে বিতাড়িত করার মধ্যে নয়, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আসবে।'[২৩] যে সমস্ত অবিচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন,

www.pathagar.com

তার বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, পরিবর্তনের জন্য 'আমাদের থাকতে হবে ভয়শূন্য, প্রেরণা থাকতে হবে অদম্য, মনুষ্যত্বের উন্নতির মাধ্যমেই শুধু আমরা উন্নতি করতে পারব।'

কিন্তু জেনারেল আইয়ুবের নেতৃত্বে সকলের জন্য অর্জন আসবে না। পাকিস্তানে সামরিক একনায়করা সব সময় ক্ষমতাকে আকড়িয়ে ধরতে চায় এবং এজন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়ক বলে মনে করে। তাই, যে সামরিক বাহিনী আগে থেকে আধুনিক ছিল, তাকে আধুনিকায়ন করার যুক্তিতে ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। চুক্তির অংশ হিসেবে পাকিস্তানকে উৎসাহিত করা হয়েছে সিয়াটোতে যোগদান করতে। এই চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৫৪ সালে, পরবর্তীতে সেন্টো চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৫৫ সালে। কমিউনিস্ট চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি সিয়াটোর অনুঘটক। ভারত, বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়া সিয়াটোতে যোগ দেয়নি। শ্রীলঙ্কাও সরে পড়েছে। পরিশেষে সিয়াটোর সদস্য থাকল পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন্‌স। সেন্টো চুক্তিতে বড় রকমের স্বার্থ জড়িত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের; মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করাই এর উদ্দেশ্য। পাকিস্তান কৌশলগত কারণেই সেন্টোতে যোগদান করল। সেন্টো কার্যত আরব বিশ্বের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের ভাঙন ধরিয়েছে। যেহেতু পাকিস্তান এই চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা, তাই সে আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছে সন্দেহভাজন হয়ে পড়ল। সুয়েজ সংকটের সময় পাকিস্তানের ভূমিকা আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছে মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ভালো ছিল না। আল-বাদ্রা নামের একটি সিরিয়ান সংবাদপত্র লিখেছিল যে পাকিস্তানও ইসরায়েলের মতো ব্রিটিশদের সৃষ্টি। জুলফিকার ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তিনি তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে থাকেন। তিনি প্রবলভাবে উপলব্ধি করতেন যে, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, তিনি মনে করতেন যে, সেন্টো এখনও নয়, পূর্বেও কখনো ইরানি-তুর্কি-পাকিস্তানি-ব্রিটিশ-ইরাকি সম্প্রদায়ের প্রতিচ্ছবি ছিল না– এর অকার্যকারিতার বিষয়টি স্পষ্ট। সেন্টোর লক্ষ্য অনুযায়ী পাকিস্তানের সাথে আরব ও মধ্য পূর্বদেশগুলোর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, কিন্তু সিয়াটোর মাধ্যমে পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পুতুলে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি সরকারের অনেক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই তার প্রচণ্ড বিরক্তির কথা গোপান রাখেননি এবং রাষ্ট্রের অনেক ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। তিনি জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন :

> 'বলা হয়ে থাকে যে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি দেউলিয়ায় পরিণত হয়েছে; আরও বলা হয় যে, আমাদেরকে সেন্টো ও সিয়াটে থেকে বের হয়ে আসতে হবে, কিন্তু পরবর্তী দিন অফিসে যেয়ে দেখা যায় যে, ঝলক দিয়ে উঠছে ডিগবাজি এবং আনুষ্ঠানিকতার সাথে ঘোষণা দেয়া হয় যে, সেন্টো ও সিয়াটো ব্যতিত পাকিস্তানের অস্তিত্বই থাকবে না। কতিপয় ব্যক্তি শুধু আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ বিষয়েই যন্ত্রণা দিচ্ছে না, আমাদেরকে বহির্বিশ্বেও লজ্জিত হওয়ার মতো কারণ সৃষ্টি করেছে।"

www.pathagar.com

এরূপ ভিন্নমতকে সরকার মোটেই স্বাগতম জানাননি বিশেষ করে জেনারেল আইয়ুব। যদিও তিনি জুলফিকার যখন জ্বালানিমন্ত্রী তখন তার উপর মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না।

জুলফিকার উপলব্ধি করতেন যে, আইয়ুব সরকারের আমলে 'নিজস্ব কোনো নীতিমালা না থাকার কারণে ভয়াবহভাবে একটি পরনির্ভরশীল দেশে পরিণত হচ্ছে।' পাকিস্তানের অব্যাহত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অপরিপক্বতা জুলফিকারকে ব্যথিত করত। আইয়ুবের পররাষ্ট্রনীতি ছিল খুবই দুর্বল। সামরিক পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রচুর মার্কিনি-অর্থ আসছিল, সেদিকেই তার মূল লক্ষ্য ছিল, কূটনৈতিক বিষয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু জুলফিকার এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এক বছর সময়কাল পার করার পর তিনি লিখেছেন, 'একটি দেশের পররাষ্ট্র নীতিতেই তার সার্বভৌমত্ব প্রকাশ হয়। যদি কোনো দেশ বৈদেশিক নীতি ব্যতিত অন্য সকল শক্তির অধিকারী হয়, তবে তাকে স্বাধীন বলা যায় না।'

পাকিস্তান ক্রমাগতভাবে তার শক্তি ব্যয় করছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে এবং ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করেছে এশীয় ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে। জুলফিকার দেখলেন যে, পাকিস্তান ঠাণ্ডাযুদ্ধের ডিমগুলো দিয়ে বাক্সটি ভরছে এবং এ সমস্ত প্রকাশ করে জেনারেল আইয়ুবের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটিয়েছিলেন।

তিনি বলেছেন,

> 'আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের একটি আবর্তের মধ্যে আছি যে ক্ষেত্রে সঠিক ও ভুল পথে যার অর্থ যথাক্রমে বেঁচে যাওয়া অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। আন্তর্জাতিক উদ্বেগকে প্রশমিত করার পরিবর্তে গণদেবতারা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষের মাধ্যমে বিশ্বে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে চলেছে।'

জুলফিকার ইতিহাসবিদ হিউগ ট্রেভার-রোপারের কথা অনুযায়ী যে কোনো পথে ঝাপ দিতে অস্বীকার করলেন, যা স্বভাবতই জেনারেল আইয়ুবকে ক্রুদ্ধ করল।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ছিল জুলফিকারের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জেনারেল আইয়ুবের আমলে পাকিস্তান ও চিনের সম্পর্কের অবনতি ঘটা ছিল অবধারিত। জেনারেল ক্রমাগত চীনকে বাইরে রেখে যুক্তরাষ্ট্রকে স্থান করে দিচ্ছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে, পাকিস্তান এখন আর আমেরিকার সুনজরে নেই। চীনের সাথে সম্পর্ক এবং বিপরীতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও ঘুরে গেল ১৯৬৩ সালে, যখন জুলফিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় পররাষ্ট্রনীতির স্থপতি হলেন। ১৯৬২ সালে চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বাভাস পেয়ে এবং তরুণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চীনের সাথে ঝুঁকে পড়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার দেয়া ৩০০ মিলিয়ন টাকা স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে উঠিয়ে নিয়ে পাকিস্তানস্থ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা করলেন। এটি পাকিস্তানের প্রতি সুস্পষ্ট সতর্কতা।

কিন্তু ভুট্টো এই হুমকিতে তেমন সাড়া দিলেন না। গুজব আছে যে, আমেরিকার কোনো এক কূটনীতিক, বলা হয়ে থাকে কিসিঞ্জার– জুলফিকারকে বলেছিলেন যে তিনি যদি

www.pathagar.com

তাদের একজন সিনেটর হতেন, তবে তাকে বের করে দেয়া হতো। জবাবে জুলফিকার বলেছিলেন, 'আমি কখনো সিনেটর হতাম না, হতাম আপনাদের প্রেসিডেন্ট।'

তিনমাস পর পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে একটি সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিটি সম্পাদিত হয় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী এবং চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ই'র দ্বারা। এই চুক্তির মাধ্যমে চীনের পিং কিয়াং এলাকা এবং পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়। এটি একটি বড় অর্জন বলে ঘোষণা করা হয়। এটি শুধু চীন ও পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনই ঘটায়নি এর দ্বারা এই দুই প্রতিবেশীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, এশিয়ার এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা করে।

এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র খুব বিরক্ত হলো। তারা ঘোষণা করলো যে, 'এই সীমান্ত চুক্তি হলো বিশ্ব শান্তির একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি।' তারা ঢাকা বিমান বন্দর নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত তহবিল প্রত্যাহার করলো।

জুলফিকার চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন অব্যাহত রাখলেন। দেশ দুটো বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করল। পাকিস্তান রপ্তানি করতে থাকল পাট, তুলা, কাপড় এবং আরও কিছু জিনিস। এদেশে আমদানি হতে থাকল চীনের রাসায়নিক রং, মেশিনপত্র এবং খনিজ মোম। ১৯৬৪ সালে চীন পাকিস্তানকে ৬০ মিলিয়ন ডলার সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে, এই কারণে যে জুলফিকার আলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর আমেরিকা তার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। দুই দেশের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হলো এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নের বিষয়ে বলতে থাকলেন, তিনি ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধার একটি অশনি-সংকেত দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, 'ভারত কর্তৃক যদি পাকিস্তান আক্রান্ত হয়, তবে এশিয়ার বৃহত্তম যে দেশের সাথে আমাদের সীমান্ত যুক্ত আছে, সে দেশের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।' আইয়ুব সম্ভবত চীনের সাথে নতুন সম্প্রীতিতে সাচ্ছন্দ বোধ করেন নাই, তবে পাকিস্তানের জনগণ এটিকে সাদরে গ্রহণ করে। সে সময়ের শ্লোগান ছিল, পাক-চীন ভাই ভাই; আমরা এখন আর নিম্নবর্গের নই। পাকিস্তান নতুন সীমান্ত খুলে দেয় এবং আগের নিরাপত্তাহীন অবস্থা অবসান ঘটে। একমাত্র কর্তৃত্বপরায়ণ প্রিয় বন্ধুর চলে যাওয়ায় বরং নতুন উদ্যামের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সালে যখন চেন ই পাকিস্তান আসেন, তখন তাকে খুব জাঁকজমকের সাথে পাকিস্তানিরা সংবর্ধনা দিয়েছেন। তখনকার ইংরেজি পত্রিকা ডন মন্তব্য করেছে যে, এর আগে কোনো বিদেশী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানে এত বড় অভ্যর্থনা পাননি।

যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, প্রেসিডেন্ট কেনেডির অধীনস্থ আমেরিকা ভারতের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে সিনেটর হাবার্ট হামফ্রে চীনের কমিউনিস্ট হুমকির প্রতিরোধের জন্য ভারতের সাথে মৈত্রী বন্ধনের প্রস্তাব রাখেন। উন্নয়নশীল দেশগুলো আবার পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে বৃহৎশক্তির প্ররোচণায়।

১৯৬৫ সালে জুলফিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি সমর্থন করেননি। ফলে জেনারেল আইয়ুব ওয়াশিংটনে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাননি। জুলফিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এই মন্ত্রণালয় ছিল গতিশীল, সম্ভবত তার সবচেয়ে চমৎকার সময় কাটছিল এ সময়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিষয়ে তিনি যে সমর্থন দেননি, এজন্য গর্বে আমার

www.pathagar.com

বুক ভরে উঠেছে।

আমি আমার স্নাতকপূর্ব গবেষণাপত্র লিখেছি জুলফিকারের দ্বিপাক্ষিক পররাষ্ট্রনীতির উপরে। আমি আমার পিতার কাছে এসব বিষয়ে শুনেছি, আমার পিতামহের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল বিশাল আকারের। আমার এক গবেষণা উপদেষ্টা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আমি যেন জুলফিকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময়ের ঘটনাবলি বেশি না লিখি। তিনি থিসিসের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে এই উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি ছিল আবেগজড়িত। তাই আমি আমার উপদেষ্টাকে সেভাবেই বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। নিউইয়র্কে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক ও আফগানিস্তানে আক্রমণ চালাচ্ছে; এই দুটি দেশের সাথে আমার পূর্বপুরুষদের বন্ধন আছে– নুসরাতের আছে তার পারিবারিক কুর্দি রক্ত–এবং দেখছি যে আমার দেশ এই অন্যায় যুদ্ধের পক্ষে সহযোগিতা করছে। আমি আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। এখান জুলফিকারের একান্ত প্রয়োজন। আমি একজন তরুণ পাকিস্তানি হিসেবে যার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্র, বেসামরিক ও সামরিক শাসনামলে, আমি আমার দেশ সম্পর্কে কোনো গর্ব অনুভব করার মত কিছু দেখি নাই। আমার এই অনুভূতি সহজাত নয়, আমার পিতামহের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করার পূর্বে আমি বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি নাই।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের ফলে জুলফিকার ও জেনারেল আইয়ুব খানের সম্পর্কের ভাঙন ধরল। এই যুদ্ধের অনুঘটক ভারতীয় সংসদ কর্তৃক একত্রিকরণ বিল পাস, যার মধ্য দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ হিসেবে পরিণত করা। কাশ্মীরীরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দান করেন, তাঁরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক, ভারতের নয়, তারা যুদ্ধ-বিরতি লাইন অতিক্রম করলেন এবং ফলশ্রুতিতে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল। আসলে কোনো যুদ্ধই হয়নি। শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান তখনও ভুলতে পারেনি কাশ্মীর উপত্যাকা হারানোর বেদনা, যে উপত্যাকাটি তাদের পূর্বপুরুষগণ তাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তাদের আবাসভূমি হিসেবে।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী কার্গিলে সৈন্য পাঠাতে শুরু করল এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মিরের সামরিক কৌশলগত সুবিধাজনক স্থান দখল করল এবং নিশ্চিত করল যে সার্বিকভাবে একটি যুদ্ধের সূচনা ঘটেছে। উভয় দেশই দেখল যে যুদ্ধ অবধারিত, উভয় দেশই পরস্পর প্রতিবেশী দেশকে দোষারোপ করতে থাকল। নেহেরু বিশ্বাস করেন যে পাকিস্তান ক্রমাগত আগ্রাসনের মাধ্যমে কাশ্মীর ভূখণ্ডকে ধ্বংস করছে, আর ভারত শুধু শান্তির উদ্দেশ্যই কাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ভারত মনে করে বিভেদ সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান, প্রচারণার মাধ্যমে দেশটি ঘৃণা ও অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে। পক্ষান্তরে জুলফিকার ভারতকে দেখছেন একটি দখলদার দেশ হিসেবে। তিনি মনে করতেন যে ভারত কর্তৃক কাশ্মীরকে দখলে রাখা আর পর্তুগাল কর্তৃক মোজাম্বিক দখল করে রাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই, ১৯৬৫ সালের শরৎকালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। পাকিস্তান অবিশ্বাস্য রকমের নাজুক অবস্থায় ছিল; যখন ভারত তার

www.pathagar.com

সামরিক প্রয়োজনের শতকরা ৮০ ভাগ নিজেই মেটাতে পারে,[৩৯] অপর দিকে পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল শূন্য, তার নির্ভরশীলতা ছিল সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রের উপর। যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের একমাত্র সামরিক সাহায্যদাতা দেশ। ভারত অবশ্য জোট নিরপেক্ষ দলের সদস্য হিসেবে সেখান থেকে সামরিক সহায়তা পেতে পারে, তারা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নয়। তাছাড়া তাদের সাথে সম্পর্ক আছে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের।

ভারতের বাইশটি সামরিক ডিভিশন, যা সজ্জিত ছিল মার্কিনি অস্ত্র দ্বারা, তা ছিল পাকিস্তানের সাড়ে ছয়গুণ বড়। এটি সুস্পষ্ট যে মিত্রদের সাহায্য না পেলে পাকিস্তান ভারতের সামরিক বাহিনী কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যাবে। এরূপ করুণদৃশ্য দেখার পরও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসল না। এটি যুক্তরাষ্ট্রের-পক্ষে বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতা, যেহেতু পাকিস্তানই ছিল এই অঞ্চলে তার সবচেয়ে বড় মিত্র। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র চীন এগিয়ে এসেছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কার্যক্রম হলো উভয়দিকের সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দেয়া, তাতে পাকিস্তান নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল। পাকিস্তানের ধারণা ছিল যে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এবং তার কারণেই পাকিস্তান আঞ্চলিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সিয়াটো ও সেন্টোর সদস্য হয়েছে; তাই প্রত্যাশিত ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিরাপদে রাখবে যে কোনো আগ্রাসন ও ক্ষতি থেকে। আইয়ুব খান ইতোমধ্যেই তার পৃষ্ঠপোষকদের কাছে একজন অগ্রহণযোগ্য কূটনীতিকে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে আবেদন জানালেন। জনসন প্রশাসন থেকে জবাব আসল যে, চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, এমন কোনো দেশকে তারা সমর্থন দান করে না। প্রেসিডেন্ট জনসন আরও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন যে, অর্থনৈতিক সাহায্যও আর অব্যাহত থাকবে না।

সেক্ষেত্রে ভারত ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পেয়েছে, সেখানে পাকিস্তান তার ঠাণ্ডাযুদ্ধের দানব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলো। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে বিষয়টি পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হলো। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২৪৬.৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও সাহায্য দিল এবং আর ৩৪.২ মিলিয়ন দিল আমদানি-রফতানি বাবদ ব্যাংক ঋণ, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান তুলনামূলকভাবে পেল ১৮২.৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও সাহায্য কম এবং আমদানি-রফতানি ব্যাংক ঋণ হিসাব কিছুই পায়নি। দৈনিক টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখেছে যে যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল জেনারেল আইয়ুবকে উৎখাত করতে ভারতকে উৎসাহ দিয়েছে পাকিস্তান আক্রমণ করতে। যুক্তরাষ্ট্র আভাস দিয়েছে যে আইয়ুবের পতন অত্যাসন্ন। যুদ্ধ-বিরতি লাইনের বাইরের কাশ্মিরের অংশ ভারত কর্তৃক পুনঃদখল করার বিষয়টিকে নয়াদিল্লীস্থ মার্কিন দূতাবাস 'অনুমোদন' দিয়েছে।

পাকিস্তানকে সমর্থন করার বিষয়ে চীনের প্রতিক্রিয়া অবশ্য দ্রুত এবং জোরালো। যখন ভারতীয় বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে লাহোর আক্রমণ করে, চীন এগিয়ে আসল এবং এটিকে ভারতীয় আগ্রাসন বলে অভিহিত করল এবং ভারতের দাবি তারা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে মাত্র, তা প্রত্যাখ্যান করল। চীন যুক্তরাষ্ট্রকেও আংশিকভাবে দোষারোপ করল ভারতের উপর পক্ষপাতিত্বের কারণে। প্রধানমন্ত্রী চৌ-এনলাই দৃঢ়তার

www.pathagar.com

সাথে বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত ভারত এরূপ একটি সামরিক অভিযান চালাতে পারে না।[৫২] চৌ-এনলাই শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, সোভিয়েত ইউনিয়নের অশোভন ভূমিকারও নিন্দা করেন।'

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের আক্রমণের আশঙ্কা হচ্ছিল। চীন এ সময় পাকিস্তানকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে একটি কৌশল অবলম্বন করল। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ চীন ভারতকে চূড়ান্ত হুসিয়ারী দিল, চায়না-সিকিম সীমান্ত থেকে সামরিক স্থাপনা সরিয়ে নিতে হবে তিন দিনের মধ্যে, অন্যথায় ফল খুব খারাপ হবে। চীনের এই হুমকির কারণে ভারত পেছনে ফিরল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে চাপ উঠিয়ে নিল।

জাতীয় সংসদে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীনের অবদানের কথা উত্থাপন করলেন, ইতোপূর্বে তিনি এ বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন, তার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, তিনটি বিষয়ের বিবেচনায় ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি– বিধাতা, মৌসুমি বায়ু এবং চীনের চরমপত্র।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ থামল। দুই পক্ষই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিল। কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। যুদ্ধে দখলকৃত ভূমি ফেরত, যুদ্ধবন্দীদের ফেরতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনায় বসতে আইয়ুব খানকে তাসখন্দে আমন্ত্রণ জানাল ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জুলফিকার ছিলেন আইয়ুব খানের সোভিয়েত ইউনিয়নে না যাওয়ার বিষয়ে অনমনীয়। কারণ যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বৈত ভূমিকা ছিল কদর্য। তিনি চেয়েছিলেন, আইয়ুব যেন তাদের কাছে নতজানু না হয়। সোভিয়েত নয়, চীন যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সহায়তা দান করেছে, অথচ তাকে রাখা হয়েছে বাইরে। জেনারেল আইয়ুব পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা গ্রাহ্য করলেন না। পাকিস্তানের জনগন আইয়ুবের তাসখন্দ যাত্রার প্রতিবাদ করল। জেনারেল আইয়ুব ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে তাসখন্দ গেলেন।

তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের পক্ষে জেনারেল আইয়ুব খান এবং ভারতের পক্ষে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। এই ঘোষণায় তাসখন্দ ঘোষণাপত্রে কাশ্মীর থেকে সেনা অপসারণের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে; এর মধ্যে আছে যুদ্ধ বিরতি লাইন মেনে নেয়া, যুদ্ধ বন্দীদের প্রত্যাবর্তন এবং উভয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি। জেনারেল আইয়ুব তাসখন্দে এসে কোনো জোরালো বক্তব্যই রাখতে পারেননি এবং আমন্ত্রণকারীকে ধন্যবাদ দেয়ার সময় বললেন যে, ভারত ও পাকিস্তান বহুদিন বিদেশী শক্তির অধীনস্ত থেকে অনেক ভোগান্তির শিকার হয়েছে এবং এখন উভয় দেশই স্বাধীনতা লাভ করেছে; এসমস্ত বলে অবচেতনভাবে তিনি পাকিস্তানকে আবার দুই বৃহৎশক্তির কব্জায় আবদ্ধ করলেন।

সরকারিভাবে যুদ্ধ অবসান হয়েছে একটি অচলাবস্থার মধ্যে। পাকিস্তান কাশ্মীর তো দখল করতে পারেইনি, উপরন্তু ভারতীয় বাহিনীর দ্বারা তার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বিরোধীদের মধ্যে যারা মনে করলেন যে পাকিস্তান যুদ্ধে জিতেছে, কিন্তু মূল বিষয় ছিল কাশ্মীরকে মুক্ত করা, তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা দ্রুত আন্দোলনে নামলেন। জুলফিকার মনে করলেন যে, জেনারেল আইয়ুব তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে

www.pathagar.com

পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য এনেছেন। তার মতে কাশ্মীর সমস্যার কোনো সমাধান না করে শুধুমাত্র সেনা প্রত্যাহারের মধ্যে ঘোষণা সীমাবদ্ধ থাকার অর্থ জেনারেলের দুর্বল পরিচালনা। তিনি আগেই আইয়ুবকে এ ধরনের বড় ভুল করা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সবই বৃথা।

কাশ্মীর পাকিস্তানিদের কাছে প্রায় পৌরাণিক গুরুত্ব বহন করে এবং জুলফিকার বুঝলেন যে জেনারেল আইয়ুব পরিস্থিতিকে যেভাবে পরিচালনা করছেন, তার ফলে পাকিস্তানের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে এবং সে সুবিচার পাচ্ছে না। জুলফিকার নিজে উপলব্ধি করলেন যে, কাশ্মীরকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে, যদি পাকিস্তান সত্যিকার অর্থে এর অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়।[৪৭] তিনি আর জেনারেলের নির্দেশ পালন করতে সমর্থ থাকলেন না। তাসখন্দে চীনকে বাদ দেয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হলো এবং পাকিস্তান ও ভারতের জন্য প্রতিশ্রুত সামরিক ও অর্থনৈতিক বরাদ্দ আবার পুনর্জীবিত করল। ঘোষণার দুই দিন পর জুলফিকার ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং জেনারেল আইয়ুবের সরকার থেকে বিদায় নিলেন।

এটি ছিল ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়,[৪৮] বলেছেন মির্জা মোহাম্মদ খান, এখন তার বয়স আশি বছর, তিনি এখন হৃৎপিণ্ডের অসুখে ভুগছেন, আমাকে বললেন, "নাসের যে সুয়েজখালকে জাতীয়করণ করেছেন, সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় যে ভূমিকা রেখেছেন, প্যাট্রিক লুবুম্বার কঙ্গোর কর্মকাণ্ড এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিশ্বের তরুণ সমাজকে প্রেরণা দিয়েছে। রাজনীতি হলো বাস্তবতার সাথে কল্পনার সংমিশ্রণ। আমি আইয়ুবের আমলে ভুট্টোর সাথে সাক্ষাত করেছিলাম, কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা কাউকে, বিশেষ করে ছাত্রদেরকে ৭০ ক্লিফটনে যেতে দিত না। তারা ভুট্টোর কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য ভয়-ভীতি দেখাত, কিন্তু আমরা ভয় পেতাম না।" মীরাজ ছিলেন তৎকালীন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট, তিনি এখনও এই বৃদ্ধ বয়সেও রাজনীতির একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড।

'সেই সময়গুলোতে তারা ভুট্টোকে নিয়ন্ত্রণ করত, কারণ তারা জানতেন যে, ভুট্টো এই সরকার ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এবং তাই তারা তাকে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করছেন। সংবাদপত্রেও তার খবর খুব ছোট্ট করে ছাপা হচ্ছিল। এনএসএফ-এর দৃষ্টিতে এই সরকারের বিরুদ্ধে আমরা ছিলাম ঘোরতর প্রতিপক্ষ। আমাদের পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেজন্যই তিনি আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাকে শ্রদ্ধা করতেন।' মিরাজ আমার সাথে উর্দুতে কথা বলছিলেন, মাঝে মাঝে থামছিলেন সাথে রাখা টয়লেট পেপারে কফ রাখার জন্য। তিনি কিছুক্ষণ পরপরই বিরতি দিচ্ছিলেন, ভাবছিলেন আমি সঠিকভাবে লিখছি কিনা, কারণ আমি নোট নিচ্ছি ইংরেজিতে।

'১৯৪৬ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধ নাবিক ধর্মঘট হয়েছিল, তখন আমি একটি বড় পাত্র ফেলেছিলাম একটি দালানের পঞ্চম তলা থেকে ব্রিটিশ ট্রাকের উপর। তখন তারা আমাকে খুব পিটিয়েছিল। এরপর থেকে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পছন্দ করি না। আজও আমার এ বিষয়ে বীতশ্রদ্ধা আছে', তিনি খুলে বললেন।

মিরাজ একজন মার্কসবাদী। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী ছাত্রনেতা যিনি তার জীবনের একটি বড় সময় কাটিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের অভিজাত তন্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

লড়াই করে, যে শাসন গরিব লোকদেরকে দমিয়ে রাখে। 'যখন আমরা শুনলাম যে, ভুট্টো আইয়ুবের সরকার থেকে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন, আমরা এনএসএফ-এর ছাত্রদেরকে একত্রিত করে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যখন তিনি রাওয়ালপিন্ডি থেকে করাচি ফিরে আসলেন। আমরা হাজার হাজার ছাত্র তাকে অভ্যর্থনা জানালাম, আমরা তাকে ৭০ ক্লিফটনে নিয়ে একটি বড় সমাবেশের আয়োজন কলাম। সেখান থেকে চলে আসার পূর্বে আমরা তাকে একটি কাগজ দিলাম, যাতে বৈদেশিক নীতিমালা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ছিল। তিনি ওইদিন সন্ধ্যায় আবার আসতে বললেন তার সাথে দেখা করতে। তিনি ইতোমধ্যে দ্রুত কাগজগুলো পড়েছেন এবং এর প্রশংসা করলেন।

'সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে আমাদের প্রায়ই কথা হতো, আমরা কথা বলতাম হরিজনদের সম্পর্কে, কৃষকদের সম্পর্কে, মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে, শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে। তিনি বলতেন, 'আমি আছি গরিবদের সঙ্গে, যারা নগ্ন পায়ে আছে, তাদের সাথে, তৃণমূলদের সাথে।' এজন্য জনগণ তাকে ভালোবাসত।' জুলফিকার জেনারেল আইয়ুবের সরকার ত্যাগ করেছেন চুপচাপ বসে থাকার জন্য নয়; তিনি প্রতিবাদ হিসেবে পদত্যাগ করেছেন এবং সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তিনি পরবর্তীতে কী করেন, তা দেখার জন্য। মিরাজ, রাজনীতিতে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, সম্ভবত জুলফিকারের সামন্তবাদী পরিবারের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখতেন না, কিন্তু তবু তিনি ভুট্টোর সাথে যোগদান করলেন, কারণ তিনি তার মধ্যে ভিন্ন কিছু পেয়েছেন, যা বেশিরভাগ জমিদারের মধ্যে অনুপস্থিত। 'তোমাকে আমি বলছি, তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম,' মিরাজ আমাকে বললেন বহু বছর পর। জুলফিকার যখন সরকারে ছিলেন, তখন তার সাথে যে বিরূপ সম্পর্ক ছিল, তা' তিনি পরবর্তীতে ভুলে গিয়েছিলেন। 'হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আমার নেতা, তবে তার সাথে আমি তর্ক করতাম আর তিনি তা সহ্য করতেন। আমি তাকে রক্ষা করতাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি সামন্ততন্ত্রের অবসান আনবেন। আমি যখন তাকে বলতাম, মি. ভুট্টো, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটান।' তিনি আমাকে বলতেন, 'আমরা স্বাধীন জাতি নই। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতেই হবে। পাঞ্জাব হলো আমাদের ক্ষমতার স্থান। বেশিরভাগ সেনাবাহিনীর লোক ও আমলারা এসেছে পাঞ্জাব থেকে। যদি আপনি পাঞ্জাবকে জয় করতে পারেন, আপনি সারা পাকিস্তানকে জয় করবেন।' তখনকার ওই বিদ্যমান অবস্থায় আমরা লড়াই করেছি, জুলফিকারের বয়োবৃদ্ধ সহকর্মী ড. গোলাম হোসেন স্মরণ করেন। তিনি আরও বললেন, 'আমরা চেয়েছিলাম শ্রেণী সচেতনতা, আমরা চেয়েছিলাম যথার্থ পরিবর্তন।'

কিন্তু এটা খুব সহজ কাজ নয়, সামরিক শাসনের আমলে তো নয়ই। তারা পাকিস্তানি রাজনীতির দড়ি টেনে ধরেছে, এখনও তারা আমাদের দড়ি টেনে ধরে, তাদেরকে এখনও পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই।

জুলফিকার আইয়ুব সরকারের মন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসার পর তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। আইয়ুব তার জনপ্রিয়তা রোধ করতে ব্যর্থ হলেন। জুলফিকারকে সাহায্য করতে যারা এগিয়ে এলেন, তারা সাধারণ মানুষ, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিক– আমলা বা সামরিক মোসাহেব নয়, জনগণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। রাষ্ট্র ভাবল, সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা জনগণকে দমিয়ে রাখা যাবে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ভোটারদেরকে খুব সামান্যই গ্রাহ্য করে (ভোটের সুযোগ খুব কমই আসে, কখনো উন্মুক্ত ভোটের ব্যবস্থা হয়নি)। বাইশ বছর পুরানো এই রাষ্ট্রে কখনও ন্যায় সঙ্গতভাবে, নিরপেক্ষভাবে মুক্ত ভোটের মারফত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্র দুশ্চিন্তায় পড়ে জুলফিকারের আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের জন্য।

পাকিস্তানে রাষ্ট্র ক্ষমতাবান হয় বাইরের শক্তির বলে, বড় দেশের এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সির প্রভাবে; এই ক্ষমতা রাষ্ট্র সর্বদা ধরে রাখে। জুলফিকার ভুট্টো চলে যাবার পর চীন তাদের উপর বিরক্ত হয়, সন্দেহ করে যে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের কারসাজির কারণে এটি ঘটেছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই আলবেনিয়া ও বোসনিয়ায় রাষ্ট্রীয় ভ্রমণ শেষ করে ফেরার পথে জেনারেল আইয়ুবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য করাচিতে আসলেন। তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন, ভুট্টোর বিদায়ের কারণে চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি হবে কিনা। আসলে ভুট্টোর বিদায়ের পর চীনের সাথে যে সম্পর্ক ছিল, তা হলো ধীরে চল নীতি।

ভুট্টোর নিজ শহর লারকানার একজন আইনজীবী আবদুল ওয়াহিদ কাটপার ভুট্টোর বর্ণিত একটি গল্প বলেছিলেন : তার পদত্যাগের পর আইয়ুব ভুট্টোকে তার সাথে দেখা করতে বললেন। ভুট্টো যখন তার সাথে দেখা করতে গেলেন, প্রেসিডেন্ট তাকে ভয় দেখালেন। আইয়ুব তার জুতার মোজা ও পোশাক ঠিক করতে করতে কথা বলার আগে চিন্তা করার সময় নিয়ে তাকে বললেন, 'দেখুন আমরা পাঠান, আমরা আমাদের শত্রুকে শান্তিতে থাকতে দেই না, এমন কি কবরে গেলেও না।' বার্তাটি সুস্পষ্ট।

পাকিস্তানিরা তাসখন্দ ঘোষণাকে নিশ্চিতরূপে কাশ্মীরকে হারানোর দলিলরূপে ধরে নিয়েছেন। আবারও তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া হলো। শুধু ভুট্টোই তাসখন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে বলেছেন; অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে নীরব রইলেন। জুলফিকার ক্রমাগত তার প্রাক্তন উপরওয়ালার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে লাগলেন, আর তাকে আরও বেশি হয়রানির শিকার হতে হলো।

ওই সময়ে সিন্ধু সরকার খোলাবাজারে চাল বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকারের কাছে বিক্রির নির্দেশ দিলেন। দশ ওয়াগন চাল সরকারের কাছে জমা দেয়া হলে, বিক্রেতারা সামান্য মূল্যই পায় এবং এর বিনিময়ে মাত্র এক ওয়াগন চাল মুক্তবাজারে বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যেহেতু জুলফিকার জমিদার পরিবারের লোক, তাই সুযোগ নেয়া হলো, সরকার ভুট্টোর চালকলের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, তারা তিন ওয়াগন চাল পেশোয়ারে নিয়ে বিক্রির চেষ্টা করছিল।

আবদুল ওয়াহেদ কাটপার, লারকানার একজন তরুণ আইনজীবী, তখন ছুটি কাটাতে পরিবারের সাথে কোয়েটায় ছিলেন, সেখানেই তিনি খবরটি শুনলেন, জুলফিকারের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ আনা হয়েছে। তার পরিবার তাকে লারকানায় যেয়ে ভুট্টোর পক্ষে আইনী সহায়তা দান করতে বললেন। ওই সময় তার সাথে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কোনো পরিচয় ছিল না, তিনি শুধু তাকে নামে চিনতেন। তিনি অবাক হয়ে তার পারিবারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কেন যাব? ভুট্টোর কি এই মোকদ্দমায় লড়ার জন্য তরুণ আইনজীবীর অভাব, কাটপারের দৃষ্টিতে মামলাটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক; এটি সহজেই

www.pathagar.com

আদালতে লড়া যায়। কিন্তু তাকে বলা হলো যে, ভুট্টোর পাশে এখন কেউ নেই। যখন থেকে তিনি সরকারে নেই এবং সরকারি কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না, তখন থেকে তারা তার সাথে নেই।'

'অতএব আমি আমার ছোট রাশান গাড়ি সারারাত চালিয়ে লারকানায় পৌঁছলাম,' কাটপার স্মরণ করলেন। আমি আটককৃত কর্মীদের জামিনের জন্য দরখাস্ত করলাম, অভিযুক্তদের মধ্যে কিছু মহিলা ছিলেন, তারা স্থানীয় আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন পেলেন। প্রকাশ পেল যে, চাল বিক্রির জন্য যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদের কাছে চাল বিক্রির অনুমতিপত্র আছে। ভ্রান্ত ধারণা থেকে তাদের নামে মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছে, এর দ্বারা জনগণকে ভুট্টো সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে। আমি পেশোয়ার পুলিশের মুখোমুখি হলাম, কারণ তারাই গ্রেফতার করেছে এবং দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করেছে, ঘটনার সত্যতা প্রমাণের পর পরিশেষে মামলাটি খারিজ হলো।'

চাল নিয়ে গোলযোগের পুরো সময়টিতে জুলফিকার ছিলেন প্যারিসে। ফিরে এসে জানলেন যে, তার নগরীর একজন অপরিচিত ব্যক্তি তার পক্ষ হয়ে মামলাটি লড়েছেন এবং এটি বাতিল হয়েছে, ফলে পারিবারিক মিলের কর্মীরা মুক্ত হয়েছে। তিনি ফোনে কাটপারকে জুলফিকারের লারকানার বাড়ি আল মুর্তজা ভবনে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। কাটপার বললেন, 'সেখানেই আমাদের শুরু। তিনি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন আমার সাহায্যের জন্য এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমার সেবা দানের জন্য তিনি কী পরিমাণ অর্থ ঋণী। আমি তাকে আমার 'ফি' এর কথা ভুলে যেতে বললাম এবং বললাম যে, আমি কর্তব্যবোধ থেকে কাজটি করেছি। এরপর ভুট্টো পকেট থেকে একটি নোটিশ বের করলেন– এটি লারকানার জেলা কমিশনারের একটি চিঠি, তিনি বাড়ির সকল অস্ত্র জমা দিতে বলেছেন। (আমি জোরে হেসে উঠলাম, কাটপারের কথা বাধাপ্রাপ্ত হলো এবং তিনি অবাক হলেন যে, আমি এর মধ্যে কৌতুকের কী বিষয় খুঁজে পেলাম। আমি বললাম, এ জন্যই আমার পিতা মুর্তজাকে পুলিশ ক্রমাগত হয়রানি করত- অস্ত্র। এই পরিবারের প্রাচীন নিদর্শন স্বরূপ কিছু অস্ত্র এবং শিকারের অস্ত্র ছিল অনেক আগে থেকেই। সবগুলোরই আইনগত অনুমোদন আছে, কিন্তু সহজ পন্থা.. ।) কাটপার বললেন যে, এ সমস্ত হলো শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য কিছু কৌশল। এরপর তিনি বলতে থাকলেন, 'আমি তার কাছ থেকে নোট নিলাম এবং আদালতে দরখাস্ত পেশ কররাম। এভাবেই আমি মি. ভুট্টোর সাথে ঘনিষ্ঠ হলাম।'

সরকার যখন ক্রমাগত তাকে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করছে, তখন তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচির খসড়া তৈরিতে ব্যস্ত। তিনি দেশব্যাপী ভ্রমণ করতে থাকলেন এবং তরুণ রাজনৈতিক ও স্থানীয় নেতাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। তিনি চারটি প্রদেশ ও পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ কার্যক্রম চালাতে থাকলেন। তিনি নিজে একটি দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এজন্য কাটপার অনেক সময় জুলফিকারের সাথে আল মুর্তজায় কাটিয়েছেন। তারা একসাথে খাবার খেয়েছেন অনেক বার এবং একসাথে সন্ধ্যাবেলা সিন্ধী লোকসঙ্গীত শুনেছেন। 'তিনি কখনো উর্দু গান শুনতেন না, শুনতেন শুধু সিন্ধী গান। এগুলো ছিল সুফি সঙ্গীত।' কাটপার গর্বের সাথে বললেন। সে সময় লাহোরের ড. মুবাশ্বির হাসান ও জে,এ রহিম লারকানায় ছিলেন জুলফিকারের সাথে। তারা যৌথভাবে গঠিত হওয়া

www.pathagar.com

পাকিস্তান পিপলস পার্টির কর্মসূচির যৌথ প্রণেতা। তারা এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, জমিদার পরিবার থেকে নয়, তারা ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী। শরৎকাল শেষ হয়ে শীতকাল ঘনিয়ে আসছে, দলের সূচনা হওয়ার তারিখ নিকটবর্তী। জুলফিকার তার বন্ধু কাটপারকে প্রস্তাব দিলেন, তার সাথে লাহোর যেতে। কাটপার একটু লজ্জাজড়িত আপত্তি জানালেন, 'আমি তো রাজনীতিবিদ নই।' আসলে তিনি ছিলেন লারকানা বারসমিতির সভাপতি, যা বাস্তবে একটি বড় রাজনৈতিক পদ। জুলফিকার জোর দিয়ে বললেন, আপনি আমাদের সাথে যাবেন; এরপর তারা দু'জন লাহোরের পথে যাত্রা করলেন। পাকিস্তানের অন্যান্য মহানগরের মতো লাহোরে কোনো হট্টগোল নেই, এটি সবসময় শান্ত ছিল। বাড়িগুলোর মধ্যে দূরত্ব আছে, রেস্তোরাঁগুলো উন্নতমানের, মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কারণে লাহোর পাকিস্তানের চমৎকার শহর।

এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। মোঘলরা এটিকে রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এখানে আছে জাহাঙ্গিরের কবর, শীষমহল আর সালিমার বাগান। এগুলোর নকশা এঁকেছেন শাহজাহানের তৈরি তাজমহলের স্থপতি। লাহোরকে বলা যায় পাকিস্তানের জন্মভূমি, কারণ এখানেই লাহোর প্রস্তাব গৃহিত হয়, মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে। লাহোরেই পাকিস্তানের স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল। এই লাহোরেই যুক্ত হলো আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনার, পাকিস্তান পিপলস পার্টির জন্মভূমি হিসেবে যখন ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের বিখ্যাত সন্তান পাঞ্জাবে এসেছিলেন তার নিজের ইতিহাস রচনা করতে।

যখন খবরটি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, জুলফিকার এখন জেনারেল আইয়ুবের প্রশাসন থেকে মুক্ত, নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরির আয়োজন করতে যাচ্ছেন, তখন জেনারেলের সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে, বিষয়টিকে তারা সহজভাবে গড়ে উঠতে দেবে না। লাহোর নগরী এবং নিকটতস্থ জেলাগুলোতে ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে জুলফিকারের বিরাট বিরাট সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কারণ এটি হতো সরকারের জন্য বিব্রতকর অবস্থা। এই ১৪৪ ধারাটি কার্যকর করা হয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারণে– ১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধের সময়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা সভা-সমাবেশ ইত্যাদি পণ্ড করার জন্য এবং অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান দখলের প্রতিবাদে ইসলামিক দলগুলোর সমাবেশ বন্ধ করা হয় এই ধারার বলে।

১৪৪ ধারা জারি হয় রাষ্ট্রীয় বিশেষ জরুরি অবস্থার কারণে, কিন্তু এখন আইনের এই ধারাটি ব্যবহার করা হয় পিপপির আবির্ভাবকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। পূর্বপরিকল্পনা ছিল যে নগরের একটি বড় পার্কে সমাবেশ থেকে দলের কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হবে একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. মুবাশ্বির হাসানের ৪-কে গুলবার্গের বাড়িতে। যেহেতু কোনো মহলই সরকারের বিরাগভাজন হয়ে জুলফিকার ভুট্টোকে স্বাগত জানাতে সাহস করল না, তাই ড. মুবাশ্বির তার বাড়িতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলেন।

৩০ নভেম্বর ১৯৬৭ ড. মুবাশ্বিরের ছোট প্রাঙ্গনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিরা এসে জমায়েত হতে লাগলেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ-- ধনী ও দরিদ্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধার্মিক।

তিনি বিশ্লেষণ করলেন, নতুন এই দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য হবে সামাজিক

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার। এর নীতিমালা হবে উৎপাদনকে শোষণের হাতিয়ার হতে দেয়া হবে না। তিনি নির্দিষ্ট কিছু শিল্পকারখানাকে জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন, সেগুলো হলো ব্যাংক, পরিবহন এবং জ্বালানি সম্পদ এবং সেগুলোর পাবলিক সেক্টরের অন্তর্ভুক্তির। জুলফিকার মনে করেন যে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হলো মৌলিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে জনগণকে কখনো যুক্ত করা হয় নাই। শুধু জনগণই পারেন তাদের রাষ্ট্র ও সরকারের সমস্যা সমাধান করতে।

অর্থনীতির মতো কাশ্মীরের গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, কাশ্মীর ব্যতীত পাকিস্তান অসম্পূর্ণ, মস্তকবিহীন দেহের মতো। তিনি উত্তর ভিয়েতনামে বোমা নিক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানান এবং বলেন, পাকিস্তানি হিসেবে আমরা ভিয়েতনামীদের অদম্য সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং সতর্ক করলেন যে, এই সময়ে পাকিস্তানে পুলিশ বাহিনীর সহিংসতা, সাংস্কৃতিক অবনতি, আইন-শৃঙ্খলাহীনতার পরিণতি হবে দেশের ধ্বংস।

জুলফিকার উপসংহারে বললেন যে, এ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। তিনি প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন।

তিনি বললেন, 'আমরা ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করি, তবে অতীতের খারাপ বিষয়গুলোর বিরোধিতা করি। আমরা সেই সকল ঐতিহ্যকে সম্মান করি– যেগুলো পাকিস্তানের জনগণের জন্য কল্যাণকর, সে গুলোকে সমর্থন করি না– যেগুলো দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। আমরা দেশকে দেব একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, আমরা পাকিস্তানকে দেব একটা বৈপ্লবিক ধরণ।'

ড. মুবাশ্বির পরে আমাকে বর্ণনা দিয়ে এটিকে আখ্যায়িত করেছেন 'আমাদের সকলের জীবনের বিশেষ দিন' এবং সেদিন যেরূপ উত্তেজনা এবং উদ্যম দেখা গিয়েছে তার উদাহরণ দিলেন। 'খোরশেদ হাসেম মীরের কথাই ধরো। তিনি ছিলেন রাওয়ালপিন্ডির রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় একজন আইনজীবী, তাদের জেলা বার সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। জুলফিকার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি আমাকে আড়ালে জানিয়েছিলেন যে, তিনি নতুন এই দলে যোগদান করার জন্য আসেন নাই, এসেছেন শুধু পর্যবেক্ষণ করতে। সম্মেলন চলতে থাকা অবস্থায় তিনি তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ চাইলেন, একটি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিলেন এবং মঞ্চেই সিদ্ধান্ত নিলেন দলে যোগদানের।' এমনকি কাটপার, অন্য একজন আইনজীবী, যিনি সর্বদা রাজনীতিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, তিনি জীবনে প্রথম জনসভায় বক্তৃতা দিলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো সেদিন বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে এবং তিন ঘন্টা পর্যন্ত চলছিল, সে সময়ের মধ্যে চারটি কমিটি গঠিত হয়েছিলঃ পরিচালনা কমিটি, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি, প্রস্তাব কমিটি এবং খসড়া ঘোষণা কমিটি। জুলফিকার প্রত্যেকটি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। নির্বাচনকে দলের অন্যতম নিয়ম হিসেবে বিবেচিত হলো, কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুর পর এই পদ্ধতি দ্রুত বাতিল করা হয়েছে।

বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার পর সেদিনের কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটল।

www.pathagar.com

পরবর্তী দিবস, ১ ডিসেম্বর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো, প্রথম পর্যায়ের কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির পর দলে পঁচিশটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। খসড়া ঘোষণা কমিটি দলের কর্মসূচির রূপরেখা উপস্থাপন করল।

সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে প্রস্তাবের প্রসঙ্গ ছিল কাশ্মীর। এখানে ঘোষণা করা হলো যে, 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতেই শুধু কাশ্মীর ও জম্মুর সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা হতে হবে পাকিস্তান, ভারত ও জাতিসংঘের স্বীকৃতির মাধ্যমে। অন্য কোনো প্রকারে নয়।' তাসখন্দে যা হয়েছে, সেরূপ কোনো মীমাংসার ভিত্তিতে এর সমাধান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। জুলফিকার বুঝেছিলেন যে, পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কাশ্মীরের জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা পালন করে দায়মুক্ত হওয়া। পরবর্তীতে আইয়ুব বলেছেন যে, কোনো বিবাদের সমাধান না হলে সেটিকে আলাদা করে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। জুলফিকার বলেন, এরূপ ফাঁকা কথার ফলশ্রুতিতে এই হয়েছে যে, যখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সেক্রেটারি সর্বশেষ পাকিস্তানে এসেছিলেন, তিনি রূঢ়ভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিশ্রুত, কাশ্মীরের গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পঞ্চম প্রস্তাব সামরিক মৈত্রী হলো দলের কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জুলফিকারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে। সিয়াটো ও সেন্টো পাকিস্তানকে কলঙ্কের জালে আটকিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে জোট বন্ধন হয়েছে দাসত্বের মতো। এই সম্মেলন থেকে সরকারকে আহ্বান জানানো হলো এই দুটো জোট থেকে বের হয়ে আসার। কারণ, 'পাকিস্তানের নিরাপত্তার সঙ্কট উদ্ভব যখন হয়েছিল তখন তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।' প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের যে যৌথ চুক্তি আছে তাও বাতিল ঘোষণা করার আহ্বান করা হয়, কারণ ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র কোনো সহায়তা প্রদান করেনি। তিনটি সামরিক মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে দ্বারে দ্বারে সাহায্যের আবেদন করতে হয়েছে যুদ্ধের সময়, অথচ যুক্তরাষ্ট্র কোনো সাহায্য করেনি।' আমেরিকাকে তার সামরিক ঘাঁটি উঠিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে প্রস্তাবের সমাপ্তি ঘটল।

ভিয়েতনাম ও মাধ্যপ্রাচ্য যথাক্রমে দুটো প্রস্তাব অনুমোদিত হলো। জুলফিকার লিখেছেন, মুসলমান হিসেব আমাদের কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ নেই; যখন আমরা এই কথা বলি, তখন আমরা ইহুদি সম্প্রদায়ের কথাও বলি।তবে প্যালেস্টাইন দখলের বিষয়টি বেআইনি এবং সুপরিকল্পিতভাবে একটি জাতির প্রতি বঞ্চনা এবং ভিয়েতনামের উপর কার্পেট বোম্বিং যে একটি চরম অবিচার, তা আমাদের দল মনে করে।

সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেয়ার সাথে জুলফিকার আহবান করেন তাদের জন্য কাজ করতে। 'আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কোনো মতবাদ, ধর্মীয় কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে নয়। এটি কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ দ্বারা পালিত নয়। এর মূল লক্ষ্য সুবিচার প্রতিষ্ঠা।'

এই অনুভূতির বশবর্তী হয়েই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, অষ্টাদশ প্রস্তাব, যা তৃতীয় বিশ্বের সংহতির জন্য আহ্বান জানানো হয়। এটি হলো জুলফিকারের সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের একটি বিস্ময়। তিনি বিশ্বকে দুইভাগে বিভক্ত দেখেছেন, একদিকে অতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী এবং অন্যদিকে আর এক শ্রেণী, যারা এই গ্রহের সমস্ত সম্পদ দখল করে এর মালিক হয়েছে। 'তৃতীয় বিশ্বে কোনো অর্থনৈতিক সুবিচার নেই। শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি আরোপ করে এখানে আধিপত্য করছে। জুলফিকারের দৃষ্টিতে এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, আমাদের ব্যবসার শর্ত আমাদের বাজার এবং আমাদের সম্পদ ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ধনী দেশগুলোর রাজনৈতিক নীতিমালার উপর।' যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের জনগণ সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ হয় একই রকম যন্ত্রণা আর সংগ্রামের কারণে শোষণের বিরুদ্ধে, তাই এরূপ বিরূপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের সিদ্ধান্ত তারাই নিবে ঐক্যবদ্ধভাবে।

জুলফিকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে চিন্তা করেছেন, তা শ্রেণী যুদ্ধ নয়, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা দখলের লড়াইও না, তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পদের পুনঃর্বন্টন এবং একটি বিশ্বব্যাপী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা, যাতে সকল উন্নয়নশীল দেশ বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবে। এটিই প্রগতিশীল জুলফিকারের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম পন্থা। যে সকল সমালোচক জুলফিকারের বিরূপ সমালোচনা করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেন, তারা ইচ্ছাপূর্বক জুলফিকারের দূরদর্শিতা আর রাজনৈতিক দর্শনকে অবজ্ঞা করে। জুলফিকার মনে করতেন, 'তৃতীয় বিশ্ব কারো দয়ার প্রত্যাশী নয়; সে শুধু তার ন্যায্য পাওনা বুঝে পেতে চায়। আমরা চাই এমন একটি পরিবেশ, যার দ্বারা সুযোগ সৃষ্টি হবে সুযোগ বঞ্চিত বিরাট জনগোষ্ঠীর।'

জনগণের মঙ্গলের জন্য আমরা আনন্দের সাথে পরিশ্রম করে যাব; আমরা বর্তমান আরাম-আয়েশ ত্যাগ করব। যদি তৃতীয় বিশ্ব এ বিষয়ে এখনই কাজ শুরু না করে এবং লক্ষ্য ঠিক না করে, তবে ভয়ের কারণ আছে, তখন আমাদের সম্মিলিত ক্ষমতা নিশ্চল হয়ে পড়বে, আমরা তখন চিন্তাকে বাস্তবতায় পরিণত করতে ব্যর্থ হবো, কবিতা হবে না রাজনীতিতে পরিণত, ভাবনা হবে না বাস্তবমুখী।'

সম্মেলনের চতুর্থ ও শেষ অধিবেশনের শুরু হয় ১ ডিসেম্বর বিকেল বেলা এবং সেখানে দলের প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। নতুন রাজনৈতিক ফোরাম গঠনের জন্য সম্মেলনে একটি দলিল তৈরি করে এবং দলের একটি নামকরণ ঠিক করে, এতদিন দলের কোনো নাম ছিল না। সমাজতান্ত্রিক পার্টি, প্রগতিশীল পার্টি ইত্যাদি নামের জন্য প্রস্তাব উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এর নামকরণ করা হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে অন্তবর্তিকালীন গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয় এবং একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। প্রতিনিধিরা জুলফিকারের নামে সোচ্চার হলেন এবং অন্য কোনো নাম প্রস্তাব করতে অস্বীকৃতি জানালেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিদের কাছে উর্দুতে বক্তব্য রাখলেন এবং অঙ্গীকার করলেন দলকে, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ এবং সকল পাকিস্তানিকে সেবাদান করার।

www.pathagar.com

৩

মীর মুর্তজা গোলাম ভুট্টো জন্মগ্রহণ করেন ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪। তার বোন বেনজিরের জন্মের এক বছর পর। এই পুত্রের জন্মের পর জুলফিকার ও নুসরাত তাকে স্বাগতম জানান। বোন বেনজিরের এক বছর পর মুর্তজার আগমণে ৭০ ক্লিফটন পারিবারিক ভবনটি সম্পূর্ণ হলো। পরিবারে এখন সদস্য সংখ্যা চার; তারা চলে গেলেন দোতলায়, সেখানে থাকেন স্যার শাহনেওয়াজ ও তার স্ত্রী, বেগম খুরশিদ। মুর্তজা নামটি রাখা হয় তার প্রপিতামহের নামানুসারে। সে ছিল সদানন্দ উজ্জ্বল একটি শিশু। আলোকচিত্রে দেখা যায়, তার ছোট বেলায় বাগানে ক্রীড়ারত অবস্থায়, তাকে দেখা যায় সাইকেল চালাতে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে একটি বোন পেল, নাম সনাম এবং একটি ছোট্ট ভাই শাহনেওয়াজ, যিনি ছিলেন তার চার বছরের ছোট। তার খুব আকাঙ্ক্ষা হতো পিতা বা চাচার সাথে লারকানায় বন্য শুকর ও হরিণ শিকারে যেতে। তার শিকারের সুযোগ হয়েছিল খুব সামান্য, কারণ জুলফিকার তরুণ কেবিনেট মন্ত্রী হওয়ার পর শিশুদের জন্য পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন সুইস মহিলাকে গভর্নেস নিয়োগ দেয়া হলো জুলফিকার ও নুসরাতের সন্তানদের তত্ত্বাবধানের জন্য। কারণ তাদেরকে ছেলে-মেয়েদের রেখে প্রায়ই পাকিস্তানের ভেতর ও দেশের বাইরে যেতে হতো। শিশুরা এই মহিলাকে বিভিন্নভাবে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পেত। আব্বা অনেক বছর পরও স্মরণ করেন সেই সুইস মহিলা, বেচারা নোরীনের কথা। বেনজির অবশ্য দুষ্টামি কম করতেন এবং অনেক সময় এই গভর্নেসের পক্ষ নিয়ে ছোটদের শাসন করার চেষ্টা করতেন।

নিহত হওয়ার কয়েক মাস আগে মুর্তজা করাচির এক ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারে বলেছেন–

> যেহেতু আমার পিতা ছিলেন একজন মন্ত্রী, তাই পরিস্থিতির কারণে আমাদের পিন্ডিতে যেয়ে থাকতে হয়েছে, তাই আমাদের জমিদারি চালচলন গড়ে উঠেছিল সীমিত মাত্রায়। আমরা যখন গ্রামে বেড়াতে যেতাম, তখনও আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে হতো, আমরা শিকারে অংশ নেয়ারও সময় ও সুযোগ পেতাম না, যা জমিদার পরিবারের সন্তানদের জন্য ব্যতিক্রম। আসলে আমরা অন্যান্য জমিদার পরিবারের সন্তানদের মতো বেড়ে উঠিনি।
>
> আমার পিতা সব সময় বলতেন, 'তোমার সবকিছু কেড়ে নেয়া সম্ভব, কিন্তু মন ও চিন্তাকে নয়।' তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন শিক্ষাকে, যা তার পিতাও দিয়েছেন তার বেলায়। তিনি বলেছেন, 'জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে

www.pathagar.com

গ্রামে গেলে সেখানকার লোকেরা যদি আমাদেরকে পা ছুঁয়ে সম্মান দেখায় , আমরা তাদেরকে তা করতে না দেয়ার শিক্ষা পেয়েছি। আমরা নিজেদেরকে এই জমিদারি সংস্কৃতির বাইরে রাখতাম।'

মুর্তজা ঘোড়ায় চড়ার অনুশীলন শুরু করলেন। তার মাতা নুসরাত একটি যোধপুরী ঘোড়ায় চড়া ছাই রঙের চামড়ার জ্যাকেট পরা অবস্থায় ফটো বাঁধাই করেন। সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে হাসছেন, জেল লাগানো পরিপাটি মাথার চুল ও হাতে গ্লাভস পড়া। পরবর্তীতে তিনি এই ঘটনা স্মরণ করে বলতেন, এটিই সব নয়, আমি দিন-রাত এ সমস্ত নিয়ে থাকতাম না। এটি আমার কোনো স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ছিল না।'

মুর্তজার যখন বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় হলো, তাকে ভর্তি করা হলো লাহোরের আইটচিসন কলেজে। এটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানকার পরিবেশ ছিল রক্ষণশীল ও সেকেলে ধরনের। এই প্রতিষ্ঠানে মুর্তজা টিকে ছিলেন মাত্র কয়েক মাস। এই প্রতিষ্ঠানটি আশঙ্কাজনকভাবে পরে কুখ্যাত হয় এর শিক্ষার্থী ওমর শেখের জন্য, যে মার্কিন সাংবাদিক পার্ল ডানিয়েলকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। 'এই বিদ্যালয় আমাকে একটি জামিদারী চালে চলতে উৎসাহ দিত। পাগড়ি পরা, ঘোড়ায় চড়া, ব্যক্তিগত চাকর-বাকর সাথে থাকা, এ সমস্ত হলো সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদারী জীবনযাত্রার লক্ষণ।' আইটচিসনের ছাত্রদেরকে প্রতি শুক্রবার স্কুলের মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে হতো। ক্রিকেট খেলা ছিল বিদ্যালয়ে হৈ চৈ করে খেলার একটি বিষয়। 'তারা এই বিদ্যালয়কে ধর্মীয় পরিবেশে উন্নীত করেছিলেন,' কথাগুলো মুর্তজা সাক্ষাৎকারে বললেন। তিনি আরও বললেন 'বাবুয়ানা' করার অনেকগুলো অনুসঙ্গ ছিল সেখানে। সবকিছু মিলিয়ে ছেলেরা সেখানে ক্ষুদে মনিবে পরিণত হতো।'

আইটচিসন ত্যাগ করার পর মুর্তজা যোগদান করলেন করাচি গ্রামার স্কুলে। স্কুলটি ছিল অভিজাত ধরনের, ঔপনিবেশিক আমলে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফ্রি-ম্যাশন চার্চের পাদ্রীরা। তিনি স্মরণ করেন, 'এটি ছিল কিছুটা উদারনৈতিক ভাবাপন্ন।' এখানে অনেক ধরনের লোকের মিশ্রণ ছিল। সত্য, এখানে সবাই সচ্ছল পরিবার থেকে আগত, তবে তারা এসেছে বিভিন্ন ধরনের পরিবার থেকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ জমিদার পরিবারের, কিন্তু অন্যান্য পরিবার, যেমন লেখক, পেশাজীবী ইত্যাদি পরিবার থেকেও অনেকে এসেছে।' তিনি এরূপ কিছু ছেলের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল গুড্ডু, সে এসেছে লাহোরের একটি বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম পরিবার থেকে এবং মুর্তজার চেয়ে বয়সে ছিল কয়েক বছরের বড়। মুর্তজা বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় খুবই ভালো করছিল, তবে অঙ্কে খারাপ করছিল, যা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। 'আমি অঙ্কে কোন গ্রেড পেয়েছিলাম, তা জানি না, শিক্ষকগণ আমার বিষয়টি কিভাবে নিয়েছিলেন, তাও জানি না।' তিনি বলেছেন যে, তার পিতা তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, এটি পারিবারিক ঐতিহ্য, আর ভবিষ্যতে তাকে এই বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে না।

তার গ্রামার স্কুলের নোট বইয়ে মন্তব্য লেখা থাকত 'অঙ্ক একটি বিরক্তিকর বিষয়।' জ্যামিতির নোট বইয়ের উপর তিনি পত্র লিখতেন।

মুর্তজার গ্রামার স্কুলের রিপোর্ট কার্ডগুলো একত্রে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে একটি

www.pathagar.com

কালো রঙের চামড়া দিয়ে বই আকারে, এটি বিদ্যালয়ের মর্যাদাসূচক চিহ্ন। মুর্তজার অষ্টম বর্ষের রিপোর্ট যত্নের সাথে নীল রঙের ফাউন্টেন পেন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ের নিচে তার শিক্ষক লিখেছেন, 'আরও আগ্রহ দেখাতে হবে।' প্রত্যেক সাময়িকীতে এই মন্তব্য প্রতিধ্বনি হতো। দশম গ্রেডের দিকে, অনেকটা হালকাভাবে এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনিত ঘটল, 'উন্নতি হয়েছে' সাধারণ মন্তব্য থাকত 'এই সাময়িকীতে সে অনুপস্থিত ছিল মাত্র একবার'। এটিকে মনে করা হতো সুশৃঙ্খল। আরো মন্তব্য ছিল, 'তরুণ ভুট্টো লেখাপড়ার বিষয়ে একনিষ্ঠ এবং আশা করি আগামী শিক্ষা বর্ষগুলোতেও সে তা অব্যাহত রাখবে।' এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করেছে নুসরাত, যদিও আগেরটিতে স্বাক্ষর ছিল পি, ভুট্টোর, বেনজির ভুট্টোর অন্য একটি নাম।

বেনজির ছোটভাই হিসেবে মুর্তজার সাথে দূরত্ব বজায় রাখতেন, আর মুর্তজা তাকে বড় বোন হিসেবে সম্মান করতেন। ছোট বেলায় বেনজির একা একা থাকতেন, মুর্তজা তাকে এ বিষয়ে অভিযোগ করতেন। জুলফিকারের একজন পুরানো পারিবারিক বন্ধু, যিনি প্রায়ই ৭০ ক্লিফটনে যেতেন, ভুট্টো পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, পরবর্তীতে মীর ও তার ভাইবোনেরা বেড়ে ওঠার পর তাদের সাথে আলাপ করতেন। তিনি এই পরিবারের সন্তানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেছেন, 'বেনজির সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন মীরের উপর। মীরকে যদি একটি তিন চাকার সাইকেল দেয়া হতো, তিনিও সাইকেল চাইতেন। তার পিতামাতা তাকে বোঝাতেন যে ছেলেদের খেলনা মেয়েদের থেকে ভিন্ন, তাই তাকে অনেক পুতুল কিনে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হতো না। তার ভাইদেরকে সবাই পছন্দ করে, তারা আকর্ষণীয় হাসিখুশি, আর তিনি ছিলেন লাজুক ও অন্তর্মুখী স্বভাবের, থাকতেন নিজেকে আড়াল করে, তাই অন্য ভাই-বোনদের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেকে বাইরের লোকদের মত আচরণ করতেন।'

যিনি এ বিষয়ে আমাকে বলেছেন তার নাম এখানে উল্লেখ করা যাবে না, কারণ তিনি বেনজিরের দ্বিতীয়বার ক্ষমতার সময় তার রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে কারাগারে ছিলেন।

'জুলফি নুসরাত যখনই বিদেশ থেকে আসতেন, সন্তানদের জন্য সম্পূর্ণ এক পৃথক বাক্স ভর্তি উপহার আনতেন। বইয়ের প্রতি জুলফি ছিলেন খুবই অনুরক্ত, তাই সব সময়ই বই এবং তাদের আমন্ত্রণকারীদের প্রদত্ত উপঢৌকন আনতেন সন্তানদের জন্য। একবার আমি বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম জুলফি ও নুসরাতকে স্বাগতম জানাতে এবং ওদের সাথেই তারপর ৭০ ক্লিফটনে গেলাম। বাক্স-পেটরা পৌঁছলে সব সন্তানেরাই খুব চঞ্চল হয়ে উঠল, তারা অধীর আগ্রহে দেখতে থাকল তাদের পিতামাতা তাদের জন্য কী এনেছেন, কিন্তু বেনজির সবার আগে বড় সুটকেসটির কাছে যেয়ে দাঁড়ালেন এবং দাবি করলেন যে, যেহেতু তিনি বড় সন্তান, তাকে তার পছন্দ মতো সবচেয়ে ভাল জিনিসটা দিতে হবে।' আমি এই কাহিনী শুনে হাসলাম। যখন আমি বললাম যে, একটি বই লিখতে যাচ্ছি, লোকজন আমাকে সব উদ্ভট গল্প শুনাতে লাগলেন। এ সমস্ত কাহিনী পূর্বে আমি কখনো শুনিনি। আমি কৌতুকের মধ্য দিয়েই গল্পগুলো উপভোগ করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফুফুর বয়স তখন কত ছিল, পনের?' পারিবারিক বন্ধু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'হ্যাঁ'।

শৈশবেই এই চার সন্তানের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা দেখা গেছে। সনামকে তার ভাইয়েরা প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তিনি তার ভাইদের সাথে চলতে অভ্যস্ত এবং ভাইদের

www.pathagar.com

ছেলে– বন্ধুদের সাথে মিশতেন। সনাম অবশ্য বড় বোনের সঙ্গেও মিশতেন। বেনজির রীতিনীতি মেনে চলতেন, দূরত্ব বজায় রাখতেন। তবে সনামের সাথে তার সম্পর্ক ছিল একটু ভিন্ন, তার সাহায্যকারী হিসেবে তাকে কাজে লাগাতেন। দুই বোন এক কামরায় থাকতেন, দেয়াল ছিল কাল রঙের। তারা গোপনে ধূমপান করতেন সাজঘরের ভেতর, হাতে চামড়ার গ্লোবস পরে এবং মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে যেন আঙুলে দাগ না হয় এবং চুলে ধোঁয়া না আটকে থাকে। তাদেরকে আমার মনে হতো বিদ্রোহী এবং অসম্ভব শীতল। আমি আগ্রহী হতাম আরও গল্প শুনতে; কল্পনা করতাম, আমিও বড় হলে তাদের মতো হব। আমি যখন আমার ফুফুদের দুষ্টামির গল্প শুনে আনন্দ উপভোগ করতাম, আব্বা তখন আমার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাতেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করতাম যে, আমি সিগারেট খাব না।

মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ একই কামরায় থাকতেন। কামরাটি ছিল তাদের বোনদের কামরা বরাবর একটি প্রকোষ্ঠে, সেটির অবস্থান ছিল ৭০ ক্লিফটন হাউজের মূল বাড়ির বাইরে; এটি তৈরি হয়েছিল তাদের চাচা ইমদাদ ও সিকান্দারের জন্য। ছেলেরা তাদের কামরা রঞ্জিত করলেন 'কমিউনিস্ট' লাল রং দিয়ে। তারা দেয়ালে লাগালেন লেনিন ও চে'গুয়েভারের ছবি। এসমস্ত এনেছেন তাদের পিতা তাদের জন্য সোভিয়েত রাশিয়া থেকে। মুর্তজা ও শাহ্ বয়স বাড়ার সাথে সাথে অলসতায় আক্রান্ত হলেন, অথচ বিদ্যালয়ের কড়া নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে তাদের চলতে হতো। রাতের বেলা গল্পগুজব করে তাদের অনেক সময় নষ্ট হতো, সকালে স্কুলের গাড়ি এসে আওয়াজ দিত। সকালে সময় পাবে না, এই ভয়ে অনেক সময় রাত দুটোর সময় বিদ্যালয়ের পোশাক পরে শুতে যেত, সাবধানে থাকত, যাতে পোশাকের ভাঁজ নষ্ট হয়ে না যায়। এত কিছুর মধ্যেও মুর্তজা তার চেহারা সুন্দর রাখার চেষ্টা করতেন; তিনি চুল ব্রাশ করা এবং দাড়ি কাটার জন্য বেশ সময় ব্যয় করতেন। শাহ্ কোনোক্রমে দাঁত ব্রাশ করা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে সকালে স্কুলের গাড়িতে যেয়ে বসতেন। পরবর্তীতে তারা এমনভাবে নিজেদেরকে সাজ-সজ্জায় ভূষিত করতেন যে, তাদেরকে 'স্যুটিং এন্ড বুটিং' বলা হতো।

একাদশ শ্রেণীর রসায়ন বিষয়ের শিক্ষক গোলাপী রঙের কালি দিয়ে মন্তব্য লিখেছে: 'রসায়ন বিষয়টি একদম বাদ দেয়া হবে সুবিবেচনার কাজ।' উচ্চ বিদ্যালয়ের জুনিয়র বছরে মুর্তজার লেখাপড়ার উন্নতি হয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে, রসায়ন বাদ দেয়া হয়েছে এবং বীজগণিতে আশ্চর্য রকমের ভালো ফল করেছেন। অন্য একজন শ্রেণী শিক্ষক মন্তব্য লিখেছেন, 'বেশিরভাগ বিষয়ে মুর্তজার উন্নতি এবং বিজ্ঞান বিষয়কে বাদ দেয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ– সবকিছু মিলে চমৎকার।' স্নাতক পরীক্ষায় তিনি তার শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

মুর্তজা 'এ' লেবেলে ভাল গ্রেড পেয়েছিলেন, (যা ব্রিটিশ মানের দ্বাদশ গ্রেড), কিন্তু কলেজে ভর্তির ব্যাপারে তিনি তার 'ও' লেবেলের ফলের উপর নির্ভর করেছেন দশম ও দ্বাদশ গ্রেডের– তিনি স্কুলে পড়া অবস্থায় শেষের দিকে অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করেছেন। মুর্তজা করাচির 'তেই কোনো ডু' সমিতির লোক ছিলেন, উঁ ব্ল্যাক বেল্ট (উঁচু মানসম্মত) হয়ে। তিনি কয়েকটি ডিউক অব এডিনবরাহ পুরস্কার পেয়েছেন।

মুর্তজা তার ভাই শাহ্সহ শৈশবে সাবলীল জীবনযাপন করেছেন, নতুন জাতি

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সাইরেনের মধ্যে, করাচির জরুরি অবস্থার সময় মুর্তজা স্বপ্ন দেখতেন যুদ্ধ জাহাজের চালক হওয়ার। স্বীকার করেছেন, 'আমি যুদ্ধজাহাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতাম..., মনে হয় সে সময় যুদ্ধ হচ্ছিল এবং উড়োজাহাজ ওঠা-নামা করছিল– তখন ছিল এ সমস্ত বিষয়ে আকর্ষণ জন্মাবার মতো বয়স।'

শৈশবেই মুর্তজা ও শাহের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা বড় হওয়ার পরও অব্যাহত ছিল। মুর্তজা ছিলেন বড় ছেলে, সে হিসেবে পিতা তার প্রতি কড়া নজর রাখতেন। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজকে পিতা মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসেবে হাতখরচ দিতেন, তাদের দৈনন্দিন খরচের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ বরাদ্দ করেছিলেন। মুর্তজার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুহেল বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। আপাতত মনে হতে পারে যে জুলফিকার কৃপণতা করে এরূপ চাপ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু বিষয়টি তা নয়; তিনি দেখেছেন যে আইয়ুব খানের ছেলেরা পিতার ক্ষমতার দাপটে কিরূপ উচ্ছন্নে গিয়েছিল। সুহেলের সাথে আমি এক মিনিটের জন্য নীরবে বসে রইলাম। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম টেলিভিশন বক্তৃতায় জুলফিকার বলেছেন যে, তার সরকার হবে একটি ভিন্ন প্রকৃতির, তার শাসন ব্যবস্থায় কোনো স্বজনপ্রীতি থাকবে না। সুহেল বললেন যে, তিনি সেই বক্তৃতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি কাল ফ্রেমের চশমা পরে নোট দেখে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করছিলেন; নিজের ত্রুটি স্বীকার করে দুঃখের সাথে শ্রোতাদেরকে বললেন যে, তার উর্দু বক্তৃতা শুনে ছোট শিশুরাও হাসাহাসি করে, তা সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই উর্দুতে বক্তৃতা দেন।

কিন্তু এখন ইংরেজিতে বক্তৃতা দেয়ার কারণ হলো যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সারা বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাই এমন ভাষায় কথা বলছেন, যা সবাই বুঝতে পারে। তিনি বললেন তার পরিবার থেকে সরকারে কোনো স্বজনপ্রীতি, কোনো দুর্নীতি হবে না, এটি তার প্রতিজ্ঞা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তার এক আত্মীয় মোমতাজ ভুট্টোর কথা উল্লেখ করলেন। মোমতাজ ছিলেন সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী এবং পিপপি-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তার কাছে তিনি সরকারের প্রতি সহযোগিতা চান। কিন্তু ওই পর্যন্ত। জুলফিকার মনে করেন যে, তার পুত্রদেরকে অল্পবয়স থেকেই উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা তার কর্তব্য। তাদেরকে বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে হবে এবং মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে, যদিও তখন তারা ছিল তরুণ ছেলে। জুলফিকার তার মেয়েদের প্রতি যেমন নরম ও শিথিল ছিলেন, ছেলেদের প্রতি তেমনটা ছিলেন না। তিনি তাদের কাছে দাবি করতেন নিখুঁত কাজ এবং তাদেরকে কোনোরূপ আস্কারা দিতেন না। একবার দুই ভাই ভাও নামের তাদের এক আত্মীয়ের সাথে লারকানায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই আত্মীয়টি জমিদারি চাল-চলনে অভ্যস্ত। একদিন ছেলেরা যখন পারিবারিক খাবার টেবিলে বসে অপেক্ষা করছিল, ভাও হঠাৎ শিকারের রাইফেল নিয়ে লাফ দিয়ে তাদের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মুর্তজা লুটিয়ে পড়ল। সবাই মনে করল যে, সে দুষ্টুমিপূর্ণ ভান করছে। ভাইবোনদের মধ্যে শাহই শুধু আসল বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। সে দেখছিল যে মুর্তজার সালওয়ার কামিজ রক্তে ভিজে গিয়েছে। শাহ ভাওকে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার থেকে ফেলে দিল এবং তার ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে বুলেট অপসারণ করাল।

মুর্তজা শাহ-এর উপর নির্ভর করল। উভয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হলো। মুর্তজার

www.pathagar.com

যখন অনেক বন্ধুবান্ধব হলো, তখনও তিনি তার ছোট ভাইটিকে দূরে সরিয়ে দেন নাই। তিনি সর্বদা তাকে আগলে রাখতেন। স্কুল জীবনে তার সাথে কারো কোনো সংকটের সৃষ্টি হলে সর্বদাই মুর্তজা তার পাশে এসে দাঁড়াত। সে তার পক্ষ হয়ে পিতার সাথেও কথা বলত। জুলফিকার একবার শাহকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শাহ যেতে চাচ্ছিল না। বড় ভাইয়ের তার পক্ষে ওকালতি করার কারণে শাহ এ ব্যাপারে অব্যাহতি পেয়েছিল।

বার বছর বয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুর্তজা তার পরিবারকে ঘিরে যে রাজনৈতিক শক্তি আবর্তিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে সচেতন ছিল না।

মুর্তজা বলেছেন যে, তার পিতা মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার পরও তাদের বাড়ি পুলিশ পাহারা থাকত, এসমস্ত তাদের জন্য খুব সুখকর ছিল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তার পিতা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কারণ বেতারে সব সময় তার নাম উচ্চারিত হচ্ছিল। ১৯৬৬ সালে যখন তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তখন তিনি বুঝলেন, বিষয়টি কত গুরুতর।

জুলফিকার ভীষণভাবে ব্যস্ত ছিলেন পিপলস পার্টি গড়ে তুলতে এবং হঠাৎ তিনি মন্ত্রী থেকে আদর্শ রাজনীতিবিদে পরিণত হলেন।

মুর্তজা চারদিকে শুধু জনতার ঢল দেখতে পেলেন, বিশেষ করে লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে (এখানেই জুলফিকার পিপিপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন), এবং এটি ছিল মুর্তজার মতো শিশুর জন্য বিরাট বিস্ময়। তখন ছিল তার বয়স মাত্র বার, এবং এর পর থেকে তিনি তার পিতার সঙ্গী হওয়ার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করেননি। কিন্তু তিনি তখন শুধুমাত্র একজন দর্শক হিসেবে নিজেকে ভাবতেন, নিজেকে একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে তখন ভাবতেন না।

মুর্তজা সংবাদপত্রের ক্লিপিং রাখতে শুরু করলেন। পাকিস্তানের রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ, তার পিতার দলের ওঠা ও নামা, পক্ষে ও বিপক্ষে খবর ও লেখা সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপা হতো, তা' তিনি একত্রে জমা করতেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নিবন্ধ খুঁজে বের করে একত্রিত করতেন। তিনি কিছু খুবই সাধারণ মানের নোটবুক কিনলেন, এগুলোর মধ্যে নানারূপ বৈচিত্র্য ছিল। আবার কিছু কোনো ছবি ছাড়া, সাধারণত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা ব্যবসায়ীরা হিসাবের খাতা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

ক্লিপিংগুলো ছিল ইংরেজি ও উর্দু সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহিত, স্বচ্ছ টেপ দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সংযুক্ত করা হতো। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল জুলফিকারের দেশের বিভিন্ন স্থানে, যেমন মারি, কোরাঙ্গী, কাহুটা, বিভিন্ন জায়গায় বিশাল জনসভায় বক্তৃতারত অবস্থার আলোকচিত্র। এর মধ্যে কিছু আলোকচিত্র ছিল দাঙ্গার, বিশেষ করে ধর্মীয় দল জামায়াতী ইসলাম কর্তৃক জুলফিকারের এবং তার নতুন দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের চিত্র। এর মধ্যে বিবৃতিও ছিল, জোরালো বিবৃতি : 'মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল এখানে বলেছেন যে, তার দল রাজনৈতিক দলের জোটে বিশ্বাস করে না।' 'আমাদের জোট হবে জনগণের সাথে,' এই ক্লিপিংটি নেয়া হয়েছে সোমবার, ২৭ জুলাই ১৯৭০। লাহোর থেকে প্রকাশিত ২ অক্টোবরের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে : 'পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড, এ ভুট্টো গতকাল এখানে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলও যদি একত্রিত হয়, তবু পিপলস পার্টিকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বললেন,

www.pathagar.com

'আমরা দেশে ঘুষ, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি বন্ধ করব।'

মুর্তজা সব কিছুরই ক্লিপিং রাখলেন। খবরটি ছোট বা খুব বড় থেকে যা তার চোখে পড়বে, রাখার মত মনে হবে তা তিনি সংগ্রহে রাখতেন; এটি ছিল মুর্তজার সারা জীবনের অভ্যাস। পরবর্তীকালে আমরা যখন দামেস্কে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলাম, আমি আব্বার সাথে সন্ধ্যায় সংবাদপত্রের ক্লিপিং করতাম। আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নোট বুক ছিল।

অল্পবয়সেই মুর্তজা রাজনীতির জগৎকে আবিষ্কার করেছেন এবং এটি তার জন্য কিছু ঘটিয়েছে– অদ্ভুত কিছু। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্ব সম্পর্কে। সে সময়ে তিনি অধ্যায়ন করেছেন চে-গুয়েভারার ডায়েরি, মাওসেতুং-এর চিন্তাধারা। মুর্তজার চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তার সাথে বন্ধুত্ব গুড্ডুর। তিনি মুর্তজার কথা স্মরণ করে বলেন, 'তিনি ছিলেন শান্ত, চিন্তামগ্ন, কিন্তু পাক-চীন বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে খুব ভাবাদর্শগত। এই সময়ে তিনি প্রচুর মাওবাদী বই পড়তেন এবং আমরা দূতাবাসে যেয়ে এ সমস্ত বিষয়ের ওপর সিনেমা দেখতাম।'

গুড্ডু ও মুর্তজা চে'র কর্মজীবন ও শাহাদাত বরণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে একটি কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করলেন। তারা কাল টুপি পরলেন, চে'র পোস্টার বহন করলেন এবং করাচির কেন্দ্রস্থল সদরের বেড়াতে থাকা কিছু রাশিয়ান সৈনিককে তাদের দলে নিলেন। এদেরকে না পেলে তাদের সাদামাটা ভাবেই কর্মসূচি পালন করতে হতো। এরপর তারা গেলেন ক্লিফটন সমুদ্র তীরে, সেখান থেকে সুফি মছোঁ পীরের মাজার ও অন্যান্য মাজার ও মন্দিরে। সে সমস্ত স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদের সাথে বসে সুস্বাদু খাবার খেলেন। অনেক রাতে তারা বাড়িতে ফিরে মুর্তজার বাথটাবে বসে হাঁটুগেড়ে উদাসভাবে অনেকক্ষণ সময় কাটালেন।

একদিন গুড্ডু ও মুর্তজা একটি তাঁবু ও একটি ফ্লাশলাইট নিয়ে ৭০ ক্লিফটনের বাগানে ক্যাম্প স্থাপন করলেন। আমার মনে হয় সে তখন বিপ্লবী ধরনের কিছু একটা করার চেষ্টা করছিল। রাত বাড়তে লাগল আর আমরা চেগুয়েভারা সম্পর্কে এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলাম। আমরা অনুভব করলাম যে, আমাদের কিছু করা উচিত। সেটি ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময়– জুলফিকার আলী ভুট্টো মাত্র আইয়ুবের সরকার ত্যাগ করেছেন– আর আমরা কিছু করার চেষ্টা করছি। একটা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব করলাম। সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

তারা এরপর এক ছাপাখানার সাথে যোগাযোগ করলেন, কিছু কৌশল অবলম্বন করে ছাপা খরচ অনেক কমিয়ে আনলেন, ভেতরের পৃষ্ঠার জন্য ছাপা খরচ পড়ল খুবই সামান্য, শুধু খরচ পড়ল মলাটের রঙের জন্য। তারা বন্ধু-বান্ধব ও স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে প্রচারণা চালালেন, এদের মধ্যে যারা বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন, প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধারা লালন করেন, তাদেরকে এই ম্যাগাজিনে লেখা দিতে অনুরোধ করলেন। গুড্ডু ও মুর্তজা দু'জনে মিলে প্রত্যেক সংখ্যায় ছাপার জন্য প্রবন্ধ নির্বাচন করতেন। তাদের একটি স্বপ্ন ছিল এবং ম্যাগাজিনটির মধ্যে তাদের ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করতে থাকলেন। গুড্ডুর স্মরণ আছে যে, তারা নির্বাচনের সময় লেয়ারির বস্তিতে কাজ করেছেন। তাদের সবারই ছিল গরিব লোকদের

www.pathagar.com

প্রতি সহমর্মীতা, তারা আমাদেরকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছেন। সময়টা ছিল ষাটের দশক– আমূল পরিবর্তনের যুগ।

শাহ্ ছিল তখন ম্যাগাজিনে লেখার জন্য অনেক ছোট। সে সমর্থক হিসেবে কাজ করত এবং ম্যাগাজিন বিক্রি করত। বয়সে ছোট হলেও সে সকল সময় মুর্তজার সাথে থাকত এবং তার পিতার দেশব্যাপী প্রচারণার সময় সে সঙ্গী হতো। তার ছোট ছেলে যে সর্বদা বড় ভাইয়ের সাথে থেকে কাজে সহায়তা করে এবং তাদের দু'ভাইয়েরই যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উদ্যোম ও পরিশ্রমের ঘাটতি নেই, তা দেখে জুলফিকার আনন্দিত হতেন। তাদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জন্য কাজ করা; এ জন্য তারা স্থানীয় পিপিপি-এর পক্ষে প্রচারণা চালাতো, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র ছাপাতো। যে সমস্ত ছাপাখানার মালিক আইয়ুবের এক নায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ এবং পিপিপির প্রতি সহানুভূতিশীল, তারা বিনামূল্যে এ সমস্ত ছাপাতে সম্মত হলো। এ সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ করলেন মুর্তজা। পিপিপির তহবিল ছিল তখন খুবই সামান্য। নতুন দল তখন এগিয়ে যাচ্ছিল সাধারণ মানুষের সহায়তায়। এই দলে ছিলেন অধ্যাপক, ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীরাও। জমিদার ও বড় ব্যবসায়ীরা তখনও এই দলে আসেন নাই।

মুর্তজার বয়স তখন আঠারও হয় নাই, তাঁর পিতার নির্বাচনী এলাকা লারকানায় গেলেন, গ্রামের পঞ্চায়েতের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। গুড্ডুর স্মরণ আছে, ঝাকে ঝাকে তরুণেরা সকল স্থানে তাকে অনুসরণ করে। তিনিও তার সাথে অনেক সমাবেশে সঙ্গী হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তার কাছে যেতে চাইতেন কথা বলতে, তাদের মতামত ব্যক্ত করতে। গুড্ডু বললেন, মীর তাদের প্রত্যেকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। তার পিতাও তার সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনা করতেন, তবে সেগুলো ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু রাজনীতির বিষয়ে কথা অনুযায়ী চলতেন। যে সমস্ত শ্রমিক আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ পায় না, যথা সময়ে তাদের দরখাস্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব পেলেন মুর্তজা। একটি শিরোনাম এরূপঃ 'গরি ইয়াছিনে পুলিশ জোরপূর্বক আমার কন্যাকে ছিনতাই করেছে।' আবেদনকারী নওদেরু এলাকার একজন বাসিন্দা, এখানে আছে ভুট্টোদের কৃষি জমি। আবেদনকারী লিখেছেন, 'আমার কন্যাকে ফিরে পাওয়ার অন্য কোনো উপায় না পেয়ে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক আমার মেয়েকে ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমার মেয়ের নাম রোশন খাতুন, তার সম্পর্কিত মোকদ্দমাটির রায় দিচ্ছে না লারকানার দেওয়ানী আদালত। আপনার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। ধন্যবাদ– আলী শের।' মুর্তজা আবেদনকারীদের সাথে কথা বলতেন এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের জন্য কাজ করতেন। গুড্ডু ব্যাখ্যা করেছেন, 'এই ছিল তার লক্ষ্য।' তিনি আরও বলেছেন, 'মীর অতি সম্মানের সাথে জনগণের সাথে মিশতেন এবং তারা তাকে বিশ্বাস করতেন, ওই তরুণ বয়সেও।' অনেক বছর পর দরখাস্তকারীরা আব্বাকে তার যুক্তরাষ্ট্রের কলেজে ছোট কার্ড বোর্ডের বাক্সে উপহার পাঠিয়েছিল। তিনি কখনো সেগুলো ফেলে দেননি।

নির্বাচনের সামনে মুর্তজা ও গুড্ডুর মনে যা জ্বল জ্বল করতে থাকল, তার আলোকে ম্যাগাজিনটির নাম দেয়া হলো 'ভেনসেরিমোস, এ্যাসপিনিস শব্দ, যার অর্থ 'আমরা অতিক্রম করব', এবং একটি যুদ্ধের কান্না, দীর্ঘদিন যাবত যা ছিল কাস্ট্রোর, চেগুয়েভারা এবং কিউবার

www.pathagar.com

বিপ্লবের সাথে যুক্ত। ভেনসেরিমোস এর প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে চে'র ছবি লাল রঙের। এর মধ্যে ছিল দুইজন সম্পাদকের বাণী :

'আমাদের চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা 'ভেনসেরিমোস' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করলাম। এটি আমাদের আশা, আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের স্থির সংকল্প যে ভেনসেরিমোস শিখা প্রজ্জ্বলিত করবে। মানুষের মনে আগুন জ্বালাবে। ভেনসেরিমোসকে নিয়ে আমাদের আশা, এর মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করবে, বিশেষ করে শ্রমজীবী দরিদ্রতম লোকেরা, কারণ তাদের জন্য আমাদের বার্তা আছে। তারা এই সমাজ কাঠামোকে ভেঙে ফেলবে এবং নতুন সমাজ গড়ে তুলবে। নতুন একটি জাতির সৃষ্টি হবে, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার থাকবে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হবে।'

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সূচনা সঙ্গীত শেষ হয় একটি কবিতা দিয়ে : 'ডেনকারেমোস', ক্ষুধার বন্দীত্বদশা থেকে উঠে এস, সুবিচারের জন্য জেগে ওঠ, একটি উত্তম বিশ্বের জন্ম হচ্ছে।' আবেগ ও ব্যাকরণের বিচ্যুতির মধ্যদিয়ে ম্যাগাজিনটির যে ভূমিকা লেখা হয়েছে তাতে এর ভেতরের বিষয়বস্তুর বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। সেগুলো ছিল আশ্চার্যজনকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধগুলো ছিল 'ইন্দোনেশিয়া, একটি জাতির পতন', 'মার্কিনিদের ভিয়েতনামের নীতিমালা দুর্দশাগ্রস্ত' 'পাকিস্তানের অর্থনীতির অবস্থা'। মুর্তজা এই ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছেন 'ঈশ্বরের ভুলে যাওয়া ভূমি', যার শুরু 'কাশ্মীর উপত্যাকা, যা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর স্থান, তা যুগ যুগ যাবত নিজের দেশে লোকের রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে যে, 'বিপ্লব, ডিনার পার্টি নয়,' 'প্রতিবাদ নয়, প্রয়োজন বিপ্লব,' 'এই লড়াই শোষক ও শোষিতের মধ্যে।'

সর্বশেষ কয়েকমাস অনুসন্ধান করার পর গুড্ডুকে পেলাম। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ম্যাগাজিনটির কথা বর্ণনা করলেন। সে সময় আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন চলছিল, তাই তারা 'ভেনসেরিমোস' বিতরণ করেছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এবং কিছু কপি লাহোর পাঠিয়েছিলাম পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য। মীর চেয়েছিল এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে আদর্শের বিকাশ ঘটাতে। গুড্ডু 'ভেনসেরিমোসের' কিছু কপি তার সংগ্রহে যত্ন করে রেখেছিলেন। আমি তাকে আমার ভাই জুলফির ছবি দেখালাম। তিনি ধূমপানরত অবস্থায় কেঁদে উঠলেন। আমি কিছুক্ষণ পরপরই আমার কম্পিউটার নোটবুকে তার কথা টাইপ করতে থাকলাম, আর তার স্মৃতির জট খুলতে থাকে। গুড্ডু আবার কেঁদে উঠলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, যে বইটি আমি লিখছি তা বের হওয়ার পর তাকে একটি কপি পাঠাব। তিনি আস্তে করে বললেন, 'জানি না, তখন আমি কোথায় থাকবো।' আমি বললাম, 'নিশ্চই আপনাকে বইয়ের কপি দেব, একবার যখন আপনার খোজ পেয়েছি, পরেও পাব।'

ডেলে ভেনসেরিমোসের পরের সংখ্যাগুলোর প্রচ্ছদে ছিল হো-চি-মিনের ছবি এবং ইরানের শাহের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সমালোচনা, যদিও তিনি জুলফিকারদের একজন মিত্র (যাকে তিনি আপত্তিকর ও জঘন্য বলে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মৈত্রী বন্ধন ছিল) ছিলেন; এগুলো করাচির কেন্দ্রস্থলে সদরে নিয়ে রাস্তায় শ্রমিক ও পথচারিদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। একজন রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তির ছেলে রাস্তায় নিজে দাঁড়িয়ে প্রচারপত্র

www.pathagar.com

বিলি করতে দেখে গুড্ডুর হাসি পাচ্ছিল। 'এটি ছিল চমৎকার এক তারুণ্য,' তিনি বললেন।

১৯৭২ সালের শরৎকালে মুর্তজা হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের জন্য একটি বৃত্তি পেলেন। ৯ জুন ১৯৭২ তারিখের সে বিষয়ের চিঠিতে লেখা ছিল, 'বৃত্তির জন্য ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তে এটি সুস্পষ্ট যে, আপনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে হার্ভাডের জন্য যোগ্য।' চিঠিতে স্বাক্ষর দান করেছেন কমিটির চেয়ারম্যান এন, পিটারসন, তাতে যুক্ত ছিল একটি গোল 'সি' এবং পি । মুর্তজা এই প্রথম সম্পূর্ণ একা পাকিস্তান ছেড়ে বিদেশে গেলেন।

* * *

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে আইয়ুব খানের সরকার দেশের উপর কর্তৃত্ব হারাতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের জন্য সামরিক সহায়তা উঠিয়ে নিল ১৯৬৭ সালে। আইয়ুব খানের একতরফা পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো পাকিস্তান অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং যুক্তরাষ্ট্র যখন ভারতের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হলো, 'তখন পাকিস্তানের আর মুখ রক্ষা হলো, না। কারণ, ভারত হলো পাকিস্তানের পুরানো শত্রু। পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এতই শিথিল হয়ে পড়ল যে, তারা পেশোয়ারের নিকট বাদেবরের যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ১৯৬৮ সালে আর নবায়ন করেনি।

দেশের অভ্যন্তরে আইয়ুব বৈষম্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে তার অবস্থান হারিয়েছেন। তখন শুধু জুলফিকার আলী ভুট্টোর দলই আইয়ুবের প্রশাসনকে নাড়া দেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ, যে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৯ সালে, সেটিও একইভাবে নাড়া দেয়।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীগণ নিজেদেরকে বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। তাদের দাবি ছিল অনেক যা তারা পরিশেষে অর্জন করেছেন। সারাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি সংখ্যাক লোক বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও ভৌগোলিকভাবে এই অংশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত, মাঝখানে ভারত। এর চেয়ে বড় কথা হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য।

সাংস্কৃতিক কারণেও পূর্ব পাকিস্তানিরা ছিলেন বিক্ষুব্ধ। তাদের মাতৃভাষা বাংলা, আর সরকারি ভাষা উর্দু ও ইংরেজি। আবার ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের ভাষা ছিল উর্দু। এ সমস্ত বিষয়ের জটিলতাও ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন প্রাক্তন ছাত্র নেতা। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। এখন তিনি আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা। কথিত আছে যে তিনি সাইকেলে সারাদেশ চষে বেড়াতেন। এরপর ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। ছয় দফার মধ্যে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ ভোটে ফেডারেল সরকারের জাতীয় সংসদ ও সরকার গঠন। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রের অধীনে, অন্যান্য বিষয়গুলো থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে; পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূজি যাতে পাচার না হতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে, সেজন্য সেখানকার জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে সীমিত; প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা থাকবে বিদেশের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি

www.pathagar.com

করার এবং প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে, প্রয়োজন হলে তারা সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনী গঠন করতে পারবে। পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগ যা চেয়েছে, তা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বেশি, আসলে চেয়েছে তাদের নিজস্ব দেশ।

আইয়ুব সরকার ছয়দফার কোনোটিই মেনে নেননি। একনায়ক যখন দেখলেন আওয়ামী লীগের দাবিগুলো দেশ বিভক্তির লক্ষণ, তখন এসমস্তকে তিনি স্রেফ হুমকি হিসেবে বিবেচনা করলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি মুজিবকে গ্রেফতার করলেন দেশকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনার অভিযোগে। জুলফিকারকেও গ্রেফতার করা হলো, কারণ তার নতুন দল আইয়ুবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ধ্বংসাত্মক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য তাকেও ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে তাকে মুক্তি দেয়া হয়; তার পূর্ব পর্যন্ত তাকে জেল থেকে জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ড. মুবাশ্বির হাসানের মতে, ছয়দফার মধ্যে পিপিপি সাড়ে পাঁচ দফা মেনে নিয়েছিল, শুধু প্রত্যাখ্যান করেছিল স্বতন্ত্র সংসদ ও স্বতন্ত্র বাঙালি মুদ্রা।

আইয়ুবের দুর্বলতা ও এই দুই উদীয়মান রাজনৈতিক দলের হুমকির মুখে নিরাপত্তার অভাব বোধ সামরিক শাসনের দ্বার খুলে দিল। ২৬ মার্চ ১৯৬৯ জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে তিনি নিজেকে এর প্রধান শাসক হিসেবে ঘোষণা করলেন। এর চারদিন পর তিনি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করলেন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করলেন। আইয়ুব ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে নীরবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। পরের বছর নির্বাচন ঘোষণা করা হলো।

জুলফিকার একটা বজ্জাতি ধরনের কৌতুক করলেন। তিনি পুরানো মনিবের স্মারক হিসেবে ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় তার প্রতিকৃতি তৈরি করলেন। লারকানার বৈঠকখানায় এটা ঝুলিয়ে রাখলেন। পরে জেনারেলের পরিবার এটা চেয়েছিলেন– কিন্তু জুলফিকার পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন না দেয়ার। এখনও আমাদের বৈঠকখানায় আইয়ুবের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।

অক্টোবর ১৯৭০-এ শাসনতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে তা স্থগিত করা হয় ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর পাকিস্তানে পরবর্তীতে হবে একটি নতুন ধরনের শাসনতন্ত্র। নির্বাচনী প্রচারনা ছিল হিংসাত্মক। আওয়ামী লীগ তার ছয় দফা নিয়ে দাঁড়াল, তার এজেন্ডা থেকে একবিন্দুও না সরে যেয়ে। জুলফিকার প্রচণ্ড বেগে নির্বাচন প্রচারাভিযান চালাতে লাগলেন। তিনি ব্যাপকভাবে সারা পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করলেন এবং প্রচারনা চালালেন পিপিপির শক্ত বাম ও জাতীয় রাজনৈতিক ঘাঁটি থেকে। দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিরাজ মোহাম্মদ খান স্মরণ করেন যে, 'তার ছিল অসাধারণ প্রাণশক্তি। তিনি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দশজন লোকের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন, মনে হতো যেন লোকের সংখ্যা এক হাজার।'

পিপিপির ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আইয়ুবের একক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ান, এই দলের বক্তব্য হলো, 'পাকিস্তান নব্য-উপনিবেশবাদী মিত্রদের দ্বারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের খেলার শিকার হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো থেকে বের হয়ে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। পররাষ্ট্রনীতি ও সার্বভৌমত্বের বিষয় ছিল নির্বাচনী কর্মসূচির সূচনায়। দলের মূল নীতিমালার

www.pathagar.com

সাথে সঙ্গতি রেখে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করা হয়। মুসলমান উম্মাহ এবং তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে মৈত্রী স্থাপন হলো কর্মসূচির মধ্যে নতুন সংযোজন।

জুলফিকার তার সহকর্মীদের সাথে কর্মসূচি তৈরি করার সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে সুস্পষ্ট করেন। তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করার জন্য যে আহ্বান জানান, তা শুধু তিনি একাই জানান, পাকিস্তানে আর কেউ করেনি। তিনি মনে করেন, এক সময়ে এর যে তাৎপর্য ছিল, এখন আর তা নেই। বর্তমানে এটি শুধু ঔপনিবেশিক স্বার্থ দেখে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সমর্থন করে। জুলফিকার পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ-এর সম্পর্ক থাকাতে পাকিস্তানের কোনো লাভ হচ্ছে না বলে মনে করেন। তিনি দলের কর্মসূচিতে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। (১৯৭২ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় পাকিস্তান স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথ ছেড়ে আসে। পরে তার কন্যা বেনজির প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আবার পাকিস্তান কমনওয়েলথ এর সদস্য হয়।)

এক ব্যক্তি, এক ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯৭০। তেইশটি রাজনৈতিক দল ২৯১টি আসনে প্রতিযোগিতা করে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে, যার প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১,২৩৭। তিনশত একানব্বই জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। আগে থেকেই অনুমান করা হচ্ছিল যে ফলাফল বিভক্ত হবে, পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়াভাবে জয়লাভ করবে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বেশিরভাগ আসন, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে পিপিপি জয়লাভ করবে একচেটিয়াভাবে। পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশের বাসস্থান পূর্ব পাকিস্তান। তাই, স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ বেশিরভাগ আসনে জয়লাভ করবে। তবে, শাসনতান্ত্রিক জটিলতার সমাধানে ক্ষমতার ভাগাভাগির ক্ষেত্রে মুজিব শাসন ব্যবস্থা চালাবেন পূর্ব পাকিস্তানে এবং জুলফিকার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সামরিক বাহিনীর দায়িত্বে থাকবেন ইয়াহিয়া খান, এই বিষয়টি ঝুলে থাকল।

মুজিব চেয়েছিলেন শাসনতন্ত্র তৈরি করবে তার দল এবং তিনি সরকার গঠন করবেন, অন্যদিকে সামরিক বাহিনী জুলফিকারকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা পিপিপিকে শাসন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগের সমান সুযোগ করে দেবে। সেনাবাহিনী উভয় দলকেই ক্ষমতা ও অবস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উভয় দলের মধ্যেই বিবাদের সৃষ্টি করল এবং যার ফলে কোনো সমঝোতা হলো না। যুগ যুগ যাবত পশ্চিমা আধিপত্যের আওতায় থাকার ফলে সামরিক বাহিনী, যার মূল ঘাঁটি পশ্চিম পাঞ্জাবে– তাদের পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার কোনো আগ্রহই ছিল না। অবশ্য জুলফিকারের সমাজতান্ত্রিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছাও তাদের ছিল না। ১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় সংসদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করা হলো এবং জেনারেল ইয়াহিয়া বেসামরিক মন্ত্রীসভার বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন। সামরিক বাহিনী কোয়ালিশন সরকার গঠন করার ব্যাপারে ভেটো প্রদর্শন করল এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি জাতীয় সরকার গঠন করার সুযোগ চলে গেল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। রক্তঝরা শুরু হলো।

পূর্ব পাকিস্তানে আইন অমান্য আন্দোলন চলতে লাগল। বাঙালিরা কর পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বেতার ও সংবাদপত্রের উপর সামরিক কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ

www.pathagar.com

তারা অগ্রাহ্য করতে থাকলেন। বিশ্বের অন্যপ্রান্তে হার্ভাডে মুর্তজা বুঝতে পারলেন যে, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট বিভাগ কড়া নজরে রেখেছে। তার পিতা তখনও দেশের প্রধান ব্যক্তি হননি যে তার পুত্রকে কলেজে নজরদারিতে রাখতে হবে। তখন মুর্তজার উপর বাঙালি সম্প্রদায় থেকে মৃত্যুর হুমকি আসছিল এবং স্টেট বিভাগ থেকে বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছিল।

পরিশেষে জুলফিকারকে বিষয়টি অবহিত করা হলো যে– তার পুত্রের জীবন বিপদাপন্ন এবং ইরানীদের সহায়তায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হলো; ইরানীরা কয়েকজন তরুণ এজেন্টকে পাঠালেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলেকে পাহারা দিতে। অনেক পরে মীরের সেই সময়ের নিরাপত্তাহীন অবস্থার কথা স্মরণ করেছে হার্ভাডে একই কামরায় সহাবস্থানকারী পিটার সানটিন এবং বিল হোয়াইট। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন, এই ভয়ে মীর তাদের কাছে বিষয়টি গোপন রেখেছেন। অনেক বছর পর আমি যখন তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা এই স্পর্শকাতর বিষয়টি সম্পর্কে খুব কমই বলতে পারলেন। নিরাপত্তার জন্য একজন ইরানী এজেন্ট কলেজে মুর্তজাকে অনুসরণ করতেন, ছাত্রদের সাথে চায়নিজ খাবার খেতেন এবং তাস খেলতেন। তারা ওই সময় মীরকে ইরানীদের ছায়ার বাইরে যেতে দিতেন না। আমার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে তারা স্বাচ্ছন্দবোধ করছিলেন না।

পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন দমন করতে সামরিক জান্তা সেখানকার সামরিক প্রধান করে পাঠালেন টিক্কা খানকে। টিক্কা খান ছিলেন একজন কুখ্যাত সামরিক কর্মকর্তা। জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন দেরাদুন স্কুলের স্নাতক এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামরিক অফিসার। তিনি বার্মা ও ইটালিতে যুদ্ধ করেছেন ইংরেজের অধীনে, তখন কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করার জন্য নির্বিচারে গণহত্যার জন্য তাকে বলা হতো 'বেলুচিস্তানের কসাই। এর পর তিনি 'বাংলার কসাই'তে পরিণত হন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও মুজিবের আলোচনা ব্যর্থ হলো এবং সামরিক বাহিনী জরুরি পরিকল্পনা করল : চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো এবং সারা পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। মধ্যরাতে টিক্কা খান নেতৃত্ব দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নগরের বিভিন্ন স্থান আক্রমণের। হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হলো। পাকিস্তান পরিণত হলো একটি রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে, যখন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, বাংলাদেশের আধা সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল। সামরিক বাহিনী এর প্রতিশোধ নিল বাঙালি নিধনের মাধ্যমে। ছয় মাসের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ নিহত ও আহত হলো, প্রায় এক কোটি লোক শরণার্থী হয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গেলেন।

সংঘর্ষের সহিংসতা হলো ভয়াবহ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছিল তাতে দেখা যাচ্ছিল যে, বেসামরিক লোক হতাহত হয়েছে লাখ লাখ, বলা হয়ে থাকে ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। পাকিস্তানি কর্মকর্তাগণ হাস্যকরভাবে, হামাদুর রহমান কমিশন যার পৃষ্ঠাগুলো সম্পাদিত হয়েছে সামরিক বাহিনী দ্বারা এর পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি কেউ এখনও দেখেনি– তাতে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিল ৩০,০০০। আন্তর্জাতিক হিসাব অনুযায়ী সংখ্যা হালকাভাবে দেখানো হয়েছে, মৃতের সংখ্যা ২০০,০০০। সংখ্যার তারতম্য আছে, কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ করে মহিলাদের উপর

www.pathagar.com

জঘণ্য অত্যাচার করেছিল, তাতে কোনো দ্বিমত নেই। লুসান ব্রাউন মিলার তার বই : আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে : পুরুষ, মহিলা ও ধর্ষণ' এতে দাবি করা হয়েছে ৪০০,০০০ মহিলাকে ধর্ষণ করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে। বাঙালিদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য ব্রাউন মিলার ঢাকার খাদিজা নামের তের বছর বয়স্ক একটি মেয়ের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে।

> খাদিজা আরও চারটি মেয়ের সাথে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছিল, তখন একদল পাকিস্তানি সৈন্য উঠিয়ে নিয়ে আসে তাদেরকে। সে পাঁচজনের সবাইকেই মোহাম্মদপুরের একটি সামরিক বেশ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছয় মাস বন্দী অবস্থায় রাখা হয়।
> প্রতিদিন নিয়মিত দুইজন তার সাথে অপকর্মে রত হতো। অন্যদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হতো দৈনিক দশ। খাদিজা বলল, প্রথম দিকে মুখের ভেতর কিছু দিয়ে আটকিয়ে রাখা হতো, যাতে আর্তনাদ না করতে পারে। সৈনিকরা তাদের কথা মতো পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলে তাদের খাদ্য রেশন বন্ধ করে দিত।

পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক মহিলাদের উপর অনৈতিক সহিংসতা ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ করে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের। করাচিতে কথা ছড়িয়ে পড়ল যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় দুইশত বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে, অনুরূপ হত্যাযজ্ঞ তারা সিন্ধুতেও করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আবদুল ওয়াহেদ কাটপার, সিন্ধুর একজন আইনজীবী, যিনি কর্মজীবনের প্রথম দিক জুলফিকারের সাথে কাজ করেছেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন, যখন সংবাদটি পিপলস পার্টির চেয়ারম্যানের কাছে পৌঁছল। আমি কাটপারকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বলতে চাচ্ছেন যে জুলফিকার ওই গুজবে বিশ্বাস করেছেন? তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন 'হ্যাঁ! এই খাকিদের দ্বারা কিছুই বিশ্বাস করা যায় না।'[২২] তখন জুলফিকার ফোন নিয়ে জেনারেল গুল হাসানের সাথে কথা বললেন, গুল হাসান ছিলেন এখন সিন্ধুর করপ-কমান্ডার। কাটপার স্মরণ করলেন, 'জুলফিকার তখন ক্রুদ্ধ হয়ে 'গুল হাসানকে বললেন, 'আমি শুনেছি আপনারা পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছেন। যদি আপনারা এই জঘন্য অপরাধ সিন্ধুতেও সংঘটিত করেন, তবে আমি হব আপনাদের জন্য দ্বিতীয় মুজিব এবং আপনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।'

হামাদুর রহমান কমিশন গঠিত হয় পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে। এই কমিশন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপকর্মের কথা স্বীকার করেনি। একইভাবে শর্মিলা বোস, একজন ভারতীয় হার্ভাডের শিক্ষিত অধ্যাপক এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নাতনী, ২০০৫ সালে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশীর দাবি অনুযায়ী যে ব্যাপক ধর্ষণ, ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের যে কাহিনী বলা হয়ে থাকে- তা খুবই অতিরঞ্জিত, নতুন দেশটির প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক প্ররোচনা।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে ধর্ষণের কথা

www.pathagar.com

অস্বীকার করেছে, অথচ বিষয়টি ঘটেছিল এত ব্যাপকভাবে যে, মুজিব অবশেষে ভুক্তভোগীদেরকে অভিহিত করেছেন বীরাঙ্গনা বলে। যুদ্ধের পরে তিনি তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এটি ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা তাদের সমাজে ও দেশের মধ্যে আরও লজ্জায় পড়েছে।

পাকিস্তানের সীমান্তে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সময় ভারত পূর্ব পাকিস্তানে আঘাত করতে শুরু করল। মার্চ মাসের শেষ দিকে ভারতীয় সংসদে কিছু প্রস্তাব অনুমোদিত হলো 'বাংলার জনগণের জন্য', যে শব্দ তখন পর্যন্ত কেউ আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহার করে নাই। তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে পাকিস্তানের নাগরিক বলেই মনে করা হতো। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সহিংসতা চলতে থাকল, পাকিস্তান তার কলকাতার হাইকমিশন বন্ধ করে দিল এবং ভারত তার ঢাকাস্থ কনসুলেট বন্ধ করল।

১৯৭১ সালের গ্রীষ্মে মুক্তিবাহিনীর বাংলার স্বাধীনতা-সৈনিক, ভারত থেকে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করছিল।[২৩] ভারত পূর্ব পাকিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ দান অব্যাহত রাখার কারণে দুই দেশের সীমান্তের গোলাগুলি বেড়ে চলল। জেনারেল ইয়াহিয়া জরুরি অবস্থা জারি করার ঠিক এক সপ্তাহ পর ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার ঘোষিত হলো, ইয়াহিয়া তার দেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। বছর শেষ হয়ে আসছিল এবং পাকিস্তানের ভাঙনও অবধারিত হয়ে আসছিল। ভারতের সাথেও আর একবার যুদ্ধ বাঁধার ঘনঘটা দেখা দিল।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমান বাহিনী উত্তর ভারতের সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানল। সীমান্তে গোলাগুলির মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছল এবং এবার ভারত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। ৪ ডিসেম্বর ভারত বিমান, স্থল ও সেনাবাহিনীর আক্রমণ চালাল পূর্ব পাকিস্তানে, ঢাকাকে কেন্দ্র করে। সুবিনস্ত আক্রমণের দুই দিন পর ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে নিল এবং অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিল। যে সামান্য সৌহার্দ দুই দেশের মধ্যে বিরাজ করছিল, তারও অবসান ঘটল ভারত কর্তৃক ঢাকা দখলের মধ্য দিয়ে।

ডিসেম্বরের প্রথম দিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জুলফিকারকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠালেন। ওই মাসের ১৫ তারিখে জাতিসংঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিল। জুলফিকার ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন, 'যদি ঢাকার পতন হয়ে থাকে, তবে কি আসে যায়? যদি সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানেরই পতন ঘটে, তাতেই বা কি? যদি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের পতনও হয়, আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা একটি নতুন পাকিস্তান গড়ে তুলব। আমরা একটি ভাল পাকিস্তান গড়ে তুলব। আমরা হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করব।' মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তিনি মনে করতেন যে আওয়ামী লীগের ছয় দফার কারণে দেশ ভেঙে যাবে। এখন নিরাপত্তা পরিষদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কাগজ ছুঁড়ে ফেললেন, ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন। তিনি বললেন, 'আমার দেশের অবস্থার কারণে আমার হৃদয়টা ভেঙে গেছে, কেন আমি নিরাপত্তা পরিষদে বসে সময় নষ্ট করব?'

www.pathagar.com

৪

১৬ ডিসেম্বরে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং পরেরদিন থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এর চারদিন পরেই ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ করলেন। জুলফিকার তখন নিউইয়র্কে, তিনি রাজধানী ইসলামাবাদে ফিরে আসলেন এবং দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৭২ সালে জুলফিকার এবং তার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো। দলের নীতিমালাতে সমাজতন্ত্র এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঐক্যকে গুরুত্ব দেয়া হলো। তদানিন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করলেন তিনি। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের কিছুদিন পরেই ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেইজিং সফর করলেন জুলফিকার। সেটি ছিল তার ঐতিহাসিক চীন সফর। চীন তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানায়। একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে সফরটি খুব কাজে লেগেছিল। চীনা সরকার পাকিস্তানের পূর্বের সকল ঋণ ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মওকুফ করে দেয়। শুধু তাই নয়, সে বছর কয়েক মাসের মধ্যেই তারা পাকিস্তানকে ৬০-টি মিগ জঙ্গিবিমান, একশত টি-৫৪ ও টি-৫৯ সামরিক ট্যাঙ্ক প্রদান করে। ওই সফরে চীনের দেয়া ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ ছিল সেগুলো।

কূটনৈতিক কারণ ছাড়াও জুলফিকারের নতুন সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন দিয়েছিল চীন। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক রাখতে চীন জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে তার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে মেনে নিতে রাজি ছিল না চীন। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি চীন। অর্থাৎ পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়ার অনেক পরে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

এমনকি ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক বিনিময়ে রাজি ছিল না চীন। ১৯৭৬ সালের গ্রীষ্মে পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার পরেই চীন ভারতের সঙ্গে দূতাবাস স্থাপনে রাজি হয়।

চীন ১৯৬৪ সাল থেকেই একটি পরমাণু ক্ষমতাধর দেশ। নানাভাবে দেশটি পাকিস্তানকে পরমাণু কর্মসূচিতে সহায়তা দিয়ে আসছে। এ সহায়তা শুরু হয় ১৯৭২ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পরমাণু সহায়তা কর্মসূচির অধীনে পরমাণু বোমা তৈরিতে এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে

www.pathagar.com

চীন পাকিস্তানকে সহায়তা দিয়ে আসছে।' ওই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, জুলফিকার চীনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে পররাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত ইরানের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছিল পাকিস্তান। যে কারণে চীনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছিল পাকিস্তান।

জুলফিকারের নেতৃত্বের সময়েই চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সবচেয়ে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে তিনি এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে তার সময়েই প্রথম কোনো পরাশক্তির মুখাপেক্ষী পররাষ্ট্রনীতি পরিত্যাগ করা হয়। না আমেরিকাপন্থি, না রাশিয়াপন্থি, বরং উভয়ের সঙ্গেই দ্বিপক্ষীয় পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করা হয়। পাকিস্তান ছিল এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ, কোনো পরাশক্তির নজরদারির জন্য নিয়োজিত দেশ নয়।

হার্ভাডে পড়াশুনা করার সময় ছেলে মুর্তজার কাছে লেখা চিঠিতে জুলফিকার বলেছিলেন, 'ন্যায় বিচারের ওপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান তার সার্বিক অবস্থান খুঁজে নেয়। আমি অন্তত যতদিন পাকিস্তানের ক্ষমতায় আছি ততদিন এই বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দিয়ে যাব। সেটা মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেই হোক কিংবা বিশ্বের যে কোনো দেশের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেই হোক।'

যুদ্ধে ব্যর্থতার পর জুনের শেষ দিকে বাংলাদেশ ইস্যুতে জুলফিকার ভারতের সিমলা গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশসহ উভয় দেশের জেলে আটক যুদ্ধবন্দি এবং যুদ্ধ সৃষ্ট উপমহাদেশের নতুন সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করতে। জুলফিকার লাহোর থেকে বিশাল ডেলিগেট নিয়ে রওনা হন। ওই বৈঠক দাবি করছিলো নিজের অংশ থেকে ভেঙে যাওয়া নতুন রাষ্ট্রের (বাংলাদেশ) স্বীকৃতি এবং ভারতের সঙ্গে 'কোনো যুদ্ধ নয়' এমন একটি চুক্তিতে সম্মত হওয়া।

সিমলা বৈঠকের প্রথম সেশনে ইন্দিরা গান্ধী তার উদ্বোধনী ভাষণে স্বীকার করলেন যে, দু'পক্ষের জন্য সমঝোতায় আসা একটি কঠিন ব্যাপার। জুলফিকার বৈঠকে দেয়া ভাষণে বলেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি বলতে চাই, আমরা শান্তির জন্য আগ্রহী। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এ জন্যই আমরা কাজ করে যাব। আমরা নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই, নতুন করে শুরু করতে চাই।'

প্রথম দিনের বৈঠকে কোনো ফল হলো না। দ্বিতীয় দিনেও সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন, তর্কবিতর্ক করেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না। ভারত বলছে, কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা পুনঃনির্ধারণ কর, আর পাকিস্তান বলছে কাশ্মীর প্রশ্নে গণভোট দাও। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সিমলা বৈঠকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা দু'দেশের জন্যই আলোচনা জটিল করে তুলেছে। জুলাইয়ের ১ তারিখে বৈঠকের শেষের দিন খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরুল, আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দু'পক্ষ কোনো বিষয়েই সম্মত হয়নি, সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হতে কোনো পক্ষেরই আগ্রহ নাই।

জুলফিকার নিজেও স্বীকার করলেন যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বৈঠকের ফলাফলের জন্য উভয় দেশের জনগণ রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করতে থাকলো।

www.pathagar.com

জুলফিকার নিজেও আশাহত হয়েছিলেন।

ওই দিন সন্ধ্যায় বৈঠক হলের পাশের বাগানে একাকী ইন্দিরা গান্ধী পাঁয়চারি করছিলেন। এ সময় জুলফিকার এসে তার সঙ্গে যোগ দেন। কোনো উপদেষ্টা কিংবা সহযোগী ছাড়া দুইনেতা পায়চারি করতে করতে কথাবার্তা বললেন।

কোনো উত্তেজনা ছাড়াই তারা খোলাখুলি আলোচনা করলেন। এরপর গ্রীষ্মের সেই দিনের শেষে, সন্ধ্যায় সর্বশেষ অধিবেশনে শান্তি চুক্তির জন্য মিলিত হলেন তারা। যে শান্তি উভয়কেই কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে তুলবে, উভয়কে রাজনৈতিক সমতার নিশ্চয়তা দেবে। সকল জল্পনা-কল্পনার ও দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সিমলা চুক্তিতে সই করলেন জুলফিকার এবং ইন্দিরা।

সর্বশেষ মুহূর্তে এভাবে সিমলা চুক্তিতে উভয়পক্ষের সম্মত হওয়াকে 'কূটনৈতিক মিরাকল' বলে অভিহিত করেন অনেকে। ওই চুক্তির ফলে ভারত এবং পাকিস্তান– কাউকে নিজস্ব অবস্থান থেকে ছাড় দিতে হয়নি, আঞ্চলিক ক্ষমতাধর দু'টি দেশ ভারত এবং পাকিস্তান আবার তাদের সম্ভাবনার জায়গায় ফিরে আসল।

কাশ্মীরের নতুন নিয়ন্ত্রণ রেখার ব্যাপারে ঐকমত্য, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও বিমান চলাচলের ব্যাপারে উভয়পক্ষই সম্মত হলো। দুইদেশের সংস্কৃতি বিনিময়ের ব্যাপারে আর কোনো বাধাই থাকলো না। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বিষয়টি তখনই না হলেও, এটাই সিমলা চুক্তির বড় সফলতা যে, পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দী ৯০ হাজার সৈন্য শিঘ্রই দেশে ফিরে আসে।

অনেকে বলেছেন, দুই নেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি এতটাই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল যে, চুক্তিপত্রে সই করার সময় জুলফিকারের কাছে একটি কলম পর্যন্ত ছিল না।

দেশে ফিরে আসার পর রাওয়ালপিণ্ডি বিমানবন্দরে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় জুলফিকার বলেন, এই চুক্তির সফলতার দাবিদার ভারত এবং পাকিস্তানের জনগণ। যারা তিন-তিনটি যুদ্ধের পরও ওই শান্তির জায়গায় উপনীত হয়েছে। এর ১২ দিন পর জাতীয় সংসদে সিমলা চুক্তিটি পাস করা হলো।

চুক্তিতে স্বাক্ষররত জুলফিকারের বিশাল তেল রংয়ে আঁকা ছবিটি তার ৭১ ক্লিফটনের কার্যালয়ে টাঙানো হয়েছিল। তিনি নিজেই ঝুলিয়েছিলেন। আমি যদ্দুর মনে করতে পারি, আমার দাদার বইপুস্তকে ঠাসা অফিসের মাঝখানে ছবিটি গুরুত্বের সঙ্গে শোভা পাচ্ছিল।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অর্গানাইজেন অব ইসলামিক কান্ট্রিজ বা ওআইসি'র দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন। সে সময় লাহোর নগরী যেন নতুন সাজে সেজে উঠেছিল, রাস্তাঘাট ধুয়ে মুছে ফিটফাট, নগরবাসীরা বলতে লাগল; আমরাই অতিথিদের স্বাগত জানাব। এমনকি নিজেদের বাড়িঘরে অতিথিদের আপ্যায়নের প্রস্তাব দিয়েছিল তারা, যেখানে ৩৮টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা অতিথি হয়ে আসছে ওই সম্মেলনে। হোটেল এবং সরকারি গেস্ট হাউসগুলো অতিথিদের ধারণ করতে মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। জুলফিকার তখন লাহোরবাসীদের তাদের ঘরবাড়ি অতিথিদের জন্য ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন। ইসলামিক উম্মাহর সঙ্গে সংহতি জানাতে লাহোরবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন, মিশরের আনোয়ার সাদাৎ, আলজেরিয়ার বোমেদিন, লিবিয়ার গাদ্দাফী, যার নামে লাহোরে একটি স্টেডিয়াম

www.pathagar.com

রয়েছে। এছাড়া সিরিয়ার হাফেজ আল আসাদ, সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সাল, পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি ইরানের রেজা শাহ। অবশ্য ইদি আমিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সেখানে। সম্মেলনে অতিথিদের উদ্দেশ্যে আবেগময় ভাষণে জুলফিকার বলেন, 'ইসলামকে রক্ষার জন্য পাকিস্তানের জনগণ দেহের শেষ রক্ত ঢালতেও প্রস্তুত।'

আর এখন, প্রতিবেশী আফগানিস্তানে ও ইরাকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে যুদ্ধ চলছে, মার্কিনিদের অনুগতরা যখন বিদেশী আগ্রাসনের জন্য পাকিস্তানের সীমান্ত এবং আকাশ মুক্ত করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নির্বিঘ্নে বোমা বর্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে– এ সময় জুলফিকার বেঁচে থাকলে মুসলিম বিশ্ব একজন যোগ্য নেতা পেত, যিনি মুসলিম বিশ্বের সংহতির পক্ষে কাজ করে যেতেন।

তিনি যদি আজ দেখতেন, তার দল এখন কিছুসংখ্যক মেরুদণ্ডহীন লোকের নেতৃত্বে রয়েছে, নিশ্চই ক্রুদ্ধ হতেন।

জুলফিকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন, নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে গেছেন তিনি। এ জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় গঠিত সিয়াটো জোট বা সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তার সময়ে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওআইসি সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী বলেছিলেন, 'পাকিস্তান হলো এশিয়াতে ইসলামের আশ্রয়স্থল বা নিরাপদ দুর্গ।' তিনি পাকিস্তানকে নানা ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

পাকিস্তানে ওআইসি সম্মেলন অনুষ্ঠানের ৩৫ বছর পর, এই বইটি লেখার গবেষণা কাজে আমি ইউরোপ গিয়েছিলাম। সেখানে একটি ডিনারে গাদ্দাফীর এক পুত্রের সঙ্গে দেখা হয়। তাকে দেখেই আমি চিনতে পারি কিন্তু সে আমাকে চিনতে পেরেছে কিনা তা বুঝতে পারছিলাম না। তার দিকে একটু ঝুকে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। মাথা নেড়ে, অতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে জানালো সে আমাকে চিনতে পেরেছে। আমরা আরবিতেই কথপোকথন করেছিলাম।

ওআইসি সম্মেলন নিয়ে তার সঙ্গে কথা হলো, এরপর গাদ্দাফীর নামে পাকিস্তানে তৈরি করা স্টেডিয়ামের প্রসঙ্গ উঠল, অনেক পাকিস্তানির হৃদয়ে সে ইতিহাস এখনো জাগরুক। আমার কথাগুলো সে খুব মনযোগের সঙ্গে শুনলো। আলোচনা জমে উঠল। (ওআইসি সম্মেলন নিয়ে তার কাছ থেকে নেওয়া নোট এই বইয়ের পরবর্তী কোনো এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) বর্তমান পাক প্রেসিডেন্ট জারদারির প্রসঙ্গ উঠল। জারদারি একটি বিলে সম্প্রতি সই করেছেন, সে বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হলো। ওই বিলে বলা হয়েছে, তার অতিত বা বর্তমান বিষয়ে 'চরিত্র হননকারী' হিসেবে কাউকে পাওয়া গেলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য অপরাধ হবে।

মি. গাদ্দাফী পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি তাকে বললাম, নিশ্চয়ই একদিন দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন আসবে, এবং তা হবেই। একদা মহিমান্বিত

www.pathagar.com

দেশ পাকিস্তানে তার পিতা এবং বড় ভাই সফর করেছেন, সে কথা স্মরণ করলেন তিনি। এ সময় হাসিতে ভরে উঠেছিল তার মুখ।

ওআইসি সম্মেলনটি ছিল একটি সফল ঘটনা। সেখানে ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। এছাড়া ইসলামিক কমিশন অন ইকোনোমিক কালচারাল এন্ড স্যোসাল এফেয়ার্স নামে ওআইসির আরেকটি সংস্থাও গঠন করা হয়।

এই সম্মেলনেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়, এর বিনিময়ে বাংলাদেশ তার দেশে আটক ২০০ পাকিস্তানি সৈন্যের বিরুদ্ধে আনা যুদ্ধাপরাধের মামলা তুলে নেয়। ওআইসি সম্মেলনের মাধ্যমে জুলফিকার এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এসব দেশগুলো ছিল পাকিস্তানের অকৃত্রিম বন্ধু। মুসলিম দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর স্বাধীন হতে থাকে। স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দেন তিনি। বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্র প্রধান বিশেষত সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাদশাহ শেখ জায়েদের কাছে তিনি এ ধরনের প্রস্তাবের কথা উথাপন করেন। ভারতের সঙ্গে উত্তপ্ত সম্পর্ক প্রশমনের পর চীনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয় জুলফিকার। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন অব্যাহত রাখেন তিনি। সেটি ছিল সমতাভিত্তিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। ইরান এবং আফগানিস্তানের মত প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও জোরদার সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি।

প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতির জন্য জুলফিকার সবসময় স্বীকৃতি পাবেন, এছাড়া দুইটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথমটি হলো দেশে তিনিই প্রথম একটি গণতান্ত্রিক প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। দ্বিতীয় সামন্তীয় আমলের পুরানো ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন তিনি।

১৯৭৩ সালে প্রণীত সংবিধানটি আইনে পরিণত হয় একই বছরের আগস্ট মাসে। দেশের পূর্ববর্তী সাংবিধানিক চার্টার বা সনদের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংবিধানে অটুট থাকে। আবার বেশকিছু অধ্যায়ের পরিবর্তন সাধন করা হয়।

সেখানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা বলা হয়েছে। সিনেটে প্রতিটি প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি রাখার বিধান রাখা হয়েছে। প্রাদেশিক পরিষদ থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন তারা, জাতীয় পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি পরিবর্তনযোগ্য। এর গতিমুখ সবসময় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দিকেই হয়। এদিকে পাকিস্তান এক-কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র। কাউন্সিল অব কমন ইন্টারেস্ট নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। সংস্থাটি দেশের খনিজ সম্পদ তেল গ্যাস শিল্প, পানি, জ্বালানি, প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করে। পাকিস্তানের মূল্যবান খনিজ সম্পদের উৎপাদন বণ্টনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সংস্থাটি।

নতুন সংবিধানের অধীনে জুলফিকার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলন করেন।

সামরিক শাসনের পক্ষে সুবিধাজনক প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করেন। পরবর্তীতে পুনরায় দেশে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং প্রয়োজনের ছুতোয় দেশে জরুরি আইন জারি করার বিধান রাখা হয় সেখানে। পাকিস্তানের সংবিধান সব সময় এ ধরনের

www.pathagar.com

অপকর্মকে অনুমোদন দিয়ে এসেছে। কিন্তু নতুন সংবিধানে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে ফেডারেল সরকারকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেখানে সৈনিকরা দেশের সংবিধান মেনে চলবে এবং সংবিধানে সেনাবাহিনীর সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

এই সংবিধান ছিল একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দলিল। এখানে একটি বিধানে যেখানে ইসলাম বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন নিষেধ ছিল, সেটি প্রকারন্তে ফেডারেল সরকারে শরিয়া আইন চালু করা বিরোধী ছিল, যে শরিয়া আইনে আহমদিয়া অনুসারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা পায় এবং মুসলমান হিসেবে গন্য হয় না।

পিপলস পার্টির নতুন সরকারের হাতে শুধু সেনাবাহিনীই নয় ভূস্বামী শ্রেণীর প্রভুত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

জুলফিকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সামন্ত শোষণ ও অবিচারের অবসানের কথা বলেছিলেন। এটা সবাই জানে যে, জুলফিকারের পরিবারই পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত সামন্তীয় পরিবার। তাদের পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। একবার ব্রিটিশ সরকার সিন্ধু প্রদেশের ভূমি জরিপের উদ্যোগ নিয়েছিল। একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা তার অধীনস্তকে জুলফিকারের জমির হোল্ডিং নম্বর এবং ভূমির বিস্তারিত তথ্য আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন অতিক্রম হওয়ার পর কোনো উত্তর না পেয়ে রেগে গেলেন ওই কমকর্তা। তিনি অধীনস্তকে ভর্ৎসনা করলেন রিপোর্ট সময়মত জমা না দেওয়ার জন্য। অধীনস্ত জানালেন, ভুট্টোর জমি জরিপের কাজ এখনো চলছে, এ কাজ শেষ করতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে দেশের ব্যাপকসংখ্যক লেখক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক নেতাসহ প্রগতিশীল লোকজনের সমাবেশ ঘটেছিল। ভুট্টো সত্যিকার অর্থেই একটি ভূমি সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। পাকিস্তানি সমাজে সমতা ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুত ছিলেন তিনি। তার সময়ে দলের মধ্যে সামন্তবাদ একটি অসুস্থ ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত হয়। সরকার সেচসুবিধাযুক্ত জমির সিলিং পরিবার প্রতি ২৫০ একর এবং অপরদিকে সেচসুবিধাহীন জমির সিলিং পরিবার প্রতি ৩০০ একর বেধে দিয়েছিলেন। ওই সময়ে পাকিস্তানে এটি সবচেয়ে প্রগতিবাদী ভূমি সংস্কার বলে পরিগণিত ছিল। যদিও এ ভূমি সংস্কারে ব্যাক্তিগতভাবে জুলফিকার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার সব জমি পরবর্তী উত্তরাধিকারদের হাতে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু সে ভূমিসংস্কার কর্মসূচিতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। কারণ ব্যক্তির নামে জমির সিলিং বেধে দেয়া হয়েছিল। এই সিলিং থেকে জমি রক্ষায় ভূস্বামীরা এমনকি দরিদ্র চাষীদের নামে শর্ত সাপেক্ষে চুক্তি করে জমি দিয়েছিলেন। প্রকারান্তরে ভূস্বামীরা নিজেদের করায়ত্বেই রেখে দিয়েছিলেন জমিগুলো। অনেক ভূস্বামী ওই ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপগুলো এড়িয়ে যাওয়ার বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তারা ক্ষমতাসীন পিপিপি দলে ভিড়তে শুরু করে। নানাভাবে দলের জন্য সময় এবং শ্রম দেওয়া শুরু করল যাতে তিনি নেতার নজরে পড়েন। ভেবেছিলেন, এতে নেতারা তাদের জমি কেড়ে নেয়া থেকে বিরত থাকবেন। জুলফিকার এসব ঘটনা জানতে পেরেছিলেন, পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফা ভূমি সংস্কারে আরও কঠোরভাবে ভূমির সিলিং নির্ধারণ করেছিলেন তিনি। সে দফায় সেচ

www.pathagar.com

সুবিধাযুক্ত জমি সর্বোচ্চ ১০০ একর এবং সেচ সুবিধা ছাড়া জমি সর্বোচ্চ ২০০ একর সিলিং নির্ধারণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জুলফিকার সেগুলো বাস্তবায়ন করার আর সময় পাননি।

জুলফিকারের সরকার যখন শুরুর দিকে জাতীয়করণের কর্মসূচি গ্রহণ করে তখন ভূস্বামীদের পাশাপাশি দেশের শিল্পপতিরাও বড় ধরনের ধাক্কা খেল। প্রথম দফায় দেশের ৩০টি বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের আওতায় আনা হলো। আরও কোম্পানি তালিকাভুক্ত ছিল। পাকিস্তানের বৈষম্য ও দারিদ্র্যতা দূর করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য সমাজতন্ত্রমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেন তিনি।

পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় এ ধরনের কর্মসূচির সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল অনেকে। তারা বলতে লাগল, জুলফিকারের জাতীয়করণের কর্মসূচি দেশের অর্থনীতিকে বন্ধ্যা করে রাখবে।

আমার ভাইয়ের নাম জুলফি। দাদার নাম অনুযায়ী তৃতীয় পুরুষ হিসেবে এমন নাম ব্যবহার করা হয়েছে। জুলফি ছোটবেলা লেখাপড়া করত করাচিতে, সেখানে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল সে। স্কুলের খেলার সাথীদের সঙ্গেও তার তর্ক হতো তার দাদাকে নিয়ে। রীতিমত ঝগড়া হতো ওদের মধ্যে। সহপাঠীদের অনেকে জুলফিকে বলত, 'তুমি কখনোই আমাদের বন্ধু হবে না, কারণ তোমার দাদা আমার দাদার ব্যাংকের মালিকানা কেড়ে নিয়েছে।' শুধু ব্যাংক মালিক নয়, জাহাজ কোম্পানি, ইস্যুরেন্স কোম্পানি, স্টিল মিল সহ বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানির মালিক পরিবারের শিশুরা জুলফির সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো। ওদের শিশুরা পর্যন্ত অভিযোগ করত জুলফিকারের বিরুদ্ধে।

জুলফিকারের জাতীয়করণের কর্মসূচি মোটেই তার ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। এটা জাতীয় নীতির বিষয়, অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, পাকিস্তানে ব্যক্তি ছাড়া রাজনীতি নেই, সব কিছুর জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়। তারা জাতীয়করণের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চান না। অথচ এটা সত্যি ছিল যে, মাত্র ২১টি ধনকুবের পরিবার দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে সম্পদের পুনঃবন্টনের জন্য জাতীয়করণের কথা ভাবা হয়। এটা সম্ভবত চিরস্থায়ী পদক্ষেপ ছিল না। মিশ্র অর্থনীতির যাত্রাপথে এটা ছিল স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ। এ কথা আবারো বলা চলে জুলফিকার তার অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগের কোনো সময় পাননি।

জুলফিকারের শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতি এবং সামাজিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি স্বত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর নিজেরও কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশ্চাৎপসারণ ছিল। জুলফিকার এক মেরুর ব্যক্তিত্ব। হয় তাকে ভালোবাসতে হবে নয়তো ঘৃণা করতে হবে। তার শাসনামল না দেখে এটা কখনোই বোঝা যাবে না যে, ভুট্টোর পরিবারকে ঘিরে কি পরিমাণ ক্ষমতা এবং পাশাপাশি কি পরিমাণ সহিংসতা জড়িয়ে ছিল। বেলুচিস্তানে অনেক জটিল সমস্যার মধ্যে থেকে জুলফিকার কাজ করে গেছেন।

বেলুচিস্তানের জন্য পাকিস্তানের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। বেলুচ জনগণের যারা জাতিগত গঠন ও কাঠামোর দিক থেকে গোত্র-ভূক্ত তাদের সেমেটিক বা ইরানীয় বলে অভিহিত করা হয়। আবার সীমান্তের দুই পাশেই যাদের ভাষাগত দিক থেকে আর্যদের সমগোত্রীয় তারা দাবি করে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল পার্সিয়ান। যারা বেলুচ ভাষায় কথা বলে

www.pathagar.com

তারা দাবি করে তারা এক সময় সিরিয়াতে বসবাস করত। সেখানে মেষ পালকের কাজ করত তাদের পূর্বপুরুষ। প্রথম সহস্রাব্দে তারা পশু চরাতে চরাতে মধ্য এশিয়ার দিকে চলে আসে। এরপর বর্তমানে বেলুচিস্তানে তারা বসবাস শুরু করে।

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বেলুচিস্তান অংশত আফগান, অংশত পার্সিয়ান, অংশত মোঘল শাসকদের অধীনে ছিল। উনিশ শতকের দিকে বেলুচরা ৪টি শাসকদের অধীনে বিভক্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশদের সময়েই আবার তাদের বড় অংশই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। যা বর্তমানে বেলুচিস্তান নামে পরিচিত। প্রদেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই গরিব।

উপমহাদেশ যখন ভাগ হয়, তখন বেলুচিস্তান ও নেপালকে বলা হয়েছিল তারা কোন অংশে যাবে বেছে নিতে। গণভোটে কোনো অংশের সঙ্গে না গিয়ে নেপালের মতো বেলুচের জনগণ স্বাধীন থাকতে চেয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায়নি। বেলুচিস্তানের শাসক ছিলেন কয়েকজন সামন্তীয় প্রধান, তাদের একজনকে খুব সস্তায় ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করা যায়। পাকিস্তান ওই প্রদেশে সৈন্য পাঠিয়ে বেলুচিস্তানের প্রিন্স মীর আহমদ ইয়ার খানকে তার মত পাল্টাতে বাধ্য করে। কালাতের প্রিন্স মীর আহমদ ইয়ার খান একটি চুক্তিতে সই করেন। সেখানে বলা হয়েছে, বেলুচরা তাদের স্বাধীনতার দাবি পরিত্যাগ করে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। তার ভাই পাকিস্তানের সাথে এ সকল চুক্তি মেনে নেয়নি। কিছুদিন পর তাকে হত্যা করা হয়। বেলুচদের স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রাণ দেন।

প্রথম দফায় এসব ঘটনার বছর দশেক পর আবার বেলুচদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সংঘাত লেগে যায়। জেনারেল আইয়ুব খান প্রদেশ ভেঙ্গে পাকিস্তানকে এক ইউনিট ঘোষণার পর বেলুচরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বেলুচরা কোনোদিনই প্রবেশ করেনি।

তৃতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৬০ সালে, যখন পাকসেনারা বেলুচিস্তানে সামরিক গ্যারিসন নির্মাণ শুরু করে। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। বিদ্রোহ দমন করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্বসুরি আইয়ুব খানের এক ইউনিট কাঠামোর নীতি থেকে সরে আসলেন। তিনি বেলুচদের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করলেন কিন্তু তাদের জোর করে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসলেন। ফলে তাদের শান্তিচুক্তি বেশি দিন টেকে নাই।

আমি একবার খায়ের বক্স মারি নামের বেলুচদের একজন গোত্রপতির সঙ্গে দেখা করতে করাচিতে তার বাসায় গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন মারি গোত্রের প্রধান। বাড়ির গেটে তার সঙ্গে দেখা। বিশাল বপুধারী মানুষ, কাধে অত্যাধুনিক কালাসনিকভ রাইফেল। পরনে সালোয়ার। ভুট্টোরা তার মোটেই পছন্দের লোক ছিল না। পরিচয় জানার পরেও আমাকে সাক্ষাতকার দিতে রাজি হয়েছিলেন মারি। আমাকে খুব ভদ্রভাবে গ্রহণ করলেন এবং ফলের জুস খেতে দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে এখন খুব অল্প দেশই স্বাধীন। পাকিস্তান ব্রিটিশ শাসন নিগর থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমানে আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। একটা উপনিবেশিক দেশ কিভাবে স্বাধীন দেশের মতো আচরণ করবে? পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব আগ্রাসন মেনে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, এখানে পাক কোরআন রয়েছে, এটা পবিত্র স্থান

www.pathagar.com

বাকিরা সকলেই কাফের। কিন্তু একে পাকিস্তান বলাটা অসঙ্গত। আসলে এটা নাপাক স্থান।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে বেলুচরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে? জবাবে একটি গল্প শোনালেন তিনি, 'একজন ভদ্রলোক একটি ট্রেনের লম্বা খালি সিটে একা বসে ছিল, এরপর একজন একজন করে এসে তাকে সরিয়ে নিজেরা বসতে থাকল। এভাবে একের পর একজন বসতে থাকে এবং তাকে এক কিণারায় ঠেলে নিয়ে গেল। এরপর তার আর সরার জায়গা নাই, পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। এরপরেও, তাকে সরতে বললে সে হয় তোমাকে খুন করবে নয়তো নিজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা এখন সেই পরিস্থিতিতে রয়েছি।' গোত্র প্রধান খায়ের বক্স মারি এত দ্রুত কথাগুলো বলছিল যে, আমাকে ঝুকে কান খাড়া করে সেগুলো শুনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ ভাজন মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি জানালেন, ১৯৭২ সালে বেলুচরা ফের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরিস্থিতিতে চলে এসেছিল। এ সময় তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় । পূর্ব পাকিস্তান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ফের একা হয়ে পড়ে বেলুচরা। রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলসমূহ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে পিপলস পার্টি পর্যন্ত সকলেই এদের ভুট্টো বিরোধী বলে চিহ্নিত করতে শুরু করতে লাগল। অনেক বেলুচ নেতা ফেডারেল সরকারে বেলুচদের প্রতিনিধি বাড়ানোর দাবি তুলতে লাগল। তলে তলে অনেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

ওই সময়ে ইসলামাবাদে অবস্থিত ইরাকী দূতাবাসে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি চালান জব্দ করা হয়। পুলিশ সন্দেহ করছে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিচ্ছিন্নতাবাদী বেলুচের মারি উপজাতি নেতাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই ঘটনার পর জুলফিকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমেই বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে ভেঙে দিলেন এবং মারি বিদ্রোহীদের দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। পর্দার অন্তরালে থেকে অনেকেই কলকাঠি নাড়ছিল। এদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট রেজা শাহ পাহলবীর কাছ থেকেও চাপ আসছিল। তিনি মনে করতেন ইরানের অংশের বেলুচরা পাহলবী শাসন বিলোপের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রেজা শাহ বেলুচদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ দিয়ে আসছিল। পাকিস্তান ফের বেলুচিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করল।

বেলুচদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানোর জন্য জুলফিকারই প্রথম প্রধানমন্ত্রী নন। তার আগেও অনেকে বেলুচদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের ওপর সহিংসতা চাপিয়ে দিয়েছিল অনেকে। খায়ের বক্স মারি, যে লোকটি আমাকে ফলের জুস দিয়ে আপ্যায়ন করছে, সেই গোষ্ঠীই গঠন করেছিল বেলুচ পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট বা বিপিএলএফ। তার নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল গেরিলা যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকিস্তানের ৩ হাজার সৈন্য এবং বেলুচ গেরিলাদের ১০ হাজার সদস্য নিহত হয়।

আমি গোত্র সর্দারকে ১৯৭০ সালের অভিযান সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনি বলেন, 'আপনি জুলফিকারের নাতনী, আপনার সামনে এসব বলা ঠিক হবে না।'

খুব বিনয়ের সঙ্গে এসব বললেন তিনি। তার সৌজন্যতা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

তিনি আবার বললেন, 'বিষয়টা হলো আমি তো তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে লড়েছি।'

www.pathagar.com

আমি তাকে আবার নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম, 'আমি এসেছি কথাগুলো শুনতে। দাদার পক্ষ নিয়ে কথা বলার দায়িত্ব নিয়ে নয়। আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।' হাসতে হাসতে কথাগুলো বললাম আমি।

মারি সর্দার বলতে শুরু করল, 'ভুট্টোর সঙ্গে হিটলারের কোনোই তফাৎ নেই। সেনা অভিযান শুরুর আগে এখানে হতাহতের ঘটনা সামান্যই ঘটত, অথচ এখন হত্যা খুন জখমের ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে। এখন সহিংসতা সংক্রমিত হয়ে গেছে বেলুচিস্তানের সবখানে। প্রথম দফায় গোত্রগত ভাবে আমরা প্রতিরোধ আন্দোলন করেছি, এখন ক্রমশ সেটা জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে রূপ নিচ্ছে।'

জুলফিকারের নির্দেশে মালিকে জেলে পোরা হয়েছিল। তার সঙ্গে আরো উপজাতি সর্দার তখন জেলে। এদের নীরব বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব এতে আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জুলফিকারের প্রতি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তারা।

বেলুচদের আরেক নেতা ইউসুফ মাস্তি খান, আমার বাবার বয়সী মানুষ। আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলেন তিনি। সাক্ষাৎকারে বেলুচিস্তানে জুলফিকারের ভূমিকা নিয়ে কথা বলবেন বলে ঠিক হলো। মাস্তি খানকেও জেলে বন্দি রাখা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। করাচির সদরে একটি ব্যারাকে তাকে আটক রাখা হয়েছিল ১৫ দিন, তারপর তাকে কোয়েটা জেলে রাখা হয়েছিল। মাস্তি খান তখন তরুণ, প্রাদেশিক রাজনীতিতে কনিষ্ঠ। তার বাবা আকবর মাস্তি খান ছিল জুলফিকারের পুরানো বন্ধু। রাজনীতি নিয়ে এদের দু'জনের মধ্যে প্রায়ই বিতর্ক হতো। ইউসুফ মাস্তি খান জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তার বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তারই পুরানো বন্ধু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ইউসুফের বাবা আকবর মাস্তি খানকে বেলুচিস্তানের ওপর দিয়ে একটি মহাসড়ক নির্মাণের ঠিকাদারির প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি।

ইউসুফ খান আমাকে জানালেন, এ সময় বাবাকে সোজাসাপ্টা বলে দিয়েছিলাম যে, 'যদি জুলফিকারের প্রস্তাবে রাজি হও তা হলে আমি এখনই এখান থেকে পাহাড়ে কিংবা বনে চলে যাব। এমনকি হাতে অস্ত্র তুলে নেব আমরা'। এ সময় ইউসুফ খানকে খুব প্রাণোৎফুল্ল ও তরতাজা দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, বাবা জানালেন, 'আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবো না কারণ জুলফিকার ভিষণ প্রতিহিংসাপরায়ন মানুষ।' বাবা চাচ্ছিলেন আমিও যেন তার সাথে জুলফিকারের সঙ্গে দেখা করি। একদিন সত্যিই বাবা জুলফিকারের সঙ্গে দেখা করেন। তার রাওয়ালপিন্ডির আবাসিক কার্যালয়ে গিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী বাড়ির পোষাক পরে সিঁড়ির ওপর বসে সিগারেট খাচ্ছেন। সেখানে দু'জন পুরানা দিনের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর পরিবেশটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলে জুলফিকার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেলুচিস্তান নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করছ?' জবাবে আকবর মাস্তি বললেন, 'এর জবাব কি একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শুনতে চাও নাকি বন্ধু হিসেবে শুনতে চাও?' জুলফিকার বললেন, 'তুমি খোলাখুলি বল। আকবর মাস্তি বললেন, 'তুমি কেন বেলুচিস্তানের মানুষদের হত্যা করছ?

জুলফিকার ওই প্রদেশের বিদ্রোহ সহিংসতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলেন, নানা উস্কানিমূলক কাজের কথা বললেন তিনি। তিনি বললেন, 'আমি সহিংসতা চাই না, কিন্তু আমার কিইবা করার আছে?' আকবর মাস্তি বললেন, 'তুমি সৈন্য প্রত্যাহার কর। জুলফিকার ঘাড় নেড়ে

www.pathagar.com

বললেন, 'এটা সম্ভব নয়।'

এটা ছিল পারিবারিক পরিবেশের আলাপচারিতা। পূর্বসুরিদের মতো নিজের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর আগে তিনিও সেনাবাহিনীকে কোনো ক্ষমতা দেননি। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বা বিদ্রোহ দমন শুরু করলেন, তখন থেকেই তার শুরু হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার ভর কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকা ।

শক্তির স্বাভাবিক উৎস থেকে সরে আসতে থাকে সরকার। শেষে যখন সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে নিয়ে আসা হলো ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীও সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করল। আকবর মাস্তি খানকেও আটক করা হলো। এক দশক পর্যন্ত বেলুচিস্তানে সেনা মোতায়েন থাকে।

মিরাজ মোহাম্মদ খান ছিলেন জুলফিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তার ওপর অগাধ আস্থা ছিল, জীবনভর মার্কসীয় রাজনীতি চর্চা করে গেছেন তিনি। পিপিপির নেতা ছিলেন। তিনি বললেন, 'বেলুচিস্তানের অভিযানে সেনাবাহিনীকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এতে তারা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল, কারণ সেনাবাহিনীকে সরকারের খুব দরকার। জুলফিকার নিজের লোকদের বিরুদ্ধেই লেগেছিলেন। যেমন– ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল, এদের সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। বেলুচিস্তানে সৈন্য প্রেরণ ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিরোধী মনোভাব নেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৭৪ সালে মিরাজ খান পিপিপি ছেড়ে দেন। এরপর জুলফিকারের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি হয়। ইংরেজি ছেড়ে উর্দুতে কথা বললেন তিনি।

তিনি বলেন, 'সামন্তীয় জোতদাররা তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। তারা দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে জনগণের বিরুদ্ধে দলের ক্ষমতা খাটায়, ওই সামন্তীয় জোতদাররা জনগণ থেকে জুলফিকারকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।'

মিরাজ আরও বলেন, 'শ্রমিকদের একটি প্রতিবাদ বিক্ষোভ নিয়ে করাচিতে কথা হচ্ছিল। মিটিংটি হয়েছিল ১৯৭২ সালে। জুলফিকার বলে উঠলেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, রাস্তায় বিক্ষোভের শক্তিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে চুরমার করে দিতে পারি।' জুলফিকারের অমন কথায় আমি বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করে চলে আসি।

এরপর জুলফিকার আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি দলের নিয়ম ভেঙ্গেছো। জবাবে ব্যখ্যা করে বলেছিলাম, কেন ওই আচরণ করেছি। জবাবে জুলফিকার বললেন, 'এটা সেই পরিস্থিতিতে মিরাজ আমি কথাটা বলেছিলাম। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শ্রমিকদের ওপর গুলি করেছিল পুলিশ।

ওই গুলি চালানোর আগে জনগণ এবং শ্রমিকরা ধারণা করেছিল, জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতায় আসার পর সবকিছু পাল্টে গেছে। তাদের ধারণা, তারাই এখন ক্ষমতায়। শিল্পপতিরা ছিল আতঙ্কিত। জুলফিকারকে তাদের আশ্বস্ত করতে হয়েছে।'

মিরাজ দল ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বললেন, 'আমি জুলফিকারকে বললাম, 'আপনি গোয়েন্দাদের কথামত চলছেন, যারা আপনাকে নিজের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। জে.এ রহিম, ড. মুবাশ্বির হাসানের মতো পার্টির পরীক্ষিত নেতাদের বরখাস্ত করা হলো। এরা সকলেই দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। গোয়েন্দারা তথ্য দিয়েছিল যে, এরা সকলেই ভুট্টোকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ভুট্টো ক্রমশ সন্দেহপরায়ন ব্যক্তিতে পরিণত

www.pathagar.com

হন এবং দুর্বল হতে থাকেন। তার শক্তি ক্ষয় হতে থাকে।' এর বছর খানেক পরেই মিরাজকে গ্রেফতার করা হলো, জে. এ রহিমকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো, ড. মুবাশ্বির হাসান তখনই দল না ছাড়লেও মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন। সামান্য কিছু লোকের সঙ্গে দলে থেকে গেলেন তিনি। উল্লেখ্য জে.এ রহিম ছিলেন পিপিপি'র মেনিফেস্টোর রচয়িতা, ড. মুবাশ্বির হাসান ছিলেন সরকারের অর্থমন্ত্রী।

www.pathagar.com

৫

'যারা জুলফিকারের সঙ্গে দল করেছেন, জীবন যৌবন দিয়েছেন, যারা ছিল প্রতিশ্রুতিশীল, ক্ষমতার সায়াহ্নে লাহোরের সেই দিনগুলোতে তাদের সবাইকে একে একে জেলে পুরতে লাগলেন তিনি।'

কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন মিরাজ। এখন তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ, শরীরটা অসুস্থ। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'তিনি কোনো নবী-রসুল ছিলেন না, তিনি ছিলেন বড় মাপের মানুষ, একজন গ্রেট লিডার। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিটাই এমন যে একজনকে মানুষ থেকে নবী বানিয়ে ফেলি।' মিরাজ আরও বলেন, 'জুলফিকারের ক্ষমতা যখন শেষ হয়ে আসছে, ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, অথচ এসব কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না।'

'রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতার শেষের দিকে জুলফিকার খুব নাকানি-চুবানি খাচ্ছিলেন। পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরি আচরণ করে যাচ্ছিল। 'মুসলিম বোমা' তৈরির কাজ এগিয়ে চলছিল। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী একেবারেই বন্ধুহীন হয়ে পড়েছিলেন। হেনরি কিসিঞ্জার জনসম্মুখে জুলফিকারকে একজন কর্মক্ষম এবং বুদ্ধিমান রাজনীতিক বলে অভিহিত করেছিলেন। সে-ই তখন সতর্ক করে দিয়ে বলছিল, পাকিস্তান যদি তার পরমাণু কর্মসূচি পরিত্যাগ না করে তাহলে আমেরিকা সেদেশে একটি ভয়ংকর উদাহরণ তৈরি করবে।

জুলফিকার তার পা রাখার জায়গাগুলো হারাতে বসলেন। খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। তার প্রতিপক্ষকে আশ্বস্ত করার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তিনি আশা করলেন, তার চিরাচরিত শত্রুরা এবার শত্রুতা ভুলে যাবে। প্রশমিত হবেন তারা। জুলফিকার ১৯৭৩ সালের সংবিধান বেশ কয়েকবার সংশোধন করলেন। সংবিধান সংশোধন করে ফেডারেল সরকারের হাতে এমন ক্ষমতা দেয়া হল যে, ইচ্ছা করলেই যেকোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হলো। তৃতীয় সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কোনো বন্দির আটকাদেশ নিষিদ্ধ কিংবা তার জামিন মঞ্জুরের জন্য আদালত কোনো নির্দেশনা দিতে পারবে না। নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। ধর্মীয় দলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করলেন তিনি। সংবিধান সংশোধন করে কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয়– তার ধর্মীয় পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব নিল সরকার। মুসলমানদের মধ্যে আহমদিয়া নামের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী রয়েছে। যারা বিশ্বাস করে মোহাম্মদের পরেও পৃথিবীতে নবী আসবেন। যার নাম আহমদ।

www.pathagar.com

জুলফিকার তাদের সাংবিধানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করলেন। মদ নিষিদ্ধ করলেন। জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করলেন তিনি।

যে উদ্দেশ্যে এত কিছু করলেন, অথচ কোনো কিছুতেই তার পতন থামাতে পারলেন না তিনি। বরং পুরাদমে শুরু হলো। দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী জোতদার ভূস্বামীরা নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি শুরু করে দিল। তারা নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠল। আব্দুল ওয়াহিদ কাটপার নামের একজন পিপিপির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য জানিয়েছিলেন, 'সেনাবাহিনী তাকে হত্যা করতে পারে।' ওয়াহিদ ছিলেন জুলফিকারের অন্ধভক্ত। সেনাবাহিনীকে সব সময় 'খাকি' বলে সম্বোধন করতেন তিনি। যখন বড় বড় জমিদার ভূস্বামীরা দলের ভাবমূর্তিকে জনগণের সামনে ক্ষুণ্ন করা শুরু করল, তখন জুলফিকার তাদের বললেন, 'তোমাদের এরূপ বিবাদ বিসংবাদ আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। সেনাবাহিনী আমাকে ছাড়বে না। তারা তোমাদেরও ছাড়বে না।'

১৯৭৬ সালে যখন সেনা প্রধানের দায়িত্ব থেকে বাংলার কসাই জেনারেল টিক্কা খান অবসর গ্রহণ করলেন, জুলফিকার সে পদে ৫ জন সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে জেনারেল জিয়াউল হককে আসীন করলেন। জুলফিকার বিশ্বাস করতেন, জিয়াউল হক হলেন সবকিছু এক বাক্যে মেনে নেওয়া অনুগত দাসসুলভ ব্যক্তি।

কোরান ছুয়ে সে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজের আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। ওয়াহিদ কাটপার জানান, 'জিয়া খুবই ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ ভুট্টোর সঙ্গে সব সময় আনুগত্যের অভিনয় করে যেতেন। অসম্ভব উচ্চাভিলাষী মানুষ, এ কারণে খুবই হিংস্র প্রকৃতির।'

জিয়া শক্ত মানুষ। জেল দেয়া চুলের মাঝামাঝিতে সিথি কাটতেন। কালো রং করা গোঁফ যত্নের সঙ্গে আচড়ানো, খুবই সাধারণ পরিবার থেকে আসা সামরিক কর্মকর্তা।

কোনো রাজনীতির ধার ধারতেন না কিন্তু ধর্মীয় অর্থে একজন সাধারণ মানসিকতার লোক। আমাদের পরিবারে জিয়ার আনুগত্য নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ছয় জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাকে ডিঙ্গিয়ে যাকে সেনা প্রধান করলেন জুলফিকার, সেই আবার তাকে হত্যা করে। গল্পটি হলো, সেনা প্রধান হিসেবে শপথ নিতে জিয়াকে তলব করলেন ভুট্টো, যথাসময়ে জিয়া উপস্থিত হলেন। এসেই খুব বিচলিতভাবে বসে পড়েন, তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। তার হাঁটু কাপছিল তখন। নিজের নার্ভাস প্রশমন করতে সিগারেট ধরিয়েছিলেন, এমন সময় প্রধানমন্ত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। সে সময় পদস্থ কর্মকর্তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, আঙ্গুলের জ্বলন্ত সিগারেট লুকাতে সেটা ইউনিফর্মের পকেটে ঢুকিয়ে ছিলেন। জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে সামরিক ইউনিফর্ম পুড়ে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। সে জুলফিকারকে এতটাই ভয় করত যে, তার সামনে সিগারেট খাওয়াকে বড় ধরনের অপরাধ বলে গণ্য করত। এতে সে এতটাই বিব্রত অবস্থায় পড়েছিল যে, সামরিক জ্যাকেটের পকেটে জ্বলন্ত সিগারেট লুকিয়েছিল।

পূর্ব ধারণা করা যায় না এমন শান্ত ভদ্র নম্র স্বভাবের জেনারেল তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে আর দেরি করেননি। সিগারেটের আগুনে তা পকেটে পুড়ে গেলেও জুলফিকার

www.pathagar.com

সংসদের শেষের অধিবেশনে বলেছিলেন, 'আমার রক্তের গন্ধ শুকে শুকে রক্ত পিপাসুরা ওঁৎ পেতে আছে।' হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ঘাতক এগিয়ে আসছে।

* * *

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিনগুলোতেও পুত্র মুর্তজার কাছে চিঠি লেখার জন্য সময় করে নিতেন জুলফিকার। প্রথম হার্ভাডে পৌছানোর পর মুর্তজা র কাছে চিঠি লেখেন তিনি। এটা ছিল বিদেশ বিভুইয়ে পাওয়া প্রথম বাবার চিঠি। চিঠিতে লেখেন–

'প্রথম দিকে তুমি বাড়ি-কাতর হয়ে উঠতে পার। তখন বাবা-মা, ভাই-বোনের সান্নিধ্যের আশায় উদ্বিগ্ন হতে পার। কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। ভবিষ্যতে বাড়ির সংবাদ জেনেও উদ্বিগ্ন হবে না তুমি। এর অর্থ এই নয় যে, দেশে কি ঘটছে তা নিয়ে তোমার উৎসাহ থাকবে না। তোমাকে চিঠিতে যা লিখছি এর অনেক কিছুই লিখেছি পিংকিকে। সেটিও ছিল তাকে লেখা বাবার প্রথম চিঠি। একই ব্যক্তি একই পরিস্থিতিতে একই আবেগ অনুভূতিতে কন্যার বদলে পুত্রের কাছে লিখছি। চিঠিতে যে চিন্তা ও অনুভূতির কথা বলা হয়েছে তা প্রায়ই এক। সুতরাং আমি তোমাকে লিখতে পারতাম 'প্রিয় মীর, তুমি কেমন আছ, পিংকি যখন রেডক্লিফে গিয়েছিল তখন তাকে লেখা আমার প্রথম চিঠিটি পড়ে নিও, যদি সে ওটা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ না করে, তাহলে সেই চিঠিটির ফটোকপি পাঠাব। আমি খুবই ব্যস্ত, আমার অনেক জরুরি কাজ পড়ে আছে। বিদায় হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি ভাল থেক, শরীরের প্রতি যত্ন নিও।'– কিন্তু আমি তোমাকে সেভাবে লিখব না, তোমার প্রতি আমার অনেক মমতা ও ভালোবাসা রয়েছে, যা সাধারণত প্রকাশ করতাম না, এর পেছনে হয়ত অনেক কারণ রয়েছে। আমি সেগুলো তোমাকে খুলে বলব।

তারুণ্য অবধি যখন দেশে ছিলে, তোমাকে নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না। তুমি আমার বড় ছেলে, আমি কোনোক্রমেই চাইনি তুমি নষ্ট হয়ে যাও। এই নিষ্ঠুর এবং সংঘাতময় পৃথিবীতে একজন সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে তুমি গড়ে ওঠ এটা আমি চাই। শক্ত মানুষ বলতে আমি সংঘাত প্রবণ মানুষ বোঝাচ্ছি না। কারণ আমাদের সকলেরই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া রয়েছে। শক্ত মানুষ বলতে বোঝাচ্ছি, জীবনের খারাপ দিনগুলোকে শক্তভাবে ও জোরালোভাবে মোকাবেলা করার সমর্থন।

তুমি পরিবারের বড় ছেলে। অন্যান্য ছেলেমেয়ের চেয়ে তুমিই বড়। তোমার দায়িত্ববোধ দিয়ে আমাকে এবং পরিবারকে আশ্বস্ত কর। এ কারণেই তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে বোঝাপড়ার দরকার আছে। আমি চাই, তুমি নিঃকলঙ্ক এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বেড়ে ওঠ। স্মার্ট হও। কঠিন পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠ। আমি জানি, আমি আশা করি, তুমি সেটা পারবে। একজন ব্যক্তি অপরের ভালো কিছু দেখে ঈর্ষান্বিত হতে পারে, কিন্তু আপন সন্তানের ভালো কিছুতে কখনোই সে ঈর্ষান্বিত হয় না। এ কথাটি

www.pathagar.com

আমার বাবা বারবার বলতেন। সে কথাটিই এখন তোমাকেও বলছি। তুমি যদি ফার্স্টক্লাস নিয়ে ফিরে আস তাহলে পৃথিবীতে নিজেকে সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে করব। আমি যা কিছু করেছি, তারচে' ভালো কিছু করার জন্য যদি সঠিক ধারণা নিয়ে তুমি ফিরে আস তাহলেও খুশি হব। আমার জীবনে যেমন অনেক সফলতা রয়েছে তেমনি অনেক ব্যর্থতাও রয়েছে। কিন্তু পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। কঠিন পরিশ্রমী মানুষ যদি সাধারণ মানেরও হয় সেটা অলস মেধাবীর চেয়েও উত্তম। কঠিন পরিশ্রম কখনো একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস হতে দেয় না। সময় দ্রুত চলে যায় কিন্তু জীবনের সুযোগগুলো আরও দ্রুত চলে যায়। এগুলো ক্ষণকাল ঝলকে উঠেই ম্লান হয়ে যায়। ঈশ্বর পৃথিবীটা অনিন্দ্য সুন্দর দিয়ে তৈরি করেছেন। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যটা কখনোই মানব দেহের চেয়েও সুন্দর নয়। সব কিছুর চেয়ে সুন্দর মানুষের মন, হৃদয়। আমরা যেভাবে আমাদের শরীর এবং মন তৈরি করব– সেটাই নির্ধারণ করে দেয় ভবিষ্যতে আমরা কি করব। জীবনে আমরা কি চাই, আমাদের ভালো কিছু হওয়া– এ সব কিছু নির্ধারিত হয় আমাদের শ্রম ও ইচ্ছার উপর।'

জুলফিকার তার ছেলেমেয়েদের কাছে লেখা চিঠিগুলো অবশ্যই ইতিহাসে জায়গা করে নেবে। চিঠি লেখার সময় ছিল না, অথচ সময় বের করে নিতেন। বিমানে বসে, বাড়িতে, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের দফতরে– সময় পেলেই চিঠি লিখতেন তিনি। সেগুলো তার কর্মচারীরা টাইপ করে দিত।

চিঠিগুলো কখনো কৌতুক রসাত্মক, কখনো হালকা কথাবার্তা, কিন্তু সেগুলো প্রধানত শিক্ষামূলক। তার চিঠিগুলো বিবেকজাগ্রত করার মতো এবং গঠনমূলক। বাবা তার বাবার চিঠিগুলো অর্জিনাল ইনভেলাপ এবং এমনকি স্ট্যাম্পসহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। সেখানকার স্ট্যাম্প ও সিলগুলো সবই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ওপেন হার্ট সার্জারির বাবা খুব যত্নের সঙ্গে খুলতেন চিঠিগুলো। যাতে ইনভেলপের কোনো অংশ নষ্ট না হয়। একটি নীল রঙের প্লাস্টিক ফোল্ডারে সেগুলো রাখা হতো। ফোল্ডারে ইনভেলপের স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। বাবা করাচি থাকার সময় প্রায়ই ওই চিঠিগুলোর কথা বলতেন। করাচির ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে আসার পর আমাদের প্রথম কাজই হতো ওই ফোল্ডার থেকে চিঠিগুলো খুলে দেখা। ফোল্ডারটি বাবার লাইব্রেরির সেলফে গুছিয়ে রাখা হতো। সেগুলোর আবেদন কখনো পুরানো হতো না। সেখান থেকে কেউ সরাত না ফোল্ডারটি। এটা আমাদের কাছে মহামূল্যবান; পুরাকীর্তির মতই সংরক্ষণ করতাম আমরা।

জুলফিকার তার সন্তানদের সান্নিধ্য পেতেন খুবই কম, তাদেরকে দরকারি শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেতেন না তিনি। তিনি লিখছেন,

কোনো কিছুতে সহজে উত্তেজিত হইয়ো না, এটা একটা তোমার ভালো দিক। দরকারি রাজনৈতিক শিক্ষা তুমি পেয়েছ, তোমার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ খুব কাজে আসবে। তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছ, তুমি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পিপলস রিপাবলিক অব চীনে গিয়েছ। সেখানকার বাস্তবতা, রাজনীতি ও কূটনৈতিক বিষয় খুব কাছ থেকে

www.pathagar.com

দেখেছ। তুমি বড় বড় বই পড়ে রাজনীতি শেখনি, বরং আমার কাছ থেকেই রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছে তোমার।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে তোমাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন সফরে নিয়েছিলাম। একই উদ্দেশ্যে তোমাকে আবারো ওই দু'টি দেশে পাঠাব। (উল্লেখ্য, মূর্তজা এক গ্রীষ্ম চীন সফরে কাটিয়েছিলেন। সে দেশের ইতিহাস, গ্রাম-শহরের অবস্থা, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আরও বেশিকিছু জানতে এ সফর করেছিলেন তিনি।)অন্যদের তুলনায় ওইরূপ শিক্ষা কার্যক্রমে তুমি বাড়তি সুবিধার জায়গায় আছ। তোমার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবে।'

এই চিঠিতে বিশেষভাবে জুলফিকারের মমত্ব ফুটে উঠেছে। তার চিঠিতে লেখা উপদেশগুলো সংক্ষিপ্ত। সহজবোধ্য ভাষায়, তরুণ বয়সী পুত্রকে লেখা চিঠিতে অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, সেগুলো সে হয়তো সব জানে না, যা তার জানা প্রয়োজন।

'আমেরিকানরা তর্কপ্রিয় জাতি। কথায় কথায় বইয়ের উদ্ধৃতি দিতে তারা পছন্দ করে। তারা কোনো বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে কিন্তু মূলের গভীরে যেতে পারে না। তারা আশপাশের বিষয় নিয়ে এতই মত্ত হয়ে ওঠে যে, কেন্দ্রীয় প্রশ্নটিই ধরতে পারে না। আমেরিকানরা পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেয়, অনেক মতবাদ কিংবা চিন্তাধারার দরকারি উপাদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েই সেগুলোকে স্বতসিদ্ধ বলে মেনে নেয়। অথচ যেগুলো খুবই সরল এবং বোধগম্য ব্যাপার। আমেরিকানরা সমস্যাকে জটিল করে বলতে ভালোবাসে। তারা অহংবোধে ভোগে। তারা মাত্রাতিরিক্তভাবে কলকব্জা আর মেশিনের উপর নির্ভরশীল। যেগুলো তারা নিজেরাই তৈরি করেছে। নিজেদের সৃষ্টির কোপানলে নিজেরাই অসহায় হয়ে পড়ে। এর অংশত কারণ হলো এরা বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্যাঁকে ডুবে থাকে। সুদূর প্রসারি দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলেছে তারা। নিজেদের জ্ঞানের বহর জাহির করতে কয়টা পুস্তক পাঠ করেছে তার সংখ্যা উল্লেখ করে। কয়টা পত্রিকায় লেখা ছেপেছে সেটা ফলাও করে জাহির করে। কোনো সমস্যার মর্মে যাওয়ার সিধা পথটা অনর্থক জটিল করতে ভালোবাসে তারা। আমার প্রিয় পুত্র, তুমি কিন্তু অবশ্যই কোনো সমস্যার মূল স্পর্শ করবে এবং সেখানে পৌঁছার চেষ্টা করবে'

মনোযোগ সহকারে অধ্যায়নের জন্য জুলফিকার বার বার তার সন্তানকে তাগিদ দিতেন। মাঝারি মেধার জন্য অধ্যায়নের কোনো বিকল্প নেই। অধিক মেধার চেয়ে চর্চা করা মেধা হাজার গুন উত্তম। মর্তুজাকে এসব কথা বার বার বলতেন। তিনি লিখেছেন,

'প্রিয় পুত্র মীর, সব কিছুকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবে, কোনো কিছুতে অসফল হলে ভেঙে পড়বে না, আবার কোনো কিছুতে সফল হলে আনন্দে আত্মহারা হবে না। পা সব সময় মাটিতেই রাখবে। কখনোই আত্মবিশ্বাস হারাবে না। ব্যর্থতা থেকে সব সময় শিক্ষা নেবে। সফলতায় সব সময় বিনয়ী হবে। কথা বলার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তোমার যুক্তির জায়গায় সাহসের সঙ্গে দাঁড়াবে। কিন্তু একগুয়ে জেদি হয়ে নয়। বস্তুনিষ্ঠ মনন গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে সচেষ্ট হবে। জ্ঞান আহরণের জন্য উদ্বিগ্ন থাকবে। কাণ্ডজ্ঞানের ভারসাম্য রক্ষা করবে। তোমার অতীত, তোমার সংস্কৃতি নিয়ে কখনা লজ্জাবোধ করবে না। তোমার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে ধারণ করবে, তবে তা নিয়ে উগ্র বড়াই করবে না। সব কিছুতেই স্বাভাবিক এবং সাধারণ থাকবে।
যে কোনো জটিল পরিস্থিতি কিংবা পর্যাপ্ত ধারণা ব্যতিরেকে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে কখনোই নিজের সাহস হারাবে না। ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তোমার শিকড় এখানেই প্রথিত। এখানেই রয়েছে তোমার হাজার বছরের ইতিহাস। জাতীয় ঐতিহ্যের বিষয়ে কখনোই উগ্র জাত্যাভিমানে ভুগবে না। পাকিস্তান ভালো এটা প্রমাণ করতে কখনোই বলবে না যে, আমেরিকা খারাপ, তোমার সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে হিনমন্যতায় ভুগবে না। এশিয়ার দুর্দশার জন্য হীন হয়ে থাকবে না, মহিমান্বিত নৈতিকতা ধারণ করতে কখনোই ভীত হবে না। আমাদের দুর্দশার জন্য দায়ী ইউরোপ, সেই দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করছি আমরা। সব সময় মনে রাখবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যত অগ্রগতিই ঘটুক ইসলাম হলো খোদার সর্বশেষ বার্তা। যথাসম্ভব নিজ ধর্মের সংস্পর্শে থাকবে।'

যে কোনো বাবার মতো জুলফিকার বারণ করতেন, 'না' বলতেন। মানুষের জীবন-বিধ্বংসী নেশা নিয়েও তিনি সন্তানকে একই কথা বলতেন।
তিনি নিজ সন্তানকে ধূমপান না করতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু বলতেন মদ্যপানের চেয়ে ধূমপান ভালো। পাশাপাশি এও বলতেন ধূমপানে ক্যান্সার হয়। আমেরিকায় বহু ছাত্র মাদক নেশায় আসক্ত বলে মুর্তজাকে সতর্ক করে দিতেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেননি যে, পাকিস্তানেও বহু ছাত্র মাদক নেশায় আসক্ত। তবে তিনি বলতেন, বহু ছাত্র তোমাকে মাদক নেশায় প্রলুব্ধ করতে পারে। তারা এ রকম বহু নিষ্পাপ তরুণদের নেশায় আসক্ত করে দেয়। এর ফাঁদে পা দিলে জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে, মননশীলতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি পুত্রকে মিনতি করে বলতেন, কখনোই এ পথে পা দিওনা, প্রিয় পুত্র কখনোই নয়।

'এবার উপসংহার– টানার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে, আমার এসব চিন্তা তোমার সঙ্গেই থাকবে। একবার তোমার গালে চড় মেরেছিলাম তোমার ছোট বোন সনমের মিথ্যা অভিযোগের কারণে। সেটা ছিল ১৯৬২ সালের কথা। তোমাকে অনুরোধ করছি, সে কথা তুমি ভুলে যেও। আগামী গ্রীষ্মে তুমি বাড়ি আসবে, শীত চলে গেল। ছুটিতে তোমার বাড়ি আসার প্রতিক্ষায় রয়েছি আমরা। আমরা একসঙ্গে মিলিত হবো, অনেক আনন্দ হবে। ততদিন নিজের প্রতি যত্ন নেবে, ঠাণ্ডার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কঠোর পরিশ্রম করে লেখাপড়া করবে। আমাদের কথা স্মরণে রেখ, খোদা তোমার মঙ্গল করুক।'
চিঠিতে নীল কালিতে দস্তখত করা 'তোমার প্রিয় বাবা জুলফিকার'

* * *

মুর্তজা ১৯৭২ সালের হেমন্তে উইনথ্রোপ হাউসের ছাত্রাবাসে উঠল। তার-রুমমেট ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের এক যুবক, নাম বিল হোয়াইট। কণ্ঠস্বর তার ভরাট।

www.pathagar.com

এশিয়ার কারো সঙ্গে থাকার অনুরোধ করেছিলেন তিনি। দরজায় ভুট্টো নামটি দেখেছিলেন, সে পাকিস্তানের নাগরিক তাও জেনেছিলেন, কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন নাই যে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী পুত্র।

বিল এবং ভুট্টো– দু'জনেই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষ। বরফ পড়া দেখার অভিজ্ঞতা দু'জনেরই কম। দু'জনেরই রাজনীতির প্রতি প্রবল আগ্রহ। কক্ষে লেনিনের আবক্ষ মূর্তি কিংবা দেওয়ালে সেটে দেয়া চে, চৌএনলাই-এর ছবি নিয়ে পোস্টার টাঙানো ছিল। সে ব্যাপারে তেমন আগ্রহ ছিল না বিলের। অপরদিকে বিলের মত আমেরিকার 'সঙ্গীত নিয়ে মাতাল ছিল না মীর। তারা দু'জনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়।'

নিউ ইয়র্কের কলেজ থেকে ইতোমধ্যেই আমি স্নাতক ডিগ্রি এবং লন্ডন থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছি। লন্ডনে গিয়ে আমি অনুভব করি, এখানেই আমার আব্বার একটা অতীত কেটেছে। এটা ভেবে মনে খুব সাহস পেতাম।

কলেজে প্রথম পা দেওয়ার পর পরই আব্বার কথা মনে পড়ল। একরাশ দুঃখ এসে হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তুললো। আব্বা কেমন করে এখানে চলাফেরা করেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, সময়টা বুঝি, জটিল মুক্ত এবং সুন্দর ছিল। অতীত স্মৃতি রোমন্থনে হৃদয় বেদনাবিধুর হয়ে উঠল। হার্ভাড এলামনাই এসোসিয়েশনের ওয়েব সাইট ভিজিট করে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে উঠলাম। আমার মনের পরিস্থিতি জানিয়ে ১৯৭৬ সালের ক্লাস অফিসারকে চিঠি লিখলাম। এই কলেজে আব্বার পড়াশোনার সময়কাল ও অন্যান্য বিবরণ জানালাম তাকে। সময়ের পেছনে ফিরে আব্বার সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে নয়। বরং ওই সময় আব্বার ক্লাসমেট ও শিক্ষক যারা ছিলেন, তাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। '৭৬ সালের ৪টি ক্লাসের ৩টি থেকেই কোনো ইতিবাচক উত্তর আসলো না। পরে একটি ক্লাস প্রতিনিধির উত্তর আসলো। ন্যান্সি নামের একজন ই-মেইলে আমাকে জানালো সে আমাকে সহায়তা করতে রাজি। সে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলো।

আমার আব্বা সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন তিনি। এটা আমার জন্য কতটা যে জরুরি সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। এ জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না তার। একের পর এক ই-মেইল আসতে শুরু করল।

হার্ভাডের ১৯৯৬ সালের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মিলে সত্যসত্যই আমাকে আব্বার তথ্যগুলো প্রদান করতে থাকে। আমি অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য পেতে থাকলাম। অনেকে আব্বার আসল পরিচয় জানত না অথচ তারা বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ধরনের প্রচুর ই-মেইল পেতে শুরু করলাম। তারা একই ফ্লোরে আব্বার সঙ্গে থাকতেন। আমি এ রকম অনেকের নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা জানলাম। আমেরিকান কলেজ জীবনে এরা সকলেই ছিলেন আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের মধ্যে আন্তরিক সুসম্পর্ক ছিল।

সত্যি বলতে কি, এদের মধ্যে একটা ঘটনা ছিল ব্যতিক্রম। একজন আমার অনুরোধকে ভুল বুঝেছিলেন এবং সাহায্য করেননি। অথচ, তিনি আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন! আমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনি। সেটা ২০০5 সালের ঘটনা। তখন আমার বয়স ২৩ বছর, সরল সিধা মন নিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আপনার শহরেই যেয়ে দেখা করবো, যখন আপনি আমার জন্য সময় দেন। সে সময়টা ছিল বাবার

www.pathagar.com

দশম মৃত্যু বার্ষিকীর বছর। আমার ভাইকে বাবার ব্যাপারে অনেক তথ্য জানানো দরকার। ভাইটি আমার মাত্র ৬ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছে। এখন তার বয়স ১৬ বছর।

তাই বাবা সম্পর্কে তথ্য জানাতে আমি মরিয়া হয়েছিলাম। আমার অনুরোধে ওই প্রফেসর সাহেব এতটুকুও নড়লেন না, তিনি আমাকে জানালেন, 'হার্ভাডে লেখাপড়ার সময় আমি বেনজিরের বন্ধু ছিলাম। আমাদের বন্ধুত্ব এখন পর্যন্তও অটুট রয়েছে। বোস্টন, নিউইয়র্ক এবং অক্সফোর্ডে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। অক্সফোর্ডে লেখাপড়ার সময় আমরা ঘনিষ্ঠ ছিলাম।' এ সব ই-মেইল পড়ে আমার পিলে চমকে গেল, কি অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি মনে করি, তুমি বরং বেনজিরের সঙ্গে কথা বল, সেই তোমাকে ভালো সাহায্য করতে পারবে।' আমি বুঝলাম তিনি আমাকে সাহায্য করবেন না, আমি খুব আহত হলাম। আমি অধ্যাপককে জবাবে লিখলাম,

> 'এটা খুবই দুঃখজনক যে, আমার ফুফু এ ব্যাপারে আমাকে এখন সাহায্য করবেন না। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমার উদ্দেশ্য হলো খুব সাধারণ, শুধু বাবাকে স্মরণ করা, তার জীবনের অর্থবহ ঘটনাকে মনে রাখা। কাউকে আঘাত করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি আপনি সে রকম কিছু মনে করেন, তাহলে বরং আমাকে সহায়তা না করাই ভালো। সেক্ষেত্রে আপনার মনোভাবকেই আমি সম্মান জানাব। অপরদিকে আপনি যদি বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেন এবং আমার বাবার সম্পর্কে বলেন, তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকব।'

এরপর আর কোনো জবাব দেননি তিনি।

ইন্টারনেটে অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছি, অনেকেই সাড়া দিয়েছে, তাদের বাড়িতে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যখনি তারা শুনেছে আমি আমেরিকায় যাব এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্নে অনেকেরই সাক্ষাৎকার নেব। বন্ধুরা ও তাদের পরিবার পরিজনদের আব্বার প্রতি তাদের ভালোবাসা এতটুকুও ঘাটতি হয়নি। যখনি তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিংবা যোগাযোগ হতো, সেই ভালোবাসা তারা আমাকে দিতেন।

আমার লেখা চিঠি পেয়ে বিল লিখেছে, 'তোমার আব্বা এবং আমি খুব ভালো বন্ধু ছিলাম, দু'জন একত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'ফাতিমা তুমি যদি আমেরিকায় বেড়াতে আস, নিজ বাড়ির বাইরে আর এক নিজ বাড়িতে থাকতে চাও, তাহলে সরাসরি হিউস্টনে চলে এসে। এখানে এলে তোমার আব্বা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারব, যা তোমাকে গর্বিত করে তুলবে।' বিল এবং তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে টেক্সাসে চলে গেলাম। বিলের সঙ্গে আমার দেখা হলো, আমি তার রান্না ঘরের কাউন্টারে বসে কুকি খেয়েছি, তার পরিবার পরিজনের সঙ্গে কাটিয়েছি বেশ কিছুদিন।

আব্বার সঙ্গে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ দিনের কথা জানালো বিল। প্রথমবর্ষে তাদের রুমে বিল কিনে এনেছিলেন একটি টেলিভিশন আর মুর্তজা কিনে এনেছিল একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। তারা দু'জনেই ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। গভীর রাত অবধি জেগে থাকতেন না। ঠিকমত ক্লাসে উপস্থিত হতেন। তারা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে কিংবা রুমে রাত ৮টা পর্যন্ত একটানা

www.pathagar.com

লেখাপড়া করতেন। এরপর তারা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে 'লায়ার ডাইস' কার্ড খেলতেন, গান শুনতেন, আড্ডা দিতেন। 'দ্য হার্ডার দে কাম' ছিল তাদের প্রিয় এ্যালবাম।

প্রতি সেমিস্টার শেষে দু'জনেই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতেন, বাড়ি যাওয়ার আগে পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া হতো যে, হোস্টলে আসার সময় নিজ শহরের পত্রিকা নিয়ে আসবে তারা।

হেমন্তের কিংবা বসন্তের ছুটি কাটিয়ে হোস্টেলে ফেরার সময় বিল নিয়ে আসতেন টেক্সাসের পত্রিকা এবং মুর্তজা সঙ্গে আনতো পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা।

বাকি বছরগুলো দু'জন একরুমে থাকতেন, মাঝে মাঝে অন্য কেউ হয়তো তাদের সঙ্গে থাকতে আসতো কিন্তু তাদের দু'জনের পরিবর্তন হতো না। সকলের সঙ্গেই মুর্তজার একটা ভালো সম্পর্ক থাকতো তবে রুমমেটের সঙ্গে ছিল তার বিশেষ সম্পর্ক।

বিল বলেন, 'তখন মুর্তজা ছিল ১৮ বছরের রাজনৈতিক সচেতন তরুণ।'

বিল এখন আমেরিকার চতুর্থ বৃহত্তম শহর হিউস্টনের মেয়র, ডেমোক্রাট দলের বিশিষ্ট নেতা। হার্ভাডে মুর্তজার সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার ঠিক ৩০ বছর পর তার সঙ্গে আমার দেখা হলো।

'তার একটা স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ ছিল, সেই সঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ। আমরা দু'জনেই দর্শনের দিক থেকে ভাববাদী এবং গণমুখী চিন্তা ধারণ করতাম। দু'জনেই রাজনীতিতে নামার প্রতীক্ষায় ছিলাম। অঢেল অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল না। সরকারি চাকরি নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতো, এ ব্যাপারে একটা দুর্বলতাও ছিল আমাদের। কিন্তু সে (মুর্তজা) জানত, তার বাবার জীবনেও এ রকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সে বুঝত, এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। সুতরাং সে যা হতে চায় তাই হতে হবে। তার আগ্রহই ছিল ইতিহাস, মতাদর্শ ও নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে।'

পরিবার পরিজন থেকে প্রথম প্রথম দূরে থাকতে গিয়ে তার আচরণ হতবিহবল একটা শিশুর মতো। হার্ভাডে লেখাপড়ার প্রথম বর্ষে মুর্তজার আরেকজন বন্ধু ছিল। তার নাম মিলব্রি। মুর্তজা সম্পর্কে প্রথম বাক্যেই তিনি বলেন, মুর্তজা এমন একজন মানুষ যিনি জানতেন তাকে জীবনের বড় কোনো জায়গায় যেতে হবে। অথচ সেটা কখনো তার আচরণে প্রকাশ পেত না। অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল মুর্তজার। চলাফেরায় খুব সাদাসিদে। হার্ভাডে অধ্যায়নরত অনেক শিক্ষার্থীর মতো উচ্ছৃঙ্খল কিংবা বদরাগি ছিল না মোটেই। বয়সে তরুণ কিন্তু উদাসীন গোছের। হার্ভাডে প্রথম ক্লাস করার দুই কিংবা তিন সপ্তাহ পরের একটা ঘটনা বলছিলেন মিলব্রি। 'একবার সিনেমা দেখতে যাচ্ছিলাম। মুর্তজা বলল, তার পোশাক-আশাকগুলো ময়লা হয়ে গেছে। আমি বললাম ওগুলো লন্ড্রিতে দিয়ে এস। মুর্তজা জবাবে বলল, আমি তো নিজে এর আগে পোশাক-আশাক লন্ড্রিতে দেইনি। আমি তাকে লন্ড্রিতে নিয়ে গিয়ে বললাম, তোমার সব পোশাক মেশিনের এখানে ঢোকাও, আর আমি মেশিনে পয়ষা ঢুকিয়ে গুড়ো সাবান নিয়ে আসলাম । কিছুক্ষণ পর সে চিৎকার করে বলল, 'এ তুমি কি করতে বললে, আমার জামা-কাপড় পানিতে ভিজে গেছে সেই সঙ্গে আমার জুতা জোড়াও।

এ সব কথা বলতে গিয়ে মুখে হাসি চেপে রাখতে পারছিলেন না মিলব্রি। মুর্তজা কাপড়

www.pathagar.com

ধোয়ার মেশিনের মধ্যে জুতাজোড়াসহ সব জামা-কাপড় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

মিলব্রির সঙ্গে শুটিং ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন মুর্তজা। মিলব্রি আমেরিকার টেক্সাস থেকে শুটিং শিখেছিলেন। অপরদিকে মুর্তজা লারকানায় তার পিতার সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে শুটিং শিখেছেন। তারা শুটিংয়ের অনুশীলনে মাঠে নামতেন, লালফিতায় ঘিরে রাখা হতো লক্ষ্যস্থল। মাঝখানে এক সেন্টিমিটারেরও কম ব্যাসের বৃত্তও ছিল সেই লক্ষ্যস্থল। খুব দক্ষ না হলে ওই লক্ষ্যস্থল ভেদ করানো সম্ভব নয়।

মিলব্রির জন্যও বেশ সময় লেগেছিল তাতে। মুর্তজা তার কানে কানে বলেছিল, এটা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন, এটাতো প্রকৃত খেলা নয়। এরপর তারা খেলাভঙ্গ করে চলে যায়। হার্ভাডে লেখাপড়ার সময় মুর্তজার বাড়তি কার্যকলাপগুলো খুবই সীমিত ছিল। বন্ধুরা তাকে মীর বলেই জানত। ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে সিনেমা দেখতে যেত বন্ধুদের সঙ্গে। তার বিশেষ আগ্রহ ছিল জেমস বন্ডের সিনেমাগুলো।

মুর্তজা একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় নিয়মিত খাবার খেতেন, সেখানে স্যান্ডউইচ ও স্নাকস খেতেন। রেস্তোরাঁটি ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকত। স্থানীয়ভাবে এটাকে কমদামি খাবারের রেস্তোরাঁ বলে বিবেচনা করা হতো।

হার্ভাডে ছোটভাই মুর্তজার সাথে বেনজির একবছর ছিল, বেনজির ছিল রেডক্লিফে এবং একবছর আগে এসেছে। তাদের দু'ভাইবোনের মধ্যে দূরত্ব না থাকলেও তাদের মধ্যে দূরত্ব হতে থাকে। ভাইবোনের মধ্যে আলাদা আলাদা বন্ধু ছিল। তবে তারা পরস্পরের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তবে, বেনজিরের জগতের বাইরে মুর্তজার অবস্থান ছিল। মুর্তজা তার ছোট বোন সনামের সঙ্গেই বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত।

হার্ভাডে মুর্তজার ভর্তি হওয়ার দু'বছর পর সনমও ভর্তি হয় সেখানে। শৈশবের মতই সনাম তার ভাইবোনদের মাঝে এসে পড়ে। সবাই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পায়। রাজনীতির প্রতি কোনো আগ্রহই ছিল না সনামের। খুবই সাদাসিধে ছিল সনাম।

তিন ভাইবোনের মধ্যে একান্ত বাধ্যানুগত হওয়ার দায় ছিল না তার। সকলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম সে। এমনকি ভাইদের বান্ধবীদের সাথেও। সেদিক থেকে বেনজির ছিল অহঙ্কারী ও একটু গম্ভীর টাইপের মানুষ। এমনকি তার সহপাঠিরা তার সে পরিচয় জানত। একটা অনগ্রসরতার ছাপ ছিল তার। ভাইয়ের নারী বন্ধুদের সে ভালো চোখে দেখত না। আমাদের চিঠিপত্রে, একবার আমি চিঠিতে বাবাকে তার পুরানো বান্ধবীদের সম্পর্কে জানাতে চেয়েছিলাম, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ওয়াদিকে জিজ্ঞেস কর সে তো আমার সব বান্ধবীকেই ঘৃণা করত।' মুর্তজার তিনজন রুমমেটের একজনের নাম ছিল পিটার। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তার বাবা প্রধানমন্ত্রী এটা না জানার আগে কখনোই তাকে দেখে তা মনে হতো না।' সে সময়ের কথা ভেবে এখনো অবাক হয়ে যান তিনি। তিনি বলেন, 'সে বাস্তবোচিত মানুষ, সব কিছুর ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারত। কখনোই রেগে যেত না, তবে রাগ পুষে রাখত বলে ধারণা হয়। আমার মনে হয় সে নির্দিষ্ট একটা দায়িত্ব অনুভব করত। যে দায়িত্ব অনেক বড় বিষয়ের।'

রমজানে রোজা রাখার কথা স্মরণ করলেন পিটার, ইতোপূর্বে কখনো মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হননি তিনি। মুর্তজা রোজা রাখলে বিস্ময়ের সঙ্গে পিটার প্রশ্ন করত, 'তুমি কেন সারাদিন পানাহার থেকে নিজেকে বিরত রাখছ?' তাকে পাকিস্তানি

www.pathagar.com

আদব-কায়দা অনুসরণ করতে দেখেছেন তারা। বিল তাকে জানিয়েছে যে, মুর্তজা পাকিস্তানি সঙ্গীতে খুবই আনন্দ পেতেন। এজন্য কোনো লজ্জাবোধ ছিল না তার। মুর্তজার আরেক বন্ধু মাগদা, কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রথম বর্ষেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় মুর্তজার। কমপ্যারাটিভ লিটারেচার বা তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করতেন তিনি। দেখতে ক্যাথলি টার্নারের মতো, কণ্ঠ, কণ্ঠের মুক্তার মালাটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠানামা করে তার। কিউবার বংশদ্ভুত, অংশত বাসক। একসঙ্গে নাচতে যেত তারা। মাগদা আমাকে বলেন, 'নাচ আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, কারণ আমি কিউবান, আমি নাচতে জানি। তোমার পিতা নাচতে পারত না।' বুক অবধি হাত উঠিয়ে উড়ার ভঙ্গিতে যন্ত্রের মতো নাচের ভঙ্গী করে মাগদা দাড়িয়ে আমাকে দেখালেন, 'তোমার পিতা গানের তালে তালে মাথা দোলাত আর এভাবে নাচতো। আমরা তামাশা করে বলতাম, এটা মীর নৃত্য।' তিনি আমাকে আরও বলেন, 'তোমার পিতা খুবই দয়ালু মানুষ ছিলেন। তার হৃদয়টা ছিল উদার।'

কলেজ জীবনের বন্ধুরা সকলেই আব্বার নিহত হওয়ার ঘটনায় দারুণ মর্মাহত হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সকলেই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আমি নাকি দেখতে আব্বার মতো, তবে তার চেয়ে লম্বায় একটু খাট এবং হাতগুলোও একই রকম। এ সব কথা বলতেন তারা – আব্বার বন্ধুদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে একটা জিনিস দেখেছি কীভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে সকলেই সেটা জানতে চাইত। প্রতিটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই এই একই বিষয় আসত। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তাম কিন্তু লোকজনের সামনে কখনোই নিজেকে প্রশ্রয় দিতাম না।

বৈঠকে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেও কান্না করতাম না। দুঃখের ব্যাথা বইতে আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আব্বা সম্পর্কে কয়েক সপ্তাহ ধরে সংগ্রহ করা বিষয়গুলো সবদিকে ছড়িয়ে দিতে হচ্ছে আমাকে। আমার আব্বার অতীতের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উদঘাটন করে আমি খুবই অনুপ্রাণীত হয়েছি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আমেরিকায় আব্বার বন্ধুরা ও তাদের পরিবার যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের সকলের সঙ্গেই- বেনজির এবং সনাম আমার দুই ফুফুর নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আমার ফুফুরা আব্বার গুরত্বপূর্ণ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা শুধুই মুর্তজার বন্ধু হিসেবেই সারা বছর জুড়েই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা ছিল তাদের কাছে। ক্রিসমাস ডে কিংবা শোকে পরস্পরের কাছে বার্তা পাঠান। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরও খোঁজখবর রাখেন। আর সেখানে আমি অচেনা মানুষের মত, ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বিষয় উদঘাটনের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি। আর কত দৌড়ঝাপ করে আমাকে এসব সন্ধান পেতে হয়েছে। একজন থেকে আরেকজন, একস্থান থেকে আরেক স্থান ছুটাছুটি করতে হয়েছে। আমি মোটেই পেশাদার লোক নই। নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে আনতে হচ্ছে। নিরপেক্ষ থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কোনো কিছু অন্ধকার রাখিনি। অনেকের সঙ্গেই পরিচয় ঘটেছে, তাদের অনেকেরই দরকার হয়েছে। নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছে। মিলব্রি আমাকে প্রথম দিন থেকে আপন করে নিয়েছিলেন। তার উষ্ণ হাসিমাখা আভ্যর্থনা ভুলবার নয়। আমার ফেসবুকে একটি আর্টিকেল পাঠিয়ে দেন তিনি।

www.pathagar.com

বিলের টেক্সাসের গভর্নর প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচরণায় তার সমর্থকদের তালিকায় আমার নাম ছিল। মাগদা আমাকে তার ইমেইল ঠিকানা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের কোনো ঘটনা ঘটলে তিনি ই-মেইল করেন। আবার তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলি, দেখা হলে সে আমার মাকে 'মীর নৃত্য' দেখাবে বলে ঠাট্টা করি।

* * *

হার্ভাডে মুর্তজা 'সরকার' বিষয়ে অধ্যায়ন করত। রাজনীতি বিষয়টি ছিল তার প্রধান। মুর্তজার সমাজবিজ্ঞান এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ও ছিল– এটাই তার প্রিয় বিষয়, যেটাকে 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ' বলে অভিহিত করা হতো। ইতিহাসও ছিল তার প্রিয় বিষয়। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস।

রবাট পার্লবার্গ ছিল মুর্তজার শিক্ষক। সদ্য নৌবাহিনীর চাকরি ছেড়ে টিচিং ফেলো হয়েছিলেন এবং ডক্টরেট করছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা কৌশল শীর্ষক একটি ক্লাস চলছিল। পার্লবার্গ এ সময় মুর্তজা সম্পর্কে বলেন, 'আমি যখন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া ছাত্রদের তালিকা পাই, সেখানেই মুর্তজার নাম দেখতে পাই।'

অধ্যাপক রবার্ট পার্লবার্গ এখনো হার্ভাডে শিক্ষকতা করছেন। তিনি বললেন, 'তখনই জেনেছি মুর্তজা একজন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, তবে তার বোন কলেজে থাকার সময় আমি শিক্ষকতায় আসিনি। কিন্তু মুর্তজার বোনের ঠোটকাটা কথাবার্তা, ধুর্ততা এবং গুরত্বপূর্ণদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার খ্যাতি ছিল। আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রথম যখন মুর্তজার সঙ্গে দেখা হয়, তখন পরিষ্কার বুঝে ফেলেছি যে, স্নাতকপূর্ব ক্লাসগুলোর বিষয়েই সে নিবেদিত। লেখাপড়ায় সে ছিল খুবই সিরিয়াস। কখনোই নিজেকে জাহির করত না। খুব অমায়িক মানুষ ছিলেন। আমি মনে করতাম, যাক আরেকজন ভালো ছাত্র পাওয়া গেল।'

বৈদেশিক নীতিতে মুর্তজার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হওয়ার প্রতি তার সবিশেষ মনোযোগ ছিল। একজন মার্কিন যুবকের কাছে ভিয়েতনাম যেমন তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবীতে যে নতুন স্বাধীন দেশগুলোর অভ্যুদয় ঘটতে থাকে স্নায়ুযুদ্ধ তার তালিকাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

অধ্যাপক পার্লবার্গ ইতোপূর্বে মার্কিন নৌবাহিনীর গোয়েন্দা শাখায় কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মুর্তজা তার খুব ভক্ত ছিলেন। ক্লাসের বাইরেও তারা দীর্ঘ সময় আলোচনা করতেন। অধ্যাপক জানালেন, তাকে একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদের মতই মনে হতো। তিনি আরও বলেন, 'মীর মানুষের সঙ্গে সহজেই মিশতে পারত এবং তাদের প্রতি মনযোগী হতেন। রাজনীতির সঙ্গে তার সামান্যই সংস্পর্শ ছিল। একটা মানবিক অনুভূতি ছিল মুর্তজার। কিন্তু হার্ভাডে অধ্যায়নকালে কখনোই নিজেকে রাজনীতিক হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না। মনে হতো সে যেন কিছু সময়ের জন্যই এখানে এসেছেন।'

হার্ভাডের আরেক অধ্যাপক উইলিয়াম গ্রাহাম। তিনি হার্ভাডে ধর্মশাস্ত্র পড়াতেন। বর্তমানে ওই অনুষদের ডিন। জাতিতে ইংরেজ। মুর্তজাকে 'ইসলামিক সভ্যতা' বিষয়ে

www.pathagar.com

পড়াতেন তিনি। গ্রাহাম বলেন, 'আমার মনে হয়েছে আমি একজন সাদা চামড়ার লোক ইসলামের ইতিহাস পড়াচ্ছি বলে মুর্তজা আমার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হয়।'

তিনি বলেন, 'ইসলাম সম্পর্কে মুর্তজার পাকিস্তানের বাইরে তার জানার খুব উৎসাহ ছিল। আফ্রিকার দেশগুলোতে ইসলামের বিষয়ে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না।'

একবার পরীক্ষার খাতার ইসলামিক সভ্যতা বিষয়ে কম নম্বর পেয়েছিল মুর্তজা। এতে সে 'বি' গ্রেড পায়। খাতায় সে লিখেছিল 'ইসলাম একটি সমাজ ব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা, একটা চিন্তাধারা এবং একটা শিল্প।' বার্নাড লুইসের কাছ থেকে তিনি এ উদ্ধৃতি দেন।

মুর্তজার আগ্রহের আরেকটি বিষয় ছিল, 'ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং সরকার।'

তিনি মানচিত্রের নিচে লিখে লেখেছিলেন, 'আমাদের প্রিয় নবী একাধারে ধর্মীয় নেতা একই সঙ্গে আইন প্রণেতা, প্রশাসক এবং বিচারক।' মানচিত্রটিতে ছিল সাহারা মরু থেকে দক্ষিণ তুরস্কের পর্বতময় এলাকা। শুরুর দিকে এলাকাটি ইসলামিক দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পেন্সিলে এ ধরনের মন্তব্যের পর তিনি সেখানে আরও লিখেছেন, একটা ভালো লেখা সাধারণ বিষয় থেকে বাস্তবের মধ্যে এসে ধরা দেয়।

প্রফেসর গ্রাহাম বলেন, 'ক্লাসে কিংবা ক্লাসের বাইরের যে কোনো আলোচনায় মুর্তজা কখনোই নিজের পরিচয় বলতে চাইত না।' তার দুই বোন যে প্রায় একই সময়ে হার্ভাডে পড়াশুনা করছে সেটা ওই অধ্যাপক সাহেব জানতেন। তারপরেও মীর নিজের পরিচয়ে মীর নামেই পরিচিত ছিলেন। এটা তার খুবই আকর্ষণীয় দিক।

ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে মীরের কোনো আত্মগম্ভীর ভাব ছিল না। নিজেকে জাহির করত না। কারো তদ্বিরে সে আমার কাছে আসেনি। আগ বাড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করত না, কিন্তু যখন তার সঙ্গে কথা বলা হতো, তখন নিজেকে প্রকাশ করত। খুবই আন্তরিক, সামাজিক এবং সহজে কথা বলা যায় তার সঙ্গে। ক্লাসে সচরাচর তার রাজনৈতিক ও পারিবারিক যোগাযোগের প্রকাশ ঘটত না। একান্ত প্রয়োজনের খাতিরে সে পরিচয় মিলত। পাকিস্তানের একজন রাজনীতিকের পুত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। যারা তার বাড়ির খবরাখবর জানতেন তারা ক্লাসের মুর্তজাকে সে পরিবেশে দেখেননি। এ সব ব্যাপার নিয়ে কখনো কখনো হাস্য রসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি হতো। ১৯৭৫ সালের বসন্তে অধ্যাপক পার্লবার্গ মুর্তজা সম্পর্কে এমনই একটা ঘটনা বললেন।

ওই সময় কিছুদিন ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলেন মুর্তজা। তার বন্ধুরা এবং অনুরাগীরা 'মিস্' করছিল তাকে। পরবর্তীতে ক্লাসে আসলে সকলেই তাকে ঘিরে ধরে। অনুপস্থিতির কারণ জানতে চায় তারা। মুর্তজা অধ্যাপকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, কিছুদিনের জন্য নগরীর বাইরে গিয়েছিলেন তিনি।

কোথায় গিয়েছিলে তুমি? অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন মুর্তজাকে। মুর্তজা জবাব দিলেন, ওয়াশিংটনে।

: তুমি সেখানে কী করছিলে?

: আমি সেখানে রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় অংশ নিতে গিয়েছিলাম।

অধ্যাপক মনে করেছিলেন মুর্তজা বুঝি মজা করার জন্য এসব কথা বলছেন। পরে তিনি জানতে পারেন তদানিন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট গেরাল্ড ফোর্ডের আমন্ত্রণে পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ওয়াশিংটন সফরে গিয়েছিলেন। তারই সম্মানে হোয়াইট

www.pathagar.com

হাউজে রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফোর্ডের সঙ্গে জুলফিকারের ভালো বন্ধুত্ব ছিল। এ খবরে যেন অধ্যাপক পার্লবার্গ কৌতূহলের কৌটা খুললেন। ছাত্ররা লাফিয়ে উঠল, এক ছাত্র ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে উঠল, প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের কন্যা, যার সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি ছিল, সে খুব ভালো নাচতে পারে কি-না। মুর্তজা জবাবে বললেন, হ্যাঁ সে খুব ভালো নাচতে পারে, তবে আমার মতো নয়।

পার্লবার্গ এসব কথা বলার সময় মুখে হাসি চেপে রাখতে পারছিলেন। এ রকম অনেক হাস্য রসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি হতো তাকে নিয়ে।

নিক্সনের শাসনামলেও একবার রাষ্ট্রীয় সফরে হোয়াইট হাউজ গিয়েছিলেন মুর্তজা। সে সময় ছিল মুর্তজার ২০তম জন্মদিন। এ কথা জানতে পেরেছিলেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। এ সময় একটি পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে নিক্সন গেয়ে উঠেছিলেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ মুর্তজা।' এটা ছিল মুর্তজার ২০তম জন্মদিন। সেই গল্পটি মুর্তজা নিজের জন্যই রেখে দিয়েছিলেন।

* * *

হার্ভাডের শেষ দিনগুলোতে মুর্তজা আরও উচ্চতর গবেষণার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক পার্লবার্গের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন তিনি। এটা হতো তার কঠোর পরিশ্রমের সময়। 'পাকিস্তান এবং নিরাপত্তা ইস্যু' বিষয়ে গবেষণা করতে চেয়েছিলেন মুর্তজা। পার্লবার্গ জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আলোচনা করতে তার পিতার কথা একবার চলে এসেছিল। পার্লবার্গ বলেন, 'আমি খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। এ ব্যাপারে লিখতে প্রচুর তথ্যের প্রয়োজন। এ সকল তথ্য সরকারের গোপন নথিতে থাকে। যা কখনোই প্রকাশ্যে পাওয়া যায় না। মুর্তজা বলল, আগামী গ্রীষ্মে সে বাড়ি যাবে এবং দরকারি তথ্য সে নিয়ে আসবে।'

হার্ভাডের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স'র আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এসোসিয়েট হিসেবে মুর্তজার আবেদন অনুমোদন করল। তার সেই অনুমোদনপত্রটি ইস্যু করা ছিল ১৯৭৫ সালের ১৯ নভেম্বর। গবেষণার দিক-নির্দেশনাও ঠিকঠাক করে দেওয়া হল। সেন্টারের ফেলো হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম সিনিয়র শিক্ষার্থীর ভাগ্যে জোটে। তার অর্থ, সেন্টারের গবেষণার জিনিষ-পত্র-তথ্যের অবাধ সুযোগ পাওয়া, সাধারণত এ ধরনের সুযোগ সকলের ভাগ্যে জোটে না।

মুর্তজার গাইড হিসেবে যাকে দেওয়া হলো তিনি ছিলেন মার্কিন সরকারের উপদেষ্টা। বাড়িতে লেখা চিঠিতে মুর্তজা বলেছে, তার জন্য যে উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাকে 'ভিয়েতনামের কসাই' বলে সকলেই উপহাস করে। তার আসল নাম স্যামুয়েল হান্টিংটন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় তিনি সরকারি বাহিনীর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তার পরামর্শেই গুচ্ছ গ্রাম করা হয়, সে দেশের বেসামরিক নাগরিকদের ভিয়েত কং গেরিলাদের থেকে পৃথক করার জন্য। তবে এই নয় যে, বেসামরিক নাগরিকদের বোমা মারার সুবিধার জন্য। ২০০৬ সালের বসন্তে যখন আমি ক্যামব্রিজে যাই তখন হান্টিংটন বয়সের ভারে ন্যূজ। পরনে ছিল নীল রঙের পশমী সোয়েটার, স্টারবাক স্প্রেসো কাপে করে

www.pathagar.com

কোকাকোলা পান করছিলেন তিনি। চামড়ার গদির চেয়ারে বসে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন ।

হান্টিংটন আমাকে বললেন, মুর্তজাকে ছাত্র হিসেবে মোটামুটি জানতেন তবে ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়।

যখন আমি তাকে বললাম, আপনার কাছে তো একটা সিনিয়র থিসিস করেছিলেন সে। আর তাতে অনার্স পেয়েছিল মুর্তজা।

আমি জানালাম মুর্তজা মেজর থিসিস তার তত্ত্বাবধানে করেছেন। মুর্তজা সেই থিসিসে অনার্স পেয়েছিলেন। হান্টিংটন মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ তাই নাকি, খুব ভালো কথা, কাজটির সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাকে সুখী মনে হলো। তিনি জানালেন মুর্তজা তার সাথে মাঝে মধ্যেই দেখা করতেন তার থিসিস নিয়ে আলোচনা করার জন্য। বিশেষ করে মুর্তজার এই থিসিসটি যেটা সে লিখেছিলেন 'আণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে, আমরা আলোচনা করেছি মাঝে মধ্যেই এবং তাকে আমি প্রচুর উৎসাহ দিয়েছি এ বিষয়ে।'

আমার তখন মনে হলো, নিশ্চয়ই তিনি তা করবেন, আপনি হলেন স্যামুয়েল হান্টিংটন। আণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়টির কাজে তিনিই তো উৎসাহী হবেন এবং আমার মনে হয়েছে নিশ্চয়ই হান্টিংটন এই কাজে প্রচণ্ড তাগিদও অনুভব করেছেন।

তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন তাদের দু'জনের আলোচনা, তিনি বললেন আমাদের মধ্যে অনেক 'মনোমুগ্ধকর' আলোচনা হয়েছে (হতেই হবে)। আমাদের মধ্যে ভিয়েতনাম নিয়েও অনেক কথা হয়েছে, 'কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না সে কি বলেছিল বা আমি কি বলেছিলাম,' (ভালো কথা) তিনি জানতেন এই তরুণ ছাত্রের পরিবারিক বিষয়ে, কিন্তু এই পারিবারিক বিষয়টি ছাত্র হিসেবে তাকে প্রভাবিত করেছিল বলে তার মনে হয়নি।

আমি হান্টিংটনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার পিতার কাজ সম্পর্কে তার কিছু মনে আছে কি-না?

তিনি বললেন, 'আমার যতদূর মনে পড়ে তার থিসিসটি ভালো হয়েছিল।' কিন্তু এর বেশি কিছু মনে করতে পারলেন না। তার সাথে কথা বলা কঠিন, আমরা যে এগার মিনিট কথা বললাম, তার অধিকাংশ সময় তিনি আমার দেওয়া লিখিত নোট পর্যবেক্ষণ করছিলেন, আর আমি লক্ষ্য করেছি উনি আমার বিষয়ে লেখা কাগজটিতে চোখ বুলাচ্ছিলেন। এরপর কাধ ঝাকিয়ে বললেন, 'জানো, আমার স্মরণশক্তি একেবারেই দুর্বল।'

মুর্তজা সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন তার থিসিসের কাজে- গবেষণা ও লেখায়। মুর্তজার হার্ভাডের আর একজন রুমমেট ববি কেনেডি জুনিয়র বললেন, মুর্তজা হার্ভাডে এসে প্রচণ্ড খেটেছেন, কারণ তার প্রধান থিসিস ছিল পাকিস্তানের আণবিক বোমা অর্জন। জুনিয়র ববি কেনেডির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল নিউইয়র্কে এক রেস্তোরাঁয়। আমার এই লেখা রিসার্সের অধিকাংশ ইন্টারভিউ হয়েছে রেস্তোরাঁয়। তাই আমার খাওয়াও হয়েছে যথেষ্ট। ববি কেনেডি জুনিয়র বললেন, 'প্রায় প্রত্যেকেই এই আণবিক বোমা অর্জনের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু মুর্তজা যথেষ্ট যুক্তি দিয়েই তার কথাগুলো বলতেন।'

শেষ পর্যন্ত 'অ্যা মোডিকাম অব হারমোনি', ঐকতানের কিয়দংশ সুন্দর বাধাই করা থিসিসে পাকিস্তানে আণবিক শক্তি অর্জনের যুক্তি-তর্ক, পাকিস্তান ও এই অঞ্চলে নিরাপত্তা বোমা- পাকিস্তানের আণবিক দাতাত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমাপ্ত হয়। মুর্তজা র যুক্তি ছিল

www.pathagar.com

পাকিস্তানের বোমা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে ও এই অঞ্চলের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা হবে। পাকিস্তানের আণবিক শক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হবে না বরং ভারতের একক অর্জনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে সেখানে সাম্য আসবে।

মুর্তজা তার থিসিসের কিছু অংশ তার পিতাকে পাঠিয়েছিলেন পড়ার জন্য, নুসরাত এই বিষয়ে লিখেছেন,

> 'থিসিসটি পড়ে তোমার আব্বার মনে হয়েছে, ছেলে তার বড় হয়েছে কত ভালো তুমি লিখেছো এবং আমার (নুসরাত) মনে হয়েছে তুমি আমার ক্ষুদ্র শিশুটি আর নও। আমি অচেতনভাবে সবসময় মনে করে এসেছি, তুমি আমার ছোট খোকাটি, এখন মনে হচ্ছে তুমি একটি পূর্ণ পুরুষে পরিণত হয়েছো, আমার পরিণত বয়স্ক পুত্র। উফ্ আমি জানি না আবেগে তাড়িত হয়ে কি লিখছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি অনেক অনেক। তোমার সুখী ও সুন্দর জীবন কামনা করি এবং কামনা করি শতবর্ষের দীর্ঘায়ু হও।'

জুলফিকার ছেলেদের কড়া শাসনেই রাখতেন, আর নুসরাত তার সকল সন্তানদের আদব-আহ্লাদ করতেন। নুসরাত যখন ছেলেমেয়েদের কাছে পেতেন, পরিবেশ পরিস্থিতি তোয়াক্কা না করে আবেগে আপ্লুত হতেন কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করতেন না। জুলফিকার সকল সময়ই প্রটোকল মেনে চলতেন।

মুর্তজা কলেজে পড়ার সময় তাকে তার মাতা বিভিন্ন রাজনৈতিক লেখা পেপার কাটিং পাঠাতেন দু'-এক মাস পরপর।

মতামত দেয়ার জন্য তিনজন কলেজ রিডার 'অ্যা মেডিকাম অব হারমোনি' পড়েন। প্রথমজন মন্তব্য করেন, 'দারুণ উদ্দীপক' এবং 'সুলিখিত'। রাজনৈতিক দর্শন, প্রধানত হবস, রুশো এবং ম্যাকিয়াভেলি'র মতবাদের সাথে বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক সঙ্কট ও আণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে এর আগে খুব কমই লেখা হয়েছে। থিসিসটিতে যথেষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং চিন্তা করার উপাদান রয়েছে।

দ্বিতীয় রিডার অতটা তৃপ্ত হননি। মিখায়েল নগ কুইনের মনে হয়েছে, পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র উৎপাদনে যাওয়া উচিত বলে থিসেসে মন্তব্য করা হলেও কিন্তু সে (পাকিস্তান) এখন পর্যন্ত কেন করেনি সেটা যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়নি।

তৃতীয়জনের মতামত ছিল মাঝামাঝি। তিনি পেয়েছেন, থিসিসটি যথেষ্ট যুক্তিপর্ণ ছিল। আণবিক নিরস্ত্রীকরণ দাতাত বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য রাখায় একটি ভূমিকা হয়তো রাখতে পারে, বিশেষ করে পাক-ভারতের সমস্যার ক্ষেত্রে, তবে এর দায়-দায়িত্ব লাগবে অনেক উঁচু স্তরের। আর এই আঞ্চলিক বিষয়ে দাতাত কি কাজে আসবে, তার ব্যাখ্যা এই থিসিসে অতি সরলীকৃত ও তাত্ত্বিকতাপূর্ণ।

যতই এই থিসিসকে সমালোচনা করা হোক না কেন, এই থিসিসটি উচ্চ মার্ক পায় এবং মুর্তজা কে অনার্স দেওয়া হয়। মুর্তজার সাফল্যের খবর শুনে জুলফিকার ওয়েস্টার্ন

www.pathagar.com

ইউনিয়নের মাধ্যমে টেলিগ্রাম পাঠালেন। তারিখ ১৬ জুন। ভিষণভাবে উত্তেজিত ও দ্রুত লেখা সেই টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামের একটি শব্দও সঠিকভাবে ছিল না।

তোমার মা, আমরা সকলেই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমার এই সফলতায়। নিশ্চয়ই এটা তোমার পড়ায় মনোযোগ ও শ্রমের ফল। তোমাকে আরো সফল দেখতে চাই সামনের বছরগুলোতে। তোমার প্রিয় আব্বা

মুর্তজা ১৯৭৬ সালে হার্ভাড থেকে গ্রাজুয়েট হলেন, শতকরা প্রথম পনের জনের মধ্যে একজন হয়ে।

www.pathagar.com

৬

১৯৭৬ সালের হেমন্তে মুর্তজা ইংল্যান্ডে চলে গেলেন। সেখানে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অক্সফোর্ডে ভর্তি হলেন। সেখানে রাজনীতি দর্শন এবং অর্থনীতির বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ২৮ নভেম্বর তাকে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লেখা হয়। অর্থনীতির বিষয়ে আরও প্রস্তুতিমূলক পড়াশুনায় অঙ্কের উপর দক্ষতা অর্জন করতে বলা হয়। ডিগ্রির জন্য অঙ্ক নিয়ে এই ঝামেলা ছিল ভুট্টো পরিবারের জন্য আনন্দের ব্যাপার। কারণ ওই ঝামেলা পরিবারের জন্য একটা ঐতিহ্যের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অক্সফোর্ডে এসে আবারো মুর্তজা বড় বোন বেনজিরের কাছে এসে পড়লেন। এরা এক বছর পর পর হার্ভাড থেকে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়েছেন। সনামও ভর্তি হয়েছে অক্সফোর্ডে। তারা সকলেই এক স্থানে থাকলেও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বন্ধুমহল ছিল। তারা পরস্পরের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। বেনজির যখন বিদেশে বা দূরে যেতেন পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতেন ভাইয়ের কাছে। ১৯৭৪ সালে ভাইয়ের কাছে লেখা একটি পোস্টকার্ডে বেনজির লিখেছেন,

'একজন জ্যোতিষি আমাকে বলেছে, ২৭ বছর পূর্ণ হলে বিদেশ বিভুয়ে আমার বিয়ে হবে। একটি খামার বাড়িতে ভেড়া এবং গরু চরাতে হবে আমাকে। চিঠির শেষে বি বি লেখা। আরেকটি চিঠি লিখেছিল নিউজিল্যান্ড থেকে। তখন মুর্তজা অক্সফোর্ডে আসেনি। 'আমাকে কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী মিশেল ফুটকে আমার ছোট্ট স্পোর্টস কারে করে নিয়ে যেতে হয়েছে।' সে কথাও লিখেছিল চিঠিতে। নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিলেন বেনজির পিতা-মাতার সাথে রাষ্ট্রীয় সফরে।

নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে বেনজির লিখেছেন,

'নিউজিল্যান্ড একটি চমৎকার জায়গা এবং সেখানে আমি অনেককেই পেয়েছি খুবই মুগ্ধ হওয়ার মতো। ওই মানুষদের একনজরে মনে হয়েছে প্রলুব্ধবতার।' শ্রীলঙ্কা থেকে, কানাডার একজন ড্যান্সারের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে লেখা আরেক চিঠিতে বেনজির লিখেছেন, 'আব্বা যেন না দেখে তাই আমি যখন গতকাল রাতে এক পার্টিতে সিগারেট খাচ্ছিলাম তখন শ্রীলংকার তিন মন্ত্রী আমাকে আড়াল করে রাখেন।' প্যারিস থেকে লেখা চিঠিটা ছিল অন্যতম। 'আম্মার কারণে আমাকে লুভেতে একঘণ্টা হাঁটতে হয়েছে। তবে আমার ভের্সিলি ভালো লেগেছে। আমার জন্মদিনে আমি এটা পেতে পারি।
ইতি পিংকি।'

www.pathagar.com

মুর্তজা অক্সফোর্ডে পৌছলেন অক্টোবর মাসে। ক্রিস্ট চার্চের ডিন তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন, একজন তরুণ আমাদের এখানে পৌছেছেন। তার সম্পর্কে সকল তথ্য গোপন রাখা হবে। তার আবাসিক ঠিকানা হল বাড়ি নং-২, ব্রিউয়ার স্ট্রিট। সিদ্ধান্ত হল যে, তার থাকার ঠিকানাটি প্রকাশ করা হবে না। তিনি মুর্তজার ঠিকানা প্রচার না করতে এবং সে যে ওই কলেজের ছাত্র সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ না করার নির্দেশ দিলেন। এ সম্পর্কে একটি বিশেষ নোটে বলা হলো, 'অক্সফোর্ডে মুর্তজার থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।' প্রতিদিন একই সময়ে একই রাস্তায় চলাফেরা থেকে তাকে নিষেধ করা হল।

গ্রীষ্মে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করল। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছিল এবং জুলফিকার বিরোধীদলকে মোকাবেলা করার সবধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। বিরোধীপক্ষ নতুন জোট গঠন করে নির্বাচনে নামার জন্য তৈরি হয়েছে। ঠিক এ সময় জেনারেল জিয়া সামরিক আইন জারি করে। ১৯৭৭ সালের ৪ জুলাই নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলে ঘোষণা করলেন। ৯০ দিনের মধ্যে দেশে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে 'নিরাপত্তা হেফাজতে' রাখলেন। জিয়া টেলিভিশনে ঘোষণায় এসব কথা জানালেন।

কয়েক সপ্তাহ পর জুলফিকারকে মুক্তি দেয়া হল, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণার সব বন্দোবস্ত করলেন। বড় বড় সমাবেশ করলেন। তার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের জন্য সামরিক জান্তাকে সমালোচনা করলেন। লাখ লাখ লোক জমায়েত হতে শুরু করল তার সমাবেশে। ক্ষমতায় থাকার সময়ে যতটুকু জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল, তা আবার পূরণ হতে শুরু করেছিল। জুলফিকার বিরামহীনভাবে কাজ করতে থাকেন। জেনারেল জিয়া উপলব্ধি করলেন জুলফিকার দমবার পাত্র নয়। নির্বাচনকে ঢিলেঢালাভাবে গ্রহণ করবেন না তিনি। তাকে আটক করা হলেও নির্বাচনে তাকে হারানো দুঃসাধ্য।

জেনারেল জিয়া বলতে শুরু করলেন, হয় আমি নয়তো সে (জুলফিকার), 'দুইজন মানুষ একটা কফিন।' গ্রীষ্মে মুর্তজা করাচিতে চলে আসলেন। তখনও অক্সফোর্ডের প্রথম বর্ষের ছাত্র সে। এ সময়েই তার পিতা গ্রেফতার হলেন। আটক অবস্থা থেকে তার পিতা বার্তা পাঠালেন, 'লারকানায় যাও এবং নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করো।'

মুর্তজা বার্তা পেয়ে লারকানার পারিবারিক নির্বাচনী এলাকায় চলে আসলেন, সঙ্গে থাকল ভাই শাহনেওয়াজ। ওই সময় মুর্তজার বয়েস মাত্র ২৩ বছর। জুলফিকারের মত দৃঢ়ভাবে কাজ শুরু করলেন। জুলফিকার ও তার উকিল আইনী লড়াই চালালেন। মুর্তজা বাবার জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চালালেন। স্থানীয় কৃষক এবং এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে গণসংযোগ শুরু করলেন। বাবার প্রথম নির্বাচনের সময় যাদেরকে নিয়ে ভোটযুদ্ধে নেমেছিলেন, তাদের সকলের সঙ্গেই কাজ শুরু করলেন মুর্তজা।

এদিকে সামরিক সরকার অনেককে মুক্তি দিতে এবং অনেককে গ্রেফতার করতে শুরু করলেন। জুলফিকারের বিরুদ্ধে হত্যা-ষড়যন্ত্রের মামলা চাপানো হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে বিরোধীদলের নেতা আহমদ রেজা কাসুরিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। বছর তিনেক আগে কাসুরির গাড়িতে একদল বন্দুকধারী হামলা চালায়। হামলায় গাড়িতে

www.pathagar.com

থাকা কাসুরির বাবা নিহত হন। তিনি ওই হামলার জন্য সরকারকে দুষতে থাকেন।

কাসুরি এক সময়ের পিপিপির জাদরেল নেতা ছিলেন। হামলার কিছুদিন পর নিজের দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন তিনি এবং পুনরায় পিপিপিতে যোগ দেন। জিয়ার সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর কাসুরি সেনা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জুলফিকারের বিরুদ্ধে ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য মামলা দায়ের করেন। এ মামলাটি স্পর্শকাতর কিন্তু দুর্বল, তবে হত্যা মামলায় যে কারো ফাঁসি হতে পারে এমনকি প্রধানমন্ত্রীরও। কাসুরির সাহায্যে সামরিক সরকার জুলফিকারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে।

মুর্তজা যখন লারকানায় পৌঁছলেন তখন জুলফিকার কারামুক্ত এবং শেষবারের মত মুক্ত বাবাকে দেখেন সবেমাত্র তিনি লাহোর থেকে লারকানায় এসেছেন। দু'দিন যাবৎ জুলফিকারের চোখে ঘুম নাই। মহেনজোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণের বিষয়ে নিরলস কাজ করে চলেছেন গুডু। ভুট্টোর বসত বাড়ি থেকে মহেনজোদারো মাত্র ৩০ মিনিটের পথ। নুসরাতই তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন। যেন একই সঙ্গে মুর্তজার সঙ্গ দিতে পারেন। একদিন মাঝরাতের পর ঘুম ভেঙে গেলে গুডু বাথরুমের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেন কোথা থেকে যেন ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সাধারণত পরিচিত শব্দ নয় এগুলো। মুর্তজা ঘুম থেকে উঠে কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন। এই আওয়াজ সে আওয়াজ নয় যা শুনে তারা অভ্যস্ত- জনতার কোলাহল চিৎকার এবং স্লোগান । এই আওয়াজ ভিন্ন আওয়াজ। ঘরের জানালা খুলে দেখতে চেষ্টা করেন গুডু। সে দেখল বাড়ির চারপাশ সামরিক পোশাকধারীরা ঘিরে ফেলেছে।

গুডু আতঙ্কিত হলেন, দৌড়ে গেলেন মুর্তজার কক্ষে, তাকে জানালা দিয়ে কী ঘটছে দেখার অনুরোধ করলেন। মুর্তজা খুব শান্ত এবং ধীর স্থির ছিলেন তখন। সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ করলেন। দু'জনেই তার বাবার কাছে পৌঁছে দেখলেন একজন সেনা কর্মকর্তা জুলফিকারের পাশে দাঁড়িয়ে। সেনা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলতে থাকলেন, 'দুঃখিত সাহেব, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

> মীর, শাহ এবং গুডু তখন বাড়িতে একা। গুডু সে রাতের কথা স্মরণ করে বলেন, 'আমরা সারারাত জেগে ছিলাম। জামাকাপড় গুছিয়ে সকাল হলেই মহেনজোদারোতে আমার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বাদ দিয়ে সে স্থান ছেড়ে চলে গেলাম। মীর একটু ভয় পেয়েছিল, জুলফিকার যাওয়ার আগে তাকে কিছু একটা বলে গেলেন। এটা তাদের কোনো বিশেষ কথা হবে। সকালের দিকে মীর বিমানযোগে মা নুসরাতের সঙ্গে দেখা করতে রাওয়ালপিণ্ডি গেলেন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে মায়ের সঙ্গে দেখা হল পুত্রদের। গ্রেফতারের খবর শুনে তিনি অসুস্থ এবং ভীত হয়ে পড়েছেন। জুলফিকার জুলাইয়ের প্রথমবার গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই নুসরাত রাতে ঘুমুতে পারেন না। স্বামীকে গ্রেফতার করতে বেডরুমের দিকে আসা ভারী বুটের আওয়াজ প্রায়ই তাকে ভীত করে রাখে। ছেলে-মেয়েদের আগলে রাখতে চান তিনি। তখন থেকেই কান বন্ধ করে রাখতেন। ঘরের দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে রাখতেন,

www.pathagar.com

যাতে ভারী বুটের আওয়াজ আর না শোনা যায়। সে আওয়াজ শুনে ঘুমের মধ্যে আৎকে উঠতেন তিনি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মুর্তজা এবং শাহনেওয়াজ এর পাকিস্তানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

সামরিক জান্তা জুলফিকারের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক মামলা দায়ের করতে পারেনি। বরং ব্যক্তিগত মামলাই দায়ের করেছিলো। তাকে ঘিরে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। জুলফিকার তার ছেলেদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য বার্তা পাঠালেন। দু' ছেলেকে বিদেশ পাঠাতে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা করতে এক বন্ধুকে অনুরোধ করলেন।

যদি সম্ভব হয়, আইনগতভাবেই তাদের দেশের বাইরে পাঠানোর কথা বললেন, নয়তো ভিন্ন কোনো ব্যবস্থায় সে কাজ করতে হবে বলে জানালেন তিনি। জুলফিকারকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে উচ্ছেদ করতে চাইলে পরবর্তী টার্গেট হবে তার ছেলেরা। মুর্তজা যুক্তি দিয়ে এ বক্তব্য খণ্ডন করতে চাইলেন, কিন্তু জুলফিকারের জবাবই চূড়ান্ত থাকল।

মুর্তজা অক্সফোর্ডে ফিরে চলে গেলেন আর শাহনেওয়াজ গেলেন সুইজারল্যান্ডে তার কলেজে। কিন্তু সেখানে বেশি দিন থাকা হল না তাদের। দু'ভাই মিলে বাবার জীবন রক্ষায় আন্তর্জাতিক প্রচারণায় নেমে গেলেন। 'ভুট্টো জীবন রক্ষা কমিটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হল, লন্ডন থেকে সেটি পরিচালনা হতে শুরু করল। কখনো মায়ের সঙ্গে, কখনো নিজেরা, কখনো পিপিপি'র নেতাদের সঙ্গে, কখনো একা একা কাজ শুরু করলেন। মা থাকতেন পাকিস্তানে তার মেয়েদের নিয়ে।

দু'ভাই একটি কূটনৈতিক মিশন গড়ে তুললেন। লিবিয়ার নেতা জুয়াম্মার গাদ্দাফী ছিলেন ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তারা ত্রিপলিতে গিয়ে গাদ্দাফীর সঙ্গে দেখা করলেন। গাদ্দাফী তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। এমনকি মুর্তজা ও শাহনেওয়াজকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার জন্য রাজি হলেন তিনি। জিয়ার সামরিক সরকার পাকিস্তানের ক্ষমতায় জেকে বসতে শুরু করল। জেনারেল জিয়া পাকিস্তান সফরের জন্য বহুবার গাদ্দাফীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, গাদ্দাফী প্রতিবারই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটা করেছিলেন শুধু জুলফিকারের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কারণে। তখনও লিবিয়াতে বহু পাকিস্তানি অবস্থান করছিল।

মুর্তজা এবং শাহনেওয়াজ ছুটে গেলেন বৈরুতে, সেখানে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের একজন ফিলিস্তিনি বন্ধু এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইয়াসির আরাফাত জানালেন, ভুট্টোর কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি আরও জানান, মক্কায় হজ করার সময় জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, জিয়া কাবা ঘরের সামনে কথা দিয়েছেন তিনি কখনো জুলফিকারের ক্ষতি করবেন না। দু'ভাই ফ্রান্সের গিসকার্ড দ্য ইসটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গিসকার্ড জুলফিকারের জীবন রক্ষার জন্য জিয়ার কাছে কড়াভাবে বার্তা পাঠালেন। জাতিসংঘের মহাসচিব কুট ওয়াইলহাইম, পোপ, সিরিয়ার নেতা হাফেজ আল আসাদ সহ অনেকেরই সমর্থন আদায় করা হয়।

মুর্তজার বয়স তখন ২৩, শাহনেওয়াজের ১৯। দু'জনেই কঠোর পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সংবাদ সম্মেলন, বিদেশের পাকিস্তানি দূতাবাসের ওপর চাপ সৃষ্টি, সাংবাদিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা, বিদেশের অভিবাসী

www.pathagar.com

পাকিস্তানি কমিউনিটিকে সংগঠিত করা এসব কাজ নিরলস করেছিলেন। পাকিস্তানে '৭৩-এর সংবিধান পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলছিলেন তারা। দু'ভাই এসবের মধ্যেও পড়ালেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নিজেদের পাঠ চিঠিপত্র, টেলিফোনের মাধ্যমে আদান প্রদান করেছিলেন। তখনতো বয়সে দুজনেই তরুণ। এদিকে আরাফাতকে দেয়া জিয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে চিন্তিত হলো দু'ভাই। তারা বয়সে তরুণ, এত অল্প বয়সে এ ধরনের নিম্নরুচির সঙ্গে পরিচিত নন।

ভাই শাহনেওয়াজকে ছাড়াই সফরে বেরিয়ে পড়লেন মুর্তজা। সফরসঙ্গী হিসেবে থাকলেন পাঞ্জাবের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী ভুট্টোর সহযোগী মোস্তফা খার।

এ সময় মোস্তফা খার দীর্ঘ জীবনের সকল গল্প জানেন মুর্তজা। মোস্তফা খার নিজের পারিবারিক বই লিখেছেন স্ত্রী ফাতেমা দুররানি এবং সেখানে তাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে বর্ণনা রয়েছে। মোস্তফা খার প্রতিদিন সকালে যোগব্যায়াম করতেন। অন্তত আধাঘণ্টা যোগ ব্যায়াম না করে তিনি ঘর থেকে বেরুতেন না। তখন যোগ আসনের সময় শারীরে কোনো পোশাক আশাক রাখতেন না। রীতিমত বিবস্ত্র হয়ে ব্যায়াম করতেন। প্রতি সকালে মুর্তজা অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ না মোস্তফা খার যোগ ব্যায়ামের পর্ব শেষ হওয়ার। এভাবে প্রতিদিন একঘেয়েমি অপেক্ষা ছিল বিরক্তিকর।

একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল, মোস্তফা খার হোটেল রুমে 'এখন বিরক্ত করবেন না' লেখাটি সরিয়ে সেখানে মুর্তজা 'আমার রুম পরিষ্কার করুন' লেখাটি ঝুলিয়ে দিলেন। মুর্তজা হোটেলের করিডোরে অপেক্ষা করছিলেন, হাউস কিপার এসে রুমের দরজায় লেখাটি দেখে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। হাউস কিপার ছিলেন মহিলা, ভেতরে ঢুকেই চিৎকার করে বেরিয়ে আসলেন, এ সময় মোস্তফা খার উলঙ্গ হয়ে কুকুরের ভঙ্গিতে যোগ আসন করছিলেন। দম আটকে যাওয়ার মত হাসির ঘটনা ঘটেছিল সেদিন।

এদিকে শাহনেওয়াজ ফিরে গেলেন সুইজারল্যান্ড। সময়টা ছিল ১৯৭৮ সালের বসন্ত। পড়াশুনায় মনোনিবেশ করনে তিনি। কিন্তু তার পরিকল্পনা ছিল বাবার মুক্তির জন্য ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু পিতা জুলফিকার খুব দৃঢ়চেতা মানুষ। পড়ালেখা বাদ দিয়ে চলে আসাটা কখনোই মানবেন না তিনি। লেখাপড়ার ব্যাপারে তার কোনো আপোস নাই। মুর্তজা যখন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে থিসিস করছেন, তখনও ব্রিটেনের ট্রাফেলগার স্কয়ারে পাকিস্তানি-ব্রিটিশ অভিবাসীদের নিয়ে মিটিং সমাবেশে ডুবে থাকতেন। ১৯৭৮ সালের বসন্তে ভুট্টোর জীবনরক্ষা কমিটির কার্যক্রম যখন তুঙ্গে, সেই সময়েই আমার পিতা প্রেমে পড়েন।

লন্ডন থেকে দ্য সেভ ভুট্টো কমিটি বা ভুট্টোর জীবন রক্ষা কমিটির কর্মসূচী শুরু হলেও, সারা ব্রিটেন জুড়েই এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে।

মুর্তজা ম্যানচেস্টার থেকে বার্মিংহাম পর্যন্ত ভুট্টোর জীবন রক্ষা কমিটির শাখা খোলেন। সবখানে কমিটির সমর্থকদের তালিকা প্রণয়ন করা হল। পার্ক কিংবা মিলনায়তনে ভুট্টো জীবন রক্ষা কমিটির সভা চলতে থাকল। মুর্তজা ওই সমাবেশগুলোতে খোলাখুলি জিয়ার সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন। জিয়া ক্ষমতায় আসার পর পরই পিপিপির দলীয় মুখপাত্র 'মুসাওয়াত' বন্ধ করে দিলেন। মুর্তজা ওই পত্রিকাটি পুনরায় লন্ডন থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। অনেক সাংবাদিক জড়ো হলেন ওই পত্রিকাটিতে কাজ

www.pathagar.com

করতে। খবর সম্পাদনা করতে আর্টিকেল লিখতে, সম্পাদকীয় নীতিমালা তৈরি করতে এগিয়ে আসলেন অনেকেই। পত্রিকার নাম দেয়া হলো 'মুসাওয়াত ইন্টারন্যাশনাল'। লন্ডন থেকেই পুরোদমে পত্রিকার প্রকাশনা ও প্রচারণায় কাজ চলতে লাগলো।

সুহেল সেঠী ছিলেন মুর্তজার শৈশবের বন্ধু। মুর্তজার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিলেন। প্রায়ই লন্ডন-পাকিস্তান যাতায়াত ছিল তার। মুর্তজা এবং নুসরাতের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদানের কাজ চালাতেন। পেশোয়ারের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ সুহেল। সম্প্রতি বিয়েও করেছেন। মুর্তজা এবং ভুট্টো পরিবারের প্রতি আনুগত্যের কারণে সামরিক জান্তার হাতে নির্যাতন সইতে হয়েছে তাকে এবং তার পরিবার ও শ্বশুর বাড়িতেও সে নির্যাতন থেকে বাদ যায়নি। রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য তাকে খুব চাপ দেয়া হত। কিন্তু এতে কোনো কাজ হতো না। তিনি ছিলেন আমার পিতার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু।

তিনি জানান, 'আমরা কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ চালাতাম। এটা ছিল খুব শক্ত কাজ।' নুসরাতকে 'বেগম সাহেবা' সম্বোধন করে তিনি আরো জানান, একবার বেগম সাহেবার লাহারে থেকে পেশোয়ারে আসার কথা ছিল। পিপিপি'র এক নেতার মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার কথা তার। আসল কথা ছিল জিয়ার বিরুদ্ধে ওই অনুষ্ঠানে সংহতি জানানো। আমরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু তার কোনো হদিস পাচ্ছিলাম না। তাকিয়ে দেখি বোরখা পরা এক মহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সে সময় সধারণত কেউ বোরখা পরত না। বিশেষত মিসেস ভুট্টোতো নয়ই। কেউ আন্দাজ করতে পারেনি, অথচ সেই বোরকাধারী মহিলাই নুসরাত। এভাবেই ছদ্মবেশে এসেছিলেন তিনি।

সুহেল জানান, ভুট্টো পরিবারের মধ্যেই আরেক সমস্যার তৈরি হয়েছিল।

সুহেল বেনজিরকে তার পারিবারিক ডাকনাম পিংকি বলেই ডাকতেন তখন। পিংকির কারণে একবার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ভুল জায়গায় চলে গিয়েছিল। মীর লন্ডন থেকে পিপিপির দলীয় পত্রিকা 'মুসাওয়াত' বের করতে সহযোগিতা করার জন্য আমাকে ডাকলেন। মুর্তজা এই বার্তাটি আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বেনজিরকে বললেন। কিন্তু বেনজির ওই বার্তাটি আমাকে পৌঁছে দেয়ার গুরুত্বই অনুভব করলেন না। লন্ডন থেকে 'মুসাওয়াত' বের করেছিলেন মুর্তজা। ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ওই পত্রিকা বরে করেছিলেন এবং দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুহেল আরও বলেন, 'মানুষ জানে মুর্তজা এবং শাহনেওয়াজ শুধু বন্দুক এবং দেহরক্ষী বেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু তারা জানে না ওই সময়ে তারা কি কি কাজে নিয়োজিত ছিলেন।' তিনি বলেন, 'একবার মীরের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠানোর জন্য বেনজির তার বান্ধবীর বন্ধুর কাছে একটি চিঠি দিলেন। ওই বন্ধুটি আবার তার আরেক বন্ধুর কাছে চিঠিটি দিলেন, তিনি তখন লন্ডনে যাচ্ছিলেন। বেনজির এর সবকিছু জানতেন অথচ ওই বার্তাটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। মীর শুধু জানতেন একটা চিঠি আসছে পাকিস্তান থেকে লন্ডনে। কে কোথা থেকে কীভাবে নিয়ে আসছে তা জানতেন না। তবে ধারণা করেছিলেন নিশ্চয়ই এক নির্ভরযোগ্য লোকের মাধ্যমেই চিঠিটি আসছে। কারণ বেনজির চিঠিটির গুরুত্বের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।'

সুহেল সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বেনজিরের বান্ধবীর বন্ধুর বন্ধু লন্ডনে

www.pathagar.com

পৌঁছেছিলেন, তবে চিঠিটি মুর্তজাকে না দিয়ে সেটি নিয়ে সোজা চলে গেলেন পাকিস্তানি দূতাবাসে। সেখানে চিঠিটি হস্তান্তর করলেন। আমরা অপেক্ষায় আছি, কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পরের দিন দেখা গেল পাকিস্তানের সংবাদপত্র 'নাওয়া-ই-ওয়াকত' এর পাতায় চিঠির একাংশ ছাপা হয়ে গেছে।

এসব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা মুর্তজা এবং শাহনেওয়াজের জীবন পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারতেন না, ভবিষ্যতে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। আর বুঝতে পারলেও কোনো লাভ হত না। তারা দিনরাত জিয়ার সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন।

সামরিক জান্তা জুলফিকারের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগের এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। রাওয়ালপিণ্ডির জেলে আসার সময় জুলফিকার তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির জবাব লিখে ফেলেন। বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের জন্য লিখিত হয়েছিল। জান্তা সরকার জুলফিকারের বক্তব্য কখনো গণমাধ্যমে প্রচার করতে দিতেন না। এমন কি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাবও প্রচার মাধ্যমে নিয়ে আসা হতো না। কোনো প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার করতে দেওয়া হতো না। একবার জুলফিকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব কারাগারের কঠোর নিরাপত্তার ফাঁক গলিয়ে বাইরে চলে আসে। ওই জবাবপত্রটি লন্ডনে মুর্তজার হাতে পৌঁছায়। মুর্তজা এটা বই হিসেবে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। ওই জবাবপত্রটির শিরোনাম ছিল 'যদি আমাকে হত্যা করা হয়'।

সুহেল সেদিনের কথা স্মরণ করে বললেন, বইটির ভূমিকা লিখে দেওয়া দরকার ছিল। মুর্তজা এতটাই বেপরোয়া ছিলেন যে, তিনি চাচ্ছিলেন সত্য জনসম্মুখে বেরিয়ে আসুক, বইটির প্রকাশকের কাছে কোনো রয়ালিটিও চাননি তিনি। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে দিল্লির রিসউইন সিদি প্রকাশনী। সুহেল জানান, বইটি প্রকাশের ব্যাপারে মুর্তজা একটা পয়সাও দাবি করেননি। তার উদ্দেশ্য ছিল বইটি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। এক বছরের মধ্যে বইটির নয় থেকে দশটি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল। পরবর্তীতে লন্ডনের ব্রুসফিল্ডের 'মুসাওয়াতে'র আন্তর্জাতিক কার্যালয় থেকে বইটি প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারত থেকে প্রকাশিত 'যদি আমাকে হত্যা করা হয়' বইটির প্রচ্ছদে জুলফিকারের একটি আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছিল। কভার পৃষ্ঠার পেছনে তার একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল;–

> 'যদি আমার ফাঁসি হয়, তবে দেশে গোলযোগ সৃষ্টি হবে, অশান্ত হয়ে উঠবে, সংঘাত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়বে.... গত ১০ বছরের কর্মকাণ্ড আমাকে এই বর্তমানে নিয়ে এসেছে। এখন তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য এবং প্রগতি হুমকির মধ্যে পড়েছে। এখন আমার জীবন যদি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তাহলে নিঃসন্দেহে জেনে রাখ, পাকিস্তানের ভবিষ্যতও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।'

ওই উদ্ধৃতির নিচে জুলফিকারের হাতে লেখা দস্তখত দেওয়া হয়েছিল। জুলফিকারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের শ্বেতপত্রের শুধু মোক্ষম জবাবই ছিল না ওই বইটি। তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিল সেখানে।

www.pathagar.com

'দ্য প্রিজুডাইস' শীর্ষক অধ্যায়ে জুলফিকার সরকারের নানা ধরনের অপপ্রচারের মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। তাকে আটক করার অভ্যন্তরের দুর্লভ খবরাখবরও উল্লেখ করা আছে ওই অধ্যায়ে। তিনি লিখেছেন,

> '১৯৭৮ সালের ১৮ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ থেকে ২৩ ঘণ্টাই একটা চাপা এবং দম বন্ধ হয়ে আসা 'মৃত্যুপুরিতে' আমাকে দিন পার করতে হচ্ছে।'

তিনি লিখেছেন,

> 'আমি সামরিক জান্তার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের শিকার, তীব্র কটু দুর্গন্ধময় পরিবেশে গ্রীষ্মের গরম এবং বৃষ্টির লম্বা সময় অতিবাহিত করে যাচ্ছি। আমার স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। সারা বছর জুড়ে আমাকে একাকী বন্দিদশায় রাখা হচ্ছে। এখানে খুব কম আলো, আমার দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মানষিক অবস্থা এখনো অটুট রয়েছে। কারণ আমি এমন কিছু করিনি যা আমাকে নিঃশেষ করে দেবে। চরম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও দৃঢ় মনোবল ছিল আমার। এ কারণেই এ পরিবেশের মধ্যেও ওই শ্বেতপত্রের জবাব দিতে পেরেছি। এ রকম শ্বেতপত্র লিখলেই হলো – আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দিতে হবে না? আমার যত কাজ জনগণের সামনে আয়নার মত দৃশ্যমান। আমি যুদ্ধ বন্দি ফেরত, কাশ্মীরের সঙ্গে, ইসলামী সম্মেলনের সাথে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং সর্বহারাদের সাথে একীভূত। মিথ্যা এবং সাজানো অভিযোগের জবাব দিতে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই।
>
> যেমন ভুট্টোর বিরুদ্ধে হত্যা মামলার অভিযোগ এবং তিনি একজন খারাপ মুসলমান তবে অভিযোগগুলো স্বাভাবিক হলেও পরিস্থিতিটি মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। এসবের সঠিক জবাব দিতে আমার নৈতিক অধিকার রয়েছে। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার নৈতিক অধিকার রয়েছে। লাহোর ট্রায়ালে যেমন আমি বলেছিলাম, 'আমি যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলাম তা ভুলে যান। দেশের প্রথম রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলাম তাও ভুলে যান। ওসব কিছু ভুলে যান। কিন্তু আমি যে এদেশের নাগরিক এবং একটি হত্যা মামলার বিচারাধীন আসামি এটা তো সত্য। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দেওয়ার অধিকার তো আমার আছে।'

'আমাকে যদি হত্যা করা হয়'– শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করা নয়। এই লেখাটি ছিল তার চিঠি লেখার মত বিস্তারিত, যুক্তিপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর মোর্চার উত্থানের পূর্বাপর ঘটনা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং জেনারেল জিয়াউল হকের সাথে আফগানিস্তানের

www.pathagar.com

যোগাযোগের কথা।

আব্বা বইটির প্রথম কপি তার বইয়ের তাকে রেখেছিলেন। আমি যখন বেড়ে উঠছিলাম, বয়স নয়, বইটি আবিষ্কার করলাম আব্বার বইয়ের তাকে। বইটি নিয়ে আমি আমার শোবার ঘরে গেলাম। পাকিস্তানের রাজনৈতিক শব্দাবলি আমার তখন জানা ছিল না– শ্বেতপত্র, লাল ফিতা, নানা রকমের সরকারি দাপ্তরিক শব্দাবলি, সরকারি কর্মকর্তাদের নাম– কিন্তু আগ্রহ ছিল বইটির হলুদ পৃষ্ঠাগুলোর প্রতি যেখানে ছিল আমাকে যদি হত্যা করা হয়, গোলাপী রঙের মার্কার দিয়ে হাইলাইট করেছিলাম কিছু লাইন। দামেস্কতে যখন আব্বা দেখলেন, আমি বইটির কিছু অংশে দাগ দিয়েছি, যদিও তিনি তখন কোনো রাগ প্রকাশ করেননি, আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি দাদার উপর বই লিখবো ভবিষ্যতে।

* * *

১৯৭৮-এর মে মাসে এক সাদামাটা দিনে মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ লন্ডনের পার্কলেনের হিল্টন হোটেলে কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন। সে রাতে হোটেলের ট্রেডভিক রেস্তোরাঁয় কয়েকজন রাজনৈতিক লবিস্টকে দেখলেন মুর্তজা।

দেল্লা রউফোগালিস-এর জন্ম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের জন্মস্থান গ্রিসের ভেরিয়ায়। তার পিতা এনাসটাসিওস পাসভানটিডিস ছিলেন ছোট এক ব্যবসায়ী এবং তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আলবেনিয়ার এক ছোট শহরে জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছিলেন। দেল্লা মুর্তজার আট বছরের বড়। তিনি তখন লন্ডনে জাতিসংঘের এক কনফারেন্সে গিয়েছিলেন তার এক প্রিয়জনের জেল থেকে মুক্তির জন্য তদবির করতে। তিনি তখন সেই রেস্তোরাঁয় লক্ষ্য করলেন অন্য এক টেবিল থেকে এক সুদর্শন যুবক তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। দেল্লা যুবকটি ও তার বন্ধুদের কথাও শুনতে পাচ্ছিলেন। তারা কথা বলছিল ইংরেজিতে আঞ্চলিক টানে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে যুবকটি ফিরে ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছে। সে অন্যদের চেয়ে বেশ লম্বা। দেল্লা তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, যুবকটিও হাসলো। তখন যুবকটির মুখটি ছিল উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। এ্যাম্বাস্যাডর বিষয়টি লক্ষ্য করে যুবকটির দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন দেল্লাকে যুবকটিকে চেনে কি না। তিনি বললেন, 'যুবকটি পাকিস্তানের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। তার সরকারকে সামরিক সরকার উৎখাত করেছে এবং তিনি এখন জেলে।' এরপরই এ্যাম্বাস্যাডর যোগ করলেন, 'ঠিক আপনার বিপরীত ঘটনা।'

ভুট্টো দুই ভাইয়ের মত দেল্লার তরুণ জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। সে যখন গ্রিসের এক তরুণী সে তার নানা চিন্তা এবং কল্পনা নিয়ে কবিতা ও গান লিখত। দেল্লার জন্মস্থান ভেরিয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে এবং আলেকজান্ডার তার সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটানোর জন্য এই স্থান ছাড়ার অনেক আগেই। তরুণী বয়সে দেল্লা ছিল অশান্ত প্রকৃতির, আর তিনি ছিলেন লম্বা এবং সুন্দরী এবং তিনি অপেক্ষা করছিলেন তার ছোট জগতের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর অবস্থানে যাওয়ার জন্য। তিনি ষোল বছর বয়সেই বিয়ে করেন এবং তার স্বামী একজন যন্ত্র প্রকৌশলের ছাত্রসহ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যান। তারা যখন জোহানসবার্গে তখন সেখানে বর্ণ বৈষম্য সংঘাত অনেক তুঙ্গে। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল

www.pathagar.com

সংঘাতময়, দেল্লা মডেলের পেশা বেছে নিলেন, তখন সে দারুণ আলোচিত, দারুণ লম্বা, তামাটে চুল এবং জলপাই রঙের গায়ের চামড়ার রং। তখন অল্প দিনের মধ্যেই নিউইয়র্কের উইলহেলমিনা মডেল কোম্পানির সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি হয় দেল্লার। এরপর সে স্বামীকে ছেড়ে গ্রিসে চলে যায়। সেখানে এক নৈশভোজে মিখায়েল রউফোগালিস-এর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং পরে তারা প্রেমে পড়ে। অবশ্য জেনারেল রউফোগালিস এক সময় তার ভীতির কারণ ছিল।

তার থেকে পঁচিশ বছরের বড় জেনারেল ছিলেন গ্রিসের ভয়ানক আতঙ্কের অফিস 'স্টেট ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের' প্রধান। তার সরকারের পতনের তিন মাস আগে রউফোগালিস দেল্লাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। গ্রিক অর্থডক্স বিয়ের অনুষ্ঠানে রউফোগালিসের বেস্টম্যান ছিল সামরিক জান্তা প্রধান পাপাডোপোলুস। বিয়ের ছবিতে দেখা যায় পাপাডোপোলুস দেল্লার দিকে হাত নাড়ছেন, দেল্লাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, তার চুল ছিল লাল রঙ করা। (এই লাল রঙটি কি জান্তাদের বিপদ সংকেত? সম্ভবত না)। দেল্লা স্বৈরশাসকের দিকে মুগ্ধ হাসি হেসে দৃষ্টি বিনিময় করছিল।

১৯৭৪ সালের এক সকালে পুলিশ জেনারেল রউফোগালিসকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে গেল। নতুন সরকারের আদালত রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে জেনারেলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। জেনারেলের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী দেল্লা কালক্ষেপণ না করে জেনারেলের মুক্তির জন্য দেশে এবং বিদেশে তদবীর করা শুরু করে।

দেল্লা কথা বললেন এরিস্টোটল ওনাসিস-এর সঙ্গে তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে। তিনি গেলেন যুক্তরাষ্ট্রে সি.আই.এ প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে, যারা গ্রিসের সামরিক শাসকের সমর্থক ছিল। কিন্তু দেল্লা বিশেষ কিছু করতে পারেননি, কারণ তার স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মওকুফ ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ তিনি অন্য সহকর্মী এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাপাডোপোলুসের মত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া থেকে ছাড় পেয়েছিলেন। কিন্তু দেল্লা বসে থাকার মেয়ে নন। সে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। বিচারের শেষে জেনারেল রউফোগালিস তার তরুণী স্ত্রীকে বললেন, তার মুক্তির প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে। তিনি তাকে বললেন, 'এই অবস্থা অনেকদিন চলবে প্রিয়। কতদিন, কত দীর্ঘ সময় জানি না.... তুমি তরুণ, তুমি সুন্দরী এবং তোমার সঙ্গীরও দরকার। তুমি তোমার মত কাউকে খুঁজে নাও।' তিনি তা-ই করেছিলেন কিন্তু রউফোগালিসের অনুরোধে নয়, তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততায় তিনি অবিচল ছিলেন তার কাজের মধ্য দিয়ে। দেল্লা বিশ্বের বিভিন্ন দক্ষিণপন্থি সরকারগুলোর কাছে বন্দি গ্রিক সামরিক শাসকদের পক্ষে স্পর্শকাতর এই মুক্তির আবেদন নিবেদন চালান। তিনি তাদের দণ্ডাদেশ বাতিলের আহ্বান জানিয়ে এই কারণ দর্শান যে, ঘটনার পরবর্তীতে তৈরি আইনে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

এই অভিযোগ নিয়েই দেল্লা লন্ডন এসেছিলেন এবং সোমালিয়ার এ্যাম্বাস্যাডরের সঙ্গে ট্রেডারভিক রেস্তোরাঁয় কথা বলেছিলেন। ট্রেডারভিক সবসময়ই আন্তর্জাতিক খারিদ্দারদের দ্বারা ভরপুর থাকে। তার সৌন্দর্য সৌকর্য ফার্নিচার, কাটলারি, ফুল দিয়ে সাজানো টেবিল বিত্তবান ও উপরতলার মানুষদের জন্য এক আকর্ষণীয় স্থান। এখানে হয় নানা রকম বড় বড় বাণিজ্য, লেনদেন ও রাজনৈতিক আলোচনা। এ্যাম্বাস্যাডর দেল্লাকে জিজ্ঞাসা করলেন

www.pathagar.com

তিনি কি মুর্তজার সাথে পরিচিত হতে চান কিনা। যদিও দেল্লা মুর্তজার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন তারপরও তিনি বললেন, না প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এ্যাম্বাস্যাডরের সাথেই কথা সমাপ্ত করতে চাচ্ছিলেন। খানিক পরেই দেল্লা রেস্তোরাঁর মহিলাদের টয়লেটে গেলেন এবং ফিরে এসে দেখলেন যে, মুর্তজা তার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা দ্রুত দু'জনের ফোন নম্বর লিখে রাখলেন এবং স্ব স্ব টেবিলে চলে গেলেন। যখন দেল্লা এবং এ্যাম্বাস্যাডর রেস্তোরাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন এ্যাম্বাস্যাডর মুর্তজার কাছে গিয়ে তার পিতার খবর জিজ্ঞেস করলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দেল্লা রউফোগালিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পরের দিন সকাল ১১টায় মুর্তজা দেল্লাকে ফোন করে ট্রেডারভিকে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করলেন। তারা বিকেল পর্যন্ত নিজেদের গল্প করলেন। নিজেদের ইতিহাস ও সংগ্রাম– মুর্তজা বললেন, তার পিতাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কথা আর দেল্লা বললেন তার স্বামীর মুক্তির লক্ষ্যে নানা কাজের কথা। দেল্লা জানতেন যে, তাদের দুইজনের অবস্থান ছিল বিপরীতমুখী এবং দুইজনের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে তার মনে হয়েছে তা হবার নয়। দেল্লা লক্ষ্য করেন যে সে যখন তার স্বামী সম্পর্কে কথা বলেন মুর্তজা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনেন, কোনো সমালোচনাও করেন না, মতামতও দেন না। আর মুর্তজা যখন তার পিতা আর সামরিক শাসনের কথা বলেন তখন দেল্লা মনোযোগ দিয়ে শোনেন ও তার নৈকট্য অনুভব করেন। পরের দিন তারা আনাবেল-এ নাচতে যান এবং তাদের ঘনিষ্ঠতার তৃতীয় দিনে দেল্লাকে এথেন্সে ফিরে যেতে হয়।

মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ দেল্লাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যান এবং এটা পরিষ্কার যে, তারা দুইজনেই দুইজনকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত নন। দেল্লা মুর্তজাকে রেখে ডিপারচার লাউঞ্জে বিষণ্ন মনে চলে যান। দেল্লার কাছে গত চার বছরের একাকীত্ব ও হতাশার পর এখনকার এই প্রীতি ও ভালোবাসা যেন এক ভিন্ন ধরনের অনুভূতি। এইসব ভাবতে ভাবতে এক অস্থির চিত্তে বিমানে উঠলেন। তার সিটে বসা পত্রিকায় মুখ ঢাকা এক যাত্রীকে দেখে তিনি রাগান্বিত হলেন। সে খাখাড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বললেন এই যে, এটাতো আমারই সিট। সিটে বসা ভদ্রলোক তার মুখ থেকে পত্রিকাটি সরালেন। সিটে বসা ভদ্রলোকটি আর কেউ নয় মুর্তজা। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেল্লা বললেন, 'তুমি কিভাবে এটা করলে?' দেল্লার জন্য মুর্তজা তখন সবকিছুই করতে পারে।

মুর্তজার জন্য দেল্লা ছিল তখন স্বস্তিকর এক স্বাভাবিক জীবন, যে জিয়াউল হকের সামরিক শাসনের পর স্বাভাবিক জীবন হারিয়েছিলেন। মুর্তজা যে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তার কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, তার ফাঁকে একটা স্বাভাবিক জীবন ও স্বস্তি খুঁজছিলেন তিনি, দেল্লা অনুভব করেন। মুর্তজা এরকম অবাক করা কাণ্ড আরও কয়েকবার করেছেন। তিনি মাঝে মধ্যে এথেন্সে ফোন করে বলতেন,' শাহ তোমার কাছ দিয়েই কোথাও যাচ্ছে, সে তোমাকে ফোন করবে তোমাকে চিঠি ও বই দেয়ার জন্য।' শাহের ফোন কলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সময় যায়, ফোন আসে না হঠাৎ দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। দেল্লা ইন্টারকমে উত্তর দিতে দিতে দরজা খুলে দেখেন মুর্তজা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার স্যুটকেস।

মীর তার প্রথম এথেন্স যাত্রায় কারাভেল হোটেলে উঠলেন, তিনি দেল্লার সাথে

www.pathagar.com

কোলোনাকি স্কয়ারের কালোনাকি উপস রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিয়ে, হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকা পড়ে এবং অন্যান্য ট্যুরিস্ট ও দেল্লার গ্রিক বন্ধুদের সাথে হাই-হ্যালো করে সময় উপভোগ করলেন। দু'দিন পর দেল্লাকে সাথে নিয়ে মুর্তজা তার বন্ধু মিলব্রি পোক-এর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যান। উইলিয়াম পোক সেখানে আমেরিকান এ্যাম্বাসিতে কাজ করতেন। উইলিয়াম পোকের ভাই জর্জের এক রহস্যময় ঘটনায় মৃত্যু হয় এবং তাদের পরিবার এখনো তার নামে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্কলারশিপ দিয়ে যাচ্ছে। এ্যাম্বাসিতে যাওয়ার পথে মুর্তজা দেল্লাকে সবুজ ও নীল রঙের এনামেলের আংটি জন্মদিনের উপহার হিসেবে দেন। তখন তাদের মধ্যে পরিচয় মাত্র এক সপ্তাহের কম সময়।

৫ জুন মুর্তজা লন্ডনে ফিরে আসেন। তিনি এবং শাহনেওয়াজ তাদের পিতার বিচারের উপর এক ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। এ কাজটি অল্প সময়ে সমাপ্ত হওয়ার নয়, কয়েক বছরের বিষয়, তারা লন্ডনের বিভিন্ন প্রডিউসার এবং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। সময় ছিল খুব ব্যাস্ততাপূর্ণ। পরের দিন তিনি দেল্লাকে চিঠি লেখেন, 'আমার প্রিয়তম দেল্লা, আমি এসেই অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই সকল কাজ তোমার কথা চিন্তা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আমি তোমাকে দারুণভাবে মিস করি। এই মাসেরই ১৪ তারিখে আমি আবার গ্রিসে তোমার কাছে আসব। যদি তোমাদের এ্যাম্বাসির লোকেরা আমাকে ভিসা দেয় (তারা দিয়েছিল)।

মুর্তজা যেখানেই থাক না কেন দেল্লাকে পোস্ট কার্ড বা প্রেমপত্র পাঠাতেন, আর এয়ার মেইল এনভেলপের পেছনে লিখতেন, 'আমার সকল ভালোবাসা, আমার সকল ঘুম, আমার সকল গান, আমার সকল সাদা চুল, আমার সকল চিন্তা.... ।' আমি জানতাম না যে আমার পিতা কখনো প্রেমপত্র লিখেছিল। আব্বার মৃত্যুর পর আমি তার বাক্সভরা চিঠিপত্র খুললাম, দেরাজ এবং আলমিরায় তার বই, ম্যাগাজিন ঘাটি। ভেবেছিলাম যে তার কোনো রোমান্টিক চিঠিপত্র নিদর্শন কিছু পাব কিন্তু কখনো তা পাইনি। তবে এটা কখনো ভাবিনি যে তিনি কখনো প্রেমপত্র লিখে থাকতে পারেন না। তবে মনে হয় যে দেল্লার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরেই তিনি প্রেমপত্র লেখেন। নিউইয়র্কের হিলটন হোটেল থেকে হোটেলের লেখা কাগজে তিনি দেল্লাকে লিখলেন : 'আমাদের সম্পর্ক হয়ত বা বেদনাদায়ক। একদিক থেকে দুঃখজনকও, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি এবং দু'জনেই পরস্পরকে পেয়ে সুখী, কিন্তু আমাদের রয়েছে বিরাট বাঁধা। সব শেষে, আমাদের যা পরিণতি হবে, সেটা হবে এক বিচ্ছেদের মহাকাব্য।'

মুর্তজা দ্বিতীয় দফা গ্রিসে যেয়ে কোলোনাকি টপে লাঞ্চের মধ্যেই তার কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ রাখলেন না। পাক গ্রাটিস্কয়ারে দেল্লার সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকলেন। ফোন করলেন সেখানকার মন্ত্রী ল্যাম্পরিয়াস ও প্রধানমন্ত্রী কারামানলিসের সেক্রেটারিকে। তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি দেল্লার সাহায্য নিলেন কারণ তারা ইংরেজি কম জানতেন। প্রধানমন্ত্রী কারামানলিস মুর্তজার পিতার বন্ধু ছিলেন। তিনি এক সময় দক্ষিণপন্থি রাজনীতি করতেন এবং এখন হয়েছেন মধ্যমপন্থি, তিনি সবেই প্রবাস জীবন থেকে গ্রিসে ফিরে এসেছেন। তিনি মুর্তজাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দিলেন। মুর্তজা তার পিতার জীবন রক্ষার আন্দোলনে তার সাহায্য চাইলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করলেন পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে যাতে হত্যা করা না হয় সেজন্য জিয়াউল হকের উপর চাপ প্রয়োগ করতে।

www.pathagar.com

এই দেখা সাক্ষাতে মুর্তজার সাথে দেল্লা যাননি। তিনি তো কার্যত সরকারের শত্রু। তিনি ভেবেছিলেন পাকিস্তানি এই তরুণ যুবকটির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানলে কারাগারে আটক তার স্বামী ও তার সহকর্মীদের প্রতি বর্তমান সরকার বিরূপ হবে। কিন্তু দেল্লা ছিলেন ভীষণ সাহসী। পরে তিনি ভাবলেন বরং এই কারণে তাকে ভিন্নভাবে দেখবে গ্রিস সরকার সামরিক জান্তাদের থেকে পৃথক করবে তাকে।

১৯৭৮ সালেই মুর্তজা গ্রিসে গিয়েছিল দশবার। তুরস্ক বা সিরিয়া যাওয়ার সময় বা ইউরোপের অন্য কোথাও যাওয়া-আসার পথে। তিনি কথা বলতেন গ্রিসের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে, নতুন সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং দেল্লাকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যেতেন। জেনারেল রউফোগালিস যে আজিনা দ্বীপে কারাবন্দি ছিলেন সেখানে তারা দুইজনে যান। যখন দেল্লা কারাগারে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেন তখন মুর্তজা স্থানীয় এক কফি শপে বসে পত্রিকা পড়ে সময় কাটান। তারা দু'জনে ভেরিয়াতে যান সেখানে দেল্লার মা এবং তার দুই বোন, নানা এবং ভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাত এবং দুই বোনকে নিয়ে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শহর ভেরিয়া ঘুরে দেখেন। শীতের প্রারম্ভে যখন তুষার পড়া শুরু হয় তখন নানা দেল্লা এবং মুর্তজাকে নিয়ে গেলেন দেলফির কাছে মাউন্ট পারনাসোসে স্কী করার জন্য। নানা ভালো স্কী করতো, দেল্লা তেমন নয়, মুর্তজা একেবারেই না। অন্যসব পাকিস্তানিদের মত মুর্তজার শীতের জামাকাপড়ের প্রতি ছিল দারুণ অনীহা এবং তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে আসেননি। দেল্লা যখন স্কী করে ছোট পাহাড় থেকে নিচে নামছিলেন তখন পাহাড়ের পাদদেশের এক প্রান্তে মাথায় শাল প্যাঁচানো এক লোককে তার দিকে হাত নাড়তে দেখল, এটা ছিল মীর এবং গাছের ডাল দিয়ে তুষারের উপর তার নিজের নাম লিখে রেখেছে।

দেল্লা বেশ ঘন ঘনই লন্ডনে আসতেন মুর্তজার সঙ্গে দেখা করতে। সে সময় মুর্তজা তার পিতার বই 'আমাকে যদি হত্যা করা হয়' দেল্লাকে উপহার দেন। মুর্তজা বইতে লিখলেন, 'দেল্লাকে অনেক শুভেচ্ছা সহ'। শাহ আবার আর একটু আবেগঘন কথা লিখলেন, 'অনেক অনেক ভালোবাসা সহ'। লন্ডনে দুইভাই ঘন ঘন তাদের এপার্টমেন্ট বদলাতেন। দেল্লার কোনো ধারণা নেই এটা নিরাপত্তার জন্য না অন্য কিছু, এমনকি দেল্লার ডায়েরিতে মুর্তজা একেক সময় একেক ঠিকানা লিখতেন। দেল্লার গাঢ় লাল রঙের ডায়েরিতে মুর্তজা তার প্যাঁচানো হাতের লেখায় নানান ঠিকানা লিখেছেন, একটাতে ছিল ৪২ লোনডেস স্কয়ার যেটা আবার পাকিস্তান এ্যাম্বাসির খুব কাছাকাছি। সর্বশেষ ঠিকানাটা লিখেছিলেন ৭২, স্টানহোপ নিউজ। মুর্তজার যখন চব্বিশতম জন্মদিন, সে সময় দেল্লা লন্ডনে আসেন এবং আবার সেই ট্রেডারভিকে উদযাপন করেন। দেল্লার মনে আছে মুর্তজা সে দিন আজার কোলন মেখেছিল। অবশ্য পরের বছরে মুর্তজা গ্রে ফ্ল্যানেল ব্যবহার শুরু করে এবং বাকি জীবন জিওফ্রে বিনে কোলন ব্যবহার করতেন। দেল্লার পছন্দ অনুসারে মুর্তজা টার্নবুল এন্ড এজারের শার্ট এবং সিল্ক স্যুট পড়তেন। আর দেল্লা তখনকার ফ্যাশন লম্বা জিপসি ড্রেস এবং এমব্রয়ডারি করা ব্লাউজ পরতেন। মুর্তজা রোমিও জুলিয়ো চুরুট খেতেন মাঝে মাঝে, যেটা আবার চে গুয়েভারার ব্রান্ড ছিল। চুরুটের লাল ফিতাটা মর্তুজা দেল্লার আঙ্গুলে পেঁচিয়ে দিতেন। মুর্তজার মাস্টার্সের থিসিস বাকি ছিল, সেজন্য অক্সফোর্ডে তার শিক্ষকের কাছে যেতেন এবং দেল্লাও অনেক সময় তার সঙ্গী হতেন। মুর্তজা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এমপিদের

www.pathagar.com

কাছে পাকিস্তান সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গেলে দেল্লা তার সঙ্গে যেতেন। মুর্তজা এইসব সমাবেশে একটু লাজুক থাকতেন। দেল্লা প্রথমে ভেবেছিল এই এমপি বা জনতার সামনে কথা বলতে মুর্তজা একটু লাজুক। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছেন না সেটা এ কারণে নয়, তার উপস্থিতির কারণে। মুর্তজাতো তার পিতার জন্য প্রচার চালিয়েছেন, সভা করেছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন অল্প বয়স থেকেই, এটা যে দেল্লার উপস্থিতির কারণে পরে দেল্লা তা উপলব্ধি করতে পারেন।

এটা ছিল জিয়াউল হকের স্বৈরাচারী সরকারের প্রথম দিকের কথা। জিয়াউল হক ক্ষমতায় এসে নব্বই দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের জুলাইয়ে নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর এই কথা ভুলে গিয়ে দুর্নীতিবাজদের শনাক্ত করবেন এবং তার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা দিতে থাকেন। যেটা ছিল প্রধানত ভুট্টোর বিরুদ্ধে। জিয়াউল হকের হম্বি-তম্বি যখন কমে আসে তখন মুর্তজা ভেবেছিল যে জুলফিকারকে জিয়াউল হক হত্যা করতে সাহস পাবে না। আর অনেকেই ভেবেছিল যে ধর্মপরায়ণ এই জেনারেল যিনি আবার একটু নরম প্রকৃতির এবং উপরতলার লোকদের তোষামোদ করার অভ্যাস যার সে কখনো ভুট্টোকে ফাঁসি দিতে সাহস করবে না। তা'ছাড়া পৃথিবীব্যাপী এ নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছিল এবং পাকিস্তান সরকারের উপর ভুট্টোকে রক্ষা করার জন্য চাপ আসছিল। মুর্তজা এবং শাহনেওয়াজ পৃথিবীব্যাপী লবিং করছিলেন। যা সাধারণত করা হয়, জুলফিকারের জমিজমা জিয়াউল হক তখনো বাজেয়াপ্ত করেনি এবং সেই জমিজমার অর্থ দিয়েই ভুট্টোর মুক্তির জন্য অভিযান চলছিল। তাতে করে অনেকে মনে করতেন যে জিয়াউল হক কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাবে না।

মুর্তজা তার চব্বিশতম জন্মদিনের এক মাস পর অক্টোবর মাসে আমেরিকা ও কানাডায় গেলেন সেখানকার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। মুর্তজার কলেজের রুমমেট ববি কেনেডি জুনিয়র তখন ভার্জিনিয়ার ল'স্কুলের ছাত্র। মুর্তজাকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা তিনিই করে দেন। ববি কেনেডি জুনিয়র ওয়াশিংটন পোস্টসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানের সামরিক শাসন এবং ভুট্টোর বিচারের নামে অবিচার সম্পর্কে কলাম লেখেন। তার লেখার তথ্যগুলো মুর্তজাই তাকে সরবরাহ করেছিলেন। ববি এবং মুর্তজা একসঙ্গে ওয়াশিংটনে যেয়ে ববির চাচা টেড কেনেডি এবং অন্যান্য সিনেটরদের সঙ্গে কথা বলেন। ববি আমাকে বলেছিলেন, 'মীরের কূটনৈতিক কার্যক্রম ছিল খুবই জোরালো এবং অনেকেই তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।'

প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মা লিলিয়ান কার্টারের সঙ্গে দেখা করার জন্য জর্জিয়ার সমতল অঞ্চলে গেলেন। লিলিয়ান আমেরিকার পিস কর্পে দক্ষিণ এশিয়ায় ছিলেন অনেকদিন এবং ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল তার। ববির স্মরণ আছে, 'মীরকে দেখে মিসেস কার্টার অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব আন্তরিক এবং দুঃখিত হয়েছিলেন যে এই ব্যাপারে তার বিশেষ কিছু করার নেই। যদিও তিনি যথেষ্ট আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন সাহায্য করার জন্য।' মুর্তজার তার পিতার মুক্তির প্রচেষ্টার এই বিষয়ে, এই প্রচারাভিযানে, দেনদরবারে ববি সব সময় তার সঙ্গে ছিল এবং সর্বাত্মক সাহায্য করে।

তারা আমেরিকার দক্ষিণের দিকে যান, গাড়িতে ঘোরেন, রাতে ভাল্লুকের মত প্রাণী

www.pathagar.com

রেকুন শিকার করেন। 'আমরা জর্জ কেলী নামে এক চোরাই মদ বিক্রেতার কাছে গিয়েছিলাম। আলাবামার লোনস কান্ট্রিতে মদ পান নিষিদ্ধ ছিল। দীর্ঘদেহী এই কালো লোকটি তার এক গোপন ডেরায় কালো লোকদের কাছে বিয়ার বিক্রি করত এবং সেখানে রেকর্ডের গানও বাজানো হতো। আমরা সেখানে গেলাম আমাদের শিকার করা রেকুন নিয়ে কারণ জর্জ কেলীর কাবাব তৈরিতে খ্যাতি ছিল। আমরা সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথা বললাম, গল্প করলাম এবং নাচলাম।'

নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা বা পাকিস্তানি কমিউনিটিদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি মুর্তজা চেষ্টা করতেন তার সকল কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার । সে সময়টা একা থাকা ছিল খুব কঠিন। সেই সময়ের আঠার বছর পর আমি যখন ববিকে এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ববি বললেন, 'আমি মীরকে সত্যিই ভালোবাসতাম। সে ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তার কতগুলো অন্তর্নিহিত গুণ ছিল। সে ছিল সৎ, সে ছিল আন্তরিক বন্ধু। সে অনেককে সাহায্য করত সে সব বিষয়ে, যে বিষয়ে অন্যদের তার মত সামর্থ্য ছিল না। তার জনপ্রিয় হওয়ার মত অনেকগুলো গুণ ছিল। সকলের ভালোর জন্যতো চেষ্টা করতই– আবার প্রত্যেকের জন্য পৃথকভাবে কিছু করার চেষ্টা করত, সহযোগিতা করত, খোঁজ-খবর রাখত এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাদের ব্যক্তিগত বিষয়েও জিজ্ঞাসা করত। আলাবামায় সে কালো গরীবদের সঙ্গে মিশত এবং তাদের খোঁজ-খবর নিত। এইসব কালো লোকগুলো কখনোই লোনস কান্ট্রির বাইরে যায়নি।

এরপর মুর্তজা গেলেন কানাডায়। সেখানে তিনি 'ভুট্টো বাঁচাও' কমিটি, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বললেন। তার হার্ভার্ডের বন্ধু মিল ব্রি তার সঙ্গে আমেরিকায় এবং টরেন্টোতে ছিলেন। সেই সময় মুর্তজাকে দেখে মিলব্রি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলেন। 'সেই সময়টা ছিল খুব কঠিন এবং মুর্তজা দক্ষতার সঙ্গে তার কাজ করেছে। সেই সময় তার কাঁধে ছিল বিরাট বোঝা আবার সে জীবনকে সব সময় ভালোবাসত এবং যে কাজ করত সে কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করত।'

মুর্তজা টরেন্টোতে চেষ্টা করেছিলেন তার পিতার মৃত্যু নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করার জন্য। মিলব্রি খুব নিরাশ হয়ে বললেন, 'সেটা করা সম্ভব হয়নি। আমরা বিভিন্ন টিভি স্টেশনে গিয়েছি, ভাষ্যকারদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং মনে হয়েছিল যে কাজটি হবে। শেষ পর্যন্ত হয়নি। আমরা সে কাজের জন্য ছিলাম খুবই নবীন। আমেরিকায় এত সব প্রচার কোনো ফল দেয়নি। আমেরিকানরা তাদের সীমান্তের বাইরের কথা চিন্তা করতে চায় না। তারপরও মীর তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় তার পিতার মুক্তি ও জীবন বাঁচাতে। সে ছিল আশাবাদী, আর সে যদি জানত যে তিনি নিহত হবেন তাহলে সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে পড়ত।'

আমার পিতার সঙ্গে দেল্লা প্রেমে পড়ার ৩০ বছর পর আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা এক পুনঃমিলনী। যদিও আমাদের মধ্যে আগে কখনো দেখা হয়নি। তিনিই যোগাযোগ করেন– যদিও এর আগে আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি অনেক বছর । আব্বার বন্ধুদের বলেছি– আমার আব্বার যৌবনকালের গ্রিক প্রেমের কথা। দেল্লার নামের শেষের পারিবারিক পদবীটি আমি জানতাম না। অবশ্য এখন বুঝি যে

www.pathagar.com

জানলেও কোনো কাজে আসত না কারণ তার নামের পদবী পরিবর্তন হয়েছে। আমি আমেরিকা যাওয়ার দুই বছর পর আমার এক ফুফুর ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলি। তিনি আশ্চর্যজনকভাবে আমাকে জানালেন পামবীচে এক ডিনারে দেল্লার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তিনি তার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং দুই জনেই তাদেন পাকিস্তানি যোগাযোগের কথা আলাপ করছিলেন এবং তখন নামটি চলে আসে। কোনোভাবে যখন আমার পিতার নামটি চলে আসে তখন ভদ্রলোকটি দেল্লাকে জানান, মীর নামের যে লোকটিকে সে ভালোভাসত তার একটি কন্যা আছে এবং সে দেল্লাকে খুঁজছে। এতেই কাজ হল– দেল্লা যখন জানলেন যে আমি তাকে খুঁজছি, তিনি এবং তার এক বন্ধু গুগলে সার্চ করে আমার ই-মেইল নাম্বার পান।

২০০৮ সালের গ্রীষ্মে দেল্লার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি গ্রিসে উড়ে যাই। দেল্লা তখন ষাটোর্ধ্ব বয়স্কা, কিন্তু তখনো সুন্দরী। তাকে দেখে আমার দাদীকে মনে করিয়ে দেয়। তার ছিল সুন্দর চিবুক এবং তখনো সে চিবুকের ভাঁজ অটুট ছিল, ঠিক আমার দাদীর মতো যাকে আমি ডাকতাম জুনাম। আমি এথেন্সে বিমান থেকে অবতরণ করেই তার সঙ্গে তার বাড়ি মাইকোনসে উড়াল দিলাম। তিনি আমার পিতার চিঠি ও ছবি দেখালেন। মাইকোনসে তখন খুব গরম ও প্রচণ্ড বাতাস ছিল, বাসিল গাছের পাতার গন্ধ, পুদিনা গাছের মত, গাছটি গ্রিসে মশা তাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের সুমিষ্ট গন্ধ সন্ধ্যার বাতাসকে মোহিত করে রেখেছিল। দেল্লা আমাকে বললেন, তারা মা বাকের এবং সানি ব্লু শুনতেন এবং নাচতেন (আমি ভাবলাম দুটোই তো মা'দের গান)। দেল্লা তখনই আমার চেহারায় কৌতূহল মিশ্রিত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলেন। আব্বা নাকি বলতেন তাকে দেখলে নুসরাতের কথা তার মনে পড়ে এবং তাকে মা বাকের বলে দুষ্টুমি করে ডাকত এবং নানা তামাশা করে তাকে হাসাতেন। দেল্লা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন আব্বা কিভাবে সিগারেটের ধোঁয়া বৃত্তাকার করে ছাড়তেন। দেল্লা মুর্তজার দুঃসময়ে খানিকটা জীবনের স্বাদ দেয়ার চেষ্টা করতেন। আমি আমার পিতার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি, আমি জানতাম না সারা গ্রিস জুড়ে তার এত বন্ধু-বান্ধব।

প্রথম রাতে মাইকোনসে বাইরে গেলাম ডিনার করতে। দেল্লার বোন নানাও আমাদের সঙ্গে ছিল, সে সময়ে দেল্লা বললেন, দেল্লা ও তার এক বান্ধবী ক্রিজা মন্টোকার্লোতে বেড়াতে যায়। সময়টা ছিল তাদের প্রেমের প্রথম দিককার ঘটনা। সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ করে ক্রিজা এবং দেল্লা যখন মন্টোকার্লো ছেড়ে আসবেন তখন তারা ট্যাক্সি পাচ্ছিলেন না। সেদিন বিকেলেই তাদের ফ্লাইট এবং ফ্লাইটের সময়ও ঘনিয়ে আসছিল। তাই আমার পিতা তাদের দ্রুত বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া করেন। আমি ভাবতেই পারি না আমার আব্বা এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করতে পারেন। আসলেতো তিনি প্রেমে পড়েছিলেন এবং স্মরণ রাখার মত কিছু কাজ তো তিনি করবেনই। কথাটি শুনে প্রথমে আমি হেসেছি এর পর ডিনার খেতে খেতে কেঁদেছি। কারণ আমি এই মীরকে জানতাম না।

ডিনার শেষে দেল্লা মাইকোনসের সরু ও সাদা গলিতে এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন, আমি তখনো জানতাম না কোথায় যাচ্ছি আমরা। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যাওয়ার সময় এই পথ দিয়ে আমরা যাইনি। ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেল্লা রেস্তোরাঁর মহিলা মালিককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং গ্রিক ভাষায় তার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। এটা ছিল ক্রিজা,

www.pathagar.com

নামের অর্থ হল সোনালী। দেল্লার থেকে খাটো, খসখসে কণ্ঠ এবং হাতে তার সিগারেট। তখন ছিল মধ্যরাত। দেল্লা ক্রিজাকে আমার কাছে নিয়ে আসলেন– আমি তখনো জানতাম না এটা সেই হেলিকপ্টারের গল্পের ক্রিজা– আমি শুধু হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিলাম ফাতিমা। তিনি আমার হাত শক্ত করে ধরে দেল্লার দিকে তাকিয়ে গ্রিক ভাষায় বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই বলতে যাচ্ছ না এটা সেই পাকিস্তানির কন্যা।' দেল্লা তার মুখ সামনের দিকে ঝাকিয়ে বললেন– হ্যাঁ। সে এবং ক্রিজা দুজনেই কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর তাদের চোখ মুছে ক্রিজা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে এবং আমার বাহু দুটি চেপে ধরলেন। তিনি চুমু খেলেন আমার চুলে এবং গ্রিক এক্সেন্ট ইংরেজিতে বললেন, 'এই তো সেই চোখ, আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি তুমি মীরের কন্যা।' আমি দ্বিতীয়বারের মত সেই রাতে কাঁদলাম। ক্রিজা জিজ্ঞাসা করলেন আমার কাছে আমার পিতার ছবি আছে কিনা, আমার কাছে তখন একটি ছবি ছিল, আব্বার সাথে আমার শিশুকালের, ছবিটি ছিল খুব সুন্দর। আব্বা আমাকে তার মুখের কাছে ধরে হাসছিলেন। ক্রিজা তার মাথা নেড়ে বললেন, 'ছবিতে মীরকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে।'

দেল্লা ক্রিজাকে বললেন, 'বিশ্বাস করবে মীরের কি হয়েছে।' দেল্লার চোখে তখন জল। ক্রিজা মাথা নাড়লেন, 'জানি, যখনই কথাটা ভাবি তখনই আমার পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম।'

www.pathagar.com

৭

১৯৭৯ সালের গোড়াতেই পাকিস্তানের সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেল। তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হলো। করাচিতে অবস্থানরত বেনজিরের কাছ থেকে সামরিক জান্তা মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করতে যাচ্ছে খবর পেয়ে সুহেল লাহোরে নুসরাতকে জানালো। এই দুই মহিলা সকলের আগে খবরটি পেয়ে বেদনায় বিধ্বস্ত হলেন এবং এরপর কি করবেন কোনো উপায় খুজে পাচ্ছিলেন না। জিয়াউল হক তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন, অন্যদিকে জুলফিকারের স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিল।

পাকিস্তান থেকে তখন আসছিল শুধু দুঃসংবাদ। সুবিচার পাবেন, এটা জুলফিকার কখনো আশা করেননি এবং তিনি জানতেন তারা তাকে হত্যা করবে, তারপরও মুর্তজা ভুট্টো বাঁচাও কমিটিকে নিরাশ না হয়ে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যেতে চাপ দিলেন যেন ভুট্টোর জীবন রক্ষায় আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। একজন অতি সাধারণ পোষাক পরা মানুষের হলুদ হয়ে যাওয়া একটি সাদা কালো ছবির ওপরে লেখা মুর্তজার হাইলাইট করা ক্যাপসন :

> হাউজ অব কমন্সে ১০০ জনের স্বাক্ষর করা এক প্রস্তাব আনেন এম পি স্টান নিউয়েনস : আমি লেবার পার্টির বাম দিকে অবস্থান করি... কিন্তু লেবার পার্টির বাম অংশ থেকে আমি ডানপন্থী কনজারভেটিভ পার্টির অতি ডানপন্থীদেরকেও বলতে চাই... বিচারের এক অপব্যবহার হয়েছে, রায় যেটাকে বলা হয়েছে, এখন তো তথাকথিত দণ্ডও কার্যকর করা হয়েছে। আমার মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে এটা একেবারেই হত্যাকাণ্ড, যেটা রাজনৈতিক ও বিচারের আবরনে করা হয়েছে।

ভুট্টোর জীবন রক্ষা কমিটির প্রধান হিসাবে মুর্তজা তার পিতার সামরিক জান্তার মামলার আইনী অসঙ্গতি ও ক্রটির বিষয়ে লন্ডনে দু'দিনব্যাপী এক কনফারেন্স করেন। সেখানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা বিচার পদ্ধতি ও আইনী বিষয়ে তাদের মতামত দেন। ইংল্যান্ড থেকে সেখানে ছিলেন জনাথন আইটকেন এমপি, অবজারভারের প্রধান সম্পাদক, অক্সফোর্ডের আইনের অধ্যাপকরা, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের অধ্যাপক, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দুইজন প্রতিনিধি। ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট কমিশনের চেয়াম্যান আমেরিকার কয়েকজন আইনজীবী নিয়ে জেনেভা থেকে আসেন।

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের প্রশাসনের সাবেক এটর্নী জেনারেল রামসে ক্লার্ক। সুহেলের স্মৃতিতে এই ঘটনাটি জ্বলজ্বল করছে :

'রামসে ক্লার্কের উপস্থিতি ছিল উৎসাহদ্দীপক, তিনি একটি বিবৃতিও দিলেন, 'ভূট্টোর মামলাটি হত্যা মামলা ছিল না বরং ওটা ছিল বিচারের হত্যা।"

ভুট্টোর বিচারের নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত আইন বিশেষজ্ঞরা পত্র-পত্রিকার জন্য এক বিবৃতি দিলেন। তারা সেখানে বললেন অনেক বিষয়ে এই বিচারে অসঙ্গতি রয়েছে, বিশেষভাবে ছয়টি কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন : আদালতের বিচারপতি ও আইনজীবীদের পক্ষপাতিত্ব, প্রকাশ্যে বিচার না করা, বিচারের নথিপত্র না রাখা, বিচারের কাঠামো না মেনে চলা এবং সাক্ষ্য ও আলামত যথাযথ না থাকলেও মামলা আমলে নিয়ে বিচারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যওয়া।

বসন্তের প্রথম দিকে জুলফিকার তার বড় পুত্রকে চিঠি পাঠালেন। এক বার্তাবাহক লন্ডনে আসলেন এবং মুর্তজাকে জানালেন জুলফিকারের স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং দাতে সমস্যা যার জন্য তার দাতের ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। আমার মনে আছে আমার পিতা আমাকে একবার বলেছিলেন, জেলের খাবারে কাচের টুকরা থাকতো, খেতে গিয়ে মাড়ি কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতো। জেলের খাবার ও রক্ত একাকার হয়ে যেতো। পত্রবাহক এসব সংবাদের সাথে একটি চিঠিও দিলেন।

মুর্তজা চিঠি পড়ার সময় দেল্লা তার পাশে ছিলেন। জুলফিকারের নির্দেশ, 'আফগানিস্তানে যাও এবং নিজ দেশের কাছে থাকো।' আফগানিস্তান তখন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তখনো রাশিয়ার দখলদারিত্বে যায়নি বা দাড়িওয়ালা মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করেনি। জুলফিকারের বার্তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতিশোধের। দেল্লা আমাকে বলেছেন, চিঠিটা আমি দেখেছি এবং ওদের বার বার পড়তে দেখেছি। জুলফিকার মুর্তজাকে বার্তাটি পাঠান এবং তার মাধ্যমে শাহ্‌কে। 'তোমরা যদি আমার হত্যার প্রতিশোধ না নাও, তা হলে তোমরা আমার পুত্র নও।'

দেল্লা বললেন, মুর্তজা তখনি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। আমি তাকে বললাম, আমার মনে হচ্ছে তার পিতাকে সামরিক শাসক হত্যা করবেনা, মুর্তজা তার উত্তরে বলেছিল, তারা তাই করবে, তুমি পাকিস্তান কে জান না।

যে ক্ষীণ আশা ছিল সামরিক শাসক তার পিতাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা না-ও করতে পারে, এক বছর পর সে আশা মিলিয়ে গেলো। পাকিস্তানের বিখ্যাত লেখক, ইতিহাসবিদ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তারিক আলী লন্ডনে বসবাস করেন। তার জুলফিকারের সাথে মতবিরোধ আছে এবং তিনি পিপিপি-তে যোগ দেননি এই কারণে যে দলটি তেমন বামপন্থী নন। দলে জোতদার রয়েছে– কিন্তু তারিক আলী ভূট্টো বাঁচাও আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিলেন। তারিক আলী আমাকে বলেন, যখন মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হলো তখন প্রধান কাজ হলো তার জীবন রক্ষা করার। পুরো জিনিষটাই হলো ন্যাক্করজনক। সেনারা দেশের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করবে, তা মেনে নেওয়া যায় না। ভুট্টো ও আমার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, এখনকার এই বিষয়ে তা কোনো সমস্যা নয়। মুর্তজা এই মত পার্থক্যের কথা জানতেন, তার কাছেও এটা কোনো সমস্যা ছিল না। বরং সে সন্তুষ্ট ছিল

www.pathagar.com

যে আমি এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছি। অনেক সময়ে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতো, আপনি যা করছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

আন্দোলনের গতি অনেক গুন বৃদ্ধি পেল। ভুট্টো বাচাও কমিটি এখন শুধু বৃটেনে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও পাকিস্তানীদের সভা শোভাযাত্রা করা শুরু করে। সুইডেন, ফ্রান্স, মধ্যপ্রাচ্য, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচেষ্টা জোরদার করা হলো। এসকল আন্দোলনের খবর বি বি সি-র বৈদেশিক সার্ভিসের মাধ্যমে পাকিস্তানের আভ্যন্তরে প্রচার হতে থাকে। সে সময় এসব খবর পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা যেত না। তারিক আলী বললেন, 'তখন আমাদের মনে একটি ধারণা কাজ করতো, যত কিছু হোক শেষ পর্যন্ত তারা ভুট্টোকে হত্য করবে না-কোনো না কোনো ভাবে এটা বন্ধ হবে। আমার মনে হয় মুর্তজা এবং শাহ্নেওয়াজও ওই রকম ভাবতো। তিনি একজন অত্যন্ত্য জনপ্রিয় নেতা, গণঅভ্যুত্থান ঘটবে, মানুষ ফেটে পড়বে কারাগার ভেঙ্গে ফেলবে... কিন্তু আমরা, এটা হিসেবে আনিনি যে জিয়া ইতিমধ্যে নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষকে কাবু করে রেখেছে।'

প্রকাশ্যে চাবুক, পাথর ছুঁড়ে মারা এবং এসব নির্যাতন জনসম্মুখে করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শক্তি ও নির্যাতন করার পাশবিক ক্ষমতার প্রদর্শনী হয় যা এর আগে কখনো মানুষ দেখেনি। এ অবস্থায় গণঅভ্যুত্থান একেবারেই অসম্ভব ছিল কারণ মানুষ ছিল খুবই ভীত।

জুলফিকারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণপ্রতিরোধের বিষয়ে মুর্তজা ও শাহ্নেওয়াজ প্রশ্নের সম্মুখীণ হন। এক সাংবাদিক মুর্তজাকে প্রশ্ন করেছিলেন পাকিস্তানে তার পিতার সমর্থনে কেনো জনগণ কিছু করছে না। মুর্তজা তার উত্তরে বলেছিলেন, তেমন বড় গণঅসন্তোষ না হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত, হাজার হাজার সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সীমান্ত থেকে রক্ষীদের তুলে এনে দেশের ভেতরে এমন শক্তির মহড়া দেখানো হচ্ছে যে মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

মুর্তজার পাশে বসেছিলেন শাহনেওয়াজ গাঢ় খয়েরি রং-এর স্যুট পরা। তখনও তার গোঁফ গজায়নি তার বড় ভাইয়ের মত। স্থির গলায় বললেন 'আমি আশা করি জেনারেল জিয়া আন্তর্জাতিক মহলের আবেদন শুনবেন... কিন্তু তা যদি না শোনেন, তা হলে পাকিস্তানের জন্য খুব খারাপ সময় অপেক্ষা করছে।' তবে কোনো ভাই সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা বলেনি।

কিন্তু এই বিষয়টি ওদের চিন্তায় ছিল, জুলফিকারের চিঠি পাওয়ার পর তারা তাগাদা অনুভব করে। তারিক আলী এ বিষয়ে বললেন, মুর্তজা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কি মনে হয়। আমি বলেছিলাম, 'মুর্তজা আমার মনে হয় না এটা খুব ভালো কৌশল, আর যদি হয়ও প্রকাশ্যে থেকে তা করা যায় না। যেখানে সবকিছু পর্যবেক্ষণে আছে।' আমার একেরারেই মনে হয়নি যে সেটা সম্ভব।' মুর্তজা এরপর বললেন, 'এখন তা হলে আমার পিতাকে বাচাতে এ ছাড়া আর কি করতে পারি?'

আমি তাকে বললাম 'এভাবে এটা সম্ভব নয়। এ ভাবে হবে না। তাকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে।'

* * *

www.pathagar.com

রাওয়ালপিণ্ডি রাজধানী ইসলামাবাদের একেবারে কাছে। সকল সময়ই এটা সামরিক বাহিনীর গ্যারিসন কেন্দ্র। বৃটিশদের সেনারা এখানে ছিল, স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানী সেনা। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো থেকে এ স্থানটি উচুঁ তাই একটু শীতল ও ভালো হাওয়া এখানে। কিন্তু স্থানটির দুর্ণাম অনেক বিশেষ করে রাজনীতিবিদের কাছে। উনিশ শতকের আফগান রাজা সুজা শাহ এখানে দেশান্তরী জীবন কাটিয়েছেন। এখানেই মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ'র মনোনীত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং এখানেই সেনারা ভুট্টোকে রেখেছেন মৃত্যুর অপেক্ষায়।

রাওয়ালপিণ্ডি কারাগারকে এখন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। জিয়া এটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন যেন ভুট্টোর কোনো স্মারক বা চিহ্ন না থাকে। কারাগারের একটি প্রাচীর এখনো আছে পুরানো লাল ইটের আর এটাকে ঢেকে রেখেছে লাতানো সবুজ আইভি গাছ। এ ছাড়া রাওয়ালপিণ্ডি কারাগারের বাকি অংশ এখন শপিং মল। এর অবস্থানটি প্রধানমন্ত্রীর পুরানো বাসভবন এবং সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন দফতরের মাঝখানে। এখন নাম জিন্নাহ পার্ক। এখন এখানে ম্যাকডোনাল্ডস, সিনেপ্যাক্স সিনেমা এবং একটি পাপাসালিস পিজা। যেখানে কারাগারের ফটক ছিল সেখানে এখন দোতলা দালান। দোতলায় বড় করে লেখা 'ব্লাকস' এবং একজন মহিলার ছবি, হয়তোবা একটি বিউটি পার্লার, আমি ঠিক জানি না। নিচের তলায় লেখা 'তেকুইলা সিটি', এর সাথে আর কিছু লেখা নাই, অনুমান করা যায় কি হয় সেখানে, এ্যালকহল ফ্রি পাকিস্তানে। এখানেই সেনারা ভুট্টোকে হত্যা করেছে। এবং পরে সকল চিহ্ন ও রক্ত মুছে ফেলেছে।

দেল্লার মনে আছে, ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিলের আগের রাতটি ছিল ব্যস্ততাপূর্ণ। সেন্ট্রাল লন্ডনের স্টনহোপ মিউসে যে বাড়িটিতে মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ থাকতেন, সেটা ছিল লোকারণ্য। ভুট্টো ভাইদের এই বাড়িটিতে সবসময়ই লোকজনের আনাগোনা থাকতো, দেশের থেকে চিঠি বা খবর নিয়ে আসা আগন্তুক, ভুট্টো বাঁচাও কমিটির সমর্থক ও লোকজন, মাঞ্চেস্টার বার্মিংহাম এবং লিডস থেকে আগত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা সে রাত্রিতে বসার ঘরে ও করিডোরে অনেকে ঘুমিয়েছে, মেঝেয় বসে বাড়িতে রান্না পাকিস্তানী খাবার খেয়েছে। সকলে ঘুমিয়েছিল, সকাল ছয়টা ও সাতটার মধ্যে এক সময় ফোন বেজে উঠলো।

'এটা কি ভুট্টোদের বাড়ি? ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন। মুর্তজার ঘুম যেন না ভাঙ্গে, সন্তপর্ণে দেল্লা জবাব দিল, হ্যা। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে লোকটি বি বি সি র রিপোর্টার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জানেন কি-না যে ভোর রাত দু'টোর সময় ভুট্টোকে হত্যা করা হয়েছে। দেল্লা কথাটির পুনরাবৃত্তি না করে শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, তিনি জানেন না। তখন বিবিসি'র রিপোর্টার পরিবারের মুখপাত্র মুর্তজার সাথে কথা বলতে চাইলেন। দেল্লা মুর্তজাকে ঘুম থেকে উঠালেন ফোনটি তার হাতে দিয়ে বললেন, বিবিসি থেকে ফোন।

মুর্তজার উঠে বসলেন পা ভাজ করে বিছানার ওপর। দেল্লা উঠে যেয়ে বসলেন অপরদিকে। তখনই মুর্তজার হাত কাঁপতে থাকলো, মুখ কাঁপতে থাকলো, মুখের দাঁত বাড়ি খেতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর মুর্তজা স্থির হলেন এরপর বললেন, 'তারা একজন হিরোকে হত্যা করেছে। তার বদলা তাদের দিতে হবে।' মুর্তজা ফোন রেখে দিলেন।

www.pathagar.com

দেল্লার মনে আছে তখন মনে হয়েছিল, খাঁচা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টারত পাখির মত। দেল্লা মুর্তজাকে জড়িয়ে ধরলেন, শান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তাকে সাবধান থাকতে বললেন।

এই ঘটনার আশঙ্কা তাদের আগের থেকেই ছিল। তাদের পিতার শেষ চিঠি পাওয়ার পর থেকেই তারা তৈরী হয়েই ছিল।

মুর্তজা উঠে গোছলখানায় গেলেন, গোছল করে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরলেন। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানরা শোক প্রকাশের জন্য সাদা কাপড় পরে থাকেন। মুর্তজা এরপর পাশের ঘরে গিয়ে শাহকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, তাদের পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। মুর্তজা শাহকে একসেট সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী দিয়ে বললেন, গোসল করে পরে নিতে। ইতোমধ্যে শোক-সন্তপ্ত মানুষের ভীড় জমে উঠেছে বাড়ির বাইরে। মিডিয়ার লোকজনও এসে জড়ো হচ্ছে।

মুর্তজা সাংবাদিকদের সামনে স্বাচ্ছন্দই বোধ করেন, কিন্তু সেদিন আর বাড়ির বাইরে যেতে চাইলেন না। আমি এখন কি বলবো, আর বলার কি আছে? মুর্তজা দেল্লাকে জিজ্ঞেস করলো। 'যে কথাটা ফোনে একটু আগে বলেছো সেটা আর বলবে না। তোমাকে সাবধানি হতে হবে, তোমার মা এখনো পাকিস্তানে।' শাহনেওয়াজকে নিয়ে মুর্তজা বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গেলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সাংবাদিকদের ক্যামেরা চলতে থাকলো। দুই ভাই ছিল হতাশ ও পরিশ্রান্ত। মুর্তজা কথা বলতে লাগলেন, 'আমার কথা বলার বেশি কিছু নাই। এটা আমাদের পরিবারের জন্য অনেক ক্ষতি। তারা আমাদের পিতাকে হারমানার চেষ্টা করেছে। তারা তাকে নির্যাতন করেছে দু'বছর। কিন্তু সফল হয়নি। তারা তার উপর কলঙ্কলেপন করার চেষ্টা করেছে। এখন তারা তাকে হত্যা করেছে। আমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। তারা আজ একজন শহীদকে কবর দিয়েছে।'

জুলফিকারের ফাঁসি কার্যকর ও তাকে কবর দেওয়ার পর সেনাবাহিনী ঘোষণা দেয়। তার পরিবারবর্গকে লাশ দেখতে দেওয়া হয়নি। এমনকি কোনো প্রমাণপত্রও নাই যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, না আছে মেডিক্যাল রিপোর্ট, না আছে অন্য কোনো প্রমাণ। সামরিক বাহিনী ফাঁসির কথা দাবী করলেও তার পক্ষে কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি। তার পরিবারবর্গ বিশ্বাস করে তাকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। ববি কেনেডি জুনিয়র স্মরণ করেন পিতার এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড মুর্তজার জন্য ছিল মর্মান্তিক। 'এই ঘটনা তাকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে যে সকল কিছুর প্রতি সে বিশ্বাস হারায়, বিশ্বাস হারায় সরকারের প্রতি, বিশ্বাস হারায় দেশের প্রতি।'

পাকিস্তানে ভুট্টোর মৃত্যুর খবর মানুষকে প্রচণ্ডভাবে শোকাভিভূত করে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও জুলফিকারের নির্বাচনী এলাকা লারকানায় মানুষ নিজ শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভুট্টোর আদিবাসস্থান গারহি খুদাবক্সে মানুষ ও গাড়ির ঢল নামে তার কবর জেয়ারত করার জন্য।

আবার কেউ কেউ এই ঘটনায় আনন্দও প্রকাশ করে। এদের মধ্যে একজন হলেন জমিদার খুরো পরিবারের নিসার খুরো। যিনি ভুট্টোর ফাঁসি দাবি করে আসছিলেন। পিপিপি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লারাকানার আধিবাসি আবদুল ওয়াহিদ কাটপার স্মরণ করেন খুরো আওয়াজ তুলেছিল ভূট্টোকে আগে ফাঁসিতে ঝোলাও তারপর তার বিচার কর।

www.pathagar.com

লারকানায় বিভিন্ন স্থানে সভা করে সে বলেছিল, আগে ফাঁসি পরে বিচার।

কাটপার জানান, ভুট্টো সাহেবকে যখন হত্যা করা হয় তখন খুরো সারা শহর জুড়ে মিষ্টি বিতরণ করে এবং সকলেই এটা জানে। তিনি বেদনার সঙ্গে বললেন, অথচ জুলফিকারের মৃত্যুর পর তার কন্যা বেনজির নিসার খুরোকে পিপিপি'র সিন্ধু প্রদেশ কমিটির প্রধান করেন। খুরো এখনো বেনজিরের স্বামীর পিপিপি-তে এবং সিন্ধুর এ্যাসেম্বলির স্পিকার।

লন্ডনে, সকাল থেকেই লোকজন আসতে থাকে ভুট্টোদের শোক জানাতে। মার্গারেট থ্যাচার এসেছিলেন। তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজকে চিঠি দিলেন নুসরাতকে দেওয়ার জন্য। এমপিরা এবং ভুট্টো বাঁচাও কমিটির সদস্য ও সমর্থকরা এসেছিলেন। তারিক আলী বললেন, প্রবাসী পাকিস্তানিরা মনে করেন, যদি আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতো এবং সামরিক জান্তাকে বলতো, আমরা চাই না যে তোমরা ভুট্টোর ফাঁসি দাও, তা-হলে কখনো ভুট্টোর ফাঁসি হতো না। তারিক আলী আরো বললেন, হেনরি কিসিঞ্জার যে তার অঙ্গীকার রাখেন না, তার জলন্ত উদাহরণ হলো জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তারিক আলী বললেন, মুর্তজা তখন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। তবে তার চেহারায় স্পষ্ট বিশেষ করে তার পিতার ফাঁসি হওয়ার পর। বাড়ির ছোট ছেলে শাহনেওয়াজ ছিল প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ। দেল্লার মনে আছে পুলিশ একদিন সকালে এসে দরজায় নক করে বলে পাকিস্তান দূতাবাসে ফোন করে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে, ফোন কলের সূত্র ধরে তারা বাড়ি সনাক্ত করেছে।

তবে সে সময়ে টেকনোলোজী এতো উন্নত ছিল না যে, সহজেই বের করা যাবে ফোন কলের উৎস কোথায়, তারপরও পুলিশের বিভিন্ন ব্যবস্থাও ছিল। শাহনেয়াজ দরজা খুলে দিল। সে নিজেই ফোন কল করেছে। সেখানে কোনো বোমা ছিল না, সেরকম করার কোনো শক্তি ও উপায়ও ছিল না, কিন্তু সে ছিল তরুণ এবং ছিল ক্রুদ্ধ। সে পাকিস্তানের দুতাবাসের লোকদের ভীত করতে চেয়েছিল এবং বোঝাতে চেয়েছিল ঘটনার পরিণতি আছে। পুলিশ শাহ্‌কে থানায় নিয়ে গেল। মুর্তজা শাহ্‌'র সঙ্গে থানায় যেতে চেয়েছিল, পুলিশ তাকে একাই নিয়ে গেল। পুলিশ বুঝতে পারে শাহ্ অত্যন্ত মানষিক চাপে এই কাজটি করেছে। তার পিতাকে সদ্য হত্যা করা হয়েছে, তারা বিষয়টি উপলব্ধি করলো।

ভুট্টো বাঁচাও কমিটি লন্ডনের হাইড পার্কে নামাজে জানাজা করে। হাজার হাজার লোক সাদা পোশাকে জানাজায় যোগ দেয়। তারিক আলী বললেন সকলেই খুবই ক্রুদ্ধ ছিল। আমার মনে আছে আমি যখন মুর্তজা ও শাহ্‌'র সঙ্গে কথা বলছিলাম, মুর্তজা বললো, 'এই হলো শেষ পর্যন্ত, এর শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের এই ভাষাটাই মানুষ বোঝে।' মুর্তজা ছিল খুবই বিক্ষুব্ধ তার পিতাকে ফাঁসিতে দেওয়া হলো, সে বাইরে থেকে জানলো-শুনলো কিন্তু কিছুই না করতে পারার অসহায়তা তাকে ক্ষুব্ধ করে।

দেল্লা এথেন্সে ফিরে যাওয়া স্থগিত করে মীরের সঙ্গে থেকে গেল। পিতার ফাঁসির পর সে ছিল বিধ্বস্থ। মুসলমানদের শোকের চল্লিশ দিন পালন করলো। মুর্তজা খালি মেঝেতে, কোনো কম্বল বা বালিশ ছাড়া ঘুমালো। দেল্লাকে বললো, আমি স্মরণ করতে চাই আমার পিতাকে। কিভাবে তিনি তার কারাগারের সেলে খালি মেঝেতে দিনের পরদিন, রাতের পর

www.pathagar.com

রাত কাটিয়েছেন। তার অনুভূতিটা আমি পেতে চাই। দেল্লা ও তার দুই বোন নানা এবং ভাও মুর্তজাকে বোঝাতে চেষ্টা করে খালি মেঝেয় না ঘুমানোর জন্য। তারা মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ ঠিকমত খাচ্ছে কি-না, তারা কিভাবে আছে খোঁজ-খবর নিতো। নানা মুর্তজাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন সে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে ঘুমায়, তাকেও সে ওই কথা বলেছিল। একমাস পর মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখনও তিনি মেঝেতেই ঘুমাতেন।

* * *

কূটনৈতিক ও মিডিয়ার মাধ্যমে দু'বছর চেষ্টা করে, স্বৈরশাসকের কাছে হার মেনে তাদের পিতাকে হারিয়ে তারা তাদের লড়াইয়ের ভিন্ন পথ নিল। তাদের পিতার চিঠির সূত্র ধরে পাকিস্তানে নির্যাতন ও নৃশংসতা বৃদ্ধিতে এই দুই তরুণ, যাদের চে-গুয়েভারা উদ্দীপ্ত করে, ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রিকার প্রতিরোধ যুদ্ধ যাদের অনুপ্রাণিত করে, তারা জিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজের সহচর সুহেল পাকিস্তানে তার পরিবার রেখে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সুহেল বললেন, 'যেখানে শাসনতন্ত্র বাতিল হয়, যখন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সহাবস্থান থাকে না, যখন একজন বন্দুকের নলের ডগায় দেশ চালায়, তখন নাগরিকদের কর্তব্য হয়ে দাড়ায় তার প্রতিরোধ করার।'

তারিক আলী যিনি ঘনিষ্ঠভাবে তাদের লড়াই পর্যবেক্ষণ করেছেন, বলেন, 'বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে তাদের পিতার জীবন রক্ষায় সমর্থন না পাওয়ায় তাদের মনে হয়েছিল, সশস্ত্র লড়াই ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। সে সকল চেষ্টাই করেছে, পত্রিকা প্রকাশ করেছে, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছে। প্রেস কনফারেন্স করেছে, এ্যামবাসীর সামনে বিক্ষোভ করেছে, বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছে, কথা বলেছে আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এবং কোনোটাই কাজ করেনি। ভুট্টোর জীবন রক্ষা করা যায়নি।

১৯৭৯ সালের মে মাসে শাহনেওয়াজকে নিয়ে মুর্তজা দামেস্ক গেলেন হাফেজ আল আসাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য। প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ তাদের পিতার বন্ধু এবং দু'জনকে রাজনৈতিক আশ্রয় দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মুর্তজা অবশ্য দেল্লাকে বলেননি, কেন তিনি দামেস্ক যাচ্ছেন, তবে দেল্লা বুঝতে পারেন। বিষয়টি অতি সাধারণ নয়, ভিন্ন কিছু। দেল্লা বলেন, পিতার ফাঁসির পর তার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। সে তার কাজে গভীর মনযোগী হয়। আগে ছিল সে ছাত্র, প্রধানমন্ত্রীর পুত্র– সে যেত নাইটক্লাবে, সমুদ্র সৈকতে, সে সবচেয়ে ভালো জিনিষটাই পছন্দ করতো, জামা-কাপড়, খাদ্য– এখন থেকে সবকিছু বন্ধ। সে যায় সিরিয়া, লিবিয়া ও আফগানিস্তান। তাকে হাসতে দেখা যায় না। সে নিজেকে আত্মসংবরণ ও কঠিন অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করেন। তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে লাগলেন।

মুর্তজা টেলিফোনে দেল্লাকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আফগানিস্তানে যেতে বললেন। মুর্তজা সিরিয়া হয়ে আফগানিস্তানে যাবেন। ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মে দু'জন আর শুধুমাত্র লবিস্ট বা পরস্পরের সাহায্যকারী বা জীবন সংগ্রামের খবর লেন-দেন কারী নন– তারা তখন গভীর প্রেমিক-প্রমিকা। মুর্তজা লন্ডনের স্লোয়ানে স্ট্রিটের এক জুয়েলারি দোকান

www.pathagar.com

থেকে এক সাধারণ আংটি কিনে দেল্লাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তা সে পারে না সে বিবাহিত। তার স্বামী জেনারেল রউফোগালিস তখন বন্দী, সে সময় সে এই বিষয়ে ভাবতে পারে না। হতে পারে পরে কোনো এক সময়।

দেল্লা ১২ জুন কাবুলে গেলেন। মুর্তজা ছিল বিমানবন্দরে। সরকার তাকে সেখানে একটি বাড়ি দিয়েছে থাকার জন্য। বাড়িটা চিকেন স্ট্রিটের কাছে এবং কাছেই ছিল মাংসের কসাইয়ের দোকান। অল্প কিছু আসবাবপত্র। শোবার ঘরে দেয়ালের পাশে সদ্য প্যাকেট খোলা চকচকে অস্ত্র। যার ঘরে আগে থাকতো বই, সেই মুর্তজা অস্ত্রগুলো দেল্লার নজরে আসায় বললেন, ও কিছু নয় এগুলো খেলনা।

দেল্লা উত্তরে বললেন, খুব ভালো খেলনা। আমার মনে হয় না সে বুঝতে পেরেছিলো, কি সাংঘাতিক কাজে সে হাত দিয়েছে। একত্রিশ বছর পর দেল্লা আমাকে বললেন, কি সাংঘাতিক কাজে হাত দিয়েছিল সে। এটা নিশ্চিত যে সে নিজেকে সমর্পন করেছিল এই কাজে। আমি কখনো আমার স্বামীর জন্য এ ধরণের কাজ করে। এই বিপদ ডেকে আনতে রাজী হতাম না। সে যা করেছিল তার পিতার নির্দেশে, যা তার কাছে ছিল অলংঘনিয়। বেদনাহত হলেও তাকে এই সাহসের জন্য, তার কর্তব্যপরায়ণতার জন্য আমি শ্রদ্ধা না করে পারিনি।

রাতের খাবার কাবুলি নান ও ভেড়ার মাংস খাওয়ার পর দেল্লা অস্ত্রের বিষয়টি আবার তুললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কেন সে আফগানিস্তানে অবস্থান করছে। সোজাসুজি বললেন, তিনি মনে করেন যে পথে সে ও শাহ্ তাদের পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে সে পথটি সঠিক নয়। মুর্তজা ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, তুমি এটা বুঝবে না। তারা আমার পিতাকে ফাঁসি দিয়েছে। তুমি বুঝতে পারবে না এটা কি রকম আমাদের আঘাত দিয়েছে। মুর্তজা তাকে বললেন, সে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অস্ত্র বোঝাই প্লেন নিয়ে এখানে এসেছে। পুরো প্লেনে সে ছিল একমাত্র যাত্রী। দু'মাস আগেও দেল্লা মুর্তজাকে যেভাবে জানতো এখন তার সঙ্গে মিল নেই, একেবারে ভিন্ন মানুষ। তবুও তারা কিছুটা সময় আনন্দে কাটালো। মুর্তজা দেল্লার জন্য শালোয়ার কামিজ কিনে দিলেন। দেল্লা মনে করেছিলেন কামিজ ট্রাউজারের সাথে মানাবে, সেভাবেই সে পরলেন।

এক সপ্তাহ পর দেল্লা এথেন্সে রওয়ানা হলেন। করাচিতে যাত্রা বিরতি করলেন নুসরাত ও বেনজিরকে চিঠি দেওয়ার জন্য। দেল্লার জীবনে এটাই প্রথম পাকিস্তান সফর। ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে আসার পর তাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো নুসরাতের কাছে। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ভালো করে একে অপরকে দেখলেন। এটাই ছিল তাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ দেখা। দু'জনের চেহারায় আশ্চর্যজনক মিল, একইরকম প্রশস্ত চিবুক, খাড়া নাক, একই রকম শারিরীক গঠন, তবে নুসরাত দেল্লা থেকে একটু খাটো। নুসরাত কম্পিত গলায় তার পুত্রের খবর জিজ্ঞেস করেন। দেল্লা মুর্তজার চিঠি হাত বাড়িয়ে তার হাতে দিলেন। দেল্লার যতখানি জানা নুসরাতের সকল প্রশ্নের এক এক করে উত্তর দিতে থাকলেন। নুসরাত তার হাত ধরে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই বাড়ির কান আছে।' দীর্ঘ যাত্রায় দেল্লা ছিল ঘর্মাক্ত, তার জামা কাপড় পাল্টানো ও গোছানোর প্রয়োজন। কিন্তু নুসরাত চাচ্ছিলেন বেনজিরের চিঠিটা দিক আগে। দেল্লা অপেক্ষা করেন কিন্তু বেনজিরের দেখা নাই। দেল্লা

www.pathagar.com

অপেক্ষা করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে তাকে বেনজিরের কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

তাকে পাশের আরেকটা বাড়িতে ৭৯ ক্লিফটনে নেওয়া হলো। এটা বাইরের বাড়ি ও অফিস। সেখানে একটা ঘরে বেনজির টাইপ করছিলেন। সে মুখ তুলেও তাকালো না সোনালী চুলের এই আগন্তুকের দিকে। দেল্লা তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'আমি এতোক্ষণ অপেক্ষা করে আছি, আমার বিষয়টি খারাপ লাগছিল, আমাকে অপেক্ষা করিয়ে সে কি বোঝাতে চায়। তার ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছি, যার সঙ্গে তার দু'বছরের দেখা নেই। আফগানিস্তান থেকে এখানে এসেছি তাদের চিঠি নিয়ে, যেন তার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

অবশেষে দেল্লা তার সাত বছরের ছোট বেনজিরের সঙ্গে কথা বললেন, সাক্ষাতটি পরস্পরকে নিজেদের নাম বলা ও চিঠি দেওয়া ও গ্রহণের মধ্যে সমাপ্ত হলো। বেনজিরের আচরণ ছিল শীর্ষ রাজনৈতিক নেতার মত। দেল্লা বললেন, মুর্তজা তাকে বলেছিলেন তাদের পিতার অবস্থানটি বেনজির নিতে চায়, তার লক্ষ্য আগাগোড়া সেদিকে। দেল্লার জন্য এই যাওয়াটা ছিল দারুণ অস্বস্তিকর। নুসরাত তার সঙ্গে কথা বলেন ফিস ফিস করে এই ভয়ে যে বাড়িতে আড়িপাতার যন্ত্র বসানো থাকতে পারে আর বেনজির তো কথা বলবেনই না। দেল্লা পরের দিন সকালেই এথেন্সে রওয়ানা হলেন।

যখন দেল্লা গ্রিসে এবং মুর্তজা কাবুলে তখন তারা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে কিছু করার আশা একেবারে পরিত্যাগ করলেন। তাদের দু'বছরের প্রচেষ্টায় এই উপলব্ধি হলো শান্তিপূর্ণভাবে সামরিক শাসকদের কিছু করা সম্ভব নয়। জিয়ার নিপীড়ণ ছিল প্রচণ্ড এবং সামরিক বাহিনী তখন তার অবস্থান পাকাপোক্ত করে বসেছিল, দুই ভাই তখন পিপলস লিবারেশন আর্মি নামে এক গেরিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তারা সেই বাল্যকাল থেকে যে গেরিলা যুদ্ধের কথা শুনে রোমাঞ্চিত হতেন তারই প্রতিরূপ দিতে গিয়ে টের পেল একটি প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সাথে পেরে ওঠা সহজ কাজ নয়।

দেল্লাকে তাদের পিএলএ সম্পর্কে মুর্তজা তামাশা করে লিখলেন:

> আমরা অর্থাৎ পি এল এ অনেক কারণেই উল্লেখ করার মত : ১। আমাদের অফিসিয়াল মুখপাত্র হলো একটি কুকুর, ২। যোদ্ধার চেয়ে আমাদের কমান্ডার বেশি, ৩। আমরা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সংগঠন যারা লড়াইয়ে বিশ্বাস করি, ৪। গোপনীয় কিছু গোপন রাখা যাবে না, ৫। পিএলএ প্রধান বন্ধুর চেয়ে শত্রু সৃষ্টিতে বেশি আগ্রহী– কারণ সে মনে করে কাজটি মজার, ৬। এখনও কেউ জানে না প্রধান কে, ৭। অফিসিয়াল মুখপাত্র হাড় চুষতে পছন্দ করে এবং কার্পেটের ওপর বিষ্ঠা করে।

মুর্তজা আরো লিখলেন :

> পি এল এ যাদের জন্য লড়াই করছে সেই পাকিস্তানের জনগণ এক অদ্ভুত কিসিমের মানুষ। তাদের 'স্বাধীনতা যুদ্ধে' জয় হয় তাদের চাওয়ার এক বছর

www.pathagar.com

> আগে। স্বাধীনতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের হাতেপায়ে ধরা হয়েছে স্বাধীন হওয়ার জন্য... পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জনগণের বীরত্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ১। যখন এক সৈন্য তার পেছনের দিকে পড়ে যায় তখন তার মগজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ২। তারা সমান অধিকারে বিশ্বাস করে : যদিও তারা জনসংখ্যার শতকরা ০০.০৬ ভাগ কিন্তু জাতীয় সম্পদের শতকরা ৭০ বা ৮০ ভাগ তাদের উদরে যায়।
>
> পি. এল এ'র অফিসিয়াল মুখপাত্র ওক্ষ (কুকুর) মনে করে যে সে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে এ বিষয়ে যে কোনো সময়ে বিতর্কে বসতে প্রস্তুত। আমরা তাকে (কুকুর) নিষেধ করেছি না করার জন্য, কারণ তা হলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে গণআত্মহত্যা শুরু হবে। এটা আমাদের সাহসী সেনাবাহিনীর একটা স্বাভাবিক চরিত্র। তারা বীরত্বের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করায় বিশ্ববিখ্যাত। এক ধূর্ত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ একবার বলেছিলেন, 'যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সেনাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না।' খাটি কথা। আর যখন জেনারেলরা সরকার চালায় তখন এটাকে শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। চাবুকের রাজত্ব হবে এবং ব্যারাক হবে কবর। তখনই এটার শেষ হবে। এভাবেই সমাপ্ত হবে দুঃখজনক ও সংক্ষিপ্ত পাকিস্তানের ইতিহাসের। যে জাতি তার রক্ষককে হত্যা করেছে। যে হাত তাকে খাওয়া দেয় সে হাত তারা ভেঙে দেয়। ইতিহাসের কাছে পাকিস্তান হবে একটি লজ্জার এবং ভুলে যাওয়ার।
>
> মুর্তজা চিঠির শেষে লিখলেন ভালোবাসাসহ সালাহউদ্দীন। জেরুজালেমের মুক্তির লড়াইয়ে আরব যোদ্ধা সালাহউদ্দীনের স্মরণে এই নাম!

জুলাইয়ের শেষ দিকে কর্নেল গাদ্দাফির সঙ্গে দেখা করার জন্য মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ লিবিয়ায় যান। সেখান থেকে তারা সিরিয়ায় যান। দেল্লা সিরিয়ায় দুই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে দেখা করার সময় মুর্তজা দেল্লাকে সঙ্গে নেন। সেখানে দেল্লাকে তার প্রেমিকা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন মুর্তজা। সিরিয়ার সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে একটা মিটিং-এ এক সিরিয়ার জেনারেল দেল্লাকে জিজ্ঞেস করেন, তার স্বামী জেনারেল রউফোগালিস কেমন আছেন। দেল্লা হতচকিত হয়ে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। দেল্লা যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন এবং বলেন জেনারেল রউফোগালিস ভালো আছেন। দেল্লা ভীত হয়ে পড়লেন। মুর্তজা দেল্লাকে মা'লুলায় বেড়াতে নিয়ে গেলেন, সিরিয়ার এই অতি প্রাচীন শহরে আদি ভাষা আরামেইকে এখানকার লোকজন কথা বলে। তারা একটি খ্রিস্টান মনিস্টারি দেখতে যান। এক মহিলা জ্যোতিষি তাদের ভবিষ্যৎ গণনা করলেন কার্ড দিয়ে। সে দেল্লাকে বললেন তার কোনো সন্তান হবে না, তবে তার সঙ্গের লোকটির সন্তান হবে। দেল্লার কাছে এটা বাস্তব ও একই সঙ্গে বিস্ময়, কিভাবে হলো। সে এক দক্ষিণপন্থি বন্দি জেনারেলের স্ত্রী এবং বামপন্থি উদীয়মান বিপ্লবীর প্রেমিকা।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমাজতান্ত্রিক সরকারের সাথে যে সকল রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

www.pathagar.com

ছিল, মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ সে সকল রাষ্ট্রে তাদের নবগঠিত পিপলস লিবারেশন আর্মির প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য যান। তারা তাদের ধন্যবাদ দেন তাদের পিতার জীবন রক্ষার প্রচেষ্টায় জেনারেল জিয়ার কাছে আবেদন করার জন্য। তারা বললেন, এবার তারা তাদের সংগ্রামে এক নতুন দিকে বাক নিচ্ছে। এখন সশস্ত্র যুদ্ধ করবে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে।

ইয়াসির আরাফাত জুলফিকারকে খুব পছন্দ করতেন, তিনি দুই ভাইকে তাদের লড়াইয়ের এই নতুন পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানালেন এবং তার লড়াই এই দুই ভাইকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অনেক বিশিষ্টজনেরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন– লোকের মুখে মুখে ছিল আরাফাত পিএলও'র সদস্যদের কাবুলে পাঠিয়েছেন মুর্তজা ও শাহনেওয়াজের লোকজনকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে। এমনও বলা হলো পিএলও থেকে অস্ত্র চালান আসছে এবং আরাফাত ব্যক্তিগতভাবে দুই ভাইকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু এই প্রচার সঠিক ছিল না। তারা পিএলও থেকে কিছুই পাননি। শুধু দুই ভাইয়ের গলায় ছিল প্যালেস্টাইনি রুমাল, যাকে তারা বলে কেফফিয়া। মুর্তজা সিনিয়র কমান্ডার হিসেবে পরতেন লাল কেফফিয়া আর শাহনেওয়াজ পরতো কালো কেফফিয়া। এই পর্যন্তই। আমার পিতাকে আমি জানি। আমি নিশ্চিত ওইসব প্রচারে তিনি আনন্দ পেতেন, প্রচারের ফানুস ও তার সংগঠন সম্পর্কে কল্পকাহিনী শুনে।

সেপ্টেম্বরে মুর্তজা ও দেল্লার দেখা হলো জেনেভায়। মুর্তজা সেখানে গিয়েছিলেন আরব আমিরাতের নেতা জুলফিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেখ জায়েদের সঙ্গে দেখা করতে। ১৩ সেপ্টেম্বর তার সাথে দেখা হলো এবং মুর্তজা আশা করেছিলেন তিনি পিএলএ-কে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করবেন। কিন্তু মুর্তজা ফিরে এলেন ব্যর্থ হৃদয়ে এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে।

তিনি দেল্লাকে এসে বললেন শেখ জায়েদ মনে করেন তাদের পথ সঠিক নয়। তিনি মীরকে লন্ডনে ফিরে যেয়ে ঘর সংসার করতে উপদেশ দিয়েছেন। সময়ে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, ধৈর্য্য ধর। শেখ পিএলএ-কে আর্থিক অনুদান দিতে রাজি হলেন না। তবে মীরকে শুভেচ্ছা হিসেবে ১০,০০০ ডলার দিলেন। মুর্তজা দশ হাজার ডলারের এনভেলাপটি দেখিয়ে দেল্লাকে বললেন, 'এটা দিয়ে আমি কি করবো?' দেল্লা মুর্তজাকে শান্ত হতে বললেন এবং বললেন তিনিও মনে করেন শেখ ঠিক কথাই বলেছেন। সশস্ত্র যুদ্ধের চিন্তা মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা উচিত। যত বড় মহান কাজই হোক ওই সশস্ত্র পথে যাওয়া ঠিক হবে না। মুর্তজা দেল্লাকে বললেন, 'হয়েছে। এবার চলো আমরা হেঁটে আসি।' তারা হোটেল থেকে দ্রুত বের হলেন। মুর্তজা দেল্লাকে নিয়ে ঢুকলেন রোলেক্স ঘড়ির দোকানে এবং দেল্লার জন্য ঘড়ি কিনলেন। 'এটা আবুধাবির শেখের পক্ষ থেকে', মুর্তজা দেল্লাকে ঘড়িটি দিয়ে বললেন। মুর্তজা ওই লোকটির টাকা তার লড়াইয়ে ব্যবহার করতে চায়নি, ওই শেখের টাকা সে গ্রহণ করবে না।

মুর্তজার কলেজ জীবনের বন্ধু মিলব্রি পোলক এখন উইন ওয়ার্ল্ড লোয়েস্ট নামে এক এনজিওর কর্মকর্তা। এনজিওটি কাজ করে নারীদের নিয়ে যারা কিছু উদ্ভাবন করতে চায়। মিলব্রি বললেন, মুর্তজার কাবুলে যাওয়া ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। তাকে এই কাজে অনেক ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সুখ-আহ্লাদ- তার জীবন যাত্রা, তার বন্ধ, চলাফেরা-সকল

www.pathagar.com

কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে। এটা ছিল তার চরম সিদ্ধান্ত, ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল। সে ছিল সুযোগ্য পুত্র, একজন ভালো পাকিস্তানি এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তাকে। কাবুলে ইতোমধ্যে পিএলএ'র গঠন প্রায় সমাপ্ত, সেখানে ফিরে যাওয়ার আগে লন্ডনে শেষবারের মত যাত্রা বিরতি করেন মুর্তজা। সে তার কলেজ জীবনে দুই বন্ধুর সাথে সেখানে দেখা করলেন। তিনি বুঝত পেরেছিলেন এরপর সে হয়তো সহসাই সেখানে যেতে পারবেন না। একটা গুজব ছিল জেনারেল জিয়া পিআইএ-কে নির্দেশ দিয়েছেন তারা দুই ভাইকে পিআইএ-তে পেলেই সেই বিমানটিকে সরাসরি পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার। বিপদের আলামত তারা টের পাচ্ছিলেন।

লন্ডনে মুর্তজা তার কলেজ জীবনের রুমমেট বিল হোয়াইটের সাথে দেখা করলেন। বিল হোয়াইট তার বন্ধুর মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করে শঙ্কিত হলেন। মুর্তজা আমাকে বললো, 'বন্ধু আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকদিন আর দেখা হবে না।' বিল ধীরে ধীরে শান্ত গলায় আমাকে বললেন, 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কি, কি হয়েছে?' সে বললো, 'আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি, তা হয়তো তুমি পছন্দ করবে না। সে কাজ খুবই বিপদসঙ্কুল। আর আমি জীবিত নাও থাকতে পারি।' আমি বললাম, 'কি যা-তা বলছো, আমাদের যোগাযোগ থাকবে। আমি সবসময় মুর্তজার সাথে যোগাযোগ রক্ষার কথা ভাবি, আমরা পরস্পরের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো। চিঠি পাঠাবো, দেখা করবো। আমি যখন চলে আসছিলাম মীর বললো, 'তুমি সত্যিই ভাবো যে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে।' আরেক বন্ধু মাগদালেনাও তাকে বিদায় জানান একইভাবে। আমি তাকে শেষবার দেখলাম লন্ডনে ১৯৭৯ সালে সে কাবুলে যাওয়ার আগে। মুর্তজা বলেছিল, 'আমি যদি নিয়মিত যোগাযোগ না রাখতে পারি, তাহলে ভাববে না যে আমি ভালো বন্ধু নই।' মাগদা কথাটা শেষ করার আগেই কাঁদতে থাকলেন। মাগদা বা বিল কেউই মুর্তজাকে আর দেখেননি।

১৯৭৯ সলের ১৭ সেপ্টেম্বর, তার ২৫তম জন্মবার্ষিকীর একদিন আগে কাবুলে উড়ে গেল। এটাই ছিল তার পরবর্তী তিন বছরের আবাসস্থল।

www.pathagar.com

৮

এদিকে পাকিস্তানে নুসরাত এবং বেনজির একবার জেল একবার বাড়ি, এভাবে তাদের চলছিল। যখন রাজনৈতিক আন্দোলন ঘনীভূত তখন তাদের জেলে পাঠানো হয় আবার যখন শান্ত হয় তখন তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। লারকানার আল মুর্তজা হাউজে আমার বই রাখার জন্য আলমারির কিছু অংশ যখন খালি করছিলাম তখন এক থাক রেজিস্টার খাতা নজরে আসে। আমি ধূলোময়লা পরিষ্কার করে যখন খাতাগুলো খুললাম, তখন নজরে আসলো এগুলো তখনকার সময়ে বেনজিরের লেখা ডায়রি ও নোটবুক। বিভিন্ন তারিখে লেখা ডায়রি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের কিছু সময়ের।

বেনজিরের ডায়রির লেখাগুলো ছিল বিভিন্ন সময়ের, অনেক সময় পরস্পরবিরোধী ও বিভিন্ন বিষয়ের। মনে হবে যেন এগুলো একজনের লেখা নয়, দুইজনের লেখা। ১৮ নভেম্বরে লারকানা জেলের সুপার যিনি আবার বেনজিরের হাউজ এ্যারেস্টেরও তত্ত্বাবধায়ক, তাকে লেখা চিঠিটি ছিল বলিষ্ঠ।

> কয়েকদিন থেকে আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। গতকাল যখন আমার শরীর বেশি খারাপ হলো তখন আমি একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলাম। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও কোনো ডাক্তার আসে নাই। রাজনৈতিক আটক বন্দিদের সঙ্গে বাজে আচরণ করাই আপনাদের নীতি। আল্লাহ ও পাকিস্তানের মানুষের দোহাই আপনারা দয়া করে জেল ম্যানুয়েল পড়ুন এবং আপনাদের কাজের মূল্যায়ন করুন... আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিও : ক। বইপত্র আমার কাছে পাঠাতে বাধা দেওয়া হয়, খ। খাদ্যদ্রব্যও আমার কাছে পাঠাতে বাধা দেয় ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, গ। লেখার জিনিসপত্র দিতেও বাধা দেওয়া হয়, ঘ। আমার বোন জানিয়েছে যে, আমার আইনজীবীকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

আরেকটি লেখায় আবার ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। 'এখানে অনেক মশা। দুপুড়ে ঘুম থেকে উঠলাম। ম্যাসাজ নিলাম একঘণ্টা। গোছল করে জামা-কাপড় পরলাম। বই পড়ি। বিকেল চারটায় চা খেলাম। হরিণকে খাওয়ালাম। জানালা পরিষ্কার করলাম। স্ক্রাবল খেললাম। পড়লাম একটু। রাতের খাবার আটটায়। পড়া ও স্ক্রাবল খেলা। সময়ের অপচয় আর কি হতে পারে।'

আবার এখানে, রাজনীতিতে একজন নবাগত হিসেবে তার পিতাকে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ

www.pathagar.com

করতে দেখেছেন। ক্ষুধার্ত মানুষের মত দ্রুত বেনজির তার জানা রাজনৈতিক চিন্তা, বিভিন্ন জনের নাম ও আলোচনার কথা লিপিবদ্ধ করেন। কয়েকদিন আগের এক সন্ধ্যায় আমরা সম্ভাব্য এক মন্ত্রিসভার প্রস্তাবনা করলাম। বেনজির এগুলো লিখেছেন তার গোছানো ও খুব ঘন ঘন লেখায়। স্থানীয় নেতাদের একটি তালিকাও তৈরি করেন, তারা কে কত ভোট পাবেন তার সম্ভাব্য সংখ্যাও। আরেক স্থানে বেনজির লিখেছেন, কর্পস কমান্ডারদের চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, মনে হয় জিয়া তার ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়ে মানাতে পারবে না। এক নির্লজ্জ খুনি, বিংশ শতাব্দীর ইয়াজীদ।'

আবার আরেকজন বেনজির, গৃহবন্দি হয়েও তার অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবন। ১৪ নভেম্বর তিনি লিখেছেন, 'বছরের পর বছর লাগে একটি ভালো প্রজাতির গোলাপ ফুল পেতে, ম্যাকিয়াভেলি যাকে ব্ল্যাক প্রিন্স বা কালো রাজপুত্র বলেছেন সেই নীল গোলাপ পেতে বা খয়েরী ভ্যালভেট গোলাপ পেতে।' এর তিনদিন পর তিনি লিখেছেন, 'আজকে তার বুয়ার (খালা) পাঠানো ক্যান্ডি ও অন্যান্য রান্না করা খাবার দিতে দেয়নি।'

এরপর আর এক সময় তার দুই দিকটাই ফুটে ওঠে– জটিল, ক্ষুদ্র এবং স্বার্থপর, বেনজির লিখলেন শুক্রবারে, 'মিউ মিউ করতে করতে জানালার ধারে সুগার এলো তাকে ভেতরে আসতে দিতে হবে, সে একটা ইঁদুর ধরেছে সেটা তাকে দেখাতে চায়। সুগার মাঝে মাঝে একেবারে মানুষের মত আচরণ করে। তার ভাবটা এমন যে, সে যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। সানি (সনাম) ২৩ তারিখে এসেছিল তার আচরণ ছিল রুক্ষ যা আমাকে ক্ষুব্ধ করে। তার স্বার্থপরতার সীমা নেই। সে বুঝতে পারে না আমরা কি অবস্থায় আছি। কি ক্ষতি হয় সে যদি একটু ভদ্র আচরণ করে।' এক তারিখহীন পৃষ্ঠায় বেনজির এক বই সম্পর্কে তার মতামত লিখেছেন, 'যে শীর্ষে ওঠে তাকে বেয়েই উঠতে হয়... নেতার গুণাবলি : যে পড়ে যে শোনে।' 'প্রচারে নামলে প্রচার করবে কথা বলার মত করে লিখবে। এক সুলিখিত বিজ্ঞাপন ভালো অঙ্কন এবং একটি ভালো শিরোনাম। প্রকাশনার একটা ভালো মাত্রা দেয় এবং আবেদন সৃষ্টি করে।'

মুর্তজার কাবুলে যাওয়া নির্দিষ্ট ছিল। তার বাবা তার চিঠিতে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল আফগানিস্তান যাওয়ার এবং পাকিস্তানের কাছাকাছি থাকার।

সুহেল যিনি আফগানিস্তানে যেয়ে মুর্তজার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমাকে বললেন, 'আফগানিস্তানে নির্বাসিত জীবন যাপন নতুন কিছু নয় এটা পাকিস্তানের ঐতিহ্য। । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খিলাফত আন্দোলন চলাকালে যোদ্ধা ওবায়েদ উল্লা সিন্ধি- বৃটিশ বিরোধী লড়াইয়ে কাবুলে নির্বাসিত ছিলেন।

ভুট্টো পরিবারের ইতিহাসে এরকম ঘটনা আছে। মুর্তজার বড় দাদা গুলাম মুর্তজা ভুট্টো, যার নামে তার নাম, পালিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের উত্তর সীমান্তের কাছে আফগানিস্তানে নির্বাসিত জীবন-যাপন করেছিলেন। গুলাম মুর্তজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এক ব্রিটিশ কমিশনারের স্ত্রীর। আর ঘটনাটা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে ক্ষিপ্ত বৃটিশ কমিশনারের কাছ থেকে বাঁচার জন্য আফগানিস্তানে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি কাবুলের আমীরের অতিথি হিসেবে বসবাস করেন; এরপর তার সাথে ব্রিটিশ বিশেষ করে তার প্রেমিকার স্বামীর সঙ্গে সমঝোতা হয় এবং লারকানায় ফিরে আসেন। এর অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি নিহত হন।

ভুট্টোর মতো অনেক বেলুচ এবং পাকতুনরা আছে পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের

www.pathagar.com

হাত থেকে বাঁচার জন্য আফগানিস্তানে পালিয়ে গেছেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে, এছাড়া মিল রয়েছে জাতিগতভাবেও। যে কারণে একজন পাকিস্তানির ভারত বা বাংলাদেশ থেকে আফগানিস্তানে নির্বাসন জীবন অনেক সহজ।

শাহনেওয়াজ তখনি তার ভাইয়ের সঙ্গে আফগানিস্তানে যাননি। সে তখনো লন্ডনে এবং সেখানে তার ব্যক্তিগত কিছু কাজ ছিল। তখন এক তুর্কী মেয়ে তার বাগদত্তা, যার সাথে তার পরিচয় হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের কলেজ জীবনে। তারা দু'জনে বহু বছর প্রেম করার পর শাহনেওয়াজ বিয়ের প্রস্তাব দেন। নূরসেলী এসেছেন তুরস্কের এক ধনী পরিবার থেকে। দীর্ঘদেহী ও সোজা সরল মেয়ে। শাহনেওয়াজ তাকে গভীর ভালোবাসত। যখন শাহনেওয়াজ তাকে জানাল যে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করতে যাচ্ছে তখন নূরসেলীর পরিবার ভীত হয়ে পড়ল। তারা শাহ্কে এই পথ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। আর না হলে এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন বলে যানান। এরপর শাহের আর কিছু করার ছিল না। শাহ্ লন্ডনে তাদের বাগদান রহিত করেন এবং ব্যাগ গুছিয়ে কাবুলে চলে আসেন। তারপর দুই ভাই কাবুলের চিকেন স্ট্রিট বাংলো ছেড়ে ১৯৭৯ সালের বসন্তে আকবর খান রোডের একটা বাড়িতে চলে আসেন। জার্মান এ্যাম্বেসির কাছে এই বাড়িটিকে বলা হয় প্যালেস নাম্বার টু। এর বাম দিকেই ছিল লিবিয়ান এ্যাম্বেসি এবং আধা কি. মি দূরে পাকিস্তানের এ্যাম্বেসেডরের বাসভবন। এটা ছিল তিন বেডরুমের একতলা বাড়ি– একঘরে থাকতেন মুর্তজা, একঘরে থাকতেন শাহ এবং অন্যটিতে থাকতেন সুহেল– একটা পড়ার ঘর, একটা রান্না ঘর, এবং একটা বড় বসার ঘর। দেয়াল ছিল সাদা রঙের এবং বসার ঘরে কাঠ মোড়ানো। বাড়িতে ছিল একটা বড় লন সেখানে তারা ব্যাডমিন্টন খেলতেন। লনে বসে তারা অনেক সন্ধ্যায় কাবাব বানিয়েও খেতেন।

কাবুলে মুর্তজার নাম ছিল সুলেমান খান। আর তাকে সেখানে সাবধানে থাকতেই হবে কারণ পাকিস্তানি দূতাবাসের কর্মচারীদের বাসভবন খুব কাছেই। অল্প কিছু শব্দ ছাড়া মুর্তজা খুব একটা দাড়ি ভাষা জানতেন না। কাউকে সম্বোধন বা তার উত্তর দেয়া এইসব সাধারণ কিছু শব্দ ছাড়া। পশতু একেবারেই না। সুহেল পশতু জানতেন কারণ তার পরিবার এসেছে পেশোয়ার থেকে। এই তিনজনের মধ্যে শাহ্ একটু ভালো দাড়ি জানতেন। তবে এটা একারণেই যে শাহের কলেজ জীবনে অনেক পার্সিয়ান বন্ধু ছিল। তাদের সাথে শাহ্ বেশ সাবলিলভাবে পার্সিয়ান ভাষায় কথা বলত।

গ্রিসে দেল্লা যে কুকুরটির কথা বলেছিলেন, সেই ওল্‌ফকে (কুকুরটির নাম) মুর্তজা লন্ডন থেকে কাবুলে নিয়ে আসেন। মুর্তজা সব সময় কুকুর পছন্দ করতেন এবং তিনি বললেন যে, ভালোই হল কুকুরটি আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে। কিন্তু ওল্‌ফ পাহাড়াদারী তৎপরতা থেকে পোষ্য কুকুর হিসেবেই ভালো ছিল। প্যালেস নাম্বার টু এর পাশের অংশে বেশ কিছু রাশান থাকতেন– কি কারণে তারা সেখানে থাকতেন কারও জানা ছিল না। তার ঢোকার পথ ছিল পৃথক এবং লন ছিল পৃথক। এই রাশানরা ওলফের সঙ্গে গেটের বাইরে খেলা করত। রাশানরা একদিন চলে গেল, এরপর ওল্‌ফেরও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। মুর্তজা নিশ্চিত যে রাশানরা ওল্‌ফকে চুরি করেছে। ওল্‌ফ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মুর্তজা জার্মান শেফার্ড কুকুর কিনলেন এবং তার নাম দিলেন ওল্‌ফ টু। তিন বছর পর মুর্তজা যখন

www.pathagar.com

কাবুল ছেড়ে যান তখন ওল্‌ফ টু-কে সঙ্গে নিয়ে যান।

১৯৭৮ সালের বিপ্লবের পর নতুন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো দুই ভাইকে খুব আন্তরিক অভ্যর্থনা দেন এবং কাবুলে তাদের লিবারেশন আর্মি সংগঠিত করার স্বাধীনতা দেন। তাদেরকে একজন গাড়ির ড্রাইভার দেয়া হয় নাম ছিল আবদুর রহমান।

মধ্য বয়স্ক আবদুর রহমান তাদের শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেত এবং আর একটি বিশেষ কাজ করত সে, সপ্তাহে দু'দিন প্রেসিডেন্টের পাঠানো খাবার নিয়ে আসত। প্রেসিডেন্ট জোর করেই খাবার পাঠাতেন। সুহেল বললেন, 'আফগানিস্তানে একটি অবাক হওয়ার জিনিস ছিল যে, প্রত্যেক অফিসে প্রেসিডেন্ট থেকে পিওন পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীরা কম দামে খাবার পেত। তারা পেত ভাত, দুটো রুটি, তরকারি এবং আলু। সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এবং ড. নাজিবউল্লাহও একই খাবার পেতেন। শুধু অন্যদের থেকে একবাটি দই বাড়তি পেতেন। আফগানিস্তানিরা চাল উৎপাদন করে না কিন্তু তারা ভাতের পাগল– তারা একই খাবার প্রতিদিন দুপুরে খেতেন। যখন রাশানরা আফগানিস্তান আসল, সেই সময় কারফিউর কারণে আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই রাতের খাবার পেতাম, এর সাথে পেঁয়াজ, টমেটো ও মসলা যোগ করে সন্ধ্যা পেরুলে রাতে 'পাকিস্তানি' খাবার খেতাম। খাওয়ার সময় খাবার স্টোভে গরম হতে থাকত।'

ড. নাজিবউল্লাহ যিনি পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তার দুইজন সহকারী ছিল। এই সহকারীদের দাড়ি ভাষায় মুনাওয়াংস বলা হয়। একজন মুনাওয়াংসের নাম হল নূরিস্তানী তার উপর দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান থেকে আগত এই আগন্তুকদের সাথে কাজ করা।

নূরিস্তানী ছিলেন একটু খাটো, ক্লিন সেভ করা, সাদা চুল এবং মাথার সামনে ছিল টাক পড়া, সে সময় ভুট্টোদের সঙ্গে দেখা করতে পরিপাটি স্যুট পরে আসতেন। সুহেল বললেন, 'তার সাথে আমাদের বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সপ্তাহে দুই তিনবার দেখা করতে আসতেন এবং তাদের সেখানকার পরিস্থিতি ওয়াকিবহাল করতেন এবং পাকিস্তানি যেসকল খবর তার কাছে থাকত তা জানতেন। তিনি আফগানিস্তানের খুবই নামকরা রাজনৈতিক পরিবারের লোক ছিলেন– তার ভাই ছিল কাবুল এয়ারপোর্টের প্রধান, এক ভগ্নিপতি ছিল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি মুর্তজারা যখন পাকিস্তানে ফিরে আসলেন তখন নূরিস্তানির সাথে তাদের পেশোয়ারে দেখা হয়েছিল, তখন আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নূরিস্তানী পেশোয়ারে পালিয়ে আসেন। সে সময় দু'পক্ষের ভূমিকার বিপরীত রূপ নেয়। ভুট্টো ভাইয়েরা হন স্বাগতিক এবং নূরিস্তানী হন অতিথি। আমি সুহেলকে জিজ্ঞেস করলাম নূরিস্তানীর খবর জানেন কিনা– সে কি এখনো পেশোয়ারে। সুহেল মাথা নেড়ে জানালো– না সে জানেন না। 'আমরা শুনেছি তার ভগ্নিপতি যিনি ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান মুজাহিদরা তাকে হত্যা করেছে। আমি জানি না তার বা তার ভাই বিমানবন্দরের প্রধান সুলতানের কি হয়েছে। কাবুলে এই তিন যুবক ছিলেন খুবই নিঃসঙ্গ। যখন রাশানরা আফগানিস্তানে অভিযান চালায় এবং দুই মাস পরে যখন রাত ৯টা থেকে কারফিউ দেয়া হল তখন তাদের কিছু করার উপায় ছিল না। সুহেল হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা তখন লং ডিসটেন্স কল করতাম আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে। সেখানকার টেলিফোন সংযোগ এত খারাপ ছিল যে লাইন অনেক সময় পাওয়া যেত না। আমরা তখন টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে গল্প করতাম। সময়

www.pathagar.com

যেত অনেক ধীরে, একেবারেই ভালো লাগত না। কখনো কখনো আমরা ভুলেই যেতাম যে আমরা রাতের খাবার খেয়েছি কিনা এবং যখন রান্না ঘরে গিয়ে দেখতাম সিনকের উপর আমাদের ব্যবহৃত হাড়ি পাতিল প্লেট পড়ে আছে তখন বুঝতাম যে, আমরা খেয়েছি। কারফিউ শুরু হলে সব রকমের যোগাযোগ যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত এবং অনেক সময় টেলিফোন অপারেটরও থাকত না। ক্রমেই নিঃসঙ্গতা বাড়তে থাকে। সেখানে মাত্র একটা টিভি চ্যানেল ছিল। সেখানে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একটা আধাঘণ্টার অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল রঙারঙ।' সুহেল মুচকি হেসে আবার বলল, 'এটা ছিল একটা গানের অনুষ্ঠান। সেখানে ছয়টা গান হত। এর মধ্যে একটি উর্দু, একটি ইংরেজি গান। এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান। আর না হলে বাকি সব অনুষ্ঠান ছিল প্রচারণামূলক। আমাদের ওই অনুষ্ঠানটির জন্য সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতো। আমরা অনুষ্ঠানটি দেখতাম পাকিস্তানি খাবার ও স্ন্যাকস নিয়ে।'

১৯৭৮ সালের বসন্তকাল থেকে রাশানরা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আফগানিস্তানে সম্পূর্ণভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে। যারা কাবুলে থাকেন, তাদের কাছে রাশান অভিযানে নতুনত্বের কিছু ছিল না, তারা তাদের সকল সময়ই দেখে আসছে, এমনকি পাশের বাড়িতেও তারা আছে। পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে সারা পৃথিবী জুড়ে এই রাশান অভিযানের খবর প্রচারিত হয়। এথেন্সে বসে দেল্লা টেলিভিশনে এই খবর দেখেন এবং প্রেসিডেন্ট তারাকি নিহত হওয়ার খবরে মর্মাহত হন। দেল্লা যখন কাবুলে গিয়েছিলেন তখন তিনি রাষ্ট্রের দায়িত্বে এবং সে সময় মুর্তজা আফগানিস্তানের রাজনীতির জটিল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন। দেল্লা সে সময়ে কাবুলের রাজনীতির জটিল বিষয়গুলো তার গোলাপী নোটবুকে লিখে রেখেছিলেন। ব্যক্তি ও স্থানের নাম দেল্লার পক্ষে সঠিকভাবে লেখা সম্ভব নয় বলে মুর্তজা নিজেই তার ডায়রিতে লিখে দিয়েছিলেন– বাবরাক কামাল, হাফিজুল্লাহ আমিন, নূর মোহাম্মদ ও অনেকের নাম। দেল্লা লিখেছেন ছোট ছোট অক্ষরে এবং সংক্ষেপে, কখনো অর্ধসম্পন্ন বাক্য। পরে সে তার লেখার অনেক কিছুই উপলব্ধি করতে পারেন না, কি লিখেছে সে, যেমন : 'কাইবার নামে কামালের একলোক, বক্তৃতায় অনেক কথা বলতো, সে নিহত হয়েছে।' আরেকটি লেখায়, 'আমিনের বাড়িতে তারাকি নিহত হয়েছে।'

দেল্লা ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ মুর্তজাকে ফোন করেন, কিন্তু টেলিফোন লাইন বন্ধ। তিনি মুর্তজার বন্ধুদের কাছে লন্ডনে ফোন করলেন, তাদের কাছেও কোনো খবর নাই। সকলেই ছিল চিন্তিত, কিন্তু দেল্লা ব্যতিক্রম, তিনিই কিছু করার চেষ্টা করেন। দেল্লা তার এক আইনজীবী বন্ধুর কাছে গেলেন, যিনি আবার এ্যাকরোপোলিস পত্রিকার শেয়ার হোল্ডার। তিনি তাকে পত্রিকার একটি প্রেস পাস যোগাড় করে দেন। দেল্লা এই প্রেস পাস নিয়ে গলায় ক্যানন ক্যামেরা ঝুলিয়ে এথেন্স এয়ারপোর্ট থেকে আলইটালিয়া ফ্লাইট নম্বর ৭৮৮তে উঠলেন এথেন্স থেকে নয়াদিল্লি। ভেবেছিলেন ভারত থেকে কাবুলে যাবেন। তিনি মধ্যরাতে দিল্লিতে পৌছালেন, সেখানে আফগানিস্তানের আরিয়ানা এয়ারলাইন্সের ডেস্কে যেয়ে কাউকে পেলেন না। বাকি রাত তার কালো স্যুটকেসের ওপর শুয়ে কাটলো।

পরের দিন বিকেলে আরিয়ানা এয়ারলাইন্স জানায় তাদের কাবুলের পরবর্তী ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। দেল্লা হতাশ এবং কি করবে উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, অবশেষে

www.pathagar.com

তারই মত হতাশ দুইজনকে পেলেন– একজন ইতালির কূটনৈতিক, তার হাতে ব্রিফকেশ। সেটা আবার শেকল দিয়ে তার কব্জির সাথে লাগানো এবং অপরজন মার্কিনী পোশাক জিন্স ও কাউবয় বুট পরা এক আমেরিকান। আমেরিকান ভদ্রলোক পরিচয় দিল সে এক ব্যবসায়ী, কাবুলে যাচ্ছিল কার্পেট কিনতে। দেল্লার কাছে তার পরিচয় সঠিক মনে হয়নি, তার সন্দেহ সে সিআইএ'র লোক। দেল্লা অনিরাপদ বোধ করলেন, ভয় পেলেন তার পরিচয় না আবার তারা জেনে যায়, রক্ষা তার হাতে একটা ক্যামেরা আছে।

ওই অপরিচিত তিনজন এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এসে কাছাকাছি তাজমহল হোটেলে উঠলেন। তারা তিনজন সন্ধ্যা কাটালেন হোটেলের ছাদের রেস্তোরাঁয় এবং একটু আগেই ঘুমাতে গেলেন সকালে ফ্লাইট ধরার জন্য। এয়ারপোর্টে যেয়ে জানলেন সেই ফ্লাইটও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। দেল্লা ওই দুইজনসহ আবার তাজমহল হোটেলে ফিরে আসলেন এবং সেখানে এসে দেখলেন যে হোটেলে কোনো রুম খালি নাই। তারপর তারা একটু কম দামের হোটেল অশোকা হোটেলে গেলেন। যে ইতালিয়ান কূটনৈতিক শুধুমাত্র খাওয়ার সময় তার ব্রিফকেশের চাবি খোলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন দিল্লিতে তাদের দূতাবাসে চলে যাওয়ার। এরপর দেল্লা ও কার্পেট ব্যবসায়ী অশোকায় থাকলেন, এরপর কি হয়, কতদিন থাকতে হয় ভেবে পয়সা বাঁচানোর জন্য একরুম শেয়ার করলেন।

কাবুলে যাওয়ার চতুর্থ প্রচেষ্টায় স্বস্তি এলো তারা কাবুলে যাওয়ার একটি ফ্লাইট পেলেন। নিরাপদেই কাবুলে প্লেন অবতরণ করল, দেল্লা তাকিয়ে দেখলেন এয়ারপোর্টের চারদিকেই রাশান সেনা ভর্তি, দেল্লা এবার আমেরিকান ব্যবসায়ী থেকে সড়ে দাঁড়ালেন, ব্যবসায়ীর ট্রাঙ্ক ভর্তি ছবির ফিল্ম ছিল এবং তাকে এ বিষয়ে সেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছিল, দেল্লা যখন এয়ারপোর্ট থেকে মুর্তজাকে ফোন করেন, মুর্তজা হতভম্ব যে তাকে চারদিন চেষ্টা করে কাবুলে আসতে হয়েছে। সে মুর্তজাকে ফোন করেনি কেন? মুর্তজা বললেন, 'সেখানে অপেক্ষা কর, আমি লোক পাঠাচ্ছি তোমাকে আনার জন্য।'

দেল্লাকে আনার জন্য সুহেলকে এয়ারপোর্ট পাঠানো হলো। প্যালেস নাম্বার ২তে আসার পথে দেল্লা দেখলেন রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। প্রচণ্ড শীত, পথে-ঘাটে তুষার ও কাদা। দেল্লা তার নতুন ভূমিকা সাংবাদিক হিসেবে সচেতন হলেন। বাড়ির বাইরে এক রাশান সৈন্য ট্যাঙ্ক থেকে ঝুকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। দেল্লা গাড়ি থেকে বের হয়েই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করতেই সৈন্যটি রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে এলো, সুহেল তাড়াতাড়ি তাকে গাড়ির গ্যারেজে ঢুকিয়ে নিলেন এবং রাইফেল তাক করা সৈন্যটিকে রাশান ভাষায় কিছু বললো। এই কাবুলের সঙ্গে দেল্লার আগে পরিচিত ছিল না, খারাপ কিছু ঘটছে দেল্লা ভাবলেন।

মুর্তজা এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে, সে সময় যে কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা দেল্লাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। রাতে ডিনারের সময় আজিমউদ্দিন নামে এক অতিথি আসলেন। মুর্তজা আগেভাগেই দেল্লাকে জানিয়ে রাখলেন, বর্তমান সরকারের সাথে আছেন এই ভদ্রলোক। দেল্লা সাংবাদিকদের মত তাকে জিজ্ঞেস করলেন তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে। ভদ্রলোক খুব সাবলীলভাবে আফগানিস্তানের শতবর্ষের ইতিহাস বর্ণনা করলেন এবং তারাকী নিহত হওয়া পর্যন্ত এসে শেষ করলেন। আজিমউদ্দিন কোনো গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণভাবেই বললেন, যে কথাটা রাস্তাঘাটে সকলের কাছ থেকে জানা যায়। প্রাক্তন

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, ক্রুদ্ধভাবেই সে প্রতিরোধ করেছে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য, তার মৃত্যু হতে দশ মিনিট লেগেছিল। দেল্লা তাকে আরো জিজ্ঞেস করলো, রাশানপন্থী তারাকিকে কেন এভাবে হত্যা করা হলো? আজিমউদ্দিন বললেন, 'সে ছিল সাংঘাতিক, তাই তাকে আমরা শেষ করেছি।' মুর্তজা দেল্লাকে স্পর্শ করে কথা থামাতে বললেন। আজিমউদ্দিন আফগানিস্তানের সিক্রেট সার্ভিসের লোক, এবং এখন পর্যন্ত তার সাথে তাদের সৌহার্দ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

এক সন্ধ্যায় দেল্লা, মুর্তজা, সুহেল এবং শাহ্ ইন্টারকন্টিনাল হোটেলে যান। দেল্লা লক্ষ্য করেন যখন পাকিস্তান ও জিয়ার বিষয় আলোচনায় আসে তখন মুর্তজা কঠিন হয়ে যান। কাবুলের মত তারও পরিবর্তন হয়েছে। হোটেলে একটি বোর্ড ছিল সেখানে দিনের খবর থাকতো। বোর্ডের উপর লেখা ছিল বুলেটিন বোর্ড, ইংরেজি বানানে হয় BULETIN BOARD, দেল্লা দাগ দিয়ে করলেন BULET/IN/BOARD

মুর্তজা অনুভব করে দেল্লা তাকে ভীষণ ভালোবাসেন– না হলে পাগলের মত এই সময়ে ছুটে আসতেন না। তাকে দেখতে পেয়ে মুর্তজা ভীষণ খুশি একথা তাকে জানান। আবার নিরাপত্তাহীনতার কথাও বলেন তাকে। রাশানরা দেল্লাকে তার স্বামীর কারণে ভাবতে পারে সে আমেরিকার পক্ষের লোক, সিআইএ'র হয়ে কাজ করছে। অনেকেই তাদের এই বিষয়ে দীর্ঘদিন থেকে সাবধান করে আসছিলো। কিন্তু বিষয়টি এখন গুরুতর– দেল্লার নিরাপত্তার জন্যই তাকে কাবুল ছেড়ে যাওয়া উচিত।

এই ভাবার পরের দিন ছিল রোববার, উপায় খুঁজছিল দেল্লাকে কিভাবে ফেরত পাঠানো যায়। দেল্লার প্রেসকার্ড-ই এই সুযোগ এনে দেয়। কানাডার এক টিভির কয়েকজন সাংবাদিক প্রাইভেট প্লেনে করে পেশোয়ার যাচ্ছে, তারা আর একজন নিতে পারবে বলে জানায়। দেল্লা তাদের সঙ্গে গেলেন। তারা আবার দ্রুত পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন– মুর্তজাকে ফেব্রুয়ারিতে তুরস্কে যেতে হবে। দেল্লা তাকে জিজ্ঞেস করেননি কেন– এসব বিষয়ে সে প্রশ্ন করা একেবারেই বাদ দিয়েছিলেন এবং মুর্তজা বলেছিলেন সেখান থেকে তিনি এথেন্সে যাবেন।

রাশান অভিযানের পর টেলিভিশনের প্রোগ্রাম সহনিয় মাত্রায় এলো। কিছু ভালো প্রোগ্রাম সংযোজন হলো। ইসলামি মুজাহিদিনদের তামাশা করার জন্য মিশরীয় বেলি নাচ শুরু হলো। টিভির পর্দায় লেখা থাকতো আরবের নাচ।

সারাদিন দুই ভাই তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচি লেখা শুরু করলেন। তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় আল জুলফিকার। নামের পাশেই ধারালো তলোয়ার, যা শিয়া ইমাম আলী ব্যবহার করতেন। ইমাম আলী ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ অকুতোভয় যোদ্ধাও। তার পিতার নামও জুলফিকার আলী : আলীর তলোয়ার। তারা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কথা বলেন, ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ার ও যুবকদের সঙ্গে যারা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে আল জুলফিকারের সদস্য করা হলো। তখনও মুর্তজার অক্সফোর্ডের জন্য থিসিস লেখা শেষ হয়নি। যতটা সময় পায় তার থেকে কিছুটা সময় মুর্তজা তার থিসিস সম্পাদনা ও টাইপ করার কাজে নিয়োজিত থাকলো। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ তাদের নতুন সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ও আলোচনা শুরু করলেন। কিভাবে সামরিক স্বৈরাচারকে

www.pathagar.com

মোকাবেলা করা যায়। সুহেল এসব স্মরণ করে বললেন, 'রাশানরা আসার পর, মুজাহিদিনদের আক্রমণ যখন তীব্র হচ্ছিল এবং এক সময় তারা ঘোষণা দিল যে তারা কাবুল আক্রমণ করতে যাচ্ছে, সে সময় মীর আমাদের নবাগত লোকজনের মনোবল ঠিক রাখার জন্য তাদের বাসস্থানে যেয়ে রাত কাটাতে শুরু করেন। তারা যেন এই পরিস্থিতিতে মনোবল না হারায়।'

আফগানিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে দেল্লা আবার তার স্বামীর মুক্তির চেষ্টা করা শুরু করলেন। তিনি এ কারণে আমেরিকাও গেলেন। সেখানে এক সভায় সোমালিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আহমেদের সঙ্গে দেখা হল, তখন তার পোস্টিং ছিল জাতিসংঘে। যেখানেই তিনি যান না কেন হয় তার স্বামীর পক্ষে কথা বলেন আর না হয় মুর্তজার। আহমেদ তাকে জিজ্ঞাসা করল জুলফিকারের মৃত্যুর পর সেখানকার পরিস্থিতি কি? মুর্তজার পক্ষ হয়ে তার কাছে কিছু বলা সম্ভব নয়, ঠিকও হবে না।

ফেব্রুয়ারিতে মুর্তজা তুরস্ক থেকে লিবিয়া যাওয়ার পথে এথেন্সে দেল্লার সঙ্গে দেখা করলেন। দেল্লা যখন এদিক সেদিক ছিলেন তখন তার ডায়েরিতে মুর্তজা লিখলেন 'ক্লাব' দেল্লা পরে সেখানে তারিখ লিখেন মার্চ, মীর কোন ক্লাবের কথা লিখেছেন সে ডায়রির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখ দেখলো 'এক ঐতিহাসিক দিন।' যখনই মনে হলো মুর্তজা আবার আগের মত অবস্থানে চলে এসেছেন, পরক্ষণেই দেখা গেল সে আড়াল হয়ে গেল।

পাকিস্তানে জুলফিকারের গ্রেফতারের পর থেকেই ভুট্টো পরিবারের উপর ন্যাক্কারজনক আক্রমণ শুরু হয়। সামরিক জান্তা বলা শুরু করলেন এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলো জুলফিকারের তথাকথিত অ-ইসলামিক কাজকর্ম, তিনি একজন কমিউনিস্ট এবং ধর্মে বিশ্বাস করেন না। তারা নুসরাত এবং তার কন্যাদের ছবি ছাপল। তাদের মুখের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাঁতারে পোশাকে অন্য কোনো মহিলার বা পার্টিতে পান করা অবস্থায় বা পানরত অবস্থায়। আক্রমণের প্রধান দিকটি ছিল মুর্তজা এবং শাহনেওয়াজ।

দুই ভাইয়ের কাবুলে আসা এবং তাদের ঘোষণা যে তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যতক্ষণ না গণতন্ত্র এবং ১৯৭৩ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃবহাল হচ্ছে, এজন্য তাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। তাদের বলা হয় যে, তারা সন্ত্রাসী। অথচ আল জুলফিকার বিবৃতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কার্যক্রম তখন শুরু করেনি, বিবৃতিগুলো ছিল সাদামাটা সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানি জনগণের সমর্থন কামনা করে। কিন্তু তাদের পক্ষে ভেতরে ভেতরে ছাত্র এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থন পাওয়া যায়। এরাই ছিল বৃহত্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ এবং এদেরকে সহজভাবে দেখা হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি যত বিরূপই থাকুক না কেন হাস্যরস ও কৌতুকবোধ কোনো পরিস্থিতিতেই মুর্তজার কম ছিল না। সে কৌতূক করে দেল্লাকে তার দেশ সম্পর্কে চিঠি লিখল, 'তিনটি বিষয়ে গ্রিস আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত– এক, জনসংখ্যার চেয়ে দ্বীপের সংখ্যা বেশি, দ্বিতীয়, এক সময় এটা তুরস্কের অংশ ছিল, তৃতীয়ত, এ দেশের জাতির নায়ক আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার। লিবিয়া থেকে মুর্তজা দেল্লাকে উটের ছবির একটি পোস্টকার্ড পাঠান। সেখানে দেল্লাকে লিখলেন তিনি এখন দেল্লার আংটিটি পরে আছেন যদিও তার বাবার দেয়া ঘড়ি ছাড়া কোনো অলঙ্কার তিনি এখন আর পরেন না। মুর্তজা লিখলেন, 'আমি তোমার কথা সব সময় ভাবি।' মুর্তজা আরও লিখলেন গ্রীষ্মে তার সঙ্গে ভারতে

www.pathagar.com

বেড়াতে যাওয়ার জন্য।

দেল্লার স্বাস্থ্য খারাপ ও পরিশ্রান্ত থাকায় ভারতের এই সফরে যাননি। অনেক বছর থেকে তার যে স্বাস্থ্যের সমস্যা ছিল তা তিনি অবহেলা করে আসছিলেন। এখন তিনি চিকিৎসায় মনোযোগ দিলেন। জেল থেকে লেখা জুলফিকার একটি চিঠিতে ভুট্টো বাঁচাও কমিটির হয়ে তার পুত্ররা যা করছে তার জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। চিঠি আমি দেখিনি আমার মা ঘিনওয়ার কাছে শুনেছি। তিনি চিঠির এখানে সেখানে নানা রকম মতামত দিয়েছেন। এবং চিঠি শেষ করেছেন এই লিখে যে, তারা যেন কখনো ভারতে না যায়। এটা কোনো অনুরোধও ছিল না। আবার কোনো কারণ দর্শানো হয়নি, এটা ছিল তাদের প্রতি নির্দেশ। কিন্তু তারা পিতার কথাটি রাখেননি।

দিল্লিতে মুর্তজা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। অবশ্য ইন্দিরা ও জুলফিকারের মধ্যে সম্পর্কের খুব টানাপোড়েন ছিল এবং তার পুত্র রাজিবের সঙ্গেও দেখা করেন। রাজিব গান্ধীর নিহত হওয়ার দিনটির কথা আমার মনে আছে। আমি ও আমার পিতা লেবাননের এক সুপার মার্কেটে ইলেকট্রোনিক দ্রব্য বিভাগের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন একটি টেলিভিশনে রাজিব গান্ধীর মৃত্যুর খবরটি প্রচার হচ্ছিল। আব্বা থমকে দাঁড়ালেন তার মাথা কাঁপতে থাকল এর আগে জানতাম না যে আব্বার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

মুর্তজা এর পর আরও দু'বার এথেন্সে যান : একটি ছিল ভারত থেকে ফেরার পথে আরেকটি হল তার জন্মদিন পালন করতে চার দিনের জন্য দামেস্ক যাওয়ার পথে সেপ্টেম্বর মাসে। দেল্লা তাকে কখনো জিজ্ঞেস করেনি সে কোথায় যাচ্ছে কি করছে, সে এসব কথা জিজ্ঞেস করা বন্ধ করে দিয়েছিল। মুর্তজা আবার শেষবারের মত এথেন্সে গেলেন... তারা জানতেন না যে এটিই তাদের শেষ দেখা এবং সাক্ষাৎটি ছিল অম্লমধুর, মুর্তজা ছিল আত্মমগ্ন। সে বার বার তার চুল টেনে নিচে নামাচ্ছে, এটা সে করে যখন সে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন থাকে। দেল্লা লক্ষ্য করল সে সিগারেটও বেশি খাচ্ছে এবং স্বাভাবিকের চেয়েও কম কথা বলছে। দেল্লার শরীর তখনো ভালো ছিল না। মুর্তজা শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বললেন তাকে।

১৮ অক্টোবর এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে মুর্তজা এক আবেগময় চিঠি লিখলেন দেল্লাকে এবং সে চলে যাওয়ার আগে না পড়ার জন্য বললেন। দেল্লা গাড়ি চালিয়ে মুর্তজাকে এথেন্স এয়ারপোর্টে নিয়ে গেলেন। মুর্তজা বিমানে ওঠার আগে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। দুজনেই পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শিগগিরই তাদের আবার দেখা হচ্ছে।

www.pathagar.com

৯

পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, পাকিস্তানে তখন আগুন জ্বলছিল। জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পেশীশক্তি দিয়ে দাবিয়ে রাখা হলো। কিন্তু আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসি দেয়ার পর আন্দোলন বন্ধ করার জন্য কারফিউ দেয়া হল। জেনারেল জিয়া সকল রকম রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। জনসমাবেশ বন্ধ করলেন এবং পত্রপত্রিকার সেন্সরশিপ আরোপ করলেন। জিয়ার সকল রকম নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকার, লিঙ্গ স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মৌলিক স্বাধীনতাবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মৌলিক স্বাধীনতাবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠল। এই ধরনের আন্দোলন পাকিস্তানে এর আগে আর হয়নি। জিয়া এই আন্দোলন প্রতিরোধে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলেন, প্রকাশ্যে চাবুক মারা এবং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো। তার সময় মানবিক মূল্যবোধের চরম অবনতি ঘটল। রোযার মাসে করাচিতে পানি সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। তিনি নিশ্চিত করলেন যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাতে পানি না থাকে এবং মানুষ পানি না পান করতে পারে। তার শাসন সময়গুলোতে সকল অফিস, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক করলেন। এরপর পাকিস্তানে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল রাজনৈতিক শক্তি ও কর্মীদের নেতৃত্বে যেখানে মুর্তজা যুক্ত ছিলেন। চারটি পেশাজীবী সংগঠন আন্দোলন শুরু করে– সাংবাদিক, আইনজীবী, নারী সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন।

বিপদের আঁচ পেয়ে জেনারেল জিয়া ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন। আর এদিকে ছয়টি দৈনিক পত্রিকাকে স্থায়ীভাবে প্রকাশনা নিষেধ করলেন। এদের মধ্যে ছিল মুর্তজার লন্ডন থেকে প্রকাশিত মুসাওয়াত, আমীর, হাওয়াত, আফাক, শাহাফাত এবং সাদাকাত। সাপ্তাহিক মুশতাকবাল এবং মাসিক ধানাকও বন্ধ করে দেয়া হল। মার্শাল ল' রেগুলেশন ১৯ জারি ও কার্যকর করা হল যেখানে ইসলামী আদর্শে পাকিস্তানের নিরাপত্তা, নৈতিকতা এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য সকল সংবাদ সেন্সর করার ক্ষমতা সরকারের উপর অর্পণ করা হলো।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম, বিবিসিসহ সকল প্রতিষ্ঠানে সামরিক জান্তা দিনে ২ বার করে খবর সেন্সর করতেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন কোনটা প্রকাশ করা যাবে আর কোনটা যাবে না। ইসলামী আদর্শ নামে জেনারেল জিয়া যা করছিলেন তা অনেক সময় ছিল কাল্পনিক এবং তার স্বেচ্ছাচারিতা। এমনকি কার্টুন ফিল্মে পপির বান্ধবি অলিবঅল যেহেতু স্কার্ট পরে সেহেতু ফিল্মটি বন্ধ করে দেয়া হল। পাকিস্তান টেলিভিশনের মহিলা

www.pathagar.com

উপস্থাপিকাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক করলেন। হিজাব বাধ্যতামূলক করার কারণে সংবাদ পাঠিকা মেহতাব রাশদী সংবাদ পাঠ ছেড়ে দেন।

যে সংবাদ আইটেমটি সামরিক শাসকদের কাছে ভালো লাগতোনা সেটাকেই তারা রাষ্ট্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করতেন। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান প্রেস ইনস্টিটিউটের লাহোর ব্যুরো প্রধান হুসেইন নাকি রিপোর্ট লিখলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই। ফলে তার চাকরি চলে যায়। এমন কড়া নজরে প্রেসকে রাখা হল যে, কোনো প্রতিবাদী অনশনের খবর, ছাত্রদের বিক্ষোভ বা রাজনৈতিক সভা মিছিলের খবর রিপোর্টার এবং সম্পাদকদের জানাতে হত সরকারি মহলকে। তাদেরকে সেখানে যেতে এবং ওইসব সংবাদ ছাপাতে নিষেধও করা হয়েছিল।

এটা বলা যায় যে, পাকিস্তানের সব সরকারই পত্রপত্রিকাকে সুনজরে দেখেনি, কোনো না কোনোভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করতোই। তবে জিয়ার মত নিশংস ও কঠোর কেউ ছিল না। ১৯৭৮ সালে দৈনিক পত্রিকা উর্দু ডাইজেস্, দি সান এবং পিপিপি-এর পত্রিকা মুসওয়াত-এর সম্পাদকদের গ্রেফতার করা হয়, 'জিয়ার বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলার জন্য।' তাদের প্রত্যেকের ১ বছরের জেল এবং প্রকাশ্যে ১০টি করে চাবুক মারার শাস্তি দেয়া হয়। পরে যদিও তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে এটাই পরিষ্কার হয় যে, জিয়া কতটুকু পর্যন্ত যেতে পারেন। লাহোরের কিন্নারিদ কলেজের শিক্ষক সিদ্দিক কুয়ে হিদায়েত উল্লাহ লাহোরে প্রকাশ্যে চাবুক মারার দৃশ্য একবার দেখেছিলেন, 'চাবুক মারা হয় জেল রোডের কাছেই ব্যস্ততম চৌরাস্তায়। হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখল। তারা কেউ কেউ এর কাছে বাজারে এসেছিল বা এসেছিল অন্য কোনো কাজে। কিছু লোক এমন উৎসাহী হলেন যে, ভালো করে দেখার জন্য গাছের উপরে উঠলেন। ঘটনাটি ন্যাক্কারজনক। সেখানে চেঁচামেচি ও আতঙ্ক বিরাজ করছিল এই চাবুক মারার সময় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে সরকার সম্পর্কে ভীতভাব সৃষ্টি হয়।' ঐ বছরই করাচির দৈনিক সাদাকাতের সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয় কেন্দ্রীয় বাজেট সমালোচনা করার জন্য এবং পরে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

নাট্যকার, কবি ও লেখকরাও জিয়ার অসহিষ্ণুতা থেকে বাদ পড়লেন না। তাদের উপর নানারকম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। চাপ সৃষ্টি করা হল এবং যাদের কাজকর্মে ও লেখা লেখিতে জান্তা সন্তুষ্ট ছিলেন না তাদের অনেককে দেশের বাইরে চলে যেতে হল। পাকিস্তানের খ্যাতনামা কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ বৈরুতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। নিয়ামত উল্লাহ মাজহী, নাসির মির্জা এবং তারেক আলী বিদেশ চলে গেলেন। কিন্তু রিপোর্টার এবং সাংবাদিকরা সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। ১৯৭৪ সালের মে তে চার সাংবাদিককে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা কখনো ঘটেনি। কিন্তু এতসব নির্যাতনেও সংবাদ মাধ্যমকে অবরোধ করা যায়নি। সংবাদকর্মীরা দুইভাবে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করলেন।

প্রথমত, সাংবাদিকরা অনশন, মিছিল এবং অবস্থান ধর্মঘট করে বা সরকারের সমালোচনামূলক খবর ছাপে। চাবুক মারার ঘটনার দুইমাস পর ১৫ জন সাংবাদিক গ্রেফতার হন। জিয়া তার সরকারের এই আচরণের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমার এইসব পত্রিকা এবং সাংবাদিকদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই যারা তাদের কলমকে

www.pathagar.com

ব্যবহার করে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে।'

তার এই বক্তব্য সাংবাদিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ালো। গ্রেফতারে ভীত না হয়ে ১৯৭৯ সালে মুসওয়াত পত্রিকা বন্ধের প্রতিবাদে সাংবাদিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু করল। তারা তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া ও গ্রেফতর করার আগ পর্যন্ত তা চালিয়ে গেল। মোজাফফরবাদের ৯টি পত্রিকাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হল। কারণ তারা সরকারবিরোধী লেখা ছাপছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য ১৯৮৩ সালে ১০ জন সাংবাদিক চাকরি হারান এবং তাদের কোনো সংবাদপত্রে কাজ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্র এর আগে কখনো এতো সাহসীকতার পরিচয় দেয়নি; তারা সামরিক শাসনের মধ্যেও বিভিন্নভাবে তার বিরোধীতা করতে থাকে। বোর্ড অফ সেন্সরের নিয়মানুযায়ী প্রতিটি লেখাই প্রকাশ হওয়ার আগে তাদের দেখাতে হবে। বোর্ড অফ সেন্সর অনেক সংবাদ পুরোটা বাতিল করে দিতেন আবার কিছু সংবাদ ও লেখার কিছু বাদ বা পরিবর্তন করে ছাপতে দিতেন। পত্রিকাগুলো এর প্রতিবাদে এবং অর্থহীন খবর ছাপার পরিবর্তে পত্রিকার কিছু অংশ সাদা রাখা শুরু করে। কিন্তু এরপর এই সাদা রাখাও নিষিদ্ধ করা হল। ডেইলি স্টারের সাংবাদিক মাজহার আব্বাস বললেন, 'আমরা ওই সকল খালি স্থানে গাধার ছবি বা কুকুরের ছবি এবং জিয়া কথা বলছেন বা তার মন্ত্রীরা কথা বলছেন এসব ছবি ছাপাতাম এবং সেখানে কিছু অংশ খালি থাকত। তারা বিষয়টি টের পেল। না পাওয়ার কথা নয়, অতি সাধারণ মানুষও বোঝে। তখন তারা বলল যে তোমাদের বোর্ডকে জানাতে হবে তোমরা এই খালি স্থানে কি লিখতে চেয়েছিলে।

সেন্সর বোর্ডও তৎপর হয়ে উঠল তারাও নানাভাবে সরকারবিরোধী খবর প্রকাশ করা বন্ধ করলো। পত্রিকাগুলো অর্থহীন কাগজে পরিণত হলো। করাচি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে সেখানকার সেন্সর বোর্ড যে খবরটি ছাপতে দেয়নি সে পত্রিকার লাহোর সংস্করণে দেখা গেল সেই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। কারণ সেখানকার সেন্সরবোর্ড ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এর উল্টোটাও আবার ঘটতো। সবকিছু মিলিয়ে জিয়ার বিরুদ্ধে সংবাদপত্র জগৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের কাবু করার সকল প্রচেষ্টা তারা নানা পন্থায় নস্যাৎ করে দিত। জিয়ার সময় আমাদের পরিবারের অর্ধেক ছিল দেশের বাইরে আর অর্ধেক ছিল জেলে। আমি যখন এই সময়ের গবেষণা করি এবং একজন সাংবাদিক হিসেবে ওই সময় যারা সংবাদপত্র জগতের জিয়া নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়েছেন তাদের সঙ্গে সেই সময় নিয়ে কথা বলার সুযোগ ঘটে। সরস ও প্রাণবন্ত আলোচনায় তাদের কাছ থেকে যা জেনেছি পত্রিকা ফাইল দেখে তা জানা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমার বয়স যখন ২২ এবং ইংল্যান্ডে মাস্টার্স করছি তখন আমার বাবা এবং আমাদের পরিবারের অতীত নিয়ে চিন্তা করি। তখন আমার মাস্টার্স থিসিসে জিয়ার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয়টি বেছে নেই। এটা ছিল সময়োপযোগী বিষয়। জিয়ার উত্তরসূরী জেনারেল মোশাররফ তখন ৬ বছর ক্ষমতায় এবং নতুন করে আফগান যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আমার থিসিসের লেখাটি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের চেয়ে বেশি কিছু ছিল। আমি আমার পিতাকে বুঝতে চেয়েছিলাম। তার আফগানিস্তানের জীবনের বিষয়টি যে রাখঢাক করা হয় সেটি ভাঙতে চেয়েছিলাম। আমি বেড়ে উঠেছি

www.pathagar.com

আমার পিতার পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা শুনে শুনে। কিন্তু আমি যখন বড় হলাম, বেড়ে উঠলাম পিতা ছাড়া সেই ছোটবেলার কথাগুলো তখন হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম। তিনি কাবুলে কেন গিয়েছিলেন? এই সিদ্ধান্তটি আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাই শুধু এটা জানা যথেষ্ট নয় যে, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

তাকে ভালোবাসি, তার সকল কার্যক্রমকে ভালোবাসি এটাও যথেষ্ট নয়। আমাকে আরও গভীরে যেতে হবে– আরও গভীরে– কি ঘটেছিল? কি হয়েছিল সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিতা সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু আমার প্রশ্নের পরিবর্তন ঘটেছে। এইসব প্রশ্নের সন্ধানে আমি লাইব্রেরিতে ডুবে থাকলাম। প্রতিরোধ আন্দোলনের তত্ত্ব ও ইতিহাস পড়লাম। আর পড়া ছিল সত্ত্ব প্রণোদিতভাবে স্বেচ্ছায়। এইসব পড়াশুনার পিছনে শুধুমাত্র তখনকার সময়টিকে বোঝার কারণ ছিল না বরং আবেগ বহির্ভূতভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করতে আমাকে সাহায্য করেছে।

সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের অন্যদের মত আইনজীবীরাও জিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। জিয়ার শাসনের প্রথম দিক থেকেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা কনভেনশন করেছেন, মিছিল করেছেন, কোর্ট বয়কট করেছেন এবং স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। ২০০৭ সালে পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা যে আন্দোলন করেন সেটাই আইনজীবীদের আন্দোলনের প্রথম ঘটনা ছিল না বরং গণতন্ত্রের জন্য আইনজীবীদের এই লড়াই শুরু হয়েছে জিয়ার আমল থেকে। ১৯৮১ সালের কয়েক মাসেই ৪৬০ জন আইনজীবী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। আইনজীবীদের এই আন্দোলনটি ছিল সামরিক জান্তার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। কুখ্যাত ডক্টরিং অফ নেসেসিটি, প্রয়োজনের তত্ত্ব যে সকল বিষয় আইনসম্মত নয়, প্রয়োজনে সেগুলো আইনসম্মত', পাকিস্তানের আদালত সবসময় এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সেনাবাহিনীর ঘোষিত সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয় এবং জিয়ার ক্ষমতা দখলকেও বৈধতা দিয়েছিল।

জেনারেল জিয়া এইভাবে যখন বৈধতা পেলেন তখন তিনি বিচার বিভাগকে তার পক্ষে আনার জন্য আরো বেশি তৎপর হলেন। ১৯৭৯ সালে যে সকল বিচারক সামরিক শাসন সম্পর্কে উৎসাহ দেখায়নি তিনি তাদের দ্রুত চাকরিচ্যুত করলেন, সিভিল কোর্টকেও নিয়ন্ত্রণ করলেন শরিয়া কোর্ট ও সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে।

ফেডারেল শরিয়া বেঞ্চ গঠিত হল এভাবে এমনসব ধর্মীয় আলেমদের নিয়ে যাদের সিভিল ল' সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। অথচ তাদের কাজ ছিল সিভিল ল'-এর কোন কোন বিষয়টি ইসলাম সম্মত নয় সেগুলো বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করা। সামরিক ট্রাইব্যুনালকেও অনেক বেশি বর্ধিত ক্ষমতা দেয়া হল। তাদের বিচার ও ক্ষমতার বিষয় আর সিভিল কোর্টের আয়ত্তে থাকল না অর্থাৎ তাদের বিচারের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাবে না।

অর্ডিন্যান্স ৭৭-এর বলে গঠিত ট্রাইব্যুনাল সকল ধরনের মামলা শুনানি ও বিচার করতে পারবে 'রাজনৈতিক অপরাধ, সামরিক আইনবিরোধী কার্যকলাপ এবং পাকিস্তান পেনাল কোর্টের আওতাভুক্ত বিচারসমূহ।' সামরিক ট্রাইব্যুনাল সকল রকমের আইনী অধিকার খর্ব

www.pathagar.com

করে কোনো মামলার চার্জ না গঠন করেও যে কোনো মানুষকে দীর্ঘদিন আটকে রাখতে পারত। তারা বিচারের বিষয় ও বিচারের শুনানি জনসম্মুখে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারত। আসামির আইনজীবীরা আইনের বিষয়ে মতামত দিতে পারতেন কিন্তু আসামির পক্ষে যুক্তিতর্ক ও সাওয়াল করতে পারতেন না।

১৯৮৪ সালে এই ধরনের অনেক মামলা আইনবিরোধী মনে হয় আইনজীবীদের কাছে এবং তারা তখন থেকে ক্ষুব্ধ হতে শুরু করেন। বিশেষ করে দুটো মামলা যেখানে মারাত্মকভাবে আইনকে লজ্ঘন করা হয়েছিল তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে, যেমন রাওয়ালপিণ্ডি জেল কেস মামলা যেখানে ১৮ জনকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের আসামি করা হয়েছিল গ্রেফতারের ১ বছর পর। বিচারটি হয় 'ইন ক্যামেরা', গোপনে অপ্রকাশ্য আদালতে এবং তাদের শাস্তি দেয়া হয় নাম না উল্লেখ করে এক বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের কারণ দর্শিয়ে। অভিযুক্তদের সুবিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল তারা, সাংবাদিকদেরকেও সেখানে যেতে হয়নি এবং আইনজীবীদের সাহায্য পেতেও বাধাগ্রস্ত হয়েছে তারা।

দ্বিতীয় বিচারটি ছিল, কোট লাখপাত জেল কেস। এই মামলাটি ছিল আগেরটির চেয়েও একটু বড়, ৫৪ জন অভিযুক্ত ছিল এবং অভিযোগ একইরকমের। তবে এখানে আইনজীবীদের মামলার বিবরণ গোপন রাখার জন্য শপথ নিতে হয়। বিচারটি হয় অপ্রকাশ্যে এবং গোপনে। ৫০ জন অভিযুক্ত এই প্রহসন বিচার বয়কট করে কারণ তাদের কোনো মানবিক অধিকার ছিল না এবং মন্ত্রণালয় থেকে সুবিচার পাওয়ার কোনো আশা ছিল না।

এই দুটি মামলা সংবাদ মাধ্যমকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করে এবং আইনজীবীরা এর প্রতিবাদে আরো বেশি করে রাস্তায় নামে। এটাই হল শুরু। স্বৈরশাসক রাষ্ট্র বিরোধীতার নামে আরো অধিক সংখ্যক মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিতে শুরু করে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত যখন স্বৈরশাসকের নৃশংসতা চরম আকারে তখন ১শ থেকে ১ হাজার মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন গ্রহণ করা হলেও জেনারেল জিয়া একজনকেও মওকুফ করেননি।

জিয়ার নাটকীয় কার্যক্রম ছিল দেখার মত। যেমন তার ছিল গ্রেফতারের অভিযান আবার তার ছিল স্টেডিয়ামে গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখা। এটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলকে জিয়া যেভাবে তার রাজনীতির জন্য ব্যবহার করেছেন কখনো তারা তার প্রতিবাদ করেননি। যেমন, জিয়ার তথাকথিত বৈদেশিক নীতিতে ভারতের সঙ্গে সফলতা যেটা সে সময়, 'ক্রিকেট ডিপ্লোমেসি' হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। তিনি নিজেকে নাটকীয়ভাবে নানা কায়দায় স্বাভাবিক মানবিক চরিত্রের অধিকারী হিসেবে পরিচিত করতে চাইতেন অথচ আরেক দিকে প্রকাশ্যে মানুষকে চাবুক মারা, প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া, মহিলাদের পাথর মেরে হত্যা করা একই তালে চলছিল। ফউকল্টের মতে প্রকাশ্যে নির্যাতন এবং হত্যা বিচারকে গ্রহণযোগ্য করে না বরং শক্তিমত্ত্বতা প্রতিষ্ঠিত করে। এটা সবসময়ই স্বৈরশাসকরা তাদের ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য শক্তির এই ধরনের প্রদর্শনী করে থাকে।

* * *

www.pathagar.com

এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেমন ছিল সংবাদপত্র ও আইনজীবীরা তেমনি ছিল নারীরা। ১৯৭৯ সালের হুদুদ অর্ডিন্যান্স জারির ফলে নারীদের আন্দোলনের একটা বিশেষ ইস্যু হয়। এই অর্ডিন্যান্সটি এখনো কার্যকর। প্রধানত নারী ও নারীর শরীর বিষয়ে যত আইন আছে তার একটি সঙ্কলন। আইনটি মূলত 'জিনা'কে কেন্দ্র করে। এটা আরবি শব্দ যার অর্থ হল অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর যৌন সংগম। ধর্ষণের এক ভিন্ন সংস্করণ 'জিনা বিল জাবর', কিন্তু সামরিক শাসকের সংজ্ঞা অনুযায়ী সম্মতি কোনো বিষয় নয়, সংগম হল বিষয়। একজন মহিলা ধর্ষিত হওয়ার পর শাস্তি হতে পারে যদিও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, কারণ সে বিয়ে বহির্ভূতভাবে যৌন সংগম করেছে। হুদুদ আইন অনুযায়ী ধর্ষিত নারী ও ধর্ষণকারীকে জিনা বিল জাবরে বিচার করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সটি মূলত অনৈতিক যৌন সম্পর্ক, মৌলিক যৌন সম্পর্ক বিষয় এবং বেশ্যাবৃত্তির বিষয়েও।

এই হুদুদ আইনে সুরাপান এবং মাদক বিষয়ে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসদাচরণ সেটা যাই হোক না কেন, চুরি এবং অন্যান্য ছোটখাট অপরাধের বিষয়ে ধারা রয়েছে। মানুষের ব্যক্তি জীবনের গোপন বিষয়গুলো এই অর্ডিন্যান্সের আওতায় আনা হয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেশিরভাগ সময়ে প্রকাশ্যে চাবুক ও জেল দেয়া আবার পাথর ছুঁড়ে মৃত্যু, শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলা এবং জরিমানাও করা হয়।

হুদুদ অর্ডিন্যান্সের পূর্বে পাকিস্তান পেনাল কোড অপরাধের একই সমান অপরাধী করেনি– ধর্ষক ও ধর্ষিতাকে। পেনাল কোডে ধর্ষককেই শাস্তি দেওয়ার বিধান হয়েছে ধর্ষিতার নয়। আবার হুদুদ অর্ডিন্যান্সে জিনা আইনে, দুই পক্ষেরই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে সেখানে অপর পক্ষের সম্মতি থাকুক আর না থাকুক। ফলে মেডিক্যাল পরীক্ষায় পুরুষদের থেকে মহিলাদের বেশি সম্ভাবনা থাকে শাস্তির।

হুদুদ অর্ডিন্যান্স জিয়ার মধ্যযুগীয় বর্বরতার একটি নিদর্শন। এছাড়াও সে বিভিন্ন নিপীড়ণমূলক আইন করে সমাজে মানুষের অবস্থানে মৌলিক পরিবর্তন আনে। এই অর্ডিন্যান্সে লিয়াকতাবাদের লাল মাইকে অবৈধ যৌনকর্মের জন্য জনসম্মুখে চাবুক মারা হয়। তিনিই ছিলেন এই আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা। তাকে যখন ১৫টি চাবুক মারা হয় তখন সেখানে আট হাজারেরও বেশি দর্শক ছিল। যেমনটি হয় আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসনামলে। একই দৃশ্য সেখানে উৎসাহী হাজারে হাজারে দর্শকের ভীড়।

পাকিস্তানের নারীরা হুদুদ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। তারা মিটিং ও মিছিল করে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে। পুলিশ বর্বরভাবে মহিলাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করে ও গ্রেফতার করে। পাকিস্তান উইমেন ল'ইয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন এই হুদুদ অর্ডিন্যান্স বিরোধিতা করে। সরকারের বিরোধিতা ও হেনস্তা করার পরও কয়েকবার কনফারেন্স করে– ১৯৮২, ১৯৮৩ এবং সর্বশেষ ১৯৮৫ সালে, তারা নারীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বন্ধের দাবি করে। আইনজীবী মহিলাদের সংগঠন ছাড়াও অন্যান্য নারী সংগঠনও বিরোধিতা করে আন্দোলন করে এবং এই হুদুদ অর্ডিন্যান্স বিরোধিতা করে বেশ কিছু নারী সংগঠন সংগঠিত হয় এবং এখনও কাজ করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অল পাকিস্তান উইমেন এ্যাসোসিয়েশন (আপওয়া) এবং উইমেনস এ্যাকশন ফোরাম (ওয়াফ) অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

* * *

www.pathagar.com

সমাজের কোনো অংশই সামরিক শাসনে নিরাপদ ছিল না। জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে অধিকার বঞ্চিত করে, তার নাগরিক অধিকার খর্ব করে ও সেনাবাহিনী দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। সেনাবাহিনী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ না করে দিলে সে দ্রব্য বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। আবার সেনাবাহিনী কালোবাজারের বখরা না পেলে বিক্রেতা বা কালোবাজারী গ্রেফতার হবে এবং অনেকসময় তাদের চাবুকও মারা হবে।

মার্ক্সের তত্ত্ব অনুযায়ী এই অর্থনৈতিক সঙ্কটে শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদে মুখরিত হলো না, বরং তারা হতোদ্যম হয়ে পড়লো, বলা যায় ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তো বটেই। যখন রাজনীতি প্রতিরোধ আন্দোলনকে পরিচর্যা করেনি তখন ক্ষুদে ব্যবসায়ী, হকার, রাস্তার দোকানী-হকারসহ নিম্নবিত্তদের মধ্যে প্রতিরোধ শুরু হলো। এই শ্রেণীর জনতাই ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমর্থক। সামরিক জান্তার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাধন-কোষণ বড় ব্যবসায়ী, বিক্রেতা বা শ্রমিকদের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেনি। জিয়া এই সকল স্ব-উদ্যোগী কর্মজীবী মানুষের অধিকার খর্ব করে, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত করে তাদের টুটি চেপে ধরেছিলেন। তারা জিয়ার শাসনকালে ধর্মঘট, বিক্ষোভ, মিছিল-সমাবেশ করে প্রতিবাদ করে আসছিলো।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলো নানান কায়দায় ভেঙে দেওয়া বা অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছিল। জিয়া স্বয়ং এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে জিয়া পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের ইউনিয়নের সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পিআইএ'র ইউনিয়ন অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন। ১৯৮১ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত করাচি স্টিল মিলসের শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করাসহ অন্যান্য দাবিতে যারা আন্দোলন করছিল পুলিশ তাদের বেধড়ক পেটায় এবং তাদের সভাপতিকে গ্রেফতার করে। ওই বছরেই পাকিস্তান লেবার ফেডারেশনের সভা হওয়ার কথা ছিল লাহোরে। সরকার সভা নিষিদ্ধ করে, শ্রমিকদের ওভারটাইম কাজ করায়, শ্রমিক নেতাদের পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

শ্রমিক ও শ্রমিকবিরোধী কালা-কানুনের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যত লড়েছে, নির্যাতন নেমে এসেছে বহুগুণ। একজন শ্রমিক নেতাকে আর্মি ক্যাম্প ও জেলে– এই স্থানেই নিপীড়ন করা হয়। তাকে নগ্ন করা হয়, ইংরেজি অক্ষর এ (A)'র মত কাঠের ফ্রেমে হাত, পা ও কোমর বেঁধে চাবুক মারা হয়। সারাদেশের কল-কারখানার শ্রমিকদের সরকারের শ্রমিকবিরোধী শ্রম আইন ও নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হতো।

শহরের পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে। চিকিৎসকেরা এক নিরপেক্ষ কিন্তু অন্যান্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে। হুদুদ অর্ডিন্যান্স অনুসারে এক চোরের শাস্তি তার হাত কেটে ফেলা, আর এই কাজটি করবেন একমাত্র চিকিৎসকরা। চিকিৎসকরা এই দণ্ডাদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। ওকাবার গুলাম আলী নামে এক লোক মসজিদের ঘড়ি চুরির দায়ে গ্রেফতার হয় এবং তার ডান হাত কেটে ফেলার শাস্তি হয়। একজন ডাক্তারকে পাওয়া যায়নি এই কাজটি করার জন্য। অথচ সৌদি আরবে বা আফগানিস্তানে এই কাজটি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিতদের মাধ্যমেই করা হয়। আদালতের আর কোনো উপায় ছিল না, হস্ত কর্তন বাদ দিয়ে ছয় বছরের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

* * *

প্রাথমিকভাবে সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ভুট্টোর রাজনৈতিক দল পিপিপি থেকে। জুলফিকারের নিহত হওয়ার পর পরই তিন হাজার পিপিপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় যেন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনে নামতে না পারে। সেইসব প্রাক্তন বন্দিদের সঙ্গে আমি যখন কথা বলেছি তখন তারা বলেছিলেন কি ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কারাগারে। রাতে বন্দিদের এক সেল থেকে অন্য সেলে স্থানান্তর করা হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে এক জেল থেকে আরেক জেলে, যেন তারা স্থানটি বুঝে উঠতে না পারে। রাজবন্দিদের রাখা হত শত শত অপরাধীদের সঙ্গে ছোট ছোট সেলে। যদিও এইসকল অপরাধীরা জিয়াবিরোধী ছিল। তাদের সামনে তাদের খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করার পর তাদের খাওয়ার অনুমতি দেয়া হত। দুইজন বন্দির সঙ্গে আমি কথা বলেছি. তারা ভুট্টোর পক্ষে স্লোগান দেয়ার কারণে তাদের আঙ্গুলের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। সিন্ধুতে ভুট্টোর সমর্থক ও কর্মীরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে রাস্তায় নামে এবং নিজেদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং স্লোগান দেয় জিয়া হটাও। এমনকি এক চরম ঘটনা ঘটে জিয়ার সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার যখন সিন্ধুর এক প্রত্যন্ত অঞ্চল দাদুতে নামে তখন দলের কর্মীরা জিয়ার সেই হেলিকপ্টারে পাথর ছুঁড়ে মারে। জুলফিকার আলীর বিধবা স্ত্রী নুসরাতের উপর লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে এক ন্যাক্কারজনক হামলা হয়। তিনি তখন সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েছিলেন।

নুসরাত সেখানে গিয়েছিলেন কারণ ক্রিকেট খেলা দেখতে আসা বিপুল সংখ্যক দর্শক তাকে দেখে উৎসাহিত হবেন। তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার পিপিপি-এর কর্মীরা পরিকল্পনা করেছিলেন– 'জিয়ার শাসনের অবসান' লেখা একটি ব্যানার সেখানে প্রদর্শন করবে আর নুসরাত সেখান থেকে তাদের নিরাপত্তা দিতে চেয়েছিলেন। স্বৈরাচারের একনম্বর শত্রু নুসরাতকে জনতার সঙ্গে স্টেডিয়ামে দেখে সরকারের বুক কেঁপে উঠল এবং উপস্থিত পুলিশের লোকেরা এসে নুসরাতকে মাঠ ছেড়ে যেতে বলল। নুসরাত বললেন, 'কেন আমি এখান থেকে যাব, আমি খেলা দেখতে এসেছি।' তার মাথায় পুলিশ লাঠি মারে, মাথায় গ্যাসের সেল এসে লাগে এবং তাকে অর্ধচেতন অবস্থায় মাঠ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অনেক ছবিতে দেখা যায়, স্টেডিয়াম থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে আর তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত।

এটা কখনো বলা যাবে না যে, সকল পিপিপি কর্মীরাই সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। দলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা জিলানী যার চেহারা সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে মিল রয়েছে– তিনি সেই সময় জেলের অভ্যন্তরে ছিলেন না বরং বাইরে থেকে স্বৈরাচারের মজলিস-উস-সুরার সদস্য হিসেবে জেনারেল জিয়ার মানসপুত্র নেওয়াজ শরীফের সঙ্গে ছিলেন। জিলানীর এই অতীত বেনজিরের পিপিপিতে যোগ দিতে বাঁধা হয়নি এবং জারদারির নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় প্রধান স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

* * *

www.pathagar.com

জিয়ার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পিপিপি'র নেতৃত্বে বিভিন্ন কিসিমের রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ১৯৮১ সালে মুভমেন্ট ফর দ্যা রেসটোরেশন অব ডেমোক্রেসি বা এম আর ডি গঠিত হয়। দলগুলো ছিল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, ইসলামিক জামাত-উল-ইসলামী, মজদুর কিষাণ পার্টি, পাক্তুন ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স পার্টি এবং অন্যান্য আরো কিছু সংগঠন। এ মোর্চার নেতৃত্ব বেনজিরের হাতেই চলে যায়।

এম আর ডি এর কর্মসূচি ছিল সামরিক শাসনের অবসান। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার এবং যা দ্রুত মানুষের সমর্থন পায় এবং সামরিক শাসকের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ হয়। স্বৈরশাসক এম আর ডি'কে দমন করার অযুহাত খোঁজার চেষ্টা করল এবং পরের মাসেই পিআই-এর বিমান হাইজ্যাক ঘটনায় এক সুযোগ পেয়ে যায়। সামরিক শাসকের জেলখানা এমনিতে ছিল বন্দিতে পরিপূর্ণ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই অতিরিক্ত বন্দিপূর্ণ কারাগারের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবেদন করে আসছিল। সামরিক শাসক বিমান হাইজ্যাকের পর বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের অনেককে মুক্তি দিলেন আবার এম আর ডি-কে দমানোর জন্য নেতা ও সমর্থকদের জেলে দিলেন এবং এভাবেই ১৯৮১ সালের আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই সমাপ্ত ঘটল।

www.pathagar.com

১০

মুর্তজার ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বিপদ-সংকটের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত জীবনেও অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি মনে ছিল। তার পরিবারের বেশকিছু সদস্য এখানে পড়াশুনা করেছেন তাই ক্রিস্ট চার্চ প্রশাসন ছিল তার উপর সহানুভূতিশীল। মুর্তজা অক্সফোর্ড থেকে ভুট্টো-রক্ষা কমিটিতে সার্বক্ষনিক ভাবে নিয়োজিত হওয়ার উদ্দেশ্যে লন্ডন চলে যাওয়ার পর অধ্যাপক আয়ান স্টিফেনস তাকে চিঠি লিখে জানান, 'প্রয়োজনে আমি আপনার জন্য সহমর্মীতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। অবশ্যই আপনি একটি ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে আছেন।' স্টিফেনস আরও বলেছেন যে, তার একজন সহকর্মী মনে করেন যে মুর্তজা, 'তার কারারুদ্ধ পিতার করুণ অবস্থা সম্পর্কে একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোককে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে তিনি সঠিক কাজ করছেন না।'

সম্প্রতি এই অধ্যাপকের দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে— '১৯৩১ অথবা এর কাছাকাছি সময়ে আপনার পিতামহের সাথে আমার দিল্লীতে সাক্ষাৎ হয়, তিনি আমার সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার করেন ... ১৯৭৩ সালে আমি দেখেছি আপনার পিতাকে তিনি তখন ছিলেন প্রচণ্ড ব্যস্ত তা সত্ত্বেও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া অক্সফোর্ডে পড়তে যাবে রোডস স্কলার এক বাঙালী যুবককে সাহায্য করেছিলেন। এ সমস্ত বিষয়ের বিবেচনায় যদি আপনার কোনো প্রয়োজন পড়ে, আমাকে জানালে সাধ্যানুসারে আমি আপনাকে সাহায্য করেতে ইচ্ছুক।'

মুর্তজার জন্য আবাসিক শিক্ষক এবং ক্লাসে পড়াশোনা থেকে দূরে থাকার বিষয়টি ছিল খুবই কষ্টকর, তবু তিনি লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন হেডলেবুল, তার নিজের কাজের সাথে মুর্তজার আগ্রহের মিল ছিল। বুল কাজ করেছেন অন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর, তার প্রথম প্রকাশনা 'অস্ত্র প্রতিযোগীতা নিয়ন্ত্রণ'। মুর্তজার গবেষনার বিষয়ও সেটিই। ১৯৭৭ সালের মিখায়েলমাস টার্মে বিল তার ছাত্র, তখনও অক্সফোর্ডে অবস্থানরত, প্রথম তত্ত্বধায়কের রিপোর্ট লিখেছিলেন, অত্যন্ত চাপের মধ্যে আছেন, তারপরও সন্তোষজনকভাবে কাজ করছেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে, মুর্তজার গবেষণা পত্র আণবিক অস্ত্র দাতাত তার হার্ভাডের গবেষণাপত্রের সম্প্রসারণ, তাতে ঘটনার আরও গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন।

১৯৭৮ সালের শরৎকালে যখন তিনি তার পিতার বিষয়ে বিভিন্ন কাজে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করছিলেন, তখন অক্সফোর্ড থেকে তাকে জানানো হলো যে, তার গবেষণাপত্রের যে খসড়াটি জমা দেয়া হয়েছিল, তা হারিয়ে গিয়েছে। মুর্তজা

www.pathagar.com

সেটির কোনো অনুলিপি রাখেননি। তিনি তখন ভুট্টো রক্ষা কমিটির কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি তার তত্ত্বাবধায়ককে এ বিষয় লিখলেন। তিনি বিষয়টি কলেজের তত্ত্বাবধায়ককে অবহিত করলেন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে সতর্ক করলেন।

মুর্তজা লন্ডনে অবস্থানকালেই তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে হারিয়ে যাওয়া গবেষণাপত্রটি খুঁজে পাওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। গবেষণাপত্রটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে মুর্তজার উপর দায়িত্ব পড়েছিল সেটি আবার নূতন করে তৈরি করার। কিন্তু পিতার বিষয় নিয়ে তার এমন এক সংকটময় অবস্থা চলছিল যে, তার পক্ষে সেটি সম্ভব ছিল না। তত্ত্বাবধায়কের মন্তব্য ছিল যে, জুলাই মাসে তিনি সেটি মুর্তজার কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তা পৌঁছেনি।

মুর্তজা লন্ডনে অবস্থানকালীন সময়ে কমপক্ষে তিনবার বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন, কিছুটা নিরাপত্তার কারণে, কিছুটা লোকজনের ভীড় এড়ানোর জন্য হয়তো এর মধ্যেই গবেষণাপত্রটি হারিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত গবেষণাপত্রের খসড়াটি পাওয়া গিয়েছিল। তত্ত্বধায়কের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছিল এই মেয়াদে মি. ভুট্টো অক্সফোর্ডে ছিলেন না। তিনি আফগানিস্থান থেকে ফোনে অনুরোধ করেছেন তার গবেষণা সম্প্রসারণের জন্য, সেটি এখন পাওয়া গেছে। তিনটি অতিরিক্ত মেয়াদের অনুমোদন তাকে দেয়া হয়েছিল। গবেষণাপত্রের নাটক চলতেই থাকল, এখন এটি চলল ধোঁয়াটে নগর কাবুলে।

১৯৮০ এর প্রথম দিকে বুল একটি অনির্ধারিত রিপোর্ট লিখলেন, তিনি এবার এটি কালো কালিতে টাইপ করা অবস্থায় পাঠালেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, আফগানিস্থানে সোভিয়েট আক্রমণ হওয়ার পর থেকে তার সাথে এই শিক্ষার্থীর যোগাযোগ হয়নি। ছাত্র ও তত্ত্বাবধায়কের একত্রে কাজ করার কোনো সুযোগ তখন ছিল না। রাশানরা ফোন লাইন কেটে দিয়েছিল, আর আফগান ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনির্ভরযোগ্য। এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে মুর্তজা একটি পরিপূর্ণ খস্ড়া পাঠালেন। বুল এটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও মি. ভুট্টো তার কাজ চালিয়ে গেছেন।

কিন্তু এটি যথেষ্ট ছিল না। যদিও গবেষণাপত্র পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল, সেটি ভালো অবস্থায় ছিল না। অধ্যাপক বুল লিখেছেন, 'মি. ভুট্টো তার জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম করেছেন, যাতে তার গবেষণাপত্রটি সার্থক হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পূর্ণ সময়কাল অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকার জন্য ফিরে আসতে হবে।' মুর্তজা বুলকে এর জবাব দেননি। তার অক্সফোর্ডের গবেষণার এখানেই সমাপ্তি হলো।

* * *

১৯৮১ সালের শুরুতে দেল্লা এথেন্সে থাকলেন এবং সামনের দিনগুলো ভালো হবে বলে আশা করলেন। তার আর মুর্তজার ওপর অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তাদের উভয়ের আপনজনকে কারাগার থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, জুলফিকারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা, এবং কাবুলে যাওয়া। তিনি তার ডায়রিতে সামনের দিনগুলোর কথা ভেবে তার কর্তব্য ও

www.pathagar.com

দিকনির্দেশনার কথা লিখলেন। 'নিজ গোপন খবর বাইরের কাউকে দেব না। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। বছরের শেষ দিকে নিজের বাড়ির মালিক হতে হবে। উর্দু ও স্প্যানিশ শিখতে হবে।' তিনি তার স্বামী জেনারেল রউফোগালিসকে ত্যাগ করার কথা ভাবছিলেন। আট বছর হয়েছে তিনি কারাগারে । দেল্লার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই তিনি কারাবন্দী হন। দেল্লা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছেন তার মুক্তির । পরে তিনি বুঝতে পারলেন তার জন্য আর অপেক্ষা করা অযৌক্তিক; এরপর আবার যেখানে মুর্তজার সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন।

মুর্তজা প্রায়ই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন, কিন্তু রুউফোগালিস জেলে থাকা অবস্থায় তিনি তাকে ত্যাগ করতে পারেননি। কিন্তু মুর্তজা বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। তিনি তাকে শুনাতে থাকেন পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের কথা, যেখানে বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্ডার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, হিমালয় থেকে গলিত বরফের উপর দিয়ে, সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়ে, সেখানে মুর্তজা বেড়ে উঠেছেন। তিনি প্রস্তাব করলেন দু'জনের নতুন জীবন গঠনের। মুর্তজা দেল্লাকে বললেন, তাদের উভয়ের যে সন্তান হবে, তারা হবে দেবদূত। তিনি দেল্লাকে লিখলেন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে। দেল্লা লিখলেন, পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সব শেষে লিখলেন, মীরকে সবসময় ভালোবাসতে হবে।

২৬ জানুয়ারি মুর্তজার লেখা চিঠিটি দেল্লার হাতে পৌঁছায়। গভীর উত্তেজনায় দেল্লা চিঠিটি পড়ার পর ছিঁড়ে ফেললেন। মুর্তজা চিঠিটি লিখেছিলেন বার দিন আগে। তিনি লিখেছেন :

> আমি এখানে আসার পর থেকে আমাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই কম। এই কারণে আমাদের একত্রে ঘোরাফেরাও কম। আমার কাছে সকল প্রতিশ্রুতিই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে; তবে একটি অঙ্গীকার আমি অবশ্যই রক্ষা করব, তা হলো, আমি তোমাকে সিন্ধুতে নিয়ে যাব, দেখাব শ্বেত চিতা বাঘ।

দেল্লা চিঠির বক্তব্য উপভোগ করলেন; তাদের ভবিষ্যত মনে করিয়ে দেয় শ্বেত চিতাবাঘের কথা, তারা এই প্রতিকী নিজেদের মধ্যে ব্যাবহার করতো। মুর্তজা লিখেছেন :

> 'আমার কাজটি যতখানি ভেবেছিলাম, তার চেয়েও জটিল । এর জটিলতার কথা বাইরের কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এর ফলে আমি এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, যা আমি আর কখনো হইনি; তবে আমি নিশ্চিত যে সার্থক হব। কারণ জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে, ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আমি তোমার কথা চিন্তা করি এবং তোমার জন্য আমার চিন্তা সবসময় থাকবে।'

যদি এরপরও দেল্লা এই চিঠির মর্মার্থ না বুঝে থাকেন, তবে এখন এটি তার মুখে চপেটাঘাত পাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে।

www.pathagar.com

'কিন্তু তুমি যুবতী ও সুন্দরী, তোমাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে তোমার ভবিষ্যত, আমার জন্য ভাববে না, আমার ভবিষ্যত নির্ধারন হবে বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে... আমি যে কাজ ও জীবনে আছি এটা আমার নির্ধারিত নয়। তুমি তোমার জীবনকে আমার কারণে ধংস করতে পারোনা।'

মুর্তজা দেল্লাকে আরও বললেন, আমৃত্যু তিনি বলবেন যে, দেল্লাই তার সত্যিকারের এবং একমাত্র ভালোবাসার পাত্রী। 'আমি তোমার কথা ভাবি, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি। আমি আগামী দুই তিন বছর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব।' তিনি আরও অনেক কিছু লিখতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাদের সম্পর্ক শেষ হওয়ার পূর্বে এই ছিল মুর্তজার শেষ বক্তব্য।

* * *

সুহেল আমাকে আল-জুলফিকার সম্পর্কে বললেন, 'আমরাই একমাত্র সংগঠন ছিলাম যেখানে সবার জন্য প্রবেশ অবারিত ছিল না।' ভুট্টো ভাইদের দ্বারা গঠিত সংগঠনটির নতুন নাম 'আল-জুলফিকার', তাদের পিতার নাম এবং ইমাম আলীর বিখ্যাত তলোয়ারের সমম্বয়ে হয় এই নামকরণ। 'আমরা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু আমাদের কাছে আসলেই সকলকে আমরা গ্রহণ করিনি, অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে আমরা খুবই সতর্ক ছিলাম।' তিনি মাথা নাড়লেন এবং নিচের দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আমরা সতর্ক থাকা সত্ত্বেও তা ঘটে গেল।'

১৯৮১ সালের প্রারম্ভে সংগঠনটি একটি আকার ধারণ করল। যে সমস্ত দলীয় কর্মী ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সময়কাল, জুলফিকারের বিচার ও কারাদণ্ড হওয়ার সময়ে কাজ করেছে, তারাই ছিল মুক্তির সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আদর্শ প্রার্থী, এবং তারা এসেছিল পাকিস্তানের চার প্রদেশ থেকেই। পাকিস্তানে নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে দলের একনিষ্ঠ কর্মী ও সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে অনেকে বাধ্য হয়ে তখন দেশ ত্যাগ করেছিলেন। পাকিস্তানে অবস্থান করা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক; তাদের উপর বিভিন্ন রকমের নির্যাতন চালানো হতো, গ্রেফতার করা হতো। আমরা ছিলাম একজন কঠোর একনায়কের অধীন। যে সমস্ত দলীয় কর্মী ছিলেন একনিষ্ঠ তারা বেশিরভাগই ছিলেন দরিদ্র, তাদের পক্ষে ইউরোপ বা কোনো পাশ্চাত্য দেশে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তারা আসতে থাকলেন আমাদের কাছে। মূলত আমাদের কাবুলের শিবিরটি গঠিত হয়েছিল তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়া এবং জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য।'

সুহেল একজন সুবিন্যস্ত ব্যক্তি; বেশ লম্বা। তার মাথার উপরের দিকে চুলে পাক ধরেছে, তার গোঁফও কিছুটা সাদা রঙের ছোপ হয়েছে। আমার পিতার মত তিনিও ধূমপান করেন আস্তে আস্তে। আমরা যখন কাবুলের সেই পুরানো দিনের কথা বলছিলাম, সুবিধাভোগী স্বচ্ছল পরিবার থেকে আগত এই তিন যুবকের কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করছিলেন তিনি হাস্য-কৌতূকের মধ্য দিয়ে; তারা সংকল্পবদ্ধ হয়ে পরিকল্পনা করছিলেন একনায়ককে হটিয়ে দেয়ার। এজন্য তারা জীবন বাজি রেখেছিলেন।

সুহেল বললেন, 'পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন আমাদের আন্দোলনে

www.pathagar.com

যোগ দিতে।' তিনি এমনভাবে স্মৃতিচারণ করলেন, যেন ঘটনা গতকালের। 'আমরা অবশ্যই দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলাম তাদের জন্য, যারা আমাদের সঙ্গে সত্যিকারভাবে আমাদের আদর্শে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা ছিলো।' আমি পিতার প্রগতিশীলতার কথা জানতে পেরে আনন্দিত হলাম, সেই সাতাশ বছর বয়সের তরুণ অবস্থায়ও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধু পুরুষদের দ্বারাই বিপ্লব ঘটানো যায় না, নারীদের সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে। সুহেল বিস্তারিতভাবে সে সময়ের ঘটনাবলির বিবরণ দিচ্ছিলেন। প্রায়ই তিনি কাবুলের দৈনন্দিন কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে তখনকার সময়কে সবচেয়ে ভালো সময় বলে আখ্যায়িত করতেন।

সুহেল আরও বললেন, 'শেষের দিকে দেখা গেল, একশ' লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কাজকর্মের জন্য আমরা একটি স্বতন্ত্র স্থান ব্যবহার করতাম। যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি। আন্দোলনকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করেছি– এগুলো হলো রাজনৈতিক শাখা, সামরিক শাখা এবং নিরাপত্তা শাখা। মীর ছিলেন আল-জুলফিকারের মহাসচিব এবং শাহ্ প্রথমে ছিলেন নিরাপত্তা শাখার প্রধান এবং পরবর্তীতে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সামরিক শাখার প্রধানের।'

আল-জুলফিকারকে আমরা বলে থাকি এ জেড ও, 'ও' যুক্ত হয়েছে অর্গানাইজেশনের আদ্যোক্ষরে; এটি কখনো আমার কাছে বাস্তব বলে মনে হয়নি। এটি যখন ভেঙে যায়, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। আমি শুধু মাত্র এটির কথা শুনেছিলাম, এর প্রতীক চিহ্ন ধূলো বালি যুক্ত অবস্থায় অব্যবহৃত দেরাজে দেখতে পেতাম। আমি এই সংগঠনের সুহেলের মত সদস্যদেরকে দেখতে পেতাম আমাদের পারিবারিক বন্ধু হিসেবে। আমি তাদেরকে কাকা বলে জানতাম, তারা আমাকে আইসক্রিম খেতে দিতেন, তাদের সন্তানদের সঙ্গে আমি খেলা করতাম। বিষয়টিকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেকটা বিদেশী সিনেমার মত মনে হতো, যার অনুঘটনা আমি কখনো পড়িনি। তবে আমি এখন বুঝতে পারছি কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন আমার পিতা ও কাকা, যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, পরিস্থিতি তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল না। আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করি যে, আমার পিতা লন্ডনের আরামদায়ক নির্বাসন জীবন ত্যাগ করে একটি অন্যায় প্রশাসনের উৎখাতের জন্য সংগ্রাম করেছেন।

সুহেল স্থানীয় সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে কিছু ভাবতে থাকলেন এবং তারপর বললেন, 'আমাদের দৈনন্দিন কাজের শুরু হতো ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে। এর নেতৃত্ব দিতেন শাহ্। এরপর হতো আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতা। রাজনৈতিক শাখা থেকে কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। সেখানে আলোচনার ব্যবস্থা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। সেখানে আমরা শুনতে পেতাম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ইতিহাস, পিপলস পার্টির বেড়ে ওঠার কাহিনী, আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক ইতিহাস যা ছিল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত।

এরপরের সময়টি ছিল শারীরিক প্রশিক্ষণের, দুপুরের খাবারের ঠিক আগে এটি সম্পন্ন করা হতো। শাহ্ সবার সাথে বসেই খেতেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তিনি সব সময় খুব হাসি-খুশি অবস্থায় থাকতেন। এরপর আমরা রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করতাম। আমরা আলোচনা করতাম আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে। কেন আমরা যুদ্ধ করছি, সে সম্পর্কে আলোচনা হতো, সাধারণ বিতর্ক হতো। যারা

www.pathagar.com

আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের কাছে শাহ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়; শাহর মধ্যে ছিল তারুণ্য, কৌতুক এবং সশস্ত্র যুদ্ধের উপযোগী শারীরিক কাঠামো। মুর্তজা প্রতিদিন প্রশিক্ষণ স্থানটি পরিদর্শন করতেন, তবে তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতেন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে।

তিনি পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধিদের সামনে সাক্ষাৎ করতেন। তাদের কাছ থেকে তিনি দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতেন, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতেন এ সমস্ত ব্যাপারে, চষে বেড়াতেন সংবাদ মাধ্যম, কথা বলতেন সাংবাদিকদের সঙ্গে, রাজনৈতিক বিবৃতি প্রস্তুত করতেন– এ সমস্ত ছিল মহাসচিব হিসেবে মুর্তজার কাজ।

তাদের দু'জনের ভূমিকা ছিল ভিন্ন– শাহের ছিল সংগঠনের সেনাপতি হিসেবে জোরালো ভূমিকা, আর মুর্তজা ছিলেন রাজনৈতিক নেতা– সে সময় উভয়ের ভূমিকাই ছিল জোরালো এবং গুরুত্বপূর্ণ, যদিও স্বতন্ত্রভাবে।

ইতোমধ্যে দেল্লা এথেন্সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি সহজ জীবন পাওয়ার জন্য কোনো প্রস্তাব দেননি। মুর্তজার সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলাপ করেননি। আবার তিনি তাকে সবকিছু ছেড়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে দিতে চাননা।

দেল্লা ক্রুদ্ধ হয়ে মুর্তজাকে কাবুলে একটি চিঠি পাঠান। তিনি তাতে লেখেন, 'তুমি একজন দিশেহারা বেকুব; তোমাকে কে বলেছে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত দিতে? আমার ভবিষ্যৎ আমার কাছে এবং আমার ইচ্ছামত আমি সিদ্ধান্ত নেব। আমারও আছে নিয়তি, আছে কর্তব্য, যা আমি পালন করার চেষ্টা করছি। তোমার জন্য আমার অন্তরে আছে গভীর ভালোবাসা। তোমার চিঠি পেয়ে আমি ভাবছিলাম যে, আকাশ মুক্ত হয়েছে, আফগানিস্তানের পর্বতের বরফ আমার মাথায় পড়েছে।' তিনি সেই চিঠিটি অনুলিপি রেখেছিলেন, যা তিনি আমাকে দিলেন, সাতাশ বছর পর। 'সব সময় মীরকে ভালোবাসি' মন্তব্যে উপরে লিখিত মূল চিঠিটি তিনি মুর্তজাকে পাঠিয়েছেন। এরপর অপেক্ষায় থেকেছেন।

এক সপ্তাহ পর মুর্তজার কাছ থেকে একটি পোস্টকার্ড পেলেন। এটি পাঠানো হয়েছে লিবিয়া থেকে ২৩ জানুয়ারি। দেল্লা সেটি নিয়ে এথেন্সের লিবিয়ার দূতাবাসে গেলেন এবং সেখানে ডেস্কের পেছনে বসা ভদ্রলোককে বললেন যে, এই পোস্টকার্ডের লেখককে তিনি খুঁজছেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা পোস্টকার্ডটি ভালোভাবে দেখলেন এবং অবাক হয়ে ভাবলেন, হয়তো দীর্ঘকেশি এই ভদ্রমহিলা কোনোরূপ ঝামেলায় পড়েছেন। তিনি তাকে কয়েকদিন পর আসতে বললেন। পরে ওই দূতাবাসে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে তাকে জানানো হলো যে, লিবিয়াতে এরূপ কোনো লোক অবস্থান করছে বলে তারা কোনো সন্ধান দিতে পারছে না। এরপর দেল্লা ত্রিপোলির পর্যটন অফিস এবং বিভিন্ন হোটেলে অনুসন্ধান চালালেন। কিন্তু কোথাও তিনি মুর্তজার সন্ধান পেলেন না। ইতোমধ্যে মুর্তজা ত্রিপোলি ত্যাগ করেছেন।

সাহস করে অবশেষে তিনি শাহ্‌কে ফোন করে পেয়ে গেলেন। শাহ্ অবাক হলেন। যদি দেল্লা এলোপাতাড়ি ফোন করতে করতে তাকে পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের আল মুর্তজা সংগঠনের তো নিরাপত্তাই নেই। শাহ্ দেল্লাকে বললেন যে, তিনি তার দেয়া বক্তব্য মুর্তজার কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। কয়েকদিন পর শাহ্ দেল্লাকে জানালেন যে, মুর্তজা

www.pathagar.com

আবুধাবী থেকে তার সঙ্গে কথা বলেছেন, শাহকে তিনি দেল্লার সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন এবং তিনি ভালো আছেন। তিনি দেল্লাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলেছেন এবং কথা দিয়েছেন যে, কয়েকদিনের মধ্যে তার কাছে চিঠি লিখে সবকিছু বিস্তারিত জানাবেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি গ্রিসে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলো। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হলো। সকলেই টিভির সামনে বসে সেই দৃশ্য দেখছে। দেল্লাও দেখতে থাকলেন। হঠাৎ অন্য একটি শিরোনাম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পিআইএ-এর একটি বিমান ছিনতাই করা হয়েছে। ছিনতাইকারীরা দাবি করছে যে, তারা একটি জঙ্গি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, যার ভিত্তিভূমি আফগানিস্তান। সেখানেই বিমানটিকে গতিপরিবর্তন করে নেয়া হচ্ছে। দেল্লা মনোযোগ দিয়ে সংবাদটি শুনলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, সংবাদ পাঠকের কথাগুলো তিনি ঠিকভাবে শুনছেন। খবরে বলা হয়েছে যে, মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ ভুট্টো বিমান ছিনতাইয়ের আদেশ দিয়েছেন। ছিনতাইকারীরা দাবি করছে যে, আল-জুলফিকারের নির্দেশেই তারা এই কাজ করছে। দেল্লা ভাবলেন, খবরটি সঠিক নয়।

সন্ধ্যা শুরুতেই ৫-৩০ এর দিকে ২ নম্বর ভবনের ফোন বেজে উঠল। মুর্তজা ফোনটি ধরার পর যে ব্যক্তি ফোন করেছে, সে মীর মুর্তজা ভুট্টোকে চাইল। এই ফোনটির নম্বর প্রকাশ্য ছিল না, কাবুল ফোন বইয়েও এই নম্বরটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আর সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও অনেকের সঙ্গেই মুর্তজার বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি মনে করেছেন যে, ফোনটি হয়তো কোনো সরকারি কর্মকর্তাই করেছে, নতুবা বিষয়টি অদ্ভুত ধরনের। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো, 'সলিমুল্লাহ টিপু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে। 'নামটি পরিচিত, কিন্তু অন্তরঙ্গ কেউ নয়। মুর্তজা বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবেই বললেন, 'সলিমুল্লাহ টিপু কে?' সে একটি বিমান ছিনতাই করছে। আমি কাবুল বিমান বন্দর নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার থেকে বলছি। সে এখন উড়োজাহাজের মধ্যে আছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

এভাবেই মুর্তজা জানতে পারেন যে, একটি বিমান ছিনতাই হয়েছে। তবে টিপুর নাম যে তিনি এই প্রথম শুনলেন, তা নয়।

এই ছিনতাই সম্পর্কে যখন জানার চেষ্টা করেছি, কোনো সাক্ষাৎকার সহজে করা যায়নি। সুহেল ও আমি ৭০ ক্লিফটনে এই বিষয়ে কথা বলা শুরু করার পর আমার মনে হলো সেখানে ঝাড়বাতিরও কান আছে। আমরা বাগানে গেলাম, একটি চম্পা গাছের নিচে বসলাম, তারপর ফিসফিস করে কথা বললাম, মনে হলো প্রতিবেশিরা আমাদের দেখছে। আমাদের প্রতিবেশী রাশিয়ার কনসালের বাসস্থান এবং ইরানী কনস্যুলেট অত্যন্ত কাছে, আমরা এরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেও সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করলাম না। এই ছিনতাইয়ের কারণে আমার পিতার মাথার উপর যে তলোয়ার ঝুলে আছে, যে কোনো সময় তা খুলে পড়তে পারে। আমার এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সরকারি মামলায় আমার পিতা ও কাকা যে নির্দোষ, তা প্রমাণিত হয়েছে ২০০৩ সালে এবং এর ফলে অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। কে এই ছিনতাইয়ের ব্যবস্থা করেছে? কে আকাশে বিমানটির দিক পরিবর্তন করেছে? ভুট্টো ভাইদের বিষয়টি তদন্তের পর যখন দেখা গেল যে, তারা এই ঘটনায় জড়িত নয়, তখন মামলাটি এখানেই খতম করা সহজ হয়। আমি সুহেলকে নিয়ে করাচির কোলাহলপূর্ণ জমজম অঞ্চলের শপিং এরিয়ায় একটি

www.pathagar.com

কফি হাউজে গেলাম।

সুহেল আমার কাছে পিতার মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি আমার জন্মের সময়, জুলফিকার জন্মের সময় এবং একমাস বয়সের মীর আলীকে এতিমখানা থেকে দত্তক হিসেবে আমাদের পরিবারে আনার সময়, তখন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সকলের জন্মদিনে, এমন কি আমার বয়স ত্রিশ আমার জন্মদিনেও আসেন।

তিনি আমার অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেই নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন।

ঘটনার তিন মাস আগে একদল লোক করাচি থেকে কাবুল আসে। সলিমুল্লাহ টিপু তাদের মধ্যে একজন। করাচিতে তার খ্যাতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য। সে ধর্মভিত্তিক দল জামাত-ই ইসলামীর হয়ে মারপিট করতো এবং দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে গোলাগুলির ঘটনাও ঘটিয়েছে।

সুহেলের মনে আছে টিপু ছিল একজন সুদর্শন ব্যক্তি। সে একসময় কিছুকাল সেনাবাহিনীতে ছিল। শৈশবে তার স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে চাকরি করার, আর বড় হয়ে সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। কিন্তু সে দাবি করল যে, প্রশিক্ষণের সময় ব্যক্তিগত কারণে তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। কাহিনী অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, তাই সে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

সুহেল আরও বললেন, 'সে আমাদের সংগঠনের সদস্য ছিল না, সে পিপিপি'র কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে আসেনি। সে কাবুলে এসেছিল সাধারণ যোগাযোগের মাধ্যমে। আমাদের প্রধান কার্যালয়ে অনেক পাকিস্তানি সক্রিয় কর্মী, উপজাতীয় নেতা, জাতীয়তাবাদী, বামপন্থি আসতেন মুর্তজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে অথবা দেশ থেকে খবর নিয়ে।' তিনি বললেন, 'টিপুকে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হতো, সে জিয়ার শাসন ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিল, কিন্তু তার সম্পর্কিত কিছু বিষয় স্পষ্ট ছিল না। তার কিছু বিষয় ছিল বেশ শানিত আবার কিছু বিষয় ছিল অমার্জিত। তার পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি ছিল সহিংসতাযুক্ত।' সুহেল আবার বললেন, 'কিন্তু আমাদের কাছে তার আসার বিষয়টি ছিল সন্দেহজনক।'

টিপুর সঙ্গে আরও দু'জন এসেছিল, একজন তার আত্মীয়, অপরজন বন্ধু। সেটি ছিল ছিনতাইয়ের যুগ– প্যালেস্টাইনিরা এটিকে বিখ্যাত করেছে তাদের সঙ্কটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বেপরোয়া হয়ে। লায়লা খালিদ ছিনতাই করাকে তার কাজ বলতে গর্ববোধ করতেন, তিনি দ্রুত প্যালেস্টাইনবাসীদের জন্য গেরিলার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। এরপর ছিনতাই কাজ গণমাধ্যমে দারুণভাবে প্রচার ও বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করার সুযোগ হিসেবে দেখা হয়।

টিপু মুর্তজার কাছে প্রস্তাব রাখে যে তারা মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসেবে একটি পাকিস্তানি বিমান ছিনতাই করবে এবং নবগঠিত আল-জুলফিকার যেন এর নেতৃত্ব দেয়। সুহেল স্মরণ করেন, পাকিস্তানে তখন চলছিল স্বৈরশাসন, বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। টিপু বলেছিল যে জনগণ ভয়ে কাঁপছে। সে বলেছিল অনেক রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে আবদ্ধ আছে এবং আদালতে ন্যায় বিচারের আশ্রয় নেওয়ার কোনো উপায়ই নেই তাদের। তার এই কথাগুলো সত্য; আইনজীবীদের মধ্যেও অনেকেই এই শাসনযন্ত্রকে সমর্থন করছে। টিপু কারাগারের বন্দিদের মুক্তির উপায়

www.pathagar.com

হিসেবে একটি বিমান ছিনতাইয়ের প্রস্তাব দেয়।

মুর্তজা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এরূপ ছিনতাইয়ের প্রস্তাব এই প্রথম আসেনি। বন্ধুদের নিয়ে টিপু আসার একমাস আগে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক দল তরুণ এসে একই প্রস্তাব দিয়েছিল এবং মুর্তজা সেটিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মুর্তজা বলেছিলেন, 'যে সামরিক গোষ্ঠী জনগণের কাছ থেকে জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমাদের যুদ্ধ পিআইএ-এর মতো কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে নয়।' কিন্তু টিপু তার আবেগকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে হতাশ হয়ে পড়ল। পরে আবারও সে ওই প্রস্তাব রাখে, মুর্তজা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। সুহেল বললেন হাতে ধরা সিগারেট নাড়তে নাড়তে মুখ সামনের দিকে ঝুকিয়ে, 'সেই রাতের ফোনটি পেয়ে মীর সম্পূর্ণরূপে হতভম্ব হয়ে পড়েন।'

সেদিনের পিআইএর ফ্লাইটটির নির্ধারিত গতিপথ ছিল করাচি থেকে পেশোয়ার। মাঝ পথে আকাশে তিন ব্যক্তি বিমানের গতিপথ পরিবর্তনে বাধ্য করে। তারা পাইলটকে নির্দেশ দেয় বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করে সেটি মধ্যেপ্রাচ্যে নিয়ে যেতে। তারা বিবেচনায় আনেনি যে বিমানটি স্বল্প দূরত্ব যাত্রার। সেটিতে দূরে খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানিও ছিল না। এরপর ছিনতাইকারীরা দাবি করল বিমানটিকে কাবুল নিয়ে যাওয়ার; সেটিই ছিল নিকটতম অবতরণের স্থান– আফগান কর্তৃপক্ষ চিন্তা করল যে এই ছিনতাইয়ের কাজটি হবে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কোন্নয়নের একটি বড় ধরনের সুযোগ। তাই তার বিমানটিকে কাবুলে অবতরণের অনুমতি দেয়। বিমানটি অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে আফগান কর্তৃপক্ষ ২ নম্বর ভবনকে ডাকলেন এবং মুর্তজাকে বললেন মধ্যস্ততা করতে।

সুহেলের মনে আছে, সে সময় আমরা আফগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি দোটানার মধ্যে দিয়ে অবস্থান করছিলাম। তারা আমাদের সংগঠন পরিচালনার বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তারা মূলত যে সমস্ত পাকিস্তানি এখানে আসেন, তাদের কাছ থেতে আভ্যন্তরীণ তথ্য সংগ্রহ করতেন। মুর্তজা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি কাবুল ত্যাগ করার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি সমঝোতায় আসার ইচ্ছা পোষণ করেননি। আর এমন একটি সময়েই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল।

ফোনটি এসেছিল কুখ্যাত গোয়েন্দা প্রধান ড. নজিবুল্লাহর কাছ থেকে। তিনি সুহেলকে বললেন যে, পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলার জন্য তিনি ওই বাড়িতে আসছেন। কাবুলের পিআইএ স্টেশন প্রধানও মুর্তজাকে ফোন করলেন। তিনি আমাদের চিনতেন। তিনি আমাদের সাহায্য চাইলেন– যাতে এই সমস্যার সমাধান হয়– তিনি বললেন যে বিমানের মধ্যে আছে মহিলা ও শিশু, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

ড. নজিবুল্লাহ আসলেন। তিনি জানতেন যে, তার সরকার ও অতিথিদের মধ্যে একটি চাপা উত্তেজনা চলছে। সুহেল বললেন, 'তিনি ইংরেজি ও উর্দু উভয় ভাষায়ই ভালোভাবে কথা বলতে পারেন, কিন্তু সে রাতে তিনি পশতু ভাষায় কথা বলছিলেন এবং আমি তা মীরের জন্য অনুবাদ করেছিলাম। তিনি মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন যে দ্রুত এই ছিনতাই নাটকের অবসান হোক। তিনি জিম্মি অবস্থা থেকে যাত্রীদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের সঙ্গে সরকারের দ্বন্দ্ব চলা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করতে প্রচষ্টা চালাতে

www.pathagar.com

আগ্রহী ছিলেন।

মুর্তজা ও সুহেলকে একত্রে কাবুল বিমানবন্দরে নেয়া হলো। যিনি গাড়ি চালিয়ে তাদের বিমানবন্দরে নিয়ে ছিলেন তার নাম ক্যাপটেন বাবা। তিনি ছিলেন জাতীয় এরিয়ানা এয়ারলাইন্সের প্রধান। তারা বিমানবন্দরে পৌঁছবার পর তাদেরকে দুটো নীল কোট পরতে দেয়া হলো। যেগুলো বিমানবন্দরের প্রকৌশলীরা পরে থাকেন। তারপর গাড়িতে করে টারমাকে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে বিমানটি দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যাপ্টেন বাবা তাদের বললেন, 'ওদের বলুন, বিষয়টি এখানেই শেষ করতে, ওরা আপনাদের কথা শুনবে।'

সুহেল আরও বললেন, 'আমরা যখন টারমাকে পৌছলাম, তখন রাত প্রায় শেষ। কমপক্ষে রাত দুটো বা তিনটা হবে।' ওই সময় পর্যন্ত কোনো যাত্রীর ক্ষতি হয়নি এবং সবাই উদ্বিগ্ন ছিলেন ছিনতাই সঙ্কটের দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য। ক্যাপটেন বাবা তাদের দু'জনকে বিমানের সামনে নামিয়ে দিলেন এবং ছিনতাইয়ের নেতাকে সংবাদ দিলেন টারমাকে নেমে আসতে।

তিন ব্যক্তির কথাবার্তা চলল অল্প কিছুক্ষণের জন্য, পনের মিনিটের বেশি নয়। মুর্তজা টিপুকে বললেন, মহিলা ও শিশুদের মুক্তি দিতে। তিনি ছিনতাইকারীদের বললেন, যাত্রীদের কোনো ক্ষতি যেন না করা হয়। সুহেলের স্মরণ আছে, 'মীর খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তবু শান্ত ছিলেন অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে– সরকারের সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতি, বিমানের যাত্রী এবং পাকিস্তানে জিয়ার দুর্বৃত্তদের বিষয় ভেবে তিনি টিপুকে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটাতে বললেন। টিপু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ছিনতাইকারীরা জিয়ার কারাগারে বন্দি পঞ্চান্ন ব্যক্তির একটি তালিকা দিল এবং বিমানে আরোহণকারী যাত্রীদের নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদের মুক্তি দাবি করল। টিপু মুর্তজা ও সুহেলকে বলল, 'আমরা এখন থামতে পারি না। যে সমস্ত বন্দিদের আমরা তালিকা দিয়েছি, সরকার তাদেরকে হত্যা করবে। পঞ্চান্নজনের বেশিরভাগই সারাদেশ বিশেষ করে পাঞ্জাব থেকে বন্দি পিপিপি'র সক্রিয় কর্মী, তবে এর মধ্যে বামপন্থী সক্রিয় কর্মীও আছে। টিপু মহিলা ও শিশুদের মুক্তি দিতে সম্মত হল এবং এও জানালো, সরকার থেকে কোনোরকম ছাড় দেয়া না হলে তাদের পক্ষে ছিনতাই কাজের সমাপ্তি ঘটানো হবে আত্মঘাতী কাজ।

আলোচনা শেষ হলো। মুর্তজা জিম্মিদের নিরাপত্তার জন্য আহ্বান জানালেন। আর কোনো আলোচনা হয়নি, সময় নষ্ট হয়নি। পনের মিনিট পর মুর্তজা কাবুল বিমানবন্দর ত্যাগ করলেন এবং সলিমুল্লাহ টিপু বিমানে ফিরল। কয়েক ঘণ্টা পর আরোহীদের মধ্য থেকে মহিলা ও শিশুদের মুক্তি দেয়া হলো এবং তাদের কাবুল আন্তর্জাতিক হোটেলে নেয়া হলো।

সুহেল বললেন, 'আমরা চলে আসার পর পাকিস্তান সরকার একটি আপোস-মীমাংসা দল পাঠান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলাপ করতে এবং অবরোধের অবসান ঘটাতে। সুহেল সাতাশ বছর পরও কোলাহলপূর্ণ কফি হাউজে বসে ছিনতাইয়ের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'মীমাংসা-নাটক দেখে মনে হলো না যে সামরিক কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব সহকারে দেখছে। মনে হচ্ছিল তারা বিষয়টির দ্রুত সমাধান চায় না, তারা ছিনতাইকারীদের উত্তেজিত করতে চায়, যার ফলে যেন কোনো অঘটন ঘটে যায় এবং তারা শক্তি প্রয়োগ করার মত ওজর খুঁজে পায়।'

www.pathagar.com

কাবুল বিমানবন্দরে অবস্থানরত ছিনতাইকারীদের সঙ্গে যখন সামরিক সরকারের লোকদের মিমাংসার জন্য আলোচনা চলছিল, তখনই একজন যাত্রী নিহত হয়। মেজর তারিক রহিমকে ছিনতাইকারীরা হত্যা করল। রহিম একসময় জুলফিকারের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন এবং জুলফিকারের যখন ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড হয়, তখন তিনি কূটনীতিক হিসেবে ইরানে কর্মরত ছিলেন। মেজর রহিমের নিহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ছিনতাইয়ের বিষয়ে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনের প্রচার প্রশ্নের সম্মুখীন হলো, তারা রটিয়ে ছিল ভুট্টো দুই ভাই ও পিপিপি কর্মীরা এর পেছনে জড়িত। কিন্তু এখন প্রশ্ন আসল, ভুট্টো ভাইয়েরা কেন তাদের পিতার এডিসিকে হত্যা করবেন?

জিয়ার কারাগার রাজনৈতিক বন্দি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গন কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কেও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। স্বৈরশাসকের অনুতাপহীন সহিংসতার মধ্যে কিছু পরিবর্তন হতেই হবে– কারাগার বন্দি গণতান্ত্রিক কর্মী শূন্য করতেই হবে। তবে জিয়ার পক্ষে তার বিরোধীদের মুক্তি দেওয়া ছিল অসম্মানজনক, তার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, যে রাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রকাশ করা মানেই তার দুর্বলতা, আর যেখানে সেনাবাহিনী জড়িত।

ছিনতাই কাজের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, এটি সামরিক শাসক কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে শাসকের অনুকম্পার কারণে। ছিনতাইয়ের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধকে অজনপ্রিয় করে তুলেছিল, তাই বিরোধীদলীয় আন্দোলন, যা এম আর ডি নামে পরিচিত, তাকে কঠোরভাবে দমন করার সুযোগ পেল সামরিক কর্তৃপক্ষ। ভুট্টো ভ্রাতৃদ্বয়কে চিহ্নিত করা হতে থাকল সন্ত্রাসী হিসেবে। তাদের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করা হলো এবং বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হলো তাদের উপর। তাদের উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করা হলো। বস্তুত দীর্ঘসময়ের জন্য তাদের মাথার উপর তলোয়ার ঝুলতে থাকল।

ছিনতাইকারীদের কার্যক্রম কাবুলে চলছিল সাত দিন। এরপর আফগান সরকার বুঝতে পারলেন যে, জিয়া প্রশাসন এটি মীমাংসার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে ভয়ের বিষয় হয় যে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে যে, কাবুলে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হোক এবং তখন এটিকে ওজর দেখিয়ে তারা এখানে আক্রমণ করতে পারে। এ সমস্ত চিন্তা করে আফগান কর্তৃপক্ষ ছিনতাইকারীদের অনুরোধ করলেন বিমানটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে। তারা ছিনতাইকারীদেরকে সিরিয়ায় চলে যেতে পরামর্শ দিলেন; সেখানে কর্তৃপক্ষ ভুট্টো ভাইদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল এবং স্থানটিও উপযুক্ত। প্রথমে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ বিমান সেখানে নেয়ার জন্য অনুমতি দিতে চাননি। পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক অনুরোধ আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অনুমতি দেননি।

অবশেষে বিমানটি সিরিয়ায় পৌছল, দামেস্ক বিমানবন্দর টারমারকে রইল আরও পাঁচদিন। সম্পূর্ণ সঙ্কটটি চলছিল বারদিন ধরে। সুহেল বললেন, এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী ছিনতাই সঙ্কট। অবশেষে তালিকাভুক্ত কয়েদিদের পঞ্চান্নজনের মধ্যে চুয়ান্নজনকে পাকিস্তানে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। ছিনতাইকারীদের দাবি অনুসারে তাদের সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ বিমান সেখানে নেয়ার জন্য অনুমতি দিতে চাননি।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক অনুরোধ আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অনুমতি দেননি।

অবশেষে বিমানটি সিরিয়ায় পৌঁছল, দামেস্ক বিমানবন্দর টারমাকে রইল আরও পাঁচদিন। সম্পূর্ণ সঙ্কটটি চলছিল বারদিন ধরে। সুহেল বললেন, এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী ছিনতাই সঙ্কট। অবশেষে তালিকাভুক্ত কয়েদিদের পঞ্চান্নজনের মধ্যে চুয়ান্নজনকে পাকিস্তানে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। ছিনতাইকারীদের দাবি অনুসারে তাদের সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল এবং যাত্রী ও বিমানকে অবশেষে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মুক্ত কারাবন্দি এবং তিনজন ছিনতাইকারীকে দামেস্ক বিমানবন্দর হোটেলে রাখা হয়েছিল এবং রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। জাতিসংঘ এ বিষয়ে সহযোগিতা করে। ডা. গোলাম হোসেন ছিলেন কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন পিপিপি-এর মহাসচিব। তিনি দল ত্যাগ করে জিয়ার কেবিনেটে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে এক ডজন হত্যা মামলা করা হয় এবং তাকে জেলে আটক রাখা হয়। ডা. হোসেন একজন বৃদ্ধ লোক, তাকে দেখতে সান্তাক্লসের মত মনে হয় তার সাদা চুল দাঁড়ির কারণে। তিনি একজন কবি ও লেখক।

ডা. হোসেন তার ইসলামাবাদের বাড়িতে আমাকে বলেছেন, ছিনতাইকারীরা পিপিপির লোক নয়। সম্পূর্ণ বিষয়টি অনুষ্ঠিত হয় জেনারেল জিয়ার কূট কৌশল অনুসারে। তিনি চাচ্ছিলেন একটি বিস্ফোরণ ঘটাতে, যার ফলে সারা বিশ্ব ভুট্টো ভাইদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ডা. হোসেন লোকজন নিয়ে থাকতে এবং হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে চলতে পছন্দ করতেন। তিনি স্বর্ণের পাতলা ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করেন। তার কণ্ঠস্বর খুব বলিষ্ঠ ধরনের। তিনি একজন আবেগপ্রবণ বক্তাও। আমি তাকে রাজনৈতিক সমাবেশে দেখেছি। আমি দেখেছি জনতা তার কথা কত মনোযোগ দিয়ে শোনে। তিনি আমাকে 'সাহেবা' বলে ডাকেন, কিন্তু আমার আব্বা ও কাকাকে 'ছেলেরা' বলে উল্লেখ করেন।

তার সঙ্গে কথা হলো হাসি-মস্করার মধ্য দিয়ে, কাব্যিকভাবে। আমার অবাক লাগে, কিভাবে তিনি জিয়ার কারাগারে বেঁচেছিলেন। তাকে আটটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল, নিয়মিত হুমকি দেয়া হতো, নির্যাতন চালানো হতো। তিনি গর্বের সঙ্গে বললেন, 'প্রতিবার আমাকে বদলি করার সময় জোরে চিৎকার করে বলতাম, 'জয় ভুট্টো'! কারাগারে তাকে সংবাদপত্র ও বই পড়তে দেয়া হতো না। তবে তাকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি এবং লেখার জন্য কাগজ রাখতে দেয়া হতো। ডা. হোসেনের একটি অভ্যাস ছিল, তাকে যেখানেই স্থানান্তর করা হতো, সেখানেই তিনি তার কক্ষের বাইরে বাগান তৈরি করতেন। তিনি খুব ভালো রান্না শিখেছিলেন। তিনি তার সন্তানদের জন্য দুটো ডায়েরি লিখেছেন; তিনি তাদেরকে নিজের সাহচার্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, তার সম্পূরক হিসেবে তার এ কাজ।

'মস্তিষ্ক শরীরের অংশ, তাই না? তোমাকে এটি ব্যবহার করতে হবে অথবা হারাতে হবে।' তিনি হাসতে হাসতে বললেন। ডা. হোসেন সময় কাটাতেন দামেস্ক বিমানবন্দর হোটেলে। এক বছর পর্যন্ত তার এভাবে চলছিল। তিনি কবিতা লিখে সময় কাটাতেন; এ অভ্যাসটি তার গড়ে উঠেছিল কারাগারে অবস্থানকালে। তিনি বললেন, 'ছিনতাইয়ের সহিংসতার মধ্য দিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরুদ্ধে সহিংসতার সৃষ্টি করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রেসিডেন্ট কার্টারের তখন অন্য একটি জিম্মি সঙ্কট হয়েছিল ইরানে, সে সময়েই জিয়ার এই প্রচেষ্টা চলছিল। অবশেষে ডা. হোসেন সুইডেনে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

আশ্রয়লাভ করেন।'

সামরিক কর্তৃপক্ষ ছিনতাইয়ের দায়-দায়িত্ব সরাসরি মূর্তজা ও শাহনেওয়াজের উপর অর্পণ করল। এ সময় বেনজির একটি ভুল করলেন। তিনি আনন্দ ও উত্তেজনার বশে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ছিনতাইয়ের মাধ্যমে একটি আঘাত হানা হয়েছে মনে করে চারদিক ফোন করা শুরু করলেন। তিনি বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের বললেন, 'আমরা এটি ঘটিয়েছি!' তিনি বললেন, 'অবশেষে আমরা তাদেরকে বেকায়দায় ফেলেছি।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাকে ও নুসরাতকে ছিনতাই অনুষ্ঠান ঘটানোর কারণে গ্রেফতার করল। বেনজির তার ভাইদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। তারা যে কত ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আছে, সে বিষয়ে তার কোনো ধারণা নেই। তার ফোন করার কারণে তাকে ও তার মাকে সমঝোতায় আসতে হয়েছে, কিন্তু তার ভাইদের ভাগ্য হয়ে পড়ল অনিশ্চিত। বেনজির তার একটি তারিখবিহীন রেজিস্ট্রারে লিখেছেন, সেশন জজ-এর রিপোর্টে ছিল যে 'ছিনতাইয়ের কাজটি ঘটেছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে।' ছিনতাইকারীরা বিস্তারিত প্রকাশ করার আগেই প্রশাসন পিপিপি-কে দোষী সাব্যস্ত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল পিপিপি যাতে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা ছিনতাইয়ের প্রমাণাদি নষ্ট করে। মিথ্যা দম্ভোক্তির কারণে বেনজির বিপদ ডেকে আনেন। ফলে বিবিসি থেকে প্রচার করা হয় যে বেগম সাহেবা ও তাকে ছিনতাইয়ের জন্য বিচার করা হবে। এটি ঘটেছিল তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগ আনার আগে। অবশেষে বেনজিরের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনো মামলা হয়নি, শুধুমাত্র তার ভাইদেরকে হয়রানি করা হয়েছে।

ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে বেনজির যে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করলে তার এক বন্ধু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'না, না, না বেনজির তার ভাইদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরোধীতা করতেন।' বেনজিরের ওই বন্ধু বার বার তার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। ওই বন্ধু যদিও ভুট্টো ভাইদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন, তিনি বললেন, যে আদালতে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেই আদালত থেকেই সম্মানের সঙ্গে নির্দোষ বলে খালাস পেয়েছেন তারা।

আমার ফুফুর বন্ধুদের সাক্ষাৎকার নেয়ার বিষয়টি দিবাস্বপ্নের মত। তারা আমার সকল প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন তীর্যক বা বিকৃতভাবে। বেনজিরের প্রথমবারে শাসনামলের একজন মহিলা সংসদ সদস্য, যিনি বন্ধুত্বের খাতিরে বেনজিরের কাছ থেকে বেশ সুবিধা আদায় করেছেন, তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বেনজির ক্ষমতায় আসার আগে কেমন ছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমরা তখন ছিলাম অনভিজ্ঞ, শিশুর মত, আমাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে।' 'আমি আবার স্পষ্ট করে আমার প্রশ্নটি করলাম, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে তিনি কেমন ছিলেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'ওহ্, তিনি একইরকম ব্যক্তি ছিলেন।' তার চোখ চকচক করে উঠল। 'তিনি ছিলেন উদার, দেশের প্রতি তার খুব মমত্ববোধ ছিল– দেশ নিয়ে ভাবতেন সবসময়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়, কখনো তিনি বদলে যাননি।'

অন্যদের কাছে এ বিষয়ে কথা বলা ছিল বৃথা। বেনজিরের ভূমিকা তাদের কাছে ছিল প্রশ্নাতীত। 'তিনি কোনো ভুল করেননি, তার যে কোনো রকমের প্রস্তাবকেই ভুট্টো বিরোধীরা বাঁকা চোখে দেখতো। ইসলামী বিশ্বের এই প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক সেনাবাহিনী ভুলভাবে প্রচার করত।' তাদের অভিমত এরূপ।

www.pathagar.com

ছিনতাইয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। যে বন্ধু বেনজিরের নিরাপত্তার জন্য এক সময় কাজ করেছে, নির্বুদ্ধিতাবশত তিনি ছিনতাই কাজকে আমাদের লোক এটি করেছে বলার জন্য তার মা'সহ কারারুদ্ধ হওয়ার পর সেই বন্ধু সামরিক প্রশাসনের পক্ষের লোকে পরিণত হয়। মুক্তি পেয়ে বেনজির বুঝতে পারলেন কী ধরনের লোকজন তার চারপাশে আছে। এরপর তিনি কৌশল পরিবর্তন করলেন। তিনি নির্দোষ। তার ভাইয়েরা সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত তাকে একজন মুসলমান অং সান সু কি বা পাকিস্তানি গান্ধি বলে মনে হতে পারে।

জিয়ার আদালতে দুই ভাই এবং সুহেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো, যার পরিণতি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড। বস্তুত এই তিন ব্যক্তি ২০০৩ সালে ছিনতাইয়ের অভিযোগ থেকে সসম্মানে অব্যাহতি পেয়েছেন– জিয়ার কারণে এই মামলার সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি, তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, এটি ছিল ভুট্টো গোষ্ঠীর পরিকল্পনার অংশ। এই দিন পর্যন্ত ভুট্টোর ভাইদের জন্য এটি ছিল কলঙ্কস্বরূপ। যে আদালত ভুট্টোর ভাইদেরকে অভিযুক্ত করে শুনানি করেছিল, সেই আদালতেই মৃত্যুর পর তারা নির্দোষ ছিলেন বলে প্রমাণিত হলেন। মনে হয় ছিনতাইয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত নথিপত্রের ফাইলটি আদালত কক্ষের তলার দেরাজে রাখা হয়েছিল। যেন এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

যথাসময়ে সলিমুল্লাহ টিপু প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করতে শুরু করে। ছিনতাইয়ে তার যে ভূমিকা ছিল, তা আর উত্থাপিত হলো না।

* * *

কয়েক মাস যাবত দেল্লার সঙ্গে মুর্তজার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ২০ এপ্রিল তিনি কাবুলের নম্বরে ফোন করেছিলেন, কিন্তু কেউ সেই ফোন ধরেনি। কয়েকদিন পর তিনি মুর্তজার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন, যাতে তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল, ১৯৮১ এবং সেটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত কাগজে হাতের লেখা।' এখন হয়তো বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে, কেন আমি বাধ্য হয়েছিলাম ওই চিঠিটি লিখতে। আমি এখন পাকিস্তানি পুলিশ, আফগান বিদ্রোহী এবং ইন্টারপোলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি। বস্তুত আমার জন্য ভ্রমণ করা এখন অসম্ভব। আমার এখনকার জীবনধারা সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। শাব্দিক অর্থেই আমি একজন পলাতক ব্যক্তি, আমাকে জীবিত কিংবা মৃত পাওয়ার চেষ্টা চলছে। আমি বাধ্য হয়েছি গোপন অবস্থানে থাকতে এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে। আমার বিশ্বাস, তুমি এখানে ফোন করেছিলে। এটি অযথা। তারা কখনো সংযোগ দেবে না। তিনি চিঠিটির সমাপ্তি ঘটালেন এই বলে যে, তারা সব সময় বন্ধু হয়ে থাকবেন এবং যথা সময়ে দেল্লা বুঝতে পারবে কেন মুর্তজা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; সেগুলো ছিল বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে।

www.pathagar.com

১১

সে বছর মে মাসে দেল্লা ও মুর্তজার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়। তাদের বিচ্ছেদ হলো এবং দেল্লা এতে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তাঁর সোনালী চুল ছোটো করে কেটে গাঢ় বাদামি রঙে রঞ্জিত করলেন এবং নিজস্ব জীবন যাপন শুরু করলেন। গ্রীষ্মের পর মুর্তজার এক পুরানো বন্ধুর সাথে লন্ডনে তার দেখা হয়। তাকে মীর কেমন আছে জিগ্যেস করেন দেল্লা। জবাবে জানালেন যে, মীর ভালো আছে। দেল্লা আরও জিজ্ঞেস করেন মীর অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে সম্পকির্ত হয়েছে কি না; তিনি সব সময় সন্দেহ করতেন যে অন্য কোনো মহিলার সাথে মীরের সম্পর্ক আছে, যার ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বন্ধু জবাব দিলেন যে, তা হয়েছে। দেল্লা আবার জানতে চেয়েছিল, মীর এখন সুখী কিনা। জবাবে বন্ধু বললেন যে, হ্যাঁ, মীর এখন সুখেই আছে। দেল্লা ভাবলেন, মীর আগেও তাই ছিলেন।

অনেক বছর পর দেল্লার সাথে আমার যখন গ্রিসে দেখা হয়, তিনি আমাকে বললেন যে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার শেষদিকে আব্বার সাথে অন্য কারো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সাথে সাথেই আমি পিতার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু দেল্লা তখন তারিখ-বছর উল্লেখ করলেন। আমি হিসাব করে বের করলাম যে আমার জন্মের এক বছর এক মাস পূর্বের ঘটনা। সেই সময়ে তিনি অবিষ্কার করলেন আব্বা অন্য কারো প্রতি অনুরক্ত। ততদিনে আমি মাতৃগর্ভে এসেছি।

ঘটনাক্রমে আমার গর্ভধারিনী মাতা ফৌজিয়ার সাথে আমার পিতার সাক্ষাত হয়। তিনি সকালে একটি কুকুর সাথে নিয়ে হাঁটতেন, তখনকার দিনে এমন দৃশ্য খুব কমই দেখা যেত। তার বাসস্থানের কাছেই এই কুকুর নিয়ে চলার সময় আব্বা তাকে দেখতেন। মুর্তজাও তার কুকুর ওলফ টু নিয়ে সকালে হাঁটতে শুরু করেন। কাবুল ছিল তখন একটি নির্জন স্থান, সেখানে তখন চলছিল গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী দখলদারিত্ব; তখন তরুণদের তেমন কিছু করার মত কাজ ছিল না। ধীরে ধীরে সুহেল, শাহ্ ও মুর্তজা ওই আফগান তরুণীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। তিনি ছিলেন একটি কূটনৈতিক পরিবারের সদস্য। তার চুল ছিল পিঠে ঝুলে পড়া লম্বা ও বাদামী রং করা। তারা তাদের বাড়িতে যেতেন এবং তার পরিবারের সাথে মেলামেশা করতেন। শাহ্ তার ছোট বোন রেহানার প্রতি প্রেমাশক্ত হলেন। রেহানা ছিলেন লাজুক ও অন্তর্মুখী, অন্য বোনদের থেকে ভিন্ন, তারা একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করা শুরু করেন এবং এদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হলো। কিন্তু রেহানা ছিলেন মুজাহেদিনদের সমর্থক, আর শাহ্ কমিউনিস্ট অতিথি হিসাবে সেখানে থাকা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কৌতুক, বিতর্ক

www.pathagar.com

থেকে অবশেষে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে রেহানা ও শাহের বিয়ে হলো, তার বোনের সাথে মুর্তজার বিয়ে হয় পরে, এই সময়ের মধ্যে আমি ফৌজিয়ার গর্ভে চলে আসি।

সুহেলের মনে আছে যে, দুই ভাইয়ের বিয়ের তারিখের ব্যবধান ছিল খুব কম। তাদের বিয়ের অভ্যর্থনা দেয়া হয়েছিল একসাথে। তখন তারা তাদের খাকি ইউনিফর্ম পরেছিলেন। মীর সুহেলদের সবাইকে ইউনিফর্ম পরতে বললেন অভ্যর্থনা পার্টির জন্য। তিনি মৃদু হাসলেন নিজে নিজে, এরপর তিনি বলতে লাগলেন, 'যখন আমি ড. নাজিবুল্লাহকে বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাতে গেলাম, তিনি আমার সামনে একটি ফাইল খুলে ধরলেন।' তখন একটি অভাবনীয় কাহিনীর সৃষ্টি হলো। ড. নাজিবুল্লাহ ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান, পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এবং আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন এক জটিল ব্যক্তি, তাকে বুঝতে পারা ছিল কঠিন কাজ। তিনি ছিলেন নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত; ভুট্টো ভাইদের সাথে তার সম্পর্ক উঠামানা করছিল, তাদের কাবুলে আসার পর থেকেই। তিনি আমাকে বললেন, বিষয়টি কেন আমি তাকে আগে জানাইনি। তিনি মনে করতেন তাদের ব্যক্তিগত জীবন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাব ফেলবে। তিনি বললেন যে, এই মেয়েদের সাথে মুজাহিদের যোগাযোগ আছে। তাদের পিতা পররাষ্ট্র বিভাগে কাজ করতেন, প্রায়ই ইন্দোনেশিয়াসহ অন্য দেশ ভ্রমণ করতেন। তিনি সুহেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মুজাহিদিনদের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জেনারেল জিয়ার প্রশাসনের পাকিস্তানের আন্ত-গোয়েন্দা বাহিনী, আই এস আই-এর মাধ্যমে। আমেরিকান সি আই এ-এর অস্ত্র ও অর্থ তাদের মাধ্যমেই সরবরাহ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ড. নাজিবুল্লাহ, দুই ভাইয়ের রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীর জন্য সন্দেহ করতে লাগলেন। আবার, যখন দেল্লা মুর্তজার সাথে ছিলেন তখন আফগান গোয়েন্দা বাহিনী মনে করেছে যে দেল্লা সিআইএ'র এজেন্ট। মুর্তজা দেল-ার কাছে লেখা তার শেষ চিঠিতে লিখেছেন,

> আমার মনে হয়, শাহ্ তোমাকে আমাদের এখানকার অবস্থা বর্ণনা করেছে। যদিও আমি জানি যে কথাটি সত্য নয় যে তুমি মার্কিনিদের হয়ে কাজ করো, তবু আমার বন্ধুদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি তা করো। আমি তাদেরকে তোমার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু বুঝান সম্ভব হয়নি। তারা তোমার বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। তোমার অতীত জীবনের ঘটনাবলির অনুসন্ধান করছে, খোঁজ করছে তোমার বন্ধু-বান্ধব, ভ্রমণ, যোগাযোগ ইত্যাদি।

মুর্তজা বুঝেছিলেন যে, চিঠিটি দেল-ার কাছে পৌছবার আগেই সেন্সরড হবে, কিন্তু পরে দেখা গেল তা হয়নি। এখন তিনি দেল-ার মত দুই বোনকে সন্দেহ করছেন। সুহেল বললেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে কোনো সময় আমাদের বাড়ি আসতে এবং সেখানে আপনি এই ফাইলগুলো দুই ভাইকে দেখাতে পারেন। ড. নাজিবুল্লাহ তাদের বাড়ি যাওয়ার পূর্বেই মুর্তজার বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তার হাতে তখন বিয়ের আংটি ছিল। তিনি আর ফাইল বের করলেন না। তিনি চলে যাবার সময় সুহেল তাকে জিজ্ঞেস করলেন– ডক্টর সাহেব আপনি কিন্তু কিছু বললেন না, ড. নাজিবুল্লাহ্ বললেন– আমি এখন কি বলব? তিনি হতাশ হয়েছিলেন।

* * *

www.pathagar.com

আমি জন্মগ্রহণ করেছি কাবুলে, কার্ফিউর মধ্যে, সকাল ৩-৪৫ মিনিটে, ২৯ মে ১৯৮২ তারিখে আমার মামের প্রসব বেদনা উঠেছিল সন্ধ্যা সাতটা কিংবা আটটায় এবং তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সরকারী হাসপাতালে নেয়া হয়। কাবুলের মুজাহেদীন বিদ্রোহ তখন ছিল তুঙ্গে এবং সারা শহরেই তখন অবিরত আক্রমণ চলছিল, তাই সান্ধ্যআইন জারি করা হতো। ড. নাজিবুল্লাহর আদেশে আমার জন্মের সময় হাসপাতালের চারদিক পাহারা বসানো হয়েছিল, এই ভয়ে যে ভূট্টো পরিবারকে ক্ষতম করার জন্য হাসপাতালটি মুজাহেদিনদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। ড. নাজিবুল্লাহর স্ত্রী ফাতান হাসপাতালে ছিলেন দেখাশোনা করার জন্য। জুলফিকার সংগঠনের একজন সদস্য, এবং মুর্তজার প্রিয় বন্ধু এহমান ভাট্টি এবং শাহনাওয়াজ ছিলেন খাঁকি পোশাক পরা অবস্থায়, তারা প্রসব কামরার বাইরে অবস্থান করছিলেন। তাদের গায়ে প্যালেস্টাইনীদের কেফ্‌ফিয়াহও ছিল। ড. নাজিবুল্লাহর স্ত্রী ফাতান তা খুলে ফেলতে বললেন এজন্য যে এগুলোতে সহজে অন্যের দৃষ্টি পড়ে। মীর খুব চিন্তিত ছিলেন, সুহেল আমাকে বললেন, 'ড. নাজিবুল্লাহর দুই নম্বর ব্যক্তি জামিল নূরীস্তানী যিনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে এবং তোমার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সেখানে রাখলেন।' পরে আব্বা আমাকে ঠাট্টা করে বলতো যে নুরীস্তানী আমার নাম রাখতে বলেছিলেন গুলাবো বা গুলরুখ ধরণের কিছু , যে নাম গুল দিয়ে শুরু, এগুলো সনাতন ধরণের পশতু নাম। সকাল চারটায় আব্বা আমার জন্মের সংবাদ পেলেন। আমার জন্ম খুব একটা সহজ ভাবে হয়নি। আব্বা দিনটি উদযাপন করলেন একটি টোস্ট দিয়ে এবং আমার নামকরণের বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে। সুহেল বললেন যে, প্রথম দু'টি নামের প্রস্তাব করা হয়েছিল, ফাতিমা এবং খুরশিদ। আব্বাকে ধন্যবাদ যে, তিনি প্রথমটিই পছন্দ করেছেন। এটি আমার ইরানী বড় দাদীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। আমি খুরশিদ নামটি অপছন্দ করি বললে সুহেল বলতেন, উর্দুতে খুরশিদ অর্থ হলো সূর্য।

সুহেল বললেন যে, 'মীর সত্যিই সুখী হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তোমাকে কোলে নিলেন, যেন তুমি তার জন্যই পৃথিবীতে এসেছ।' আমার জন্মের পরপরই আমার একটি সাদা-কালো আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। আমি লম্বা ছিলাম। বার বছর বয়স পর্যন্ত আমার শরীর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এরপর থেকে বৃদ্ধির মাত্রা কমতে থাকল এবং একসময় থেমে গেল, তখন আমার উচ্চতা দাড়াল ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, আমার পিতার উচ্চতার চেয়ে এক ফুট কম। তিন মাস পর শাহনেওয়াজও পিতা হলেন। তারও হলো মেয়ে সন্তান, নাম রাখলেন 'শশী' সিন্ধী লোককাহিনীর এক করুণ চরিত্র নায়িকার নামানুসারে। দুই ভাই দুই বোনকে বিয়ে করলেন এবং দুজনের হলো কন্যা সন্তান, মনে হলো ভুট্টো ভাইদের জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

আগের মতই বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঘটনা এগিয়ে যেতে লাগল। আল-জুলফিকার সরকারের সাথে সরাসরি সংঘাতের প্রচেষ্টা চালানোর মত প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিল। রাওয়ালপিন্ডির চাকলালা বিমান ঘাটিতে জেনারেল জিয়ার বিমান ছেড়ে যাওয়ার সময় একটি দল সেটিতে মিসাইল দিয়ে আক্রমণ করে এবং অল্পের জন্য অত্যাধুনিক তাপ অনুসন্ধানী মিসাইল সামিক্স বিমানটিকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়। এটি যখন ছোড়া হয় তার আগেই বিমানটি উপরে উঠে গিয়েছিল। বিমানের পাইলট ও যাত্রীরা অবশ্য তখনই টের

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছিল। জেনারেল জিয়ার সাথে ফ্লাইটে ছিলেন তখনকার সিনেটের চেয়ারম্যান গোলাম ইসহাক খান। যে ব্যক্তির কাছে ১৯৮৮ সনে বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং মাহ্‌মুদ হাসান, জুলফিকারের মৃত্যু পরওয়ানায় যার স্বাক্ষর ছিল, যাকে বেনজির তার প্রথম সরকারের আমলে সিন্ধুর গভর্নর করেছিলেন। এটি চিন্তা করা যায় না যে, যে তিনজন জান্তা সেদিন বিমানে ছিলেন জে. জিয়ার সাথে, তাদের দু'জনের সাথেই পরবর্তীতে বেনজির আপোষ করেছিলেন। তিনি অল্পের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সাথে কাজ করতে সক্ষম হননি। সেদিন ওই তিন ব্যক্তি মৃত্যু পরোয়ানা থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণের পর থেকেই ভুট্টো ভাইদের প্রতি এবং কাবুলের এই সংগঠনটির প্রতি প্রশাসন কড়া দৃষ্টি রাখতে লাগল। 'এটি ছিল আমাদের অত্যন্ত সাহসী এবং প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা' সুহেল আমাকে বলেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও এটিকে বলা যায় একটি দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজ। জিয়ার জীবনহানির প্রচেষ্টার পর থেকে জিয়া ও সামরিক চক্র ভুট্টোদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চালাতে লাগল। সুহেল বলেছেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ মুর্তজা ও শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে চুরাশিটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা এনেছিল, সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ছিল প্রাণদণ্ডের শাস্তি। (আমার মনে হয়, অভিযোগের সংখ্যা নব্বই বা আরও বেশি। অনেকে বলে থাকেন একশরও বেশি)।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ভুট্টোদের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ গঠন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা সক্রিয়ভাবেও তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। আমি সুহেলকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ভুট্টোরা যখন কাবুলে ছিলেন, তখন তাদের জীবনের উপর কোনো প্রত্যক্ষভাবে হামলা হয়েছিল কিনা। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন যে, তা হয়েছিল পাকিস্তানের আইন অমান্যকারী উপজাতীয় এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে কাবুলে পাঠানো হয়েছিল ভুট্টো ভাইদেরকে হত্যা করার জন্য। সুহেল এ বিষয়ে আমাকে আর কোনো কথা বললেন না। তবে এ বিষয়ে আমি কিছু কিছু জানি। আমি আমার পিতার শরীরে ও মুখে দাগ দেখেছি। তার পিঠে বুকে ও নাকেও দাগ দেখেছি। আমার মনে আছে, তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন কথা বলতেন না। ছোট্ট মেয়ে হিসাবে আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম, আঘাত করেছে কারা, জবাবে তিনি বলতেন সেই লোক যারা আমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

এই এক কঠিন লড়াইয়ের ইতিহাস। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ ছিলেন তরুণ, তারা তাদের পিতার মৃত্যুপূর্ব ইচ্ছাপুরন করতে চেয়েছিল, তবে তার পরিনতি হয়েছিল তাদের জীবন দান। জুলফিকারের তার পুত্রদের, যারা ছিলেন তার উত্তরাধিকারও, তাদেরকে ভয়াবহ বিপদে ফেলে দেয়া ছিল পাগলামির মত দায়িত্বহীনতা। তিনি যে তার সন্তানদের স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ জীবনের ছেদ ঘটিয়ে প্রতিহিংসা আশ্রিত জীবনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে যে তাদেরও ধ্বংস টেনে আনবে জুলফিকারের তা বুঝা উচিত ছিল। তবে তাদেরও ভুল হয়েছিল তাকে অনুসরণ করা। তারা পরে তা উপলব্ধি করে তা বুঝা যায় তাদের চলার পথের কৌশল পরিবর্তন দেখে।

১৯৮২ সালে যখন তারা উভয়ে পিতা হতে যাচ্ছিলেন, তখন মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ তাদের সংগঠনের কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন করছিলেন। সুহেল বললেন এরপর তাদের বেশিরভাগ কাজ কর্ম চলেছে পাকিস্তানের শাসকদের বিরোধিতা করে যারা দেশের ভেতরে থেকে লড়াই করছিল তাদের সাহায্য করা। সামরিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা লড়াই

www.pathagar.com

করছিল তাদের জন্য তারা (ভুট্টো ভাইয়েরা) ছিলেন প্রধান কেন্দ্র। তারা ছিলেন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল সামরিক শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য আশ্রয়স্থল।

মুর্তজা তখন কাবুল থেকে পাকিস্তানে বেতার সম্প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তখন একনায়কের শাসনে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক অন্যায় কাজের তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। সীমান্ত অতিক্রম করে আসা এ সমস্ত তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা করছিলেন। এরপর দুই ভাইয়ের ভূমিকা দুই দিকে সম্প্রসারিত হলো। মুর্তজা চাচ্ছিলেন কূটনৈতিক উপায়ে এই শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। ইতোমধ্যে শাহনেওয়াজ অনেক সময় ব্যয় করেছেন সক্রিয় সমর্থকদের সামরিক ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে। তিনি তখনও ছিলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং একনায়কের বিরুদ্ধে আঘাত হানার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুহেল বললেন, জুলফিকারের মৃত্যুর পর শাহের পিতার স্থান নিয়েছিলেন মুর্তজা। তিনি ভাইদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিলেন। সুহেল বললেন, 'তারা পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন। শাহ্কে কৃত্তিত্বের গৌরব দিতেই হবে। তিনি তার জীবন দিয়েছেন। তিনি সংগঠনের কাজ করতে কাবুলে আসার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর ভাইকে দুর্জয় সংগ্রামে সাহায্য করাকে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছেন।'

এদিকে পাকিস্তানে জিয়াউল হক কে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল। ১৯৮৩ সালে এম আর ডি আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়েছিল এটি সিন্ধুতে প্রবল হয়েছিল, কিন্তু অন্য প্রদেশগুলোতে ব্যর্থ হয়। তবে বেলুচিস্তানে কিছুটা সফল হয়েছে বলা যায়। এম আর ডি-র আন্দোলন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মত শান্তিপূর্ণ ছিলনা। হরতালে কাজকর্ম বন্ধ থাকত, সাথে থাকত উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সহিংসতা। সিন্ধুর লারকানা, শুক্কুর, জেকোবাবাদ এবং খায়েরপুরে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। সিন্ধুর গভর্নর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, প্রথম তিন মাসের উত্তেজনা দমন করতে সরকার ১৯৯৯ জনকে গ্রেফতার করেছে, হত্যা করেছে ১৮৯ জন এবং আহত করেছে ১২৬ জন।

কিন্তু দ্রুত আন্দোলনে ফাটল ধরল। এম আর ডি-এর সিন্ধুর নেতৃত্ব মনে করলেন যে, তাদের সহযোগীরা জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য যথেষ্ট যোগ্য নয়। হাজার হাজার পাঞ্জাবীকে জান্তা কারাগারে আবদ্ধ করছে, তবে পাঞ্জাবীরা মনে করেন রাজনৈতিক ভাবে সুবিধা পেয়েছে বেনজির, তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে এবং আন্দোলন ছিনতাই করেছে। এম আর ডি অভ্যন্তরীন দ্বন্দ মেটাবার মত শক্তিশালী ছিলনা। ফলে আন্দোলনের গতি ভিন্ন পথে চলে যায়। সিন্ধুর আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্য, আর পাঞ্জাবে এর ব্যর্থতার ফলে আঞ্চলিকতার রাজনীতি বেড়ে গেলে এই দুই প্রদেশ। এর ফলে বহুদিন পর্যন্ত এই দুই প্রদেশের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ সৃষ্টি হয়। অথচ আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র ও নির্বাচনের দাবীতে, সে আন্দোলন সামরিক শাসনের বিরোধীতা এবং মানবাধিকার বিরোধী রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ১৯৮৩ সালে এম আর ডি-এর আন্দোলন জেনারেল জিয়াকে উপলব্ধি দেয় যে তাঁকে প্রকাশ্যে তাঁর শাসনামলকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে হবে।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল জিয়া তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য

www.pathagar.com

'ইসলামীকরণ কর্মসূচির' পক্ষে গণভোট করলেন, যার মাধ্যমে তার ক্ষমতায় থাকার বৈধতা জন্মাল। ভোটারদের কাছে প্রশ্ন করা হলো; 'কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী আইন প্রবর্তন সমর্থন করেন কিনা,' যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তবে আপনি জেনারেল জিয়া কে সমর্থন করেন আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট থাকার। এই গণভোটের ফলে ৯৮ শতাংশ ভোট পড়ল জেনারেল জিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ ও তার নীতিমালার পক্ষে। ধর্মীয় দলগুলোর সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হতে ভয় পেল এম আর ডি, ইসলামিকরণ কর্মসূচির বিরদ্ধে প্রাচরনা চালালো না, তবে শুধু ভোট বর্জন করল, যা ছিল একটি কারণ বিহীন সিদ্ধান্ত। জিয়া তাঁর সমর্থকদের নিয়ে ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিলেন, যা ছিল আসলে তথাকথিত বেসামরিক শাসনের আড়ালে জেনারেলের স্বৈরশাসনের বৈধকরণ। এম আর ডি এই নির্বাচন বর্জন করল, এই জোট জিয়ার স্বৈরশাসনের অবসান করতে পারলো না বরং তাকে কৌশলী এবং পাকাপোক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিল। জিয়া সাবধান হলেন, সুবিধাজনক উপায়ে নিজের লক্ষ্য অর্জনে কর্মতৎপরতা চালাতে থাকলেন, গণতন্ত্রের লেবাস ধারনে পদক্ষেপ নিলেন।

নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর জিয়া এম আর ডি-এর প্রধান এবং নব নিযুক্ত পিপিপি-র সভানেত্রী বেনজিরকে দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। বেনজির সাময়িক ভাবে পাকিস্তান ত্যাগ করে সে সময় স্বেচ্ছানির্বাসনে যুক্তরাজ্যে ছিলেন। কাবুলে অবস্থানকারী তাঁর ভাইয়েরা তার পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের বিষয় দ্বিমত পোষণ করেন। এম আর ডি ও পিপিপি-তে বেনজিরের অবস্থান নিয়ে ছিল অনেক দ্বন্দ। দলে তাঁর পিতার পদে তার যাওয়ার বিষয়টি ভোটের মাধ্যমে হয়নি, প্রথমে তিনি তাঁর মাতা নুসরাত কে প্রতীকী প্রধান বলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দেল্লার বোন নানা আমাকে মাইকোনেসে ডিনারে বলেছিলেন যে, এই প্রাথমিক পর্যায়েও বেনজিরের উচ্চাকাঙ্খার জন্য ভাই-বোনের মধ্যে টানাপড়েন ছিল। মীরের সাথে তার দ্বীমত ছিল। মীর তাকে ভালোবাসতেন, তাই সরে দাঁড়ালেন। দেল্লা বললেন মীর একদিন আমাদের বললেন, যে, 'বেনজির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীত্ব চাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি সরে দাঁড়াব।'

নতুন প্রধানমন্ত্রী জুজেনজোর উপদেষ্টাগণ তাকে এবং জেনারেল জিয়াকে পরামর্শ দেন বেনজিরকে দেশে ফিরে আসতে দেয়ার জন্য। তাঁরা বললেন বেনজির সরকারের জন্য কোনো হুমকি নয় বরং বড় রকমের হুমকি এম আর ডি-র জন্য। পরে উপদেষ্টাদের কথা-ই সঠিক প্রমাণিত হয়। ১৯৮৫ সালের মধ্যেই এম আর ডি রাজনৈতিক ভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, শুধু সে প্রতিরোধ আন্দোলনকারী বিভিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতেই ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়, সেগুলোকে আরও ভেঙ্গে ফেলেছিল। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও জিয়ার সামরিক সরকার আরও শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলো- নির্বাচন হলো পাকিস্তানে শাসন কুক্ষিগত করার একটি রীতি।

* * *

আমার জন্মের সময়ই আমার পিতা এবং কাকা কাবুল ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৮২ সালের গ্রীষ্মে এটি সুস্পষ্ট হলো যে ভুট্টো ভাইয়েরা আর আফগানিস্তানে থাকবেন না।

www.pathagar.com

বিমান ছিনতাই ঘটনা এবং মুর্তজা ও শাহনেওয়াজের স্থানীয় নাগরিককে বিয়ে করার কারণে তারা তাদের আশ্রয় দাতাদের সমর্থন হারিয়েছিলেন।

'আমরা দেখলাম যে, আফগান কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে আমাদের যোগাযোগের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে,' সুহেল বললেন, অথচ আমরা পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যই আফগানিস্তানে ছিলাম। আমাদের ভ্রমণের কাগজপত্র সরকারি কাজে আটকিয়ে রাখা হতে লাগল, আমরা বাস করছিলাম সরকারি বাড়িতে সেখানে আমাদেরকে পাহাড়া দিত সরকারি পাহারাদার, গাড়ির চালক ছিল সরকারি লোক, এসমস্ত বিষয়গুলো আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হলো। তাই আমরা তাদেরকে বললাম, তাদের পরিস্থিতিই এখন জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই আমরা এখন চলে যাচ্ছি, তাদের পরিস্থিতি ভালো হলে আমরা ফিরে আসবো। একথায় তারা হতাশ হলেন। তারা মনে করলেন যে তাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের কে বিদায়ের সময় কোনো বিদ্বেষ ভাব দেখালেন না, নূরীস্তানী প্রধানত মুর্তজার তদারকি করতেন, তিনি তার এবং শাহের চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে দুঃখিত হলেন, কিন্তু তাদের রেখে দেওয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করেন নাই।

কাবুলে এই দুই ভাইয়ের সাথে প্রায় একশত লোক যোগ দিয়েছিলেন তারাও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নূতন কোনো দেশে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সিদ্ধান্ত হলো, সাময়িক ভাবে থাকার জন্য তারা লিবিয়ায় যাবে। ওই সময় লিবিয়া ছিল ভিন্ন মতাবলম্বীদের আশ্রয় কেন্দ্র। সুহেল সে সময়ের কথা মনে করেলেন, 'ত্রিপলীতে তখন বহুদেশের লোক ছিলন, প্যালেস্টাইন, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন সহ অনেক দেশ থেকে লোকজন ত্রিপলীতে এসেছিল রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য। মুর্তজা লিবিয়া গিয়ে প্রথমে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির সাথে কথা বললেন। জুলফিকারকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন ভুট্টো পরিবারের সাথে তার একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত হলো, মুর্তজা তার পরিবার নিয়ে দামেস্ক যাবেন এবং সুহেল ও শাহনেওয়াজ ত্রিপলীতে থেকে সংগঠনের কাজ করবেন। শাহনেওয়াজ দেখবেন আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংগঠনের দিকটি, আর এই কাজে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। যারা সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আফগানিস্তানে এসে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহু ব্যক্তির সাথেও তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি তারুণদেরকে সামরিক ও প্রতিরক্ষা কৌশল প্রশিক্ষণ দিতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বড় ভাই এবং সংগঠনের প্রধান হিসাবে মুর্তজা ছিলেন কূটনীতিক কাজে। লন্ডন অবস্থান কালে তিনি অনেক সময় ব্যয় করেছেন লেখালেখিতে, বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের অবস্থা তুলে ধরার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন, তার মধ্যে একটি ছিল প্রামাণ্য চিত্র তৈরি।

শশীর জন্মের অল্পদিন পরই শাহনেওয়াজ ত্রিপলী গেলেন, তার সাথে গেলেন সুহেল। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে সুহেলের স্ত্রী তাদের দুই পুত্র বিল্লাল ও আলীকে নিয়ে লিবিয়াতে এসে তার সাথে যোগ দিলেন। তারা মাস তিনেক মাত্র ছিলেন উত্তর আফ্রিকায়। সুহেল বললেন যে সত্য বলতে গেলে কাবুল ছিল একটি জীবন্ত নগরী, কিন্তু লিবিয়ার সবকিছুই অস্বাভাবিক। তিনি আরও বললেন যে গাদ্দাফি ছিলেন তাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল, অত্যন্ত আন্তরিক, তিনি আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন, তবে সেখানে

www.pathagar.com

কেনো কাঠামো ছিল না এবং ছিল খুব সংবেদনশীল। শাহ্ ও সুহেল ছিলেন সমুদ্রের কাছে আন্দালাইস হোটেলের স্বতন্ত্র দুটো ভিলায়। তাঁদের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ছিল একেবারেই বিচ্ছিন্ন, সরকারের কড়া সেন্সরসিপের কারণে কোনো সংবাদপত্র ছিল না, টি ভি দেখেও কিছু বুঝতেন না কারণ সবকিছুই ছিল আরবী ভাষায়। আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম, সেখানকার শাসনব্যবস্থা ছিল প্রকটভাবে আমলাতান্ত্রিক।' কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, 'এটিও একটি পানীয়বিহীন দেশ, ড্রাই কান্ট্রি।' আমার কাছে আশ্চার্যের বিষয় হল যুদ্ধবিপর্যস্ত কাবুলে জীবন যাপনের পর লিবিয়াকে তারা এত নিরস, অ-আকর্ষণীয় স্থান কেন মনে করেছিলেন। সুহেল বললেন, সামান্য সিগারেট বা ডিমের মত জিনিষও ঠিকমত পাওয়া যেতনা সেখানে। হঠাৎ করে আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেল সুপারমার্কেটে ডিম পাওয়া যাচ্ছে আর মানুষ কার্টুন কার্টুন ডিম কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই তরুনদের মধ্যেও পরিবর্তন এলো। তারা ইতোমধ্যে দেখেছে তাদের চে-গুয়েভারা ধরনের বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, তাদের রোমান্টিক স্বপ্ন ভুল পথে পরিচালিত হওয়া তাদের বিরুদ্ধে জনমত যাওয়া। সুহেল বললেন, যে তরুণ যুবকেরা সবকিছু ত্যাগ করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাতিলকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে দেশত্যাগী সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো। 'আমরা আমাদের কাজের জন্য মেডেল চাইনি অথচ জিয়াবিরোধী আন্দোলনে আমরাই ছিলাম প্রথম কাতারের সৈনিক। আমরা আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে লবিং করিনি রাষ্ট্রিয় ভোজে নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য বা লন্ডনে মধ্যাহ্নভোজের জন্য, লড়াই করেই আমরা পুরো সময়টা কাটিয়েছি।'

নানান বিরূপ পরিস্থিতির কারণে শাহ্ ও সুহেল লিবিয়া ত্যাগ করে দামেস্ক চলে গেলেন মুর্তজার কাছে। তাদের সবারই পরিবার আছে। তারা আগের মত পাহাড়ি এলাকায় এবং একা নয়, এখানে শুধু তারাই নয়, তাদের মত অনেকেই আছে। এখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করার মত পরিবেশ পরিস্থিতি আছে। এদিকে পাকিস্তানের প্রতিরোধ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছিল, এমআরডি-এর রাজনৈতিক অযোগ্যতা প্রকট হয়ে পড়লো, তাদের মধ্যে আপোষকামিতার সৃষ্টি হলো। সাংবাদিক, ছাত্র, কেউই আর শাসকদের বিরুদ্ধে আগের মত জোরালো ভূমিকা রাখলেন না। আল-জুলফিকারও আগের মত শক্তিশালী থাকলোনা, ভুট্টো ভাতৃদ্বয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের অতিথি হয়ে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন যাপন করতে লাগলেন। এভাবে চলতে থাকা অবস্থায় ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে শাহনেওয়াজের কাছে এই নির্বাসিত জীবন একঘেয়ে বলে মনে হতে লাগল। তিনি হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তার বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর, সাথে তরুণী স্ত্রী ও দুই বছর বয়স্ক কন্যা। তিনি সবসময়ই ছিলেন পরিবারের একজন স্বাধীনচেতা সদস্য। আসলে দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি পরিবারের পক্ষে একত্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করা ছিল খুবই দুরহ ব্যাপার। বিষয়টিতে তিনি খুব ভালো বোধ করছিলেন না। তিনি মনে করলেন এখান থেকে সরে ইউরোপের কোথাও চলে যেতে এবং সেখানে সাময়িক ভাবে বসবাস করতে, পরে তার পরিবার কিছু স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায়। তিনি পছন্দ করলেন ফ্রান্স, যার কাছাকাছি তিনি কলেজের ছাত্র হিসাবে একসময় অবস্থান করেছেন।

মুর্তজা ছোট ভাই শাহ্‌কে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বিষয়টি শুনে মর্মাহত হলেন। তার কাছে এটিকে একটি ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছিল। শাহের ইউরোপে থাকা যে অনিরাপদ

www.pathagar.com

মুর্তজা অনুভব করলেও এ বিষয়ে কোনো কথা না বলে ভাইয়ের ইচ্ছার প্রতি সম্মতি দিয়েছিলেন। সুহেলকে কথা বলার সময় গম্ভীর ও সিগারেটে লম্বা টান দিতে দেখে আমার মনে হলো তিনিও নিশ্চই এ বিষয়ে মুর্তজার মনোভাবই পোষণ করেন। আমি সুহেলের কাছে জানতে চাইলাম, কেন সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিলনা। আমি জানতে চাইলাম যে তারা দুই ভাইই বিদেশে বাস করেছেন, কেন সেটি ফ্রান্স হতে পারে না। ফ্রান্সে থাকা কেন বিপজ্জনক তিনি বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। আফগানিস্তানে তাদের জন্য ছিল নিরাপত্তারক্ষী, তাদের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। দামেস্কতেও তাই ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে শাহ জীবন যাপন করতো প্রকাশ্যে এবং এখানে তাদের কোনো নিরাপত্তা রক্ষী ছিলনা। একবার যখন জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দুই ভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর যখন তারা আফগানিস্তানে গিয়েছেন, তাঁরা পরিণত হয়েছেন তাদের শত্রুর চিহ্নিত ব্যক্তি হিসেবে।

www.pathagar.com

১২

পরবর্তীতে কী ঘটেছিল, তা এখনও রহস্যাবৃত। আমরা যা জানতে পেরেছি, তা হলো ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে শাহ্ তার স্ত্রী রেহানা এবং কন্যা শশী দামেস্ক ত্যাগ করে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে পৌঁছলেন। তরুণ দম্পতি এই স্থান বদলকে আশার আলো বলে মনে করেছিলেন। কাবুলে রেহানা ছিলেন একজন তরুণ ছাত্রী, তিনি ছিলেন কুটনৈতিক পরিবারের সদস্য। পুরাতন শাসকদের সাথে তাদের ছিল বন্ধন। তাঁর স্বামী শাহ্ ছিলেন সোভিয়েট পন্থী কমিউনিস্টদের অতিথি। তাঁদের বয়স তখন ছিল অল্প এখন আমার যা বয়স, তার চেয়ে কম। তারা বিয়ে করেছিলেন শাহ্ পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয় আসলে ভাবাবেগের বশে। শুধুমাত্র পারিবারিক নয়, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল এ বিয়েতে। রেহানা ছিলেন মুজাহিদদের সমর্থক। শাহ্ ছিলেন বিপরীত পক্ষের বিশ্বাসী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তারা দুই ভাই বিশ্বাস করে যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের পিতার ফাঁসি কার্যকর হওয়ার জন্য ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও জিয়ার সামরিক জান্তাকে সাহায্য করছে।

ফ্রান্স এই দম্পতিকে প্রথম সুযোগ দান করে নিজেদের মত করে জীবনকে উপভোগ করার এবং রাজনৈতিক মত ও পারিবারিক বিরোধ থেকে দূরে থাকতে। তারা নিজের একটি অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতে লাগলেন। সেটি ছিল অ্যাভিনিউ দ্য রোইয়ে অ্যালবার্টের একটি দালানের তৃতীয় তলায়। শাহ্ প্রায়ই দামেস্ক যেতেন তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে তবে বেশি দিন সেখানে থাকতেন না, অধীর হয়ে ফিরে আসতেন ফ্রান্সে, সেখানে তাঁর পরিবার স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করছিলেন।

১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মে আমাদের একটি পারিবারিক পূণর্মিলন হলো ফ্রান্সের নিসে। অনেক বছর পর পরিবারের সদস্যগণ একত্রিত হলেন। নুসরাত আসলেন জেনেভা থেকে, সেখানে তিনি নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন, মুর্তজা আসলেন দামেস্ক থেকে, আর বেনজির সনাম কে নিয়ে আসলেন লন্ডন থেকে।

ভাইয়েরা পরস্পরকে আবার কাছে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন– আসলে পিতার ফাঁসি হওয়ার পর থেকে সাম্প্রতিক সময় ছাড়া তারা ছিলেন অবিচ্ছিন্ন– আবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে তারা আবেগে আপ্লুত হলেন। মুর্তজা ও শাহ্ থেকে থেকেই পরস্পরের সাথে হাস্য কৌতুক করলেন। আমরা শাহের ফ্ল্যাটে আসলাম। পরিকল্পনা ছিল এই ফ্ল্যাটে আমরা পুরো জুলাই মাস থাকব। ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় মুর্তজা লক্ষ্য করলেন যে, দালানের বাইরে কল-বেলে শাহ্ তার নাম লিখে রেখেছেন এবং সেটি তার প্রকৃত নাম।

www.pathagar.com

মুর্তজা এজন্য তাকে বকা দিলেন– তাঁর উচিত হয়নি এভাবে নিজেকে প্রকাশ করার, কারণ এটি ফ্রান্স। নিসে সেখানকার সরকার তার জন্য কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না, স্থানীয়ভাবে ভুট্টো পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সরকারি কোনো কর্মকর্তা নাই। তবে মনে হলো, এই নেইম প্লেট রাখাটা একটি সামান্য ভুল। গ্রীষ্মের শুরু হলো আনন্দের সাথেই।

আমরা পরিবারের সকল সদস্য মিলে বিকেল বেলা সমুদ্র সৈকতে যেতাম এবং সূর্যে রোদ পোহাতাম। শাহ্ ছিলেন খেলোয়াড় তিনি যেতেন জেট স্কি অথবা ওয়াটার স্কি করতে, তারপর ভেসে ভেসে তীরে আসতেন এবং নানারূপ কৌতুক করে আমাদের বোকা বানাতেন। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিস বছর শারীরিক শক্তি ছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়। আমার মনে আছে, তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে চমৎকার ভাবে জল স্কিইং করছিলেন। তিনি ছিলেন পরিবারের প্রাণ, স্নেহের ছোট সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র। তার ছিল উদ্দম এবং সর্বদা উৎফুল্ল-থাকতেন সকল পরিস্থিতিতেই এবং লোকজনের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন। শশী ও আমি উভয়েই তখন ছিলাম তিন বছর বয়স্ক, আমি ছিলাম ওর চেয়ে তিন মাসের বড়। আমরা শাহের তৃতীয় তলার ঝুল বারন্দায় দাঁড়িয়ে আনন্দ পেতাম। আমরা প্যাকেট করা ফলের রস খেয়ে প্যাকেট গুলো নিচতলায় সাতার কাটার পুলে ফেলে দিতাম। নিচতলার বাসিন্দারা ফরাসি ভাষায় গালি দিতে দিতে এগুলো সরিয়ে নিতে বলতেন। ওই ঝুল বারান্দাটি ছিল আমাদের এলাকা। সেখানে আমরা রোজ খেলাধূলা করতাম। আমার আর শশীর মধ্যে অনেক মিল ছিল। আমরা ছিলাম দুই দিকের সর্ম্পকের চাচাত ও খালাত বোন। আমাদের চুল, চেহারা ইত্যাদির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য ছিল। আমাদের যমজবোন বলে মনে হতো। কাকা শাহ্ আমার পাশ দিয়ে গেলে আমি তার পা জড়িয়ে ধরতাম বা তার কোলে উঠতাম, শশী আর্তনাদ করে উঠতো এবং বলতো, আমার আব্বা। আমি জানতাম শশী ওরকমটি আমার আব্বার সাথে করবেনা। সে ছিল একটু ভীরু। আমি আবার ছুটে গিয়ে আমার আব্বার পা জড়িয়ে ধরতাম। শশী বলে আমি নাকি তার গালে কামড় দিতাম, কিন্তু আমার মনে পড়ে না। আমাদের চারদিকে ছিলেন বয়স্ক ব্যক্তিরা। তাদের সব কথা আমরা বুঝতাম না, তবে এটা বুঝতাম যে, আমাদের চারদিকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আমরা জানতাম যে, আমাদের একজন পিতামহ ছিলেন, যাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা বুঝতে পারতাম যে, আমরা নিজদেশে বাস করছিনা, সেটি অনেক দূরে। আমরা এ সমস্ত বুঝতে পারছিলাম বড়দের কথাবার্তা শুনে। সন্ধ্যায় পরিবারের সবাই খেতে যেতাম রেস্টুরেন্টে। আমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য টেবিলগুলো একত্রে সাজানো হতো। পরিবারের সদস্যরা আলাপ আলোচনা করতেন। খাবার পরিবেশন করা হতো অনেক রাত্রে। মুর্তজা ও শাহ্ চলে যেতেন কার্লটন হোটেলে, সেখানে তারা মদ্যপান করতেন। এটি ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের স্বাধীনতা, সেখান থেকে বাসায় ফিরতেন খুব ভোরে।

১৭ জুলাই আমরা সারাদিন কাটালাম পোর্ট লা গ্যালারিতে সাঁতার কেটে। পরিকল্পনা হলো সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতে মাংসের কাবাব খাওয়ার পার্টির। শাহ্ ও রেহানা ফ্ল্যাটে থাকলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য। আব্বা শশী ও আমাকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে গেলেন এবং দিনের বেশিরভাগ সময় সেখানে কাটালেন। তিনি আমাদের সাথে জল ছিটিয়ে খেলা করলেন। ফ্লাটে রেহানা শাহ্কে পাঠালেন মুদি দোকান থেকে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে। আমরা সমুদ্র সৈকতে হাত ধরে হাটছিলাম, ওদিকে অনেক লোকের

খাবারের আয়োজন চলছিল। শাহ্ ফিরে আসলেন পানীয়, একবার ব্যবহার যোগ্য কাটলারি ছুরি, চামচ, প্লেট ইত্যাদি কেনাকাটা করে এবং এরপর বসে সিগারেট খেতে খেতে টিভি দেখতে থাকলেন। ততক্ষণে ওই রাতে আমরা কয়েকজন তখন লা নাপোলি সৈকতে। শাহ্ ও মুর্তজা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে আত্মীয় অতিথিদেরকে গাড়িতে করে সৈকতে পৌঁছিয়ে দিলেন। ৯-৩০টায় পার্টি শুরু হলো এবং আনন্দ-উল্লাস চলতে থাকল। আমার পিতামহী নুসরাতকে আমি জুনাম বলে ডাকি। জুনাম আনলেন সালাদ ও ইরানী কায়দায় তৈরি অন্য একটি খাবার। অন্য একজন এনেছিলেন আইসক্রীম ও মিষ্টি। গ্রিলটিকে আগুনে পোড়ানো হলো এবং শাহ্ চপ শেকা শুরু করলেন। আমার মনে আছে মাংসের মধ্যে লেবুর রস দেয়ার পর তা তার চোখে লাগায় তিনি খুব জোরে হাসতে লাগলেন। আমাদের হৈ-চৈ রত পরিবার বাদে সেদিন সৈকত ছিল শূন্য। আব্বা পরে আমাকে বলেছেন যে, জুনাম সেদিন খুব উচ্ছ্বল ছিলেন। জুলফিকার নিহত হওয়ার পর থেকে তিনি যে বিষাদগ্রস্ত দিন কাটাচ্ছিলেন, তা থেকে একটু মুক্ত হয়েছিলেন তখন। তিনি তার আত্মীয়দেরকে ফার্সি এবং অন্যদেরকে ইংরেজিতে কথা বলেছিলেন, সকলকে বললেন তিনি আশা করেন যে মৃত্যুর পূর্বে পরিবারের সবাইকে জীবিত দেখে যাবেন। তিনি তখন ভাবতেই পারেননি যে তাঁকে আরও একজন ভালোবাসার পাত্রকে হারানোর বেদনা সহ্য করতে হবে।

খাওয়া শেষ হলো রাত ১১ টায়। মুর্তজা ও শাহনেওয়াজ পৃথক গাড়িতে করে আত্মীদেরকে তাদের বাসস্থানে পৌঁছিয়ে দিলেন। আমি আব্বার সাথে ছিলাম। শশী কোথায় ছিল তা আমার জানা নেই। শাহনেওয়াজ ও রেহানা অ্যাভেনিউ দ্য রোই আলবার্টে পৌঁছবার পর উভয়েই খুব ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিতর্ক চলছিল। শাহ্ শহরের কোনো ক্যাসিনোতে সময় কাটাতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু রেহানা রাজী হয়নি, তিনি যেতে চাচ্ছিলেন হুইস্কি পান করার জন্য গো গো নাইট ক্লাবে।

তারা যখন অ্যাপার্টমেন্টর গাড়িবারান্দায় পৌঁছলেন, বিষয়টি কুৎসিত আকার ধারণ করল। আব্বা কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করাতে জবাবে রেহানা তাঁকে নিজের কাজে মনোযোগ দিতে বললেন। মুর্তজা তখন ক্রুদ্ধ হলেন রেহানার ওপর এবং আশা করছিলেন যে শাহ্ তার স্ত্রীকে শান্ত করবে। ততক্ষণে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে আমার পিতা এবং রেহানার মধ্যে এবং শাহ্ তখন দু'জনের ঝগড়ার মাঝখানে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। রেহানা আমার পিতা ও তার নিজের বোনকে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন। আব্বা প্রচণ্ড রকমের অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্রুদ্ধ হলেন। আমি মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলাম এবং ক্লান্তবোধ করছিলাম ও চাচ্ছিলাম বিষয়টির নিষ্পত্তি। আব্বা ঝড়ের গতিতে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের কাপড় চোপড় স্যুটকেসে ফেলা হলো এবং আমরা ধারেকাছেই জুনামের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম।

শাহ্ তার স্ত্রী ও কন্যাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেলেন এবং পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলেন। শশীকে নিয়ে রেহানা শোবার ঘরে গেলেন, শাহ্ তার ছোট মেয়ের জন্য এক বোতল দুধ আনলেন। তিনি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে বৈঠকখানায় গেলেন। ইতোমধ্যে আব্বা এবং আরও কয়েকজন পরিবারের সদস্য ক্যাসিনোতে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরলেন ভোর পাঁচটায়, বাড়ি ফেরার পূর্বে ম্যানহাটন রেস্টুরেন্টে গেলেন। আব্বা আমাদের কাছে ফিরলেন সকাল ৬-৩০-এর দিকে এবং ঘুমাতে গেলেন। পরে কী

www.pathagar.com

ঘটেছে, তা রহস্যজনক।

১৮ তারিখের সকালে আব্বা ঘুম থেকে উঠেই টুকিটাকি কাজে বাইরে গেলেন এবং তিনি এক কপি হেরাল্ড ট্রিবিউন নিয়ে তার মায়ের ফ্ল্যাটে ফিরলেন। পৌনে দুইটার সময় রেহানা এসে কলবেল টিপলেন। তাকে বিধ্বস্ত মনে হলো, তবু আব্বা তার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন না। জুনাম দেখলেন কিছু একটি গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছে। তিনি মুর্তজাকে ডাকলেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বললেন। রেহানা বললেন, 'খারাপ কিছু ঘটেছে'। 'সে মুহূর্তে মনে হয়েছে যে শাহ্ নিশ্চই নিজেকে আঘাত করে থাকতে পারে।' মুর্তজা পরে পুলিশকে রেহানার উক্তিগুলো বলেছেন, কেউ স্মরণ করতে পারেননি 'মাত্রাতিরিক্ত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা। জুনাম তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দিলেন এবং শাহের ঠিকানা জানালেন।

আব্বা শাহের সবুজ মার্সিডিস গাড়িতে চড়লেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন রেহানা, পাশে বসিয়েছিলেন শশীকে। শাহের ফ্ল্যাটে যাওয়ার পথে গাড়িতে তাদের সাথে থাকা পরিবারের অন্য একজন সদস্য জিজ্ঞেস করলেন, শাহের অবস্থা কেমন। সকলের মনে আছে রেহানা বলেছিল, তার শরীর নীল হয়ে গেছে। মুর্তজা তখন ভীত হয়ে পড়েন এবং রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন 'সে জীবিত, না মৃত?' অবশ্য তখনও তিনি ভাবেননি এরূপ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। জবাবে রেহানা জানালেন যে, তিনি জানেন না, ভালো করে দেখারও সাহস হয়নি তার।

তারা অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে দেখলেন যে সোফা ও কফি টেবিলের মাঝখানে শাহের দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুর্তজা পরে বলেছেন যে তিনি দেখেই বুঝেছিলেন যে শাহ্ মৃত।

শাহের বুকে ছিল নীল চিহ্ন এবং মুখের রং হয়েছিল নীলচে কালো, তার পরণে ছিল আগেরদিন সন্ধ্যায় পরিহিত প্যান্ট, কিন্তু গায়ে কোনো শার্ট ছিল না। তিনি ছিলেন মৃত। মুর্তজা তার ভাইয়ের দেহে নীল দাগ দেখেই বুঝেছিলেন যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। তিনি সন্দেহ করলেন বিষ। তিনি কাউকে নির্দেশ দিলেন যে নিচে পুলিশ এসেছে কিনা দেখতে। তিনি অ্যাপার্টমেন্টে খুঁজতে লাগলেন সন্দেহজক কিছু পাওয়া যায় কিনা। এক বছর পূর্বে তাঁদের দুই ভাইকে বিষের শিশি দিয়েছিল কেউ, তাঁরা স্থির করে রেখেছিলেন জিয়ার বাহিনীর কাছে ধরা পড়ার মুহূর্তে তারা তাদের জীবনের অবসান করবেন। কেউ জানে না, কোথা থেকে এই বিষ এসেছিল; তারা নিজেদের কাছে সেটি রেখেছিলেন। সেই ছোট বোতলটি সিলকরা ছিল এবং এতে রংহীন তরল পদার্থ ছিল। অন্য কোনো তরল বস্তুর সাথে মিশালেও এই বিষকে সনাক্ত করা যাবে না। এই বিষ খুব দ্রুত কাজ করে এবং গ্রহণকারী মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ এসে তখনই ফ্ল্যাট পরীক্ষা করতে লাগল। মুর্তজা সবগুলো ঘরে বিষ খুঁজলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না। তিনি রান্নাঘরের আলমারি খুঁজেও কিছু পেলেন না। যে ডাক্তার অনেক দেরিতে এসেছেন শাহ্‌কে বাঁচাবার জন্য তিনি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন যে, মুর্তজা ময়লা ফেলার পাত্র থেকে একটি ছোট বোতল বের করলেন, যার গায়ে লেখা ছিল 'পেনটরেক্সিড', তিনি বোতলটি ডাক্তার কে দিলেন এবং পুলিশকে তা জানালেন। তিনি পুলিশকে জানালেন যে এর আগে চারবার শাহ্ কে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তিনি তাদের জানালেন যে, তাদের অনেক শত্রু আছে। তিনি তাদের কে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলেন যে, তিনি কোনো ভাবেই বিশ্বাস করেন না যে, শাহ্ আত্মহত্যা করতে পারে।

শাহের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার আগে মুর্তজার আরও কাজ ছিল। তার মাতাকে বলার দায়িত্ব ছিল তার, তিনি ক্রমাগত ফোনে জানতে চাচ্ছিলেন কী ঘটেছে, আর জবাব দেয়া হচ্ছিল যে মীর যেয়ে তাকে সবকিছু জানাবে। মীর একা তার মায়ের ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন। দুশ্চিন্তায় বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি দরজা খুললেন। মীর তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, শাহ্ মৃত। তিনি বললেন 'আম্মা, গোগী আর নেই।' তিনি শাহের পরিবারিক নামটি উচ্চারণ করলেন। নুসরাত কাঁদতে লাগলেন এবং তাকে শাহের মৃত্যুদেহ দেখাতে বললেন। সবাই আবার অ্যাপার্টমেন্টে গেল, এমনকি আমিও। শশী এবং আমাকে দেখার আর কেউ নাই তাই আমরা সেই অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম পরিবারের অন্যদের সাথে।

শশী চব্বিশ বছর আগের ঘটনার স্মৃতিচারণ করছিল। তার পরিস্কার মনে আছে, অন্যান্য দিনের মত ওইদিনেও সে তার আব্বাকে জাগিয়ে দেয়ার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু ওই দিনের সকালটি ছিল ব্যতিক্রম। সেদিন তার পিতা অন্যান্য দিনের মত তাকে জড়িয়ে ধরেননি, চুমু দেননি অথবা শূন্যে তুলে ধরেননি। রেহানা পরে বলেছিলেন যে তার মেয়ের ভীত সন্ত্রস্ত স্বর শুনে তিনি সেদিন জেগে উঠেছিলেন। শশী বারবার 'আব্বা, আব্বা' করে ডাকছিল, তিনি দেখলেন যে শশী তার পিতার মৃতদেহের কাছে বসে আছে এবং তাকে জেগে তুলতে চেষ্টা করছে।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেল যে দম্পতির কামরা সংলগ্ন বাথরুমের মেঝেতে বমি। পুলিশ নিশ্চিত করে যে, শাহের শরীরে বিষ পাওয়া গেছে। এই বিষটি ছিল এতো তীব্র যে রক্তে বা শরীরে ঢোকানোর প্রয়োজন হয়না, নাক দিয়ে প্রবেশ করলেও একজনের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কেউ বলতে পারেনি কে এই কাজ করেছে।

না না ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চললো চারিদিকে, বিষটি সুস্পষ্ট যে জেনারেল জিয়া শাহের জীবনহানি করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। যদিও মুর্তজা শাহের ছিলেন জ্যেষ্টভ্রাতা এবং তিনি ছিলেন সংগঠনের নেতা, যে সংগঠন সামরিক শাসককে আক্রমণ করছে কিন্তু তাকে বিবেচনা করা হতো কূটনীতিক হিসেবে। একটি জোরালো ধারণা ছিল যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে শাহ্ই বেশি লড়াকু। তিনি ছিলেন নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে। মুর্তজা সর্বদাই বিশ্বাস করতেন যে জিয়ার সরকারই এই হত্যাকাণ্ডের আদেশ দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে এটি ঘটানো হলো, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

অনেকেই মনে করেন যে এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা। মুর্তজা এ কথার তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি সাংবাদিক ও পুলিশের লোকদের বলেছেন শাহের চরিত্র ছিল খুবই সাহসী প্রকৃতির। সে জানত, কিভাবে জীবনের মুখোমুখি হতে হয়। সে কখনো ভয় পেত না এবং সবসময়ই দেহরক্ষী সহ চলাফেরা করত। সে জানত কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। তিনি তদন্তকারীদের বলেছেন তার ভাই ছিল সুখী, সফল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল এবং জীবনে কখনো আত্মহত্যা করার মত অবস্থা হয় নাই। আত্মহত্যার কোনো নোট ছিল না। গত রাত বা তার আগের ঘটনাগুলো তো আত্মহত্যা করতে পারেন এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। নুসরাতও এমন সম্ভাবনার কথা বাতিল করেন। তিনি মনে করেন ইসলাম ধর্ম অনুসারে আত্মহত্যা মহাপাপ। তাই, শাহ্ এমন কাজ করতে পারে না তাছাড়া সে তার পিতার মৃত্যুকে অত্যন্ত সাহসের সাথে গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

তাই, শাহের পক্ষে আত্মহত্যা করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

কিন্তু অন্যান্যরা ভিন্ন চিন্তা করেন। ফৌজিয়া পুলিশের কাছে বলেছে যে শাহ্ আত্মহত্যা করেছে। ভুট্টো পরিবার আত্মমর্যাদার কারণে এটি স্বীকার করছেন না। আমি সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছি যে শাহের স্ত্রী রেহানা তার মৃতদেহের কিছু একটা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কারণ মৃত্যুর নয় ঘন্টা পর তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও পুলিশকে জানিয়েছেন। এটি সকলেরই নজরে এসেছে। এতে মনে হয়, কিছু কৌশল ছিল। রেহানার পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে এমন ইঙ্গিতও আছে। জবানবন্দি ছিল অসংলগ্ন প্রকৃতির। ফরাসি ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত জবানবন্দি আমি পড়েছি, বিভিন্ন তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। আগাগোড়া খুব ভালোভাবে পড়েও বিষয়টি আমার কাছে পরিস্কার হয়নি। আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আটকাবস্থায় থাকাকালীন যে জবানবন্দি রেহানা দিয়েছেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না যে, পুলিশের রিপোর্ট সম্পূর্ণ সঠিক। তাই, আমি রেহানার প্রতিবেদন গ্রহণ করতে পারি না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মত আমিও মনে করতাম যে রেহানা এই ঘটনার সাথে কোনও প্রকারে জড়িত আছে। তিনি যথাসময় সাহায্য চাননি। তিনি দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। আগের রাতে তিনি মুর্তজাকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেন। তাদের মধ্যে সবসময়ই অবিশ্বাস ও অপছন্দের বিষয়গুলো কাজ করছিল।

রেহানার পুলিশ জবানবন্দীতে আছে যে, শাহের মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি তাকে সাহায্য করেন নাই। অথচ ওই প্রতিবেদনেই সুস্পষ্টরূপে মন্তব্য করা হয় যে রেহানা তাকে খুন করেন নাই। রেহানাকে জেলে আটক রাখা হয়। কয়েক মাস তাকে প্রশ্ন করা হয় এবং তার পর ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি তারপর ফ্রান্স ত্যাগ করে তার পরিবারের কাছে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান, সেখানেই শশী প্রতিপালিত হচ্ছিল। সেটি ছিল তার সাথে আমার শেষ দেখা, আর আমাদের মধ্যে কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

রেহানার পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দির ভিত্তিতে মুর্তজা ও বেনজির তার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে মামলা দায়ের করেন ভুট্টো পরিবারের পক্ষে গুড সামিরিটান আইন অনুযায়ী, সেই আইন অনুযায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বাঁচার জন্য সাহায্য না করা অপরাধ। এই মামলার অ্যাডভোকেট ছিলেন জ্যাকুইউস ভার্জেস, একজন বিতার্কিত ফরাসী আইনজীবী। এই মামলায় রেহানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় একজন মৃত্যুউপক্রম ব্যক্তিকে সহায়তা না দেয়ার।

আমার মনে আছে, অনেক বছর আমার পিতা নিসের সেই ঘটনা নিয়ে সন্দেহের মধ্যেই ছিলেন। রেহানার প্রসঙ্গে আমার ফুফুরা যখন নীল হত্যাকাণ্ড বলে মন্তব্য করতেন তখন আমার পিতা নীরব থাকতেন। সেদিন আসলে কী ঘটেছিল সে বিষয় আব্বা সবসময়ই অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। অনেক সময় অনেক ক্রোধ অনেক দুঃখ পেরিয়ে গেছে। অনেক দিন পরও তিনি নিজেকে দোষারোপ করেছেন, কেন তিনি সেদিন সেখানে অবস্থান করেন নাই, তা হলে তার ছোট ভাইকে রক্ষা করতে পারতেন। তিনি সবসময়ই একথা ভাবতেন। আব্বার ওজন কমে গেল। তার হাসি চলে গেল, তার কৌতুক করা ও জোরে হেসে ওঠার ক্ষমতা আর রইল না, জুনাম ওর বুকে ভার নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন আর

www.pathagar.com

আগের মত হলেন না।

পরবর্তী তেইশ বছর আমার ও শশীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। শিশু হিসাবে আমরা চিঠি ও ফোনে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করতাম, আমরা স্বপ্ন দেখতাম আবার একত্রিত হবার, কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। তারপর আমার ছাব্বিশতম জন্ম বার্ষিকীতে, যখন এই বই লেখা শুরু করার এক মাস হয়েছে, আমি তার কাছ থেকে একটি ই-মেইল পেলাম। সেই রাতে আমার ভাবনার ওলট-পালট ঘটল। অনেক বছর আমাদের যোগাযোগ নাই, অন্তত এগার বছর তো হবেই এবং আমি বুঝতে পারিনি বিষয়টি কী হতে পারে। আমি তাকে লিখলাম, তার ফোন নাম্বার দিতে। কয়েকদিন পর আমরা কথা বললাম। এখন আমরা প্রাপ্তবয়স্ক। আমরা উচ্চবিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছি, কলেজে গিয়েছি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা আর শিশু নই। আমরা কথাবাতা বললাম, সহজ হলাম, একে অন্যকে জানলাম।

শশী পাকিস্তানে আসতে চাইল তার পিতার কবর জেয়ারত করার জন্য। সে কখনো এখানে আসে নাই। পিতার দেশের এক ইঞ্চি যায়গাও সে কখনো দেখেনি। আমরা তখন পরিকল্পনা করতে শুরু করলাম। আমি গোপনে তার সাথে মিলিত হব, কারণ আমাদের অনেক আত্মীয় এ বিষয়টি মেনে নেবেন না। বেনজিরের জীবদ্দশায় আমাদেরকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল এবং এখনও বাধা অতিক্রম করে তার পক্ষে উত্তরাধিকারিত্ব ফিরে পাওয়া সহজ নয়। আমরা পরিকল্পনা করলাম আবুধাবী বিমানবন্দরে একত্রিত হওয়ার। প্রথম আমি যাব লন্ডন, যেন আমি স্বাভাবিক ভ্রমণ করছি। শশী তখন পড়াশুনা করছিল নিউইয়র্কে, সে গেল মধ্যপ্রাচ্যে। পাকিস্তান সরকারের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা, যাতে পাকিস্তান সরকার ভুট্টো পরিবারের সদস্যদের পাকিস্তানে আগমনের বিষয় না জানতে পারে। আমি ওর পরবর্তী ফ্লাইটের বুকিং ঠিক করে ওকে নিয়ে দেশে ফিরব। আম্মা ও জুলফি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারল না যে শশী আসছে। সে বা আমি কাউকে এ বিষয় কিছু বলিনি।

কথা ছিল আবুধাবীর ছোট বিমান বন্দরের একটি নির্দিষ্ট যায়গায় আমরা মিলিত হব। কিন্তু তার আগেই আচমকা আমরা দু'জনে মুখোমুখি হলাম, আর আমরা দেখা মাত্রই দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পারলাম। আমার চুল ছিল কোকড়ানো এবং ওর ছিল ঢেউ খেলানো। আমরা ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, তবুও পরস্পরকে চিনতে পারলাম। সে আমাদের জন্য ব্রেসলেট নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে করাচী যাওয়ার পথে বিমানে বসে আমরা আলাপ করতে থাকলাম। পরবর্তী ভ্রমণ ছিল করাচী থেকে লারকানা, যাত্রা ছিল জটিল। আমরা শাহের কবরে গেলাম। শশী আবেগে আপ্লুত হলো, মনে হলো যেন অবশেষে তার পিতাকে ফিরে পেল। আমরা তাকে তার পিতার বাড়িতে নিয়ে গেলাম, এটি ছিল নওদেরোর বাড়ি, জুলফিকার আশা করেছিলেন যে শাহ্ সেখানে বসবাস করবে এবং সেখানে থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবে। এটি এখন বেনজিরের বিপত্নীক স্বামীর, আগে ছিল বেনজিরের দখলে। এই আসনে বেনজির ১৯৮৮ সনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই আসনে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য হয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। আমরা ওই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারিনি। যাঁরা এর ভেতরে আছেন, আমরা তাঁদের শত্রু।

পরে আমার পিতা যে ঘরে বসে কাজ করতেন, সেখানে দু'জনে বসে আলাপ করলাম।

www.pathagar.com

তাঁর মায়ের প্রসঙ্গ আনলাম। আমি তাকে বললাম যে, আমি বড় হয়ে যতটুকু শুনেছি, তাতে বুঝেছি যে পরিবারের লোকেরা রেহানাকে শাহের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে। শশী এ কথা শুনে অবাক হলো না, এই দোষারোপের মধ্যদিয়েই তো সে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু সে যা বলল, তা আমি আগে কখনো ভাবিনি। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি অন্যদিকের কথাগুলো শুনলাম। শশী বলল, 'আমার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে যা সবাই বিশ্বাস করে, তাতে আমার রাগ ও দুঃখ হয়। আমি সত্য ঘটনা জানি এবং আমি জানাতে চাই যে আমার পিতার মৃত্যুর জন্য কোনো ক্রমেই আমার মাতা দায়ী নন। তবে আমি জানি যে অনেক বড় শক্তি আছে এর পেছনে, যে শক্তি এতদিন সত্যকে প্রকাশ পেতে দেয়নি।' আমি এতদিন বিবেচনার মধ্যেই নেইনি যে ওই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কিছু থাকতে পারে। আমি এরকম কিছু ভাবতেই পারিনি। শশী তার মায়ের প্রসঙ্গে বললো তিনি ছিলেন সহজ লক্ষ্যবস্তু, যদি তিনি দোষী থাকতেন তবে তাকে তারা ছেড়ে দিলেন কেন? আর কেনই বা অন্য কোনো সন্দেহের তদন্ত হলো না, আমরা অবশ্যই মৃত্যু থেকে কোনোরকম লাভবান হই নাই। রেহানা বিষয়টিতে যদি জড়িতই থাকতেন, তবে কেন তাকে ফরাসি পুলিশ যেতে দিল, সকল তথ্য বিবেচনার পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং দেশ ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অবশ্যই হত্যার জন্য সন্দেহভাজনের ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়। আমি জিজ্ঞেস কলরাম 'তবে কে দায়ী?' জবাবে সে বলল যে, শাহের মৃত্যুর কারণে যারা লাভবান হয়েছেন তাদের উপরই তো সন্দেহ হওয়ার কথা। আমি তো এভাবে কোনোদিন কল্পনাও করিনি। এটি ছিল কলঙ্কজনক, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার মত। তবে অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পারি যে, ভুট্টো পরিবারে যে কোনো কিছুই সম্ভব।

* * *

শশী ও আমি এরপর একসাথে কয়েক মাস কাটালাম। সে স্কুল থেকে ছুটি নিল এবং আমরা একসাথে করাচীতে থাকলাম, যেমন আমাদের পিতারা অবিবাহিত অবস্থায় কাটিয়েছেন। আমরা শশীর পিতামাতা সম্পর্কে প্রায়ই আলাপ করতাম অনেক রাত পর্যন্ত, যাতে বুঝতে পারি তার পিতার কী হয়েছিল। আমি যখন ই-মেইলে শশীকে তার পিতার বিষয়ে অনুভূতি কী জিজ্ঞেস করছিলাম, জবাব দিয়েছিল, আমি ক্রুদ্ধ, আহত ও দুঃখিত। আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু স্মরণ করতে পারি না বলে দুঃখিত। আমি ক্রুদ্ধ এজন্য যে আমার পিতার জীবন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, আমার মা ও আমার কাছ থেকেও এত অল্প বয়সে। আমি আহত এজন্য যে, আমার মাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। যে সময়ে সবার উচিত ছিল একতাবদ্ধ হওয়া, তখন তৈরি হয়েছিল বিভক্তি। আমি ভেবে পাচ্ছি না, কী কারণে পাকিস্তানে এই মৃত্যু সম্পর্কে কোনো তদন্ত হয়নি, এটি হলো বিস্ময়ের ও সুবিধাজনক একটা ব্যবস্থা।

২০০৯ সালের বসন্তে আমি প্যারিসে যাই। আমি জানার চেষ্টা করেছিলাম সে রাত্রে ফ্রান্সে কী ঘটেছিল, এবং অবশেষে আমার যোগাযোগ হলো আইনজীবী জ্যাকুয়েস ভার্জেসের সাথে। শহরেই তার অফিসে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো। তার সাথে এর আগেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার বয়স তখন চার বছর, আমার পিতার সাথে যখন

www.pathagar.com

তার আলাপ হচ্ছিল, আমি তখন তার অফিসে বসেছিলাম। আলাপ হয়েছিল শাহের বিষয় নিয়ে। তারা তখন এই মামলায় রেহানার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে আলাপ করছিলেন, আমি তখন তার ডেস্কে রাখা ছোট ছোট বাক্সগুলো খুলছিলাম আর লাগাচ্ছিলাম। এবার আমি একটি ভিন্ন অফিস পেলাম– আমি কল্পনা করলাম যে, আমি একটি সুনির্দিষ্ট জবাব পেতে যাচ্ছি। ভার্জেস কানে কম শোনেন; এটি বাদ দিলে, বুঝাই যায় না যে তার বয়স হয়েছে আশি। তিনি খুব ফিটফাট অবস্থায় ছিলেন। তিনি আমাকে তার অফিসে বসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। ফরাসী উচ্চারণে তিনি আমাকে জানালেন যে, মীর তার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। তিনি বললেন যে মীরের নিহত হওয়ার খবর জেনে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। আমি শান্তভাবে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি বললেন তোমার পিতার ব্যাপারে যা ঘটেছে, তা' অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। কিন্তু বেনজির, তার বিষয়টি অত্যন্ত করুণ। আমি মনে করলাম, ভার্জেস সম্ভবত সেই কিছু বাক্য ব্যবহার করবেন, যা আমি বহুবার শুনেছি। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি তার মাথা নাড়লেন এবং বিড়বিড় করে কিছু বললেন। তিনি বেনজিরকে ভালোভাবেই জানতেন এবং তার মুখোমুখি চেয়ারে আমাকে বসালেন। তিনি আমার পিতা ও মাতা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করলেন। এরপর আমি সাহস করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই মামলা সম্পর্কে; ভার্জেস বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম, এই হত্যাকাণ্ডের সকল রহস্য উদঘাটন করতে, কিন্তু বেনজির ছিল এর বিরুদ্ধে। তিনি রাজী ছিলেন না সিআইএ এবং পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছু করতে, তবে তোমার পিতা চেয়েছিলেন। কেন বেনজির তা চাননি, আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম কৌতূহলী হয়ে ভার্জেস বললেন যে, তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। কারণ তার ক্ষমতা নির্ভর করত তাদের অনুমোদনের উপর। বেনজির তার মৃত্যুর একমাস পূর্বে ব্লাক ওয়াটার নামে এক আমেরিকার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন নির্বাচনী অভিযানে তার নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু সেই নিরাপত্তা ঠিকাদার সম্মত হয়নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আমার পিতার মতামত কী ছিল। তিনি বললেন যে মুর্তজা মোকদ্দমাটি নিয়ে আরও নড়াচড়া করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বোন থামিয়ে দিয়েছিলেন।' ভার্জেস নিশ্চিত করলেন যে, কেউই বিশ্বাস করে না যে, সেটি একটি আত্মহত্যা ছিল। এটি হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না।

সাহস করে আমি রেহানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তার এ ব্যাপারে জড়িত না থাকার কোনো কারণ আছে কি? আমার প্রশ্ন। রেহানার বিরুদ্ধে মামলাটি জটিল ভার্জেস বললেন। তিনি বললেন যে, কোনো প্রমাণ ছিল না, শুধু সন্দেহ। আমি উল্লেখ করলাম যে, পুলিশ ফাইল দেখে আমি যতটুকু বুঝেছি, তিনি তাঁর সাক্ষ্যে নিজেই বিপদ সংকেত দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্য কোনো সম্ভাবনা আছে কি, তেইশ বছর বয়স্কা বিধবাকে দিয়ে ওইরূপ বিবৃতি করানো হয়েছিল, এরূপ বক্তব্য রাখতে বোঝানো হয়েছিল, যা তার বিরুদ্ধে যায়। আবার ভার্জেস কাঁধ নাড়তে লাগলেন। আমার মাথা ঘুরতে থাকল। আমি এটি প্রত্যাশা করি নাই। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে, ভার্জেস নিশ্চিতভাবে বলার চেষ্টা করবেন যে 'এক্স' অপরাধী আর 'ওয়াই' নিরপরাধ। কিন্তু তিনি আমাকে তা বলেননি। তিনি সে ধরনের কিছুই বললেন না। আমি সুন্দর চেয়ারটির গদির গোড়ায় বসে মাথা নিচু করলাম তার কানের কাছে যাওয়ার জন্য, শশী আমাকে এক মাস পূর্বে যে কথাগুলো বলেছে, তা

www.pathagar.com

আমি তাঁকে জানালাম। আমি প্রশ্ন করলাম, এই মামলা বেনজির কেন চালিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করেছেন। তিনি কি মামলাটি না চলানোর জন্য লাভবান হয়েছিলেন, জবাব শুনে আমার হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে, আমার লিখতে কষ্ট হচ্ছে। ভার্জেস সতর্কতার সাথে জবাব দিলেন 'এটি অসম্ভব নয়।' তাঁর কাছে এগিয়ে যেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কেন'? এই তত্ত্বটিকে মনে হলো ইশ্বর নিন্দার মত, কীভাবে এটি সম্ভব? এটিতো চিন্তার বাইরের বিষয়। আল-জুলফিকার সংগঠন সম্পর্কে মীর ও শাহের সিদ্ধান্তকে বেনজির অনুমোদন দেন নাই। তিনি চলছিলেন অন্যপথে। তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন পাশ্চাত্য সাহায্য নিয়ে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের। আমি মোটেই বিস্মিত নই যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন আগে শেষ হয়ে গেলে তিনি লাভবান হবেন। ভার্জেসের কথাগুলো আমাদের দুজনের মাঝে ভাসতে লাগল। আমার মনে প্রচণ্ড নাড়া দিল, এই পরিবারের সবকিছুই এতো জটিল কেন? কেন এত কুৎসিত, এত হিংস্রতা? একটু আগে যখন আমার পিতার প্রসঙ্গ এসেছিল, ভার্জেস পাকিস্তানে আমাদের পরিস্থিতি কেমন তা জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বলি যে, সেখানে জীবন যাপন খুবই কঠিন, সেরূপ অবস্থায়ই আমরা আছি। 'কল্পনা করতে পারি যেখানে আপন বোন নিজ ভাইকে হত্যা করতে পারেন,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন এবং মনে হলো যে আমি হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠবো। আমি মাথা নাড়ালাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমার পিতার নিহত হওয়ার কারণে আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছে। আমাদের আলোচনার মধ্যে শাহনেওয়াজ ও বেনজিরের নাম এসে পড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন বেনজিরের ভূমিকা কি ছিল, যদি আদৌ তার কোনো ভূমিকা থেকে থাকে। তিনি বললেন বেনজির শাহের পরিবারের উপর সুবিচার করেননি। তাদের উত্তরাধিকার জবরদখল করে রেখেছেন। এরপর আগের শব্দটিই আমার কানে বাজতে লাগল। তবে শাহ্কে কেন প্রথমে খতম করা হলো, তিনি তো সংগঠনের প্রধান ছিলেন না, ছিলেন আমার পিতা। 'তার মনে হচ্ছিল যে, তার দুই ভাই যে সমস্ত কাজ করছেন, তাতে তার কোনো সাহায্য হতো না।' শান্তভাবে বললেন তিনি। তিনি আরও বললেন যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে শক্তিশালী ছিলেন মীর। সম্ভবত তিনি শাহ্কে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন কারণ তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে তুলনায় দুর্বল।'

আমি ভার্জেসের সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। এই সাক্ষাতকারের পর আমার পরিকল্পনা ছিল এক বন্ধুর সাথে দেখা করার, আমি তা বাতিল করলাম। কারও সাহচার্যই তখন আমার ভালো বোধ হচ্ছিল না। মুহূর্তকাল আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি দেখতে মীরের মতো।' আমার মনে হলো যে, তাঁর চোখে জল। আমার অন্তরে আঘাত লাগল। ভার্জেস জিজ্ঞাসা করলেন বেনজির কখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ভার্জেস আগের কথায় ফিরে আসলেন, জবাবে আমি বললাম, 'তিন বছর পর'। তিনি মাথা লাড়লেন এবং কিছুই বললেন না। এরপর আমি উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, 'তিনি কখনো তাঁর ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আবার শুরু করেন নাই।' আমার মাথায় তখন ছিল শশী আমাকে যে সব কথা বলেছে সেগুলো। চেয়ারে পিঠ রেখে ভার্জেস বল উঠলেন, 'সম্ভবত তিনি সবই জানতেন।'

www.pathagar.com

১৩

শাহের মৃত্যুর পর আমাদের স্থায়ী নিবাস দামেস্কে মুর্তজা দুঃখে মুহ্যমান ছিলেন। সুহেল বললেন, 'আমরা শাহ্‌কে গ্রীষ্মে হারাবার পর, আমি মীরকে দেখলাম, তাঁর ওজন অনেক কমেছে।' সুহেল যেন দূর থেকে মৃত্যু দেখছেন। সত্তরের দশকে তরুণ বয়স থেকেই আমার তার সাথে দেখা-সাক্ষাত কিন্তু তাঁকে এত রোগা কখনো দেখিনি। এটি ছিল তাঁর উপর বিরাট এক আঘাত। আমাদের দুই শোবার ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল সবসময়ই লোকজনে ভর্তি। শাহ্‌ পরিবারের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল সুহেলদের ফ্লোরের উপর। সুহেল, কামার এবং তাঁদের দুই ছেলে সব সময়ই দুই ভাইয়ের বাসায় যাতায়াত করত। অথচ হঠাৎ দেখা গেল, কেউ নেই। শাহ্‌ চলে গেল, রেহানা ও শশী অনুপস্থিত, এখন শুধু আমি ও আমার পিতামাতা। এরপর শুধু আব্বা এবং আমি এই দালানে আছি নিঃসঙ্গ ও ভবঘুরের মত।

গ্রীষ্ম চলে গেল, শরৎ আসল। এসময় আব্বা ও ফৌজিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। তাদের মধ্যে একত্রে বসবাস আর সম্ভব হলোনা, বিষয়টি খুব জটিল আকার ধারণ করল। মুর্তজা এমনিতেই অনেক বড় কিছু হারিয়েছেন এরপর তার স্ত্রীর উপস্থিতি তার বেদনার স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়, অবশেষে তাঁদের মধ্যে তালাক হয়ে গেল। আমার বয়স তখন মাত্র তিন বছর, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম শাহ্‌কে কেন্দ্র করেই এসকল কিছু ঘটছে। আমি বিষয়টি শুধরানের যোগ্য নয় বলেই মনে করেছি। আমার ক্ষুদ্র জগতের কেন্দ্রস্থল ছিল আমার পিতা তাই এ বিষয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করিনি।

পরবর্তীতে আমি শুনেছি যে, আমি নাকি রেলওয়ে স্টেশনে বা বইয়ের দোকানে গাঢ় রংয়ের বড় চুলওয়ালা কোনো মহিলা দেখলে তাকে ফৌজিয়া বলে মনে করতাম। লম্বা চুলওয়ালা মহিলা দেখলে তার পিছু নিতাম। এ সব বিষয় আমার মনে নেই। আমার শুধু মনে আছে যে, আব্বা আমাকে তালাকের কথা জানিয়েছিলেন। আমি সে সময়ের একটি উলের তৈরি কোট পরে ছিলাম এবং শব্দ শিখছিলাম, আমি আর একটি নতুন শব্দ শিখলাম, তালাক। আমি জানতাম এর অর্থ কি–এবং নিজেকে মনে হতো আমি বেশ বড় হয়ে গেছি। আমার পক্ষে ফৌজিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা খুব কঠিন। আমি আমার গর্ভধারনকারী মায়ের জন্য আঘাত পেলাম, ভীত হলাম। তিনি ছিলেন খুব সুন্দরী, তাঁর চুল ও চোখ ছিল আকর্ষণীয়। সৌন্দর্য্য চর্চায় সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন, চুল পরিচর্যা বা চোখে লাইনার টানার জন্য সময় ব্যায় করতেন। বিকেলে তিনি আমাকে তার সাথে বসিয়ে দুধ ও চিনি দিয়ে চা পান করাতেন, সে সময়টুকু মাত্র আমরা একত্রে কাটাতাম। সেই দিনগুলো আমার মনে

www.pathagar.com

গেঁথে আছে। আব্বা আমাকে গোসল করিয়ে দিতেন, ঘুমাবার আগে গল্প বলতেন, আমার চুল কেটে দিতেন, পোশাক পরিয়ে দিতেন, আমার জুতা পালিশ করে দিতেন। হতে পারে এটি আমারই ত্রুটি; ফৌজিয়ার জন্য আমার অন্তরে কোনো স্থান নাই। তবে শিশুকালেও আমি তা পারিনি। মনে হয় আমি চেষ্টা করেছিলাম।

আমার মনে আছে আমরা তখন দামেস্কে, এক বিকাল অথবা সকালে তিনি আমাকে চীৎকার করে বললেন, 'তোমার পিতাকে বল, তরমুজ কিনে আনতে'। সেটা আব্বাকে বললাম। ফৌজিয়া বিছানায় শুয়ে গড়াতে গড়াতে আবার চিৎকার করে বললেন, 'তোমার পিতাকে বলো তরমুজ আনতে।' আমার ওইটুকু বয়সে আমি বুঝতে পারঝিলাম না আমি কি করবো। এবার আব্বা ঘরে ঢুকলেন, ফৌজিয়া তীব্র কিছু পান করেছিলেন এবং ছটফট করছিলেন। আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

আমি তাঁকে বুঝতে পারিনি, তিনিও পারেননি আমাকে। আমাকে বুঝতে তিনি দেননি, তাঁকে মনে হতো বহিরাগত। তিনি শক্তও ছিলেন না, শান্তও ছিলেন না। তিনি ছিলেন বদরাগী ও অস্থির, আবার অন্যদিকে দূর্বল।

আব্বা নিহত হওয়ার পর একদিন ফৌজিয়া করাচিতে আমার স্কুলে এসে হাজির। স্কুলের অধ্যক্ষ মি. ডিওলফ আমাকে বায়োলোজী ক্লাসে এসে বললেন যে, একজন মহিলা আমাকে তার কন্যা বলে দাবী করছেন এবং বলছেন যে আমাকে যেন তার কাছে নেয়া হয়। এ ঘটনায় আমি অসুস্থ বোধ করলাম। মি. ডিওলফ আমাকে ছাত্র কাউন্সিলিং অফিসে নিয়ে গেলেন আমি সেখান থেকে আম্মাকে ফোন করলাম, তিনি তখন যাচ্ছিলেন লারকানা। আম্মাকে আমি বললাম আমি ফৌজিয়ার সাথে দেখা করতে চাইনা। তিনি বললেন, 'না, দেখা করো তার সাথে।' তালাকের পর আব্বা পরিবারিক এ্যালবাম থেকে ফৌজিয়ার ছবি তুলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, আম্মা বলেছিলেন, 'না রেখে দাও ওর জন্য।' আম্মা আবার বললেন, 'অবশ্যই দেখা করবে।' আমি বললাম, 'দেখা করতে পারি যদি তিনি তার লারকানায় যাওয়া স্থগিত করে এখানে আসেন এবং তার উপস্থিতিতে।' আম্মা বললেন, 'আধ ঘন্টার মধ্যেই আসছি।'

মি. ডিওলফের স্বল্পভাষী স্ত্রী আমাদের ফ্রেঞ্চ শিক্ষিকা। মি. ডিওলফ আমাকে পাঠালেন নার্সদের অফিসে অপেক্ষা করার জন্য। তিনি আমাকে বললেন,'ঘাবরাবার কোনো কারণ নাই, তুমি যেভাবে চাইবে সে ভাবেই হবে।' মি. ডিওলফ আমাকে ও আম্মাকে সাহায্য করেছিলেন, আব্বার নিহত হওয়ার খবর জুলফিকে বলতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই হঠাৎ আগমনের অর্থ। নার্স অফিসের বেড খালি, রোগীরা ক্লাসে গিয়েছে। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে সেখানে বাথরুমে যেয়ে দরজা লাগিয়ে রাখলাম এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম। নার্স মিসেস আলী আমার বন্ধুদের ডেকে আনলেন, তিনি ও আমার বন্ধুরা সাহায্য করলো আমার মনোবল ফিরে পাওয়ার জন্য।

মি. ডিওলফের অফিসে যখন আমাদের দেখা হলো, দারুণ অস্বস্তিতে ছিলাম আমি। 'তোমার পিতা তোমাকে ছিনতাই করেছে আমার কাছ থেকে,' সেলেফিনে মোড়ানো একটি গিফট বাস্কেট দিতে দিতে বললেন আমাকে। আব্বার মৃত্যুর তখন ছয়মাসও হয়নি। 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম।' দশ বছর পর তালাকের নাটকটি মি. ডিওলফের সামনেই হতে থাকলো, তাকে অবশ্য আমিই থাকতে অনুরোধ করেছিলাম। 'আমার লোক আছে

আমেরিকান সেনাবাহিনীতে, তারা তোমাকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তোমার পিতা কিছুই করতে পারতোনা। তোমার দিকে দেখেই ওসব করিনি।'

আপনাকে ধন্যবাদ, আর কি বলবো মাথায় আসেনি। আমি আহত হলাম, ভয় পেলাম এবং ক্রুদ্ধ হলাম। ফৌজিয়া জিদ ধরলেন, তাঁকে আম্মা বলতে হবে, বল আম্মা, আমি বললাম যে, আমি তাকে দেখতে চাই না। আম্মা আমাকে টেবিলের নিচ দিয়ে ধাক্কা দিলেন। আমি বললাম যে, আমার স্কুলের হোমওয়ার্ক আছে আমি এখন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি এবং মি. ডিওলফের দিকে তাকালাম সাহায্য করার জন্য। আম্মা বললেন যে সেটি রাতে করতে পারবে। ফৌজিয়া আবারও বললেন তাকে আম্মা বলতে। আমি অবশেষে এই শর্তে কিছুক্ষণ থাকতে রাজী হলাম যে, বিষয়টি গোপন রাখা হবে এবং পত্র পত্রিকায় যেন না ছাপা হয়।

এরপর আমি ফৌজিয়াকে এড়িয়ে যেতে থাকলাম এবং তার সাথে দেখা করতে অস্বীকার করলাম। ফৌজিয়া সংবাদ সম্মেলন করলেন এবং বললেন যে আমার দুষ্ট সৎমাতা আমাকে চুরি করেছে এবং বিলওয়াল হাউজের নির্দেশে আমার ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে। বেনজির ও জারদারির বাড়ির নাম বিলওয়াল হাউজ। তিনি আম্মাকে চাকরানি বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন যে, আব্বা তাকে ভালোবাসতেন না, শুধু তার সন্তানের দেখাশুনার জন্য তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি জুলফিকে আমার সৎভাই বললেন, আর আমি দেখতে ফৌজিয়ারই মত। ফৌজিয়া সকল ইংরেজি পত্রিকায় আমাকে খোলা চিঠি লিখলেন এবং পাকিস্তানের আদালতে আমার অভিভাবকত্ব পাওয়ার জন্য মামলা করলেন। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন একজন হৃদয়বান ব্রিটিশ মহিলা। তিনি প্রতিদিন পত্রিকাগুলো তাকের উপর উঠিয়ে রাখতেন যাতে আমি গ্রন্থাগারে হোমওয়ার্ক করার সময় সেগুলো দেখতে না পাই। আমি একজন আইনজীবীর মারফত ফৌজিয়াকে জানালাম যে, আমি তার কাছে যেতে চাই না আমি কখনো তার জন্য আমার পরিবারকে ত্যাগ করতে পারব না। তিনি এখন আমার কাছে একজন আগন্তুক। তিনি আমাকে সুগন্ধযুক্ত নেইল পালিশ দিলেন এবং বললেন দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি এদের কথ ভুলে যাব। আমি আমার এই ২৭ বছর বয়সে এখনও ফৌজিয়ার ভয়ে ভীত।

* * *

তবে ওই তালাকের বিষয়টি আমার ক্ষুদ্র জীবনের বড় বিষয় ছিল না। এর চেয়ে বড় বিষয় ছিল শাহের অনুপস্থিতির কারণে শূন্যতার। শাহ্ কাকার মৃতদেহ দেখেছিলাম। আমার সব মনে নেই। যখন আব্বা তার মাতাকে শাহের মৃত্যু সংবাদ জানানোর পর তাকে শাহের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে আসলেন, সে সময় শশী ও আমাকে রাখার অন্য কেউ ছিল না। তাই তাদের সাথেই আমাদের সেখানে যেতে হয়েছে।

আম্মা আমাকে বলেছেন, আমার অবচেতন মনে অনেকদিন বিষয়টির অস্তিত্ব ছিল। তেইশ বছর পর রান্না ঘরে কিছু খাবার জিনিস খুজঁতে যেয়ে তিনি বলেছিলেন,'শাহ্ কার্পেটের উপর উপুর হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য গেথে ছিল তোমার স্মৃতিতে অনেকদিন। একদিন দামেস্কতে তোমার পিতা যখন শোবার ঘরে উপুর হয়ে শুয়ে ছিলেন, তুমি কেঁদে

www.pathagar.com

উঠেছিলে, মনে করেছিলে যে, তারও অবস্থা বুঝি শাহের মত হয়েছে। তুমি তাকে জাগাতে চেষ্টা করার সময় কাঁদছিলে।' অথচ কাকার মৃতদেহ দেখার স্মৃতি নেই। তবু অনেক বছর পরও আমি রাতে উঠে পরীক্ষা করতাম, আব্বার নিশ্বাস ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা।

তার ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকে নীল হয়েছিলেন আব্বা, মনে হতো তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বেঁচে আছেন এবং তা আমার জন্য। কারণ তিনি আমাকে খাওয়াবেন, গোসল করাবেন এবং ঘুম পাড়াবেন। একদিন দেখলাম যে তিনি যেন জীবন থেকে দূরে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সেই রাতে তিনি বসেছিলেন অ্যাপার্টমেন্টে এক ঘরে, যেটা পরে তার অফিস কামরা হয়, সেখানে ছিল আয়নার বুকসেল্‌ফ তার পেছনে জনালা, জানালায় সাদা পর্দা, তিনি নিঃশব্দে বসে ছিলেন, হাত দিয়ে চুল নাড়ছিলেন, যা তিনি হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় করে থাকেন। আমার মনে হলো খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। আমি তার মন ভালো করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করলাম। তিনি চেষ্টা করলেন আমার দিকে চেয়ে হাসতে। আসল বিষয় হলো শাহকে ছাড়া মুর্তজা একা। তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল অন্যান্য ভাই-বোনদের চেয়ে বেশি। মুর্তজা সব সময়ই শাহের যৌবন সুলভ উদ্দমতার জন্য তার সহায়তা পেতেন। শাহের আনন্দ ছিল সংক্রমক, ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী, তবে তা উভয় ভাইয়ের মধ্যে উপভোগ্য ছিল। শাহ্ ছিলেন উচ্ছল, মুর্তজা ছিলেন ধৈর্যশালী, শাহ্ ছিলেন বিষন্ন, মুর্তজা ছিলেন আশাবাদী। তাঁরা ছিলেন রক্তবন্ধনের ভাইয়ের চেয়ে বেশি, তাঁরা ছিলেন সহকর্মী, পরস্পরের সঙ্গী। শাহের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের উজ্জ্বলতা নিভে গেল, সুখশান্তি চলে গেল। আব্বা একদম উম্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আমি আব্বাকে আর কখনো এরূপ দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে দেখি নাই। মুর্তজার নির্বাসিত জীবন সহনীয় হয়েছিল শাহনেওয়াজের জন্য। তাঁর সাহচার্যের কারণে সহজেই অপরিচিত যায়গায় স্বাভাবিক ভাবে বাস করতে পেরেছেন। তাঁরা একসংগে ঘরে ফিরেছেন নানা রূপ কৌতুক করতে করতে, নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে, অথবা পিতার স্মৃতিচারণ করতে করতে এবং তাদের জগৎ সম্পর্কে ভাবনা নিয়ে কথা বলতে বলতে। তাঁরা নির্বাসনের মধ্যেই একত্রে স্বপ্ন দেখতেন ভাবতেন, একদিন তাঁরা দেশে ফিরবেন, সেই একদিনের অপেক্ষায় থেকেছেন। আব্বার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হলো। নীরবতা কিছুতেই ভাঙছিল না। আমিও খুব দঃখভারাক্রান্ত হয়েছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমারও খুব খারাপ বোধ হচ্ছে কিনা, কারণ আমিও তো শাহ্ কাকাকে হারিয়েছি। আমি এই প্রথম আব্বাকে কাঁদতে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন আজকে ছিল শাহের জন্মদিন। মাসটি ছিল নভেম্বর সে রাতে তার বয়স হতো সাতাশ।

* * *

দামেস্কর জীবন কাটছিল সাধারণ ভাবেই। আমাকে নূতন মার্কিন স্কুল দামেস্কর কমিউনিটি স্কুলে ভর্তি করা হলো। স্কুলটি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মেজ্জা রোডের একটি বড় দালানের নিচের আংশে এটি অবস্থিত। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল মেজ্জার পুরাতন অংশে একটি বড় মসজিদের কাছে, মসজিদটির নাম জামিয়া আল-আকরাম, আর সেখানে ছিল একটি খেলাধূলার কেন্দ্র। আমাদের দালানটি ছিল শরণার্থীদের দ্বারা পূর্ণ আমাদের উপরের তলা থেকে শাহ্ ও সুহেল চলে যাবার পর সেখানে আসলেন ওমর, আমাদের নতুন

প্রতিবেশী। এই পরিবার সাদ্দামের বাথ পার্টির শাসনের আক্রোশে পড়েছে। ওমর আমাদের বন্ধু হলেন; তিনি আব্বার সমবয়সী। তাঁদের মধ্যে আলাপ হতো দেশ নিয়ে, নির্বাসিত জীবন নিয়ে। দালানের নিচতলার বাগানের কাছের ফ্লাট প্রায়ই খালি থাকত, সেখানে আমরা পাকিস্তানী ও ইরাকীরা বসে সময় কাটাতাম।

বেনজির ভালো পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে রাজনীতি করছিলেন, আর খারাপ পরিস্থিতিতে সনামের কাছে লন্ডন যেতেন এবং আমাদের কাছে সিরিয়ায়ও আসতেন। আমি তাঁকে বলতাম ওয়াদি বুয়া এবং তিনি আমাকে বলতেন ফাহ-টী তিনি ফ-এর পর হ টেনে বলতেন। ওয়াদি এসে থাকতেন আমাদের অতিথি ঘরে। তাঁর বিদায়ের সময় আমি কাঁদতাম। যাবার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, খুব তাড়াতাড়ি তিনি আবার আসবেন। আমি তাঁর কোলে বসতাস এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তিনি যাওয়ার সময় আমাদের চুমা দিতেন। কখনো কখনো দেখতাম আব্বা ও ওয়াদি দুজনেই উত্তেজিত। অবশ্য বাইরে থেকে তা বুঝা যেত না। অনেক সময় দেখতাম আব্বা কথা বলে যাচ্ছেন ওয়াদি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কখনো কখনো আব্বার মধ্যে উত্তেজনা দেখতে পেতাম। কিন্তু ফুফুর সাথে আমার সম্পর্ক ঠিকই ছিল। আমাকে অনেকেই বলতেন যে, আমি নাকি ফুফুর মতন। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, ফুফু সুযোগ পেলে জেনেভা অথবা দামেস্ক আসতেন আমার জন্মদিন উপলক্ষে। আমরা উভয়েই মিথুন রাশির জাতক, যদিও তাঁর জন্মদিন আমার পরে। (অদ্ভুত ব্যাপার, যে তিন মহিলার সাথে আব্বার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তারা সবাই মিথুন রাশির জাতক)। ফুফুর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। পছন্দের খাবারের বিষয়েও আমাদের মধ্যে মিল ছিল। তিনি আমার মত পছন্দ করতেন চকোলেট আইসক্রীম, আপেল ক্যান্ডি, আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি আমাদের দু'জনের মতো চিনি মাখানো কাজুবাদাম কেউ পছন্দ করে। আবার আমরা দু'জনেই ছিলাম বড় সন্তান হিসেবে সচেতন।

অল্প বয়সেই আমার অনিদ্রা রোগ হয়েছে, এটি হয়তো ভুট্টো পরিবারের অভিশাপ। আব্বা আমাকে ঘুম পাড়াতেন এসময় তিনি আমাকে নানা গল্প বা কথাবার্তা বলে ভয় পাইয়ে দিতেন। ডাক্তার আলফোনসো ছিলেন এক বিরাট গোফ ওয়ালা দাতের ডাক্তার। আর যে সকল বাচ্চারা রাতে সময় মতো ঘুমায় না তিনি এসে তাদের দাত তুলে ফেলেন। সে নাকি সুরে কথা বলতো এবং বাচ্চারা না ঘুমালে বাড়ির দরজায় এসে ঠকঠক করতো। আমি এরকম গলার শব্দ ও ঠকঠক শুনলেই বাতি নিভিয়ে দিতাম। একদিন রাতে এরকম শব্দ শুনেছিলাম এবং পরের দিন সকালে ফুফুকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি ডাক্তার আলফানসো কে দেখেছেন কি-না, সে দেখতে কেমন, দাত তোলার সাড়াসি নিয়ে এসেছিলেন কি-না। সে কি জিয়ার থেকে খারাপ লোক। দেখতে কেমন। তিনি হেসে বললেন দূর বোকা ওটাতো ছিল তোর আব্বা, পাগলের মত বাইরে দাড়িয়ে কল-বেল টিপছিল।

আমি প্রাক-নার্সারীতে ক্লাস শুরু করলাম এবং সহজেই বন্ধু তৈরি করলাম। আমার প্রথম বন্ধু হলো আলী নামের একটি ছেলে সে ছুটির দিনে আমাদের বাসায় আসত এবং আব্বাকে বলত ডিম ভেজে দিতে। তার পিতা মাতার সাথে আমাদের একাটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আমরা সেখানে ছিলাম প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের অতিথি হিসেবে। আমাদেরকে একটি বড় স্রেভরলেট গাড়ি দেয়া হয়েছিল দামেস্কে বা তার বাইরে

www.pathagar.com

যাতায়াতের জন্য। আব্বা এলভিস প্রিসলে বা মোটাউনের গানের টেপ বাজিয়ে আমরা যেতাম বিভিন্ন স্থানে। কখনো আবু রোমানায়ের নোয়রা সুপার মার্কেটে। আমরা চাম হোটেলের কাছেই অ্যাপালোতে বিশেষ ভ্রমনের উদ্দেশ্যে যেতাম, সেখানে পিসত্তাচিও এবং স্ট্রবেরি আইসক্রীম খেতে। আমার পিতা সবসময় আমাকে বেরি শব্দের উচ্চারণ ঠিক করে দিতেন। আসলে আমি উচ্চারণ শিখেছি মার্কিনী কায়দায় যা আমি বিদ্যালয়ে শিখেছি। গ্রীষ্মে আমরা দামেস্কের পুরানো অঞ্চলে যেতাম, সেখানে ক্যাকটাস ফল খেতাম, এই ফলটি সম্পর্কে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শাহ্ কাকা।

কখনো কখনো আব্বা আমাকে জিয়া ও তাঁর প্রধান মন্ত্রীর ছবি দেখাতেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে বলতেন। ছবিতে থাকত গর্তযুক্ত চোখ ও লম্বা গোফ। তবে বেশি বলতেন প্রথমে আমার পিতামহ এবং পরে কাকার কথা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম আমরা নিরাপদে আছি কিনা। তিনি বলতেন যে, আমরা এখানে নিরাপদে আছি। একদিন তিনি যেন কি খুঁজছিলেন; আমি জিজ্ঞেস করাতে জবাবে তিনি বললেন যে, তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন, এখানে এমন কিছু আছে কিনা, যা আমাদেরকে আঘাত করতে পারে। আমি অনুমান করছিলাম, তিনি বোমার কথা বলছেন; বা অস্ত্র নিয়ে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখছেন। আমি তাকাবার মত সাহস পেতাম না, আব্বার পরীক্ষা করা শেষ হলে স্বস্তি বোধ করতাম।

সেটি ছিল অদ্ভুত সুন্দর শৈশবকাল। বাস্তব জীবনের লুকোচুরির ভয় পাওয়ার মধ্যে, শাহের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটার পর আমাদের অবস্থায় বিভিন্ন হুমকির মধ্যে থাকা, এসমস্ত সত্ত্বেও আমি মনে করতাম না যে, আমার পিতা ও আমার বিষয়টি ভিন্ন রকমের। আমরা জেম্‌স্ বন্ড সিনেমা দেখতাম, এবং রাত বা দুপুরে খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে চকলেট খেতাম। আব্বা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে আমার সাথে কৌতুক করতেন, আমার বুদ্ধির পরীক্ষা নিতেন। তখন আমি সাংবাদিক হতে চাইতাম, লিখতে ও পড়তে আমার ভালো লাগত। একবার টেলিভিশনে প্যালেস্টানিদের সম্পর্কে কিছু দেখানো হচ্ছিল। আমি দেখলাম যে, আব্বার চেহারা তখন অন্যরকম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, টিভিতে কী দেখাচ্ছে। তিনি বললেন যে পর্দায় সে সকল লোককে কাল আর সাদা চেকের কাপড়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, তাঁরা চাচ্ছে তাঁদের চারদিকের ধূয়া থেকে রক্ষা পেতে, বিষয়টা আমাদের মত। তাঁদের এখন আর কোনো বাড়ি নেই, তাঁরা শরনার্থীর মত বাস করছে। ফাতি তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় তাঁদের জন্যও করবে আমাদের মত তাদেরকেও যেন তিনি সাহায্য করেন। আমি এ বিষয়ে এক মিনিট চিন্তা করলাম এবং তারপর বললাম, 'আমি যদি আল্লাহ কে বলি প্যালেস্টাইনদের সাহায্য করতে, আর তিনি যদি আমাদের কথা ভুলেই যান?'

আমি জানতাম যে আমরা ভূমিহীন; আমি জানতাম যে আমি এসেছি অন্য কোথাও থেকে, যে দেশ আমি কখনো দেখিনি। আব্বা পুরানো লোকসংগীত শুনেন প্রায়ই, "হো জামালো"। তিনি তাঁর নিজের জন্মভূমির কথা মনে করেন। তিনি দেশী সাজসজ্জা আর দেশী রান্না পছন্দ করতেন। তিনি সবসময় আমার সাথে উর্দুতে কথা বলতেন তা নয়; জীবনে ও চিন্তা চেতনায় আমরা ব্যবহার করতাম ইংরেজী। তিনি যখন উত্তেজিত হতেন, তখন তার স্বর মনে হতো অন্য কারো। সকালে যখন তিনি দাঁড়ি কাটতেন, আমি তাঁকে

www.pathagar.com

অনুকরণ করার চেষ্টা করতাম। তিনি আমার মুখে ফোম মেখে ব্লেড বিহীন রেজর দিয়ে আমার গালে টানতেন। আব্বা পেশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতেন, বিশেষ করে জুতার বিষয়। আমি তাঁর পছন্দ মত জুতা চকচকে করে দিতাম। আব্বা বলতেন যে, তিনি আমাকে ভালোবাসেন এবং আমার কিছু হলে তিনি বাঁচবেন না।

www.pathagar.com

১৪

আমার পিতার সাথে মাতার ভালোবাসার সৃষ্টি হয় লিফটে উঠা-নামার সময়। প্রতিদিন আমরা দামেস্কর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চাম হোটেলের পুলে যেতাম সাতার কাটতে। তখন ছিল শরৎকাল। জল কিছুটা উষ্ণ ছিল। আমরাই থাকতাম সেখানে সবার শেষে। আব্বা আমার দ'বছর বয়সেই আমাকে সাঁতার শেখাতে শুরু করেন। প্রতি গ্রীষ্মেই সেই শেখা ভুলে যেতাম, আবার তিনি নূতন করে শেখাতেন। একদিন যখন খুব রোদ ছিল এবং আমার মনে করছিলাম যে তখনই সাঁতার কাটার উপযুক্ত সময়, আব্বা কোর্টে স্কোয়াশ খেলতে গেলেন। আমি জলের মধ্যে দৌড়াতে লাগলাম। আব্বার ওই কোর্টেই আম্মা সাপ্তাহিক এ্যারোবিক ব্যায়াম করতে আসতেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ নভেম্বর আমরা ছিলাম চাম-এর সাঁতার কাটার পুলে। আমি ছিলাম সাঁতার কাটার হলুদ বিকিনি জাঙ্গিয়া আর আব্বার পরনে ছিল লাল রং-এর সাঁতারের পোশাক। ঘিনওয়া ইটাউইয়ের বয়স ছিল তখন চব্বিশ বছর এবং তিনি ছিলেন লেবানন থেকে নির্বাসিত। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন লেবাননের গৃহযুদ্ধের মধ্যে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা মাঝ পথে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের বাড়ি ছিল পূর্বও পশ্চিম বৈরুতের একটি অ্যাপার্টমেন্টের হাউজের নিচ তলায়। সেখানে খুব গোলাগুলি হতো। তাঁর বয়স যখন বিশ বছর তখন ইহুদিরা তা দখল করে নেয়, ফলে বৈরুত আর যুদ্ধ ক্ষেত্র নয়, সেখানকার অধিবাসীরা ওই পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ঘিনওয়া বৈরুত ছেড়ে দামেস্ক এসে অভ্যর্থনা কর্মী হিসাবে কাজ করতে লাগলেন এবং আবু রাওমেনের একটি ক্যাথলিক গির্জায় তরুণীদের কে ব্যালেট শেখাতেন। সেদিন নভেম্বরের বিকালে তিনি দেখলেন যে একজন পুরুষ তাঁর শিশু কন্যাকে নিয়ে সাঁতার কাটছেন। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। আমরা যখন সাঁতার কাটার পুল ত্যাগ করছিলাম, তখন তাঁর সাপ্তাহিক দু'দিনের এ্যারোবিক ক্লাস শেষ হয়েছে। মুর্তজার পরনে ছির নীল স্যুট, শার্টটি ছিল হালকা গোলাপী রং-এর আর গায়ে ছিল চমৎকার সুগন্ধি, আর তার সুগন্ধে ভরে গিয়েছিল ক্ষুদ্র লিফটি। সুহেলও আমাদের সাথে ছিলেন এবং আমি যখন আব্বার সাথে কথা বলছিলাম, তিনি ধৈর্যধরে শুনছিলেন। ঘিনওয়া লক্ষ্য করছিলেন, কতো ধৈর্য ধরে আব্বা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। ভদ্রমহিলা ভাবছিলেন 'লোকটি কী সুন্দর ইংরেজি বলছেন বৃটিশ উচ্চারণে, কোনো আঞ্চলিকতার টান নেই, কোন দেশ থেকে তিনি এসেছেন, তা বুঝা গেলনা।'

দুই দিন পর আবার যখন তাঁদের দেখা হলো, সেটি ছিল অবশ্যই বৃহস্পতিবার। মাজেন আলুস নামের একজন দন্তচিকিৎসক ছিলেন তাঁদের উভয়ের বন্ধু। মাজেন ছিলেন

www.pathagar.com

ঘিনওয়ার পুরানো পারিবারিক বন্ধু, তিনি তাঁর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যারা এখন লেবাননে আছেন তাঁদের সকলের সুপরিচিত- মুর্তাজর সাথে তার পরিচয় এই দাঁতের চিকিৎসকের মাধ্যমে। ঘিনওয়া তার ক্লাশে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মাজেন তাঁর দিকে হেঁটে আসলেন। 'তিনি কাছে এসে আমাকে হ্যালো করলেন' এবং বললেন তার ক্লাশের কোনো এক ছাত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং তার পরিবর্তে তিনি আব্বাকে দেখিয়ে বললেন তার সাথে ঘিনওয়াকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। মাজেন এরকম ফাজলামো সবসময় করেন। 'আমি তাঁকে ধমক দিলাম এবং বলালাম যে, লোকাটি বিবাহিত এবং তিনি শুধুই আমার সময় নষ্ট করেছেন।' কিন্তু তিনি বিষয়টিতে লেগে থাকলেন। এ্যারোবিক ক্লাশ শেষ হলে মাজেন ঘিনওয়াকে নিয়ে গেলেন মুর্তজার কাছে। মুর্তজা তখন বসে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিল। ঘিনওয়া তখন জানলেন যে মুর্তজা বিবাহিত নন, তালাক প্রাপ্ত। মাজেন ঘিনওয়াকে তাঁদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে বসা প্রত্যেককেই ডক্টর বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন ঘিনওয়ার কাছে। যদিও সেখানে মাজেনই ছিলেন একমাত্র ডাক্তার। ঘিনওয়া সেখানে বসলেন। ঘিনওয়া লম্বা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির উপর, তার দীর্ঘ কাল চুল। তিনি দেখতে সুন্দর।

নীরবতা ভঙ্গ করে ঘিনওয়া মুর্তজাকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে ডক্টরেট। তিনি হেসে উত্তর দিলেন 'অর্থনীতি'। তিনি ছিলেন লাজুক এবং অমায়িক। ঘিনওয়া উচ্চস্বরে হেসে বললেন, 'এই সমাজতান্ত্রিক সিরিয়ায় একজন অর্থনীতিবিদ কি করছেন?' মুর্তজা তাঁকে বললেন যে, তিনি আফগানিস্তানে থেকে এসেছেন। একথায় ঘিনওয়া আস্বস্ত হলেন। এরপর তাঁরা আড্ডা দিতে লাগলেন। ঘিনওয়া মুর্তজাকে তাঁর মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করাতে তিনি জবাব দিলেন 'ফাতিমা'। ঘিনওয়া আরবী সুরে আমার নাম উচ্চারণ করলেন। তিনি টেবিলে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, আমি তাঁর পিছনে আছি। অমি তাঁর চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে ছিলাম। আমি ছিলাম আমার পিতার সংরক্ষণকারী; তিনি যে সুন্দরী ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলছিলেন আমি তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। তিনি নরম সুরে আমাকে বললেন, 'হ্যালো, ফাতিমা'। এরপর আমি তাঁর দিকে ঝুকে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা পর মাজেন ও ঘিনওয়া একসংগে ট্যাক্সিতে রওয়ানা দিলেন। মাজেন ঘিনওয়াকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌছে দিলেন। পথে ঘিনওয়া মাজেনের সাথে মুর্তজার অর্থনীতিতে ডক্টরেটের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। মাজেন আসল ব্যাপারটি তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। ঘিনওয়া তখন হেসে উঠলেন। তাঁর মুখে আনন্দের ঝিলিক দিচ্ছিল। ঘিনওয়া যখন মুর্তজার অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রির বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করছিলেন মাজেন তখন তাঁকে টেবিলের নিচে আড়ালে শরীরে স্পর্শ করে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। ট্যাক্সিতে মাজেন তাঁকে ভালো করে মুর্তজার পরিচয় দিলেন। তিনি তাঁকে বলেন যে মুর্তজা অর্থনীতিবিদ নন, নির্বাসিত, নিহত প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। ঘিনওয়া তখন বললেন, 'আমার কাছে জুলফিকার আলী ভুট্টো একজন বীর।'

কথাগুলো তিনি পুণর্ব্যক্ত করলেন জুলফিকারের পুরানো ড্রেসিং রুমে বসে, সেটিকে আমরা পরে বসার ঘরে পরিণত করেছি। 'চেহারা দেখেই বুঝা যায় যে জুলফিকার আলী ভুট্টো একজন বীর ছিলেন। বালিকা বয়সে তাঁকে আমি টিভিতে দেখেছি। বার বছর বয়সে আমি প্রথম তাঁকে দেখি। জিয়াউল হক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কারণে সমস্ত আরব বিশ্ব তাঁর

www.pathagar.com

প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আমরা দেখলাম ভুট্টো বীরের মত মৃত্যুবরণ করলেন।' ঘিনওয়ার মাতা কাফিয়া ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় শেখের কন্যা। তিনি ছিলেন একজন কবি ও শিক্ষক। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রকৌশলী, ১৯৪০ এর দশকে তিনি ফরাসি উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের ইতিহাস জানতেন। মাজেন ঘিনওয়ার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন মুর্তজার আসল পরিচয় যে তিনি জেনেছেন, তা মুর্তজার কাছে বলবেন না। তিনি নিজেও ছিলেন নির্বাসিত; তিনি বুঝতে পারলেন যে সহিংসতার কারণে মুর্তজা নির্বাসনে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতে চাননি। তিনি মাজেনের সাথেও এ বিষয়ে আর আলাপ করেননি। এরপর যখন ঘিনওয়া ক্লাসে গেলেন, মুর্তজা একা সাতারের পুলে, ঘিনওয়া ক্লাস শেষ করার পর মুর্তজা তাঁকে তাঁর সাথে বসে পানীয় গ্রহণ কবার আমন্ত্রণ জানালেন। অল্প কিছুক্ষণ আলাপ চলার পর মুর্তজা ঘিনওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ব্যালেট ক্লাশ সম্পর্কে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন বয়সী মেয়েদের কে তাঁর ক্লাসে ভর্তি করা হয়। ঘিনওয়া তাঁর ক্লাসে পাঁচ বছরের কম বয়সী মেয়েদেরকে ভর্তি করেন না। তবে তিনি জানতেন যে মুর্তজার মেয়ের বয়স চার বছর। তাই তিনি জবাব দিলেন, 'সাড়ে চার বছর।' আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যালেট ক্লাশে ভর্তি হলাম। আমি তাঁকে ঘিনওয়া খালা বলে ডাকতাম এবং পরে আমরা হয়েছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর একদিন মীর ঘিনওয়া কে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করলেন। আমি অসুস্থ থাকায় এ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম। সেখান থেকে আমাকে তুলে নেয়া হলো। তিনি দেখলেন, আমার আঁকা রঙিন ছবি সারা মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। ঘিনওয়া আমার আঁকা ছবি দেখে খুব প্রশংসা করলেন। শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেল ছিল শেরাটন। সে সময় শেরাটনের খাবারই ছিল সবচেয়ে সুস্বাদু। বিশেষ করে আমরা, বিদেশীরা এর খাবার খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু সেদিন আমি কোনো খাবারই খেলাম না অসুস্থতার কারণে। ছোটবেলায় আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকতাম; জ্বর, ফ্লু ইত্যদি লেগেই থাকত। আমি না খাওয়ায় আমার পিতা খুবই রেগে গেলেন। তিনি আমাকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। আব্বা আমাকে ভয় দেখালেন, যদি আমি না খাই তবে আমাকে ফৌজিয়ার কাছে দিয়ে দেবেন। ঘিনওয়া কথাটা শুনেছিলেন, তাই এই হুমকির অর্থ বুঝলেন, আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। তবে আমি যে এতে ক্রুদ্ধ হয়েছি, তা' তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। আমি বড় বড় কামড় দিয়ে খাবার মুখে দিতে লাগলাম এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমার নূতন বন্ধুর সামনে এরকম ব্যবহার করা ঠিক হয়নি।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর আব্বা আমাকে নিয়ে গেলেন আমার ডাক্তারের কাছে। তাঁর নাম ছিল ড. লেমিয়া নাবুলসি। তিনি ছিলেন খুব হাসি খুশী একজন মহিলা। গাড়িতে বসে ঘিনওয়া আন্টি এ-বি-সি-ডির বর্ণমালার গান গাইতে লাগলেন এবং আমি তাঁর সাথে যোগ দিলাম। ততক্ষণে আমরা চলে এসেছি মধ্য দামেস্কর পায়ে চলার পথে। আমি তখন ঘিনওয়ার হাত ধরে ছিলাম। মুর্তজা ও ঘিনওয়া একটি রাস্তার সংযোগ স্থলের কাছে যেয়ে আলাদা হলেন; ঘিনওয়া মাজানের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর অফিসের দিকে গেলেন এবং আমরা ডাক্তারের কাছে। আমি ঘিনওয়ার হাত ধরা অবস্থায় ছিলাম। তিনি 'ওকে ফাতি, পরে দেখা হবে,' বলে চলে গেলেন। আমি তার সাথে কিছু দূর ভুল করে চলে গিয়েছি বুঝতে পেরে দ্রুত আমি আব্বার কাছে চলে আসি। তেইশ বছর পর আম্মা আমার

www.pathagar.com

পিতামহের বসার ঘরে বসে আমাকে বললেন, 'আমি জানি না কাকে আমি প্রথম ভালোবেসেছি। তোমার পিতাকে না তোমাকে।' 'এটি ছিল ত্রিভুজীয় ভালোবাসা।'

ঘিনওয়া ও মুর্তজার প্রেম চলে বেশ কিছুদিন। তাঁরা পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করে নিজ হাতে নিজ দেশের খাবার রান্না করে খাওয়ালেন। মুর্তজা সুপার মার্কেট থেকে মশলাপাতি কিনে এবং না গুড়ো করে তৈরি করতেন চাপালি কাবাব আর ঘিনওয়া তৈরি করতেন নোনতা লেবাননী খাবার। আমি মাঝেমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকতাম। কয়েক সপ্তাহ মেলামেশার পর মুর্তজা ঘিনওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি তাঁর পিতামাতার সাথে দেখা করতে পারবেন কিনা। আমার মা, এখনও স্মরণ করেন, মুর্তজার তাঁদের বৈরুত থেকে আনা স্বল্প আসবাবপত্রের মোহাজেরিন অ্যাপার্টমেন্টে আসার কথা। আম্মা বললেন, 'সে তোমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল, আমি তাঁকে আমার পিতামাতার কাছে তার সিরিয়ায় নেওয়া নাম ড. খালিদ বলে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না, তিনি তাঁর আসল পরিচয় দিলেন; বললেন, আমি মীর মুর্তজা ভুট্টো, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ছেলে। তিনি আরও বললেন যে, আমি নিরাপদেই থাকব।' আমি আরবীতে পিতামহকে জিড্ডো বলতাম, এখানেও ঘিনওয়ার পিতাকে তাই বললাম। তিনি খুব আনন্দিত হলেন। পাঁচ মহিলার সাথে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ – সবগুলো কন্যা, সকলেই উচ্চকণ্ঠ এবং জটিল। পিতামহী তেতা ছিলেন বেশি সতর্ক। প্রথমবার মীরের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি ভান করেছিলেন যে, তিনি ইংরেজি জানেন না। আম্মা হেসে বললেন, 'তিনি মুর্তজাকে যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁরা মুর্তজাকে পছন্দ করেছেন এবং তখনই একটি বন্ধনের সৃষ্টি হয়। আব্বা বাইরে কোথাও গেলে আমি তেতা কাফিয়া ও জিড্ডোর কাছে থাকতাম। আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মীয় হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত আমি তাঁদেরকে কী বলে ডাকতাম, তা আমার মনে নেই। তবে তাঁরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আম্মা বলেন যে কোনো কিছু সম্বোধন না করে কীভাবে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তা আমি শিখেছিলাম। কিন্তু সত্য হলো, আমি তাঁদের পিতামহ পিতামহীই মনে করতাম, অন্য কিছু নয়। ঘিনওয়া আন্টি আমার রঙিন টিভি এই অ্যাপার্টমেন্টে আনলেন, কারণ তাঁদের মাত্র একটি ছোট সাদা-কাল টিভি ছিল। তিনি আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় এখানে নিয়ে আসলেন, সাথে আনলেন একটি বড় আকারের স্ট্রবেরি মিল্ক যা আমি খেয়ে থাকি। আমার খাওয়া-দাওয়া ছিল অস্থির ধরনের। আমি স্কুল থেকে সরাসরি অ্যাপার্টমেন্টে এবং বিকালে কাটাতাম তেতার সাথে। আমি তেতাকে কাপড় ধোয়ার কাজে সাহায্য করতাম তবে সাহায্যের চেয়ে সমস্যাই তৈরি করতাম বেশি। একবার আব্বা বাইরে থাকা কালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার জ্বর সারানোর জন্য রক্তপরীক্ষা করা এবং এন্টিবায়েটিক খাওয়ার প্রয়োজন হলো। আমার অসহ্য বোধ হলো, কাঁদা শুরু করলাম। আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে ঘিনওয়া আন্টিকে বলতে লাগলাম, 'আমি বাড়ি যাব। তিনি দুশ্চিন্তায় পড়লেন, কারণ আমরা সে দিন বাড়িতেই ছিলাম, আমার জ্বর দেখে তিনি সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন, শান্তভাবে বললেন, 'তুমি বাড়িতেই আছ।' আমি বিলাপ করে কাঁদতে লাগলাম, 'এটি আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি পাকিস্তানে।' আমি বিলাপ করতে থাকলাম, যদিও আমি কখনো পাকিস্তানে যাইনি। আমাদের বাড়িতে পাকিস্তান নামটি ছিল ভৌতিক। জিয়া নামটিও তাই। জুলফিকারের নামটিও এবং শাহনেওয়াজ। আব্বা ও আমি ভয় ও

ভালোবাসার অদৃশ্য বোঝা সবসময় বয়ে চলেছি। ঘিনওয়া বলেছেন আমাকে, 'আমাদের প্রথম একান্ত দেখাতেই শাহের কথা বলেছেন। আমি প্রথমে জানতাম না মীরের ওপর এর প্রভাব কতখানি, কিন্তু এক বছর পরও দেখেছি ওই কথা আলোচনায় আসলেই মীর কাদঁতেন। সে সময় আমাকে বলেছিলেন আমি যেন কখনো না মনে করি যে তাকে আমার বিয়ে করতেই হবে। সে বিয়ের কথা আমাকে বলতে পারছেনা কারণ তার ভাইয়ের মৃত্যুর পরপরই সে বিষয়ে সায় দিতে পারেন নি, দু'বছর পার হওয়ার পর যখন কিছুটা স্থিতি এলে তখন আমরা বিয়ে করি।'

* * *

১৭ অগাস্ট ১৯৮৮ তারিখে জেনারেল জিয়ার সাথে পাঁচজন জেনারেল গিয়েছিলেন মার্কিন এম আই আব্রাম ট্যাঙ্কের ট্রায়াল পরিদর্শন করতে। সহযোগিরা হলেন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ চেয়ারম্যান এবং আই এস আই গোয়েদা সংস্থার প্রাক্তন জেনারেল আখতার আবদুর রহমান, যিনি সিআইএ-র পক্ষ হয়ে আফগান যুদ্ধে কাজ করেছেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরনল্ড রাফেল এবং পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা মিশনের প্রধান জেনারেল হার্বার্ট এম ওয়াশম। ওই পরীক্ষা হয়েছিল ব্যর্থ, সুপার ট্যাঙ্কটি দশবারের দশবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সুখি হওয়ার মতো কিছুই ছিলনা, অতিথিদের মন-মেজাজ ছিল খুব খারাপ। তারা মধ্যাহ্ন ভোজ করেন সামরিক অফিসারদের মেসে এবং খাবার শেষে আইসক্রীম খেলেন। জেনারেল জিয়া নামাজ পড়তে গেলেন এবং ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের প্লেন পাক ওয়ানে উঠলেন ইসলামাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

পাক ওয়ান বিমানকে আল জুলফিকার ১৯৮২ সালে অল্পের জন্য আঘাত করতে পারে নাই, এবং তখন থেকে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছিল। আমেরিকায় প্রস্তুত বিমান সি-১৩০ ভিআইপি কেবিনে সিল করা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, এর ক্ষমতাবান যাত্রীদেরকে হত্যাপ্রচেষ্টা থেকে সুরক্ষার সবরকমের ব্যবস্থাই আছে সেখানে। ককপিটে ছিলেন চার জন, যার নেতৃত্বে ছিলেন উইংকমান্ডার মাসুদুল হাসান, তাঁর সাথে ছিলেন একজন সহপাইলট, একজন নেভিগেটর এবং একজন প্রকৌশলী, এদের সবাইকে নির্বাচন করেছেন খুব সম্ভবত জিয়া নিজে। যে পথে আগের দিন এসেছিলেন সেই পথেই বিমান চালনা করলেন যেন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী এই বিমানে কোনো বিপদ না ঘটে। সময় সূচি অনুযায়ী পাক ওয়ান ভাওয়ালপুর থেকে যাত্রা শুরু করে দুপুর ৩-৪৬ মিনিটে। ইসলামাবাদের দিকের এই ফ্লাইটটি নিরাপদে, সুন্দরভাবে গন্তব্য স্থানে পৌছবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। উড়ালের কয়েক মিনিট পর পাক ওয়ানের সাথে ভাওয়ালপুরের টাওয়ার সংযোগ হারিয়ে ফেলল। 'গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়েছিল বিমানবন্দর থেকে আঠার মাইল দূরে নদীর উপরে পাক ওয়ান ওঠানামা করছিল।' এডওয়ার্ড জেয় এপস্টেন তাঁর লেখায় লিখেছেন, 'তৃতীয় গোত্তায় এটা সোজা মরুভূমিতে আছড়ে পড়ে এবং সোজা মাটির ভেতরে ঢুকে যায়। জ্বালানিতে আগুন লেগে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। একত্রিশ জন যাত্রীর সকলেই মৃত্যুবরণ করে। তখন বেলা ৩.৫১ মিনিট।

জেনারেল জিয়ার দশ বছরের স্বৈরশাসনের কবল থেকে সমাজের কোনো অংশই মুক্ত

www.pathagar.com

ছিলনা। এই দুর্ঘটনার ফলে কোনো দেহই সনাক্ত করা যায়নি চোয়ালের হাড় ছাড়া আর সব কিছুই ছাইয়ে পরিণত হয়। সেদিনের আবহাওয়া ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল। তাই, বৈমানিকের ভুলের কোনো কারণই ছিল না। সে সময় গুজব চলছিল যে এক বাক্স আমের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য ভরে দেয়া হয়েছিল এবং তা পাক ওয়ানে রাখা হয়েছিল। জনগণের মধ্যে গুজব যে, পরিশেষে আমের কারনেই স্বৈরশাসকের পতন ঘটল। এপস্টেন উল্লেখ করেন, এই দুর্ঘটনার আসল কারণ উদঘাটনের তেমন কোনো প্রচেষ্টাই চলেনি, কোনো পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি বা কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তানের টেলিভিশিন থেকে জিয়াউল হকের নাম বাদ পড়ে গেল। সংবাদপত্র থেকেই এই নামটি একইভাবে উধাও হলো।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর তদন্ত বোর্ডের বক্তব্য ছিল, 'খুব সম্ভব এটি ছিল একটি অন্তর্ঘাত'। কিন্তু এরপর আর ব্যাপক ভাবে কোনো তদন্তই করা হয় নাই। এই হত্যাকান্ডের কোন রেকর্ডই রাখা হয়নি, কিছুই সংরক্ষণ করা হয়নি। সহিংসতাই ছিল সবচেয়ে সহজপথ একজন পাকিস্তানের রাজনীতিবিদকে সরিয়ে দেয়ার, যত জঘন্যই তিনি হোননা কেন। যুক্তরাষ্ট্রের দলিল সংগ্রহাগারে এ বিষয়ে ২৫০ পৃষ্ঠার বিবরনী আছে কিন্তু তা' আজ পর্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ, অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। শাহনেওয়াজ নিহত হওয়ার পর আল-জুলফিকার আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষ্ক্রিয় এবং অবলুপ্ত। আমি জানি আমার পিতা নিশ্চই খুশি হতেন যদি জিয়ার বিমান দুর্ঘটনার পেছনে আল-জুলফিকার যুক্ত থাকতে পারে বলে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তা সত্যি হতো। যা হোক, এই ঘটনার ফলে যে আশা জেগে উঠেছিল, কিন্তু তা বেশিদিন বজায় রইলনা।

জেনারেল জিয়া তাঁর স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক খোলস দেয়ার উদ্দ্যেশে ১৯৮৮ সালে নির্বাচন দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইতোমধ্যে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বেনজিরের সাথে আলোচনাও করেছেন। তাই তিনি ১৯৮৫ সালের মত নির্বাচন বর্জন করে ক্ষমতার বাইরে থাকতে চাইলেন না। তিনি নির্বচনের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এমন সময় জিয়া নিহত হলেন। বেনজিরের ভাগ্য বিস্ময়কর রূপে ভাল। নির্বাচনের পূর্বে জিয়া নিহত হওয়ায় তিনি লাভবান হলেন। যখন তিনি জিয়ার অধীনেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন।

মুর্তজা তাঁর বোনের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন সামরিক বাহিনীর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে দলের সিদ্ধান্তের বিষয়ে। এই বিষয়ে তিনি বেনজিরের সাথে একমত হতে পারেননি। আমার মনে আছে, আব্বা বলেছিলেন, 'অংশগ্রহণের অর্থ কি?' তিনি চীৎকার করে বলেছিলেন, 'তুমি কি জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হতে চাও?'

আমি ছিলাম তখন ছোট, বয়স মাত্র ছয় বছর। আমরা তখন ছিলাম জেনেভায়, সময়টা ছিল গ্রীষ্মের প্রথমদিক, পরিবারের সবাই মিলে একসাথে সময় কাটাচ্ছিলাম। আব্বা স্বভাবগত আবেগ প্রবণ ছিলেন, তবে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। তিনি কখনো পণ করতেন না, কখনো চীৎকার করতেন না বা আক্রামণাত্মক কথা বলতেন না। তিনি ধীরস্থির ভাবে যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে বুঝাতেন এবং কেউ যদি কথায় জয়লাভ করতে মরিয়া হয় সেখানে চুপ থেকে আলোচনা শেষ করতেন। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজ করছিলাম পিজা দিয়ে। শান্ত পরিবেশটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে পড়ল। আব্বাই বেশি ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁকে

www.pathagar.com

এতবেশি উত্তেজিত হতে কখনো দেখিনি। বেনজির বললেন, 'আমার একটি পরিকল্পনা আছে।' আব্বা ক্রুদ্ধ হলেন। আমি চিন্তিত হলাম। আব্বাকে আমি কখনো এরূপ বিপর্যস্ত হতে দেখিনি। তিনি রাগত স্বরে কথা বললেন, তিনি মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলতে লাগলেন, তাঁদের পিতা ভাই এবং অন্যান্য ব্যক্তি জিয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং অনেকে এখনও যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তঁদের সম্পর্কে আব্বার কথা শুনে আমি চোখ বন্ধ করলাম, আমি স্তম্ভিত হলাম। আমি তাঁকে নিজের সম্পর্কে মৃত মন্তব্য করতে শুনলাম। তিনি উঠে চলে যেতে চাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে চেয়ারের পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম।

'আমার পিতা নেই', একথা আমি ভাবতেই পারতামনা। কখনো কখনো তিনি যখন বলতেন, 'যখন আমি মারা যাব ...' আমি রাগ করতাম এবং তাঁর সাথে ঝগড়া করতাম। তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বলতেন, 'তবে প্রত্যেকেই তো একসময় মারা যাবে।' বলে তিনি হাসতেন। কিন্তু আমি তাঁর এ সকল কথাকে ঘৃনা করতাম। আব্বা এখন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর বোনের উপর, যাকে তিনি বলতেন পিংকি। পিংকি ক্ষমতার সাথে আত্মসমর্পন করতে যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'আমি বাইরে বসে থাকতে পারিনা। আমাদের সরকারে থাকতে হবে। এটি আমার সুযোগ। আমি এ সুযোগ ছাড়বোনা। আমরা আর এ ভাবে বাঁচতে পারি না।' তিনি অর্থ অর্জনের কথা বললেন, আব্বা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলেন।

তিনি নির্বাচনী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি তাঁর মা বা বোনকে কোনো পরামর্শ দিলেন না, তিনি কোনো প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করলেন না, নিজের সমর্থনের ব্যাপারে কোনো অঙ্গিকারও করলেন না। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের বিষয়ে মুর্তজা ও বেনজির আরও একবার আলাপ করেন। বেনজির তাঁর সদ্য বিবাহিত স্বামী আসিফ জারদারিকে পিপলস পার্টির গুরুত্বপূর্ণ এলাকা করাচির লেয়ারি থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য টিকেট দিয়েছেন জেনে মুর্তজা মর্মাহত হলেন। তিনি তাঁর বোনকে বললেন, 'এটি কর্মীদের এলাকা, পিংকি তুমি তাঁকে এখানে প্রার্থী কর কিভাবে?' বেনজির এর উত্তর দেননি, সেখানেই কথা শেষ হয়।

জারদারির পরিচয় ছিল গোবেচারা স্বল্পবাক হিসেবে। বেনজির তার বয়স ত্রিশ পার হওয়ার পর বিয়ের কথা ভাবলেন। বেনজির হলেন পরিবারের প্রথম মহিলা যিনি সনাতন প্রথায় ঘটকালি করা বিয়েতে সম্মত হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন যে যেহেতু তাঁকে প্রতিদিন অনেক পুরুষের সাথে চলাফেরা করতে হয় এবং দেশের সর্বোচ্চ পদে তিনি আসীন হতে যাচ্ছেন, তাই তার জন্য বিয়ের বিষয়টি জরুরি। না হলে তাঁর খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আম্মা দামেস্ক থাকা অবস্থায় বেনজির কিছু কথা বার্তা স্মরণ করেন; বেনজির ভাবতেন যে তাঁর মত একজন ক্ষমতাবান মহিলা, যিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, যাঁর সম্ভাবনা আছে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার তাঁকে বিয়ে করবে কে? আম্মার স্মরণ আছে, তিনি বিবেচনায় নিয়েছিলেন ইয়াসির আরাফাত কে, বলতে গিয়ে আম্মা হাসি চেপে রাখতে পারছিলেন না। শোনা যায় জিয়ার সেক্রেটারি রোয়েদাদ খান আসিফের মাকে দিয়ে আসিফের জন্য চিঠি পাঠান জুলফিকারের একমাত্র জীবিত বোন মান্নার কাছে, অবশিষ্ট ক্ষতিকর কাজগুলো তিনিই সম্পন্ন করেছেন। ভুট্টোর শহর লারকানার ড. সিকান্দার হায়াত জাতোই এ প্রসঙ্গে বলেন, সে ছিল এক অসভ্য রাস্তার ছেলে। বিয়ের আগে তাকে চিনতো

www.pathagar.com

না কেউ।'

সুহেল আরও কুটকৌশলী। তিনি বললেন, 'তাঁর পিতা হাকিম জারদারি ১৯৭০ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন নওয়ব শাহ্ থেকে' - শতবর্ষের পুরানো একটি শহর, যার নাম প্রেসিডেন্ট জারদারি পরিবর্তন করে রেখেছেন শহীদ মোহতারেমা বেনজির ভুট্টো- 'এবং তিনি পিপিপি তে যোগ দেন। শোনা যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো হাকিম জারদারিকে পছন্দ করতেন না-তাঁকে অপদস্থ করতেন, এমনকি একবার পিটুনিও দিয়েছেন, আমি ওই বিষয়ে যাচ্ছিনা। ভুট্টোর জীবদ্দশায় হাকিম পিপিপি ত্যাগ করেন- অথবা তাঁকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, দু'রকমই কথা আছে। তখন তিনি ভুট্টো-বিরোধী দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেন। সে সময় এই দলটি ছিল ভুট্টো বিরোধী।' সুহেল আরও বললেন, 'সে সময় ন্যাপ ছিল জিয়ার মিত্র এবং তোমার পিতামহের ঘোর বিরোধী একটি দল, যাদের শ্লোগান ছিল 'ভুট্টোকে একবার নয় শতবার ফাঁসিতে ঝুলাও' এবং 'তাঁর গলায় দ্বিগুণ পরিমাণে দড়ি ঝুলাও।' হাকিম ছিলেন তখন সিন্ধুর ন্যাপের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি কি ভুট্টোর বিরুদ্ধে এ ধরণের শ্লোগানে অংশগ্রহণ করেছেন? আমি জানি না। ড. সিকান্দার বললেন, 'হাকিম এ ধরণের শ্লোগানের জন্য বিখ্যাত'। জুলফিকারের চাচাত ভাই মোমতাজ ভুট্টো বললেন যে, কোনটি সত্য, তা' তিনি জানেন না, তবে এটি নিশ্চিত, জুলফি তাঁকে পছন্দ করতেন না। তার জন্য জুলফির সময় ছিলনা।

হাকিম জারদারি পরে আবার দল পরিবর্তন করেন, দল পরিবর্তনকারী সুবিধাবাদী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। আমার মনে আছে, আব্বা তাঁর সম্পর্কে প্রকাশ্য সভায় বিদ্রুপ করে বলতেন 'ডাকু হাকিম'। কিন্তু আসিফের বিষয়টি কি ? আমি সুহেলকে জিজ্ঞেস করলাম, আসিফ মি. বেনজির ভুট্টো হওয়ার পূর্বে তাঁর পরিচয় কি ছিল? সুহেল হালকা ভাবে জবাব দিলেন, 'ওহ্, তাকে এর আগে কেউ চিনতো না। অবশ্য করাচিতে তাঁর একটি পরিচয় ছিল অনধিকার প্রবেশকারী হিসাবে।'

* * *

আমার মনে আছে সেই গ্রীষ্মে আমাকে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কিছু বলছিলেন। তিনি সবসময় নিজ দেশের কথা বলতেন, সর্বদাই দেশে ফেরার কথা বলতেন, কিন্তু এবার, কিছুক্ষণ থেমে একটি কথা যোগ করলেন। 'এই কথাটা ওয়াদিকে বলবে না, ঠিক আছে।' আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, বলব না।

যখন খবর আসল যে জিয়া বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, আব্বা ও আমি তখন এক পারিবারিক বন্ধুর বাড়িতে। আমার পিতামহী জুনাম আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিলেন এবং আন্টি ঘিনওয়া ফোনটি ধরেছিলেন। জুনাম ছিলেন খুব উত্তেজিত। তিনি তার ছেলের খোঁজ না করেই প্রথমে জিয়ার মৃত্যুর সংবাদটি দিলেন, 'সে মারা গেছে ও আল্লাহ্, জিয়ার মৃত্যু হয়েছে'। ঘিনওয়া দ্রুত মুর্তজার বন্ধুর বাসায় ফোন করে সংবাদটি তাকে জানালেন। ফোনটি তাকে দেওয়ার পর তার বন্ধুরা লক্ষ্য করে মীর খুব শান্তভাবে সংবাদটি শুনছেন। তার ঘাড় লাল হয়ে উঠলো, সকলের মনে হলো পরিবারে কোনো বিপদ হয়েছে, তারপর চিৎকার করে উঠলেন মুর্তজা। ঘিনওয়া ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পেলেন।

www.pathagar.com

তিনি দ্রুত বাড়ি চলে এলেন, সাথে ছিলাম আমি, আমরা সবাই তখন ছিলাম আবেগতাড়িত, ভাবলাম, এখন পরিবর্তন আসবে, সকল কষ্টের অবসান হবে। এগার বছরের ভয় ও হিংস্রতার এবার অবসান ঘটল। জিয়া নিহত।

www.pathagar.com

১৫

১৯৮৮ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রক্রিয়াটি চলছিল ভুল পথ ধরে। যে সকল দলের সাথে জোট করার ফলে এমআরডি গঠিত হয়েছিল, তাদের সাথে বেনজির নির্বাচনী ঐক্য না গড়ে ঐক্য করলেন বৈরী আদর্শের দলের সাথে। এর কারণ হলো, তিনি ১৯৮৬ সালে এমআরডি'র দাবি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বাইরে থাকতে চেয়েছিলেন। এই ঘোষণায় কেন্দ্রকে চারটি ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব সীমিত রাখার কথা বলা হয়েছে; এগুলো হলো : মুদ্রা, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি। এই ঘোষণায় রাজনীতিকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রাদেশিক সরকারকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

বেনজির হয়তো গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কথা বলে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বাড়াতে পেরেছেন, কিন্তু ইতিহাসবিদ ইয়ান তালবোটের মতে, 'তিনি নিজের দলকে শক্তিশালী করতে এবং দলের মধ্যে গণতন্ত্র চালু করার জন্য কোনো চেষ্টাই করেননি। অথচ তিনি ক্রমাগত পাকিস্তানের রাজনীতিতে গণতন্ত্র ফিরে আসার জন্য সংগ্রামের কথা বলে যাচ্ছেন।'

তিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে ভিন্ন মতাদর্শের লোকজন ঢুকিয়েছেন। এর ফলে পিপিপি'র বেশ কিছু প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বেনজিরের নেতৃত্বাধীন পিপিপি ত্যাগ করেন। এর মধ্যে আছেন তার চাচা মোমতাজ ভুট্টো এবং ১৯৭৩ সালের শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রণেতা হাফিজ পীরজাদা এবং আরও অনেকে। দলের নবাগতরা ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য স্বার্থে দলকে ব্যবহার করতে লাগলো। অন্য দল থেকে আদর্শবিহীন লোকজন পিপিপিতে যোগ দিতে শুরু করলো। এ সকল ব্যাপারে বড় ভূমিকা রাখছিলেন বেনজিরের নববিবাহিত স্বামী আসিফ জারদারি, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে মনোনয়ন বা টিকেট দেয়ার প্রধান ব্যক্তি। তিনি টিকেট বরাদ্দ করেন তার স্কুল জীবনের বন্ধু এবং তার অনুগত ব্যক্তিদেরকে। দলের নিষ্ঠাবান কর্মী-নেতাদেরকে তিনি কোনঠাসা করে রাখলেন।

ড. গোলাম হোসেন ছিলেন পিপিপির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পিআইএ ছিনতাই মামলায় জেল খেটেছেন এবং পরে মুক্ত হয়েছেন। অথচ বেনজির/জারদারির পুনর্গঠিত দলে তার কোনো স্থান হলো না। গোলাম হোসেন ভুট্টোর আমলে দলের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন এবং সামরিক আইন চলাকালীন সময়ে পাঁচ বছর জেল খেটেছেন। ড. হোসেন আমাকে তার ইসলামাবাদের বাড়িতে বলেছেন যে, জিয়া তার কাছে তিনজন জেনারেলকে পাঠিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন দলের সেক্রেটারি জেনারেলের পদে ইস্তফা দিতে সম্মত হলে তাকে তার সরকারে মন্ত্রী করবেন। যদি আমি রাজি না হই, তবে

www.pathagar.com

আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হবে। তারা আমার বিরুদ্ধে রাওয়ালপিণ্ডির লিয়াকতবাগে গোলাগুলির নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ আনে। কল্পনা কর, আমার কোনো বিচার করা হলো না, আমি দোষী সাব্যস্তও হইনি, অথচ আমাকে জেলে থাকতে হলো। আমি তাদেরকে বললাম যে, আমার ভাগ্যে যাই হোক, আমি ভুট্টোর সাথে থাকব। আবারও তারা হুমকি দিলেন আমাকে বিচারকের কাছে নেয়ার আগে। বন্দি হিসেবে আমাদেরকে কোনো অধিকারই দেয়া হলো না। আমি বিচারককে বললাম, 'আপনি ভয় করেন জিয়াকে আমি করি আল্লাহকে, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে নয়।' আমি আদালত থেকে বের হওয়ার সময় চীৎকার করে বললাম, 'জিয়া হটাও।'

বেনজির উর্দু জানতেন না। তাকে তার বক্তব্য ইংরেজিতে লিখতে হতো। তিনি আমাকে অগ্রাহ্য করে ঝিলামের পিপিপির টিকেট দিলেন চৌধুরী আলতাফকে– তিনি ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের অর্থাৎ জিয়ার দলের সদস্য। এর কারণ হলো, তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাধর সামন্তপ্রভু। তিনি পিপিপির কোনো আদর্শই অনুসরণ করেননি, তিনি জিয়ার মজলিশ-ই সুরায়ও অংশগ্রহণ করেন। আমি আমার পদাবনতির খবরও বেনজিরের কাছ থেকে জানতে পারিনি। আমি সংবাদপত্র মারফত পরদিন তা জানতে পারি। পিপিপির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানীও ছিলেন জিয়ার ধর্মীয় কাউন্সিলের বিশ্বস্ত সদস্য, যে কাউন্সিল ছিল সামরিক শাসনামলে সংসদের প্রতিপক্ষ, ড. হোসেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

দলের অভিজ্ঞ পরীক্ষিত সদস্যদের এভাবে বঞ্চিত করার ফলে সাধারণ কর্মীরা হতাশ হলেন। এরকম একজন হলেন মাওলা হক। তিনি একজন শক্ত-সমর্থ্য দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি। আফ্রিকা, সিন্ধি ও বেলুচিস্তান এই তিনের শিদি বংশ তার।

তিনি সস্ত্রীক বসবাস করেন লেয়ারিতে, যে জায়গাটি করাচির পিপিপির ঘাঁটি। এখানকার অধিবাসীরা অনেক আগে থেকেই ভুট্টো ভক্ত।

মাওলা বক্স বললেন, 'আমরা ভুট্টোকে ভালোবাসি, তাই আমাদের কাজ, আমাদের চিন্তা, সবই ভুট্টোকে কেন্দ্র করে। ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়ার পর আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, তার খুনির সাথে আমরা কখনো আপোস করবো না। পথ ছিল খুবই কঠিন, কিন্তু আমরা গ্রেফতার কিংবা মৃত্যুর ভয় করিনি।' এ বিষয়ে কথা বলা হলে তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, অনেক আগে আমি যখন ছোট শিশু ছিলাম, তখন কাবুলে আমাদের দেখা হয়েছিল।

তিনি বললেন, 'একনায়কের আমলে, সেই দুঃসময়ে আমরা ছিলাম রাজনৈতিক কর্মী। সময়টা ছিল বিরাট সংগ্রামের ও কষ্টের, কিন্তু আমরা ছিলাম একটি পরিবার। আমাদের মধ্যে কেউ নির্যাতিত হলে আমরা সকলে তার রক্ষায় এগিয়ে আসতাম। আমরা রাজনীতি শিখেছি দলের জ্যেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কাছ থেকে। আমরা তখন ছিলাম তরুণ, নিজেদেরকে বিবেচনা করতাম তাদের ছাত্র হিসেবে এবং আমরা সমাজতন্ত্রকে ভালোবাসি, যা ছিল পিপিপি-এর আদর্শ।'

তারা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছেন। তারা গ্রেফতারের ঝুঁকি নিয়ে এমআরডি-এর পুস্তিকা বিলি করতে যেয়ে শাস্তি ভোগ করেছেন। তারা বিরূপ পরিস্থিতিতে মহিলাদের সভার আয়োজন করেছেন এবং প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করেছেন কঠিন শাস্তির ঝুঁকি নিয়ে।

www.pathagar.com

তারা করাচি থেকে বাসে চড়ে বেলুচিস্তান হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ইরান গিয়েছেন। সীমান্তের ইরানীরা জাতিগতভাবে বেলুচ, তাই তাদেরকে ভিসা ছাড়াই ইরানে প্রবেশ করতে দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে। বিদেশে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার বিষয়টা খুব ব্যয়বহুল এবং তারা নিজেদের পকেট থেকেই তা বহন করেছেন। 'মীর বাবা আমাদের অনেক পরিবারকে চিঠি দিয়ে এবং ফোন করে ধন্যবাদ দিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে। তিনি পাকিস্তানে ফেরার পর আমরা সবাই মীর বাবার সাথে যোগদান করলাম।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'আমরা এখনও সংগ্রাম করে যাচ্ছি।'

শাহনাজ বেলুচ, একজন পাতলা ও লম্বা ব্যাক্তি, ঠিক মাওলা বক্সের মত তিনি বললেন। আমাদের কথাবার্তার ধরণ বদলে গেল। বিষয়টির মূল্যায়ন কাউকে তো করতেই হবে। তিনি বলতে থাকলেন, '১৯৮৫ সালের দিকে বেনজির আমাদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছেন।' তিনি উর্দু ও ইংরেজি দুই ভাষায় আমাকে বললেন, 'দল অন্যদের দখলে চলে গিয়েছে। এর একটি ভাগ নিয়েছে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা, যাদের রাজনৈতিক জ্ঞান শূন্যের কোঠায়, আর একটি ভাগ নিয়েছে সভানেত্রী ও তার স্বামীর বন্ধুরা, তার কিছু অংশ দখল করেছে জায়গিরদার, সামন্তপ্রভু, জমিদার ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা। যারা সত্যিকারের নিষ্ঠাবান, যারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, দলে তাদের কোনো স্থান নেই, তাদের কথা বলার অধিকারও নেই।'

আকতার শেরপাও দলের একজন যোগ্য নেতা। তিনি ১৯৭৬ সালে দলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দল যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তার ফলে তিনি এখন অন্য দলে আছেন। 'দুই পিপিপি'র মধ্যে বিরাট ব্যবধান', শাহনাজ বেলুচ বললেন, 'শেরপাও ছিলেন একজন যোগ্য রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন পারভেজ মোশাররফের কেবিনেটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যখন দেশের অভ্যন্তরে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ চলছিল। সে সময়ে তার ভূমিকার কারণে তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। পরিবারবর্গসহ তিনি কয়েকবার আক্রান্ত হয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন। আমাদের এই সাক্ষাতের পর তিনি মোশাররফের কেবিনেট ত্যাগ করেন। কয়েক বছর আগে তিনি এর একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করেন, যেটি প্রকাশ্যে বেনজির ও তার স্বামীর সমালোচনা করে। তিনি বলেন, 'মি. জুলফিকার ভুট্টো ছিলেন একজন ভালো শ্রোতা। আমি তার সময়ে সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, লক্ষ্য করতাম যে, তার টেবিলের চারদিকে যারা বসে আছেন তাদের প্রত্যেকের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তার কন্যা তার মন মত না হলে অন্যের কথা শুনতেই রাজি নন। এই দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার তুলনা করা যায় না। হ্যাঁ, তারও সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে, তবে তার পিতার সাথে তুলনাই হয় না। তিনি চালিকা শক্তি পেয়েছেন তার পিতার কাছ থেকে। মি. ভুট্টোর দল আর বেনজিরের দলের মধ্যে একটি ব্যবধান গড়ে উঠেছে– সেটি হলো, আমাদের পুরনো কর্মীদের সাথে ব্যবসায়ীদের যারা দলের আদর্শকে মুছে দিতে চায় তাদের সাথে প্রকট দ্বন্দ্ব। তা হলো আদর্শের লড়াই। তিনি আরও বলেছেন, 'বেনজির ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিপরীত, জুলফিকার দলকে গড়ে তুলেছিলেন দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে টিকেট দিয়ে। কিন্তু বেনজিরের সঙ্গে কাজ করতে যেয়ে দেখলাম, তিনি আমাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন–

www.pathagar.com

বললেন মাওলি। তিনি আরও বললেন, 'এখন টিকেট পাচ্ছে ভূস্বামী জমিদার যারা কৃষকদেরকে শোষণ করছে সেই জায়গিরদাররা– তারা টিকেটের পর টিকেট পাচ্ছেন। এ সমস্ত হচ্ছে যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়– ক্ষমতা ও স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে।

আমি বললাম, এসব লোকেরা যে দলে আসছে, তা তিনি দেখেননি কেন? কেন এ সকল সুযোগ সন্ধানীদেরকে বেনজিরের রাজনীতিতে স্থান দেয়া হলো? মাওলি এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন, তিনি বুঝেছেন, কী আমার জিজ্ঞাসা। বেনজির যখন ১৯৮৬ সালে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে ফিরে আসলেন, আমরা তার সাথে যোগদান করলাম, কারণ তিনি অঙ্গিকার করেছিলেন যে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর কর্মসূচি এগিয়ে নেবেন। আমরা তার সঙ্গেই ছিলাম, কারণ তিনি অঙ্গিকার করেছিলেন যে আর কোনো ভুট্টো নিহত হবে না। দলের শক্তি দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। তা সত্ত্বেও জনগণ আমাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা তার জন্য সংগ্রাম করছ কেন?' আর আমাদের উত্তর একই। আমাদের সংগ্রামের সূচনা তার দ্বারা হয়নি, শুরু হয়েছে অনেক আগে।

* * *

তিনি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যে লেনদেন করেছিলেন তা তার ভাগ্যকে আটকে দেয়, এমনকি জিয়ার তিরোধানের পরও। সামরিক বাহিনী ঠিক করে রেখেছে যে, বেনজিরকে এরূপ একটি আঁটসাট অবস্থায় রাখা হবে, যাতে তিনি বেশিদূর এগিয়ে যাবার সুযোগ না পান। তাই, নির্বাচনের ফলাফল দেখা গেল, জাতীয় সংসদের ২০৭ আসনের মধ্যে পিপিপি পেল বিরানব্বইটি, যার অর্থ হলো সংসদে তার জিয়ার শাসনকাঠামোর কোনো পরিবর্তন আনার সুযোগ রইল না।

বেনজির সামরিক বাহিনীর শর্ত মেনে নিলেন। শর্তগুলো হলো, প্রতিরক্ষা বাজেট আগের মতই থাকবে, নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে সেনাবাহিনীর মতামতকেই চূড়ান্ত হিসাবে মানতে হবে, আইএমএফ-এর ঋণের শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে। জিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াকুব আলী খানকে একই স্থানে বহাল রাখা হলো যেন তিনি সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষ স্থান আফগানিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি বিষয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন। জিয়ার এক সময়ের প্রিয়পাত্র এবং সিনেটের চেয়ারম্যান গোলাম ইছহাক খানকে পদোন্নতি দিয়ে করা হলো বেনজিরের প্রেসিডেন্ট।

২ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পাকিস্তানের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেনজির ভুট্টো শপথ গ্রহণ করলেন। দামেস্কে মুর্তজা ভোটের ফলাফল জানতে উদ্বিগ্ন ছিলেন। পাকিস্তানি দূতাবাস আমাদের বাসায় সর্বশেষ সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিল। ভোটের ফলাফল জানার পর মুর্তজা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ঘিনওয়ার মনে আছে, মুর্তজা বলছিলেন, এই নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে। 'এগার বছর সামরিক শাসন থাকার পর পিপিপি এতো কম আসন পেতে পারে না।'

পিপিপি কোনো রকমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। মুর্তজা তার বোনের সঙ্গে কথা বললেন এবং বুঝাতে চেষ্টা করলেন, 'পিংকি, এই ফলাফল মেনে নিও না।'। তিনি তা

www.pathagar.com

মানলেন না, তিনি ক্ষমতায় যাচ্ছেন, এজন্য আনন্দিত। নুসরাতও এই ফলাফল মেনে না নিতে তার কন্যাকে পারমর্শ দিলেন। তিনি বললেন যে, এই ফলাফল না মেনে নিলে বেনজির আরও শক্তিশালী হবে। বেনজির পরামর্শ অনুযায়ী জনগণের কাছে তার প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করলেন, তারপর তার মাতাকে রেখে একাকী লারকানায় গেলেন এবং তার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। শেষমেস তিনি সামরিক বাহিনীর সকল শর্তেই সম্মতি জানালেন।

ঘিনওয়ার মনে আছে, 'সেদিন ফোন সারাদিন বাজতেই ছিল, অনেক মানুষ মুর্তজাকে অভিনন্দন জানান, মীর মুবারক, অভিনন্দন। তিনি উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিলেন যদিও তিনি ছিলেন মর্মাহত। তার তোমাকে স্কুল থেকে আনার কথা ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তারই পরিবর্তে আনতে যাব কিনা। আমি কারণ জিজ্ঞেস করাতে জবাবে তিনি বললেন যে, লোকজন আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসবে; কিন্তু এটিতো আসলে বিজয় না।'

দামেস্কর কমিউনিটি স্কুলে আমি ও আব্বা একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছি। আমরা দেখেছি স্কুলটি গড়ে উঠতে, মাটির তলায় ক্লাশরুম থেকে বহুতল দালানে। আব্বা স্কুলের রীতি অনুযারী স্কুলে এসে গল্প পড়ে শোনাতেন, খুব ভালো পড়তেন আব্বা, গল্পানুযারী মুখভঙ্গী করে। সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন তিনি। শিক্ষক ও অভিভাবক সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। আসলে আমরা সেখানে এক পরিবারের মত ছিলাম। স্বাভাবিক কারণেই তারা আব্বাকে অভিনন্দন জানাতে আসবে যেটা আব্বা চান না।

জিয়ার দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান এক সপ্তাহ পর বেনজিরকে প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। এই অপমানে মুর্তজা আরও ক্ষিপ্ত হলেন। সামরিক বাহিনীর শর্ত, সামরিক বাহিনী কর্তৃক সাজানো নির্বাচন ইত্যাদি কারণে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তার বোনের সাথে আবার কথা বললেন। তিনি বললেন, 'ওরা তোমার হাত বেঁধেছে, তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ। তাদের শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান কর, সরকারে যেও না, পিংকি বিরোধীদলীয় আসন গ্রহণ কর। এই জারজদের কাছে মাথা নত করো না।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোকেরা এ সমস্ত কথা তাকে শুনতে নিষেধ করল। বেনজির ফোনে তার ভাইকে বললেন, 'আমরা বিরোধীদলে বসতে পারি না মীর। দল থেকে কিছু না পেলে সে ক্ষেত্রে অন্যরা আমাদের ত্যাগ করবে, কারণ তারা আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে।' এটি সত্য নয়। দলে অনেক অনুগত কর্মী আছে। চলে যাবে সুবিধাবাদীরা, নবাগত সম্পদশালী ব্যক্তিরা। তবে বিষয়টি জুয়ার মত, বেনজির ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না।

* * *

মুর্তজা ১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মে ঘিনওয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আমরা উভয়েই তার ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়েছি। আমি আন্টি ঘিনওয়ার প্রতি আমার অধিকার আব্বার জন্য আলাদা করে রাখি। আব্বা খুব বিবেচক। ভালোবাসা দিবসে তিনি ঘিনওয়ার জন্য ফুলের তোড়া কিনেন, সঙ্গে আনেন আমার জন্যও ছোট তোড়া। কিন্তু ভাষাগত বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তাকে 'ডার্লিং' বলে ডাকেন কেন।

www.pathagar.com

আমি চাইতাম, আমার প্রতি তার যে মমত্ববোধ তাতে অন্য কেউ যাতে ভাগ না বসায়। জবাবে তিনি বললেন যে, তিনি তাকে ভালোবাসেন, তাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে কি বলবেন?' তিনি বিষয়টির মিমাংসা করে দিলেন। ঘিনওয়াকে তিনি বলবেন 'ডার্লিং' এবং আমাকে বলবেন 'ডিয়ার'।

'সেটি ছিল আমার ছাব্বিশতম জন্মদিন।' আম্মা আমাকে বললেন, 'আমি জানতাম, মীর আমাকে বাগদানের আংটি দিতে যাচ্ছেন। বিয়ে সম্পর্কে আমরা কথাবার্তা বলেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমি শুধু ভেবেছি যে তিনি আমাকে আমার জন্মদিনে বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রস্তাব দেবেন। তিনি বিষয়টিতে চমক লাগাতে চাচ্ছিলেন। তাই আমি অপেক্ষা করছিলাম। ওইদিন আমরা কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই শেরাটনে দুপুরের খাবার খাচ্ছি, হঠাৎ তিনি আমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার জন্মদিনে কী চাই? তখন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'কি? আমি কি বলেছি?' এমনকি, তিনি হাসলেনও না। মনে হলো, আমার চেহারা লাল হয়েছে।'

আম্মা তার বাগদানের আংটি এখনও মাঝে মাঝে পরেন। তিনি স্মারক হিসেবে এটি পরে থাকেন। আজ তার হাতে এটি নেই। তার আঙুল খালি।

আম্মা বললেন, সেদিন তার সংশয় ছিল মনে করেছিলেন, হয়তো আমি 'হ্যাঁ' বলব না। তাকে আমার কাছ থেকে সরাসরি শুনতে হবে; তাই আমি বললাম, আমার মনে হয়, তিনি আমাকে প্রস্তাব দেবেন। এবার তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'কেন আমি তা স্পষ্ট করে বলছি না।' পরদিনই আংটির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো।

শেরাটন হোটেল সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। দামেস্কে অবস্থানকালে এটি ছিল আমাদের জন্য একটি প্রিয় স্থান। এখানে আমরা যেতাম, গ্রীষ্মকালে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সাঁতার কাটতাম; আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা হতো এখানে, এখানে আমি খেলাধূলা করতাম। সেটিই ছিল আমাদের জগৎ, কারণ আমাদের চলাচল ছিল নিয়ন্ত্রিত। আব্বার মৃত্যুর পর আমি দুপুরের খাবার খেতে একদিন সেই হোটেলে গিয়েছিলাম। পরিচারকরা আমার টেবিলের চারদিকে জড়ো হলো। তারা কাঁদল। আব্বা ছিলেন তাদের বন্ধু, এবং সারা হোটেলেই তার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

মুর্তজা ও ঘিনওয়া আমাকে তাদের বাগদানের সংবাদ দিতে বাড়ি আসলেন। আব্বা দ্রুত সংবাদটি আমাকে দিলেন। আমি রোমাঞ্চিত হলাম। ঘিনওয়া আমাদের সাথে না থাকলে আমি তার অভাব অনুভাব করে থাকি। আব্বারও অবস্থা একইরকম।

তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ২১ মার্চ, ১৯৮৯। বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল সংক্ষিপ্ত। জুনাম আসলেন করাচি থেকে। ঘিনওয়ার পরিবার থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন তেতা কাফিয়া ও জিচ্চা আব্বাউদ। সাথে ছিলেন তার তিন বড় বোনের একজন খোলোউদ, তাকে আমি বলতাম লুনুমান্দা। আম্মা আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'আমি নূতন পোশাক পরেছি, তুমিও তাই; তুমি মনে করেছ তোমারও বিয়ে। তুমি সবসময় এবং বিশেষ করে ছবি তোলার সময় আমাদের মাঝখানে ছিলে।' ইসলামী প্রথা অনুসারে তারা উভয়েই বিয়ের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করলেন আমাদের খাবার ঘরে বসে। আমি এক হাতে একটি ক্যামেরা নিয়ে, অন্যহাতে একটি ডায়েরি, যার উপরে লেখা ছিল 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' আব্বার দেয়া উপহার।

আমি তখন মাত্র লেখা শিখেছি। ডায়েরির পাতায় ইচ্ছা মত লিখতে লাগলাম।

www.pathagar.com

আব্বাকে বললাম, কী লিখব। তিনি কিছু ছবি আঁকলেন এবং কিছু লিখলেন। বিয়ের দিন আমি ডায়েরিতে দুই লাইন লিখলাম 'আব্বা ভালো, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন এবং আপনাকেও ভালোবাসেন।' এর নিচে কিছু আঁকলাম। আবার লিখলাম 'আজ আব্বা ও ঘিনওয়ার বিয়ে হলো, এটি আমার জন্য একটি বিশেষ দিন। এখন আমি ঘিনওয়াকে বলি 'আম্মা' এবং আব্বাকে আব্বাই বলি।' তখন আমার বয়স সাত বছর।

বিয়ের আইনগত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর জুনাম আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, এখন থেকে ঘিনওয়াকে আন্টি না বলে 'আম্মা' বলতে হবে। এতে আমি খুব রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। আমার গর্ভধারিনী মায়ের সাথে তো আমার সেরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

এটি ছিল একটি বিশেষ দিন। তাই, ডায়েরিটিতে আম্মার জন্যও একটি পৃষ্ঠা রাখা হয়েছিল। কয়েকদিন পর তিনি তা পূরণ করলেন। তিনি লিখলেন, 'আমি এখন একজন খুব সুখি ব্যক্তি, কারণ আমি হলাম ফাতিমা নামের খুব সুন্দরী একটি মেয়ের মা। সত্যিই সে খুব মিষ্টি ও চমৎকার মেয়ে।'

দশদিন পর আমার পিতা-মাতা একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। শেরাটন হোটেলের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন তাদের ত্রিশজন বন্ধু-বান্ধব। আমি অসুস্থ ছিলাম, টনসিল অপারেশন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি, মনমরা হয়ে বাড়িতে ছিলাম লুলু আন্টির সঙ্গে।

সে বছর আগস্টের শেষ দিকে আম্মার সাথে আমি পাকিস্তান গেলাম। এটি ছিল তার প্রথম পাকিস্তানে ভ্রমণ, আর আমার দ্বিতীয়। আম্মার সাথে আবার করাচি এসে আমি জায়গাটিকে নিজের বলে অনুভব করলাম, কিন্তু আম্মার জন্য এই ভ্রমণটি ছিল কষ্টকর। আম্মা বললেন, 'মীর কখনো নির্বাসনে থাকার কথা ভাবেনি, সে সবসময় দেশে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করে, যদিও আমার কাছে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। যতবারই আমি ফ্ল্যাটের কিছু পরিবর্তন করতে চাই মীর বলে যে এগুলো আমাদের নয়, আমরা তো শিগগিরই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। সে সবসময়ই ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।' –আম্মা বললেন।

মুর্তজা তার মায়ের কাছে বললেন যে, তিনি দেশে আসতে চান, তার নির্বাসিত জীবনের শুরু হয় জিয়ার শাসনকালে এবং জিয়ার মৃত্যুর পর এর অবসান হওয়া উচিত। জুনাম তা সমর্থন করেন, কিন্তু পরিবারের আরেকজন বেনজির এ বিষয়ে একমত হলেন না। মুর্তজা যখন বললেন যে, জিয়ার সামরিক প্রশাসন তার বিরুদ্ধে যে অনেকগুলো রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা রুজু করেছে, তিনি তার মোকাবেলা করবেন। কিন্তু বেনজির নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তার ফাইল হারিয়ে ফেলেছে। কেউ বলতে পারে না, তার বিরুদ্ধে কতগুলো মোকদ্দমা আছে, কী কী অভিযোগ এনেছিলেন সেই একনায়ক। তিনি তার ভাইকে বললেন যে তার হাত এখন বাঁধা অবস্থায় আছে।

সুহেল বললেন, '৮৮ সালে প্রথমবার পিপিপি সরকার গঠন করার পর দেশত্যাগী অনেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। জিয়ার আমলে রাজনৈতিক হয়রানির শিকার অনেক সিন্ধি ও বেলুচ– এমনকি খায়ের বক্স মারিও আফগানিস্তান থেকে ফিরেছেন। তাই এটিই প্রত্যাশিত ছিল যে মুর্তজা এবং তার অনুসারীরাও একইরূপ আচরণ পাবেন। 'আফগানিস্তানের জন্য যুদ্ধ করেছি, জিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, তথাপি আমরা ফিরে আসার প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হলাম না।' মুর্তজার সঙ্গে সুহেলকেও প্রবাসে থাকার যন্ত্রণা

www.pathagar.com

ভোগ করতে হলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আব্বা কেন ফিরে গেলেন না?' জবাবে তিনি বললেন, 'পাকিস্তানে মুর্তজার কর্মীবাহিনীর শক্তি ছিল। তবে তিনি চান নাই যে, তাকে নিয়ে তার বোন কোনো সমস্যায় পড়ুক। তার বোনের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার জন্য তিনি দোষী হতে চাননি। তিনি জানতেন তার বোন কতখানি ক্ষমতার কাঙ্গাল। তবে আমার মনে হয়, অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার সরকার কতটা দুর্বল এবং পরিণতিতে ক্ষমতা হারাবে?'

বিবিসি থেকে এক সাক্ষাৎকারে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন তিনি তথাকথিত গণতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করে দেশে ফিরে যান নাই; তিনি তখন অকপটে বললেন যে, 'আমি বাইরে আছি। আমি ফিরে যেয়ে আমার বোনের সরকারের পতন ঘটানোর কারণ হতে পারি না।' আসলে তিনি নিজেই ব্যবস্থা করতে পারতেন।

করাচিতে তার প্রথম যাত্রায়ই আম্মা সংবাদ সম্মেলন করেন। আব্বা চেয়েছিলেন যে ঘিনওয়া তার পক্ষ হয়ে কথা বলবেন। সেই ১৯৮৯ সালে একজন সাংবাদিক যে প্রশ্ন করেছিলেন, তা সবারই মনে আছে: 'মুর্তজা কেন গণতন্ত্র ফিরে আসার পরও তার নিজ দেশে ফিরে আসছেন না?' আম্মা অকপটে জবাব দিলেন : 'তিনি তা'ই চাচ্ছেন। কিন্তু তার বোন তাকে এখন না আসতে বলছেন।' বেনজির তার ভাতৃবধূর এরূপ খোলাখুলি মন্তব্য ভুলেন নাই।

আমরা দামেস্ক ফিরে যাওয়ার পরপরই আম্মা বুঝতে পারলেন যে তিনি গর্ভবতী। পিতামাতা একসাথেই তা আমাকে জানালেন। তাদেরকে বিচলিত বলে মনে হলো। অনেকদিন পর্যন্ত আমি ছিলাম পরিবারের একমাত্র শিশু। আব্বা একদমে বলে ফেললেন, 'ফাতি, আমরা একটি ছোট শিশু পেতে যাচ্ছি।' আমি আশা করেছিলাম যে, এটি মেয়ে হবে না।

জুলফিকার আলী ভুট্টো (ছোট)-এর জন্ম হয় ১ আগস্ট, ১৯৯০। আমি ছিলাম আমার বন্ধু পলাদের বাড়িতে। আব্বা সেখান থেকে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। আব্বা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমাকে আনতে গিয়েছিলেন, আমার আরও দু'ঘণ্টা খেলার কথা ছিল; তাই আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। তিনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, তা আগে বলেননি। আব্বা নিচ তলায় গাড়ি থেকে পাগলের মত অনবরত হর্ণ বাজাচ্ছিলেন। আমি সাড়া না দেওয়াতে তিনি ইন্টারকমের মাধ্যমে আমাকে জিনিসপত্র নিয়ে আসতে বলেন। আব্বা সাধারণত এরূপ চিন্তিত থাকেন না; আমি মনে করলাম তিনি আমার সঙ্গে কোনো চালাকি করছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি ভোরবেলা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে আমার পাশে খেলা করছিলেন। কিন্তু এবার সেরকম কিছু মনে হলো না। তিনি আমাকে গাড়িতে করে শহরের কেন্দ্রে চামি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমরা দু'জনেই এই প্রথম জুলফিকে দেখলাম। জুলফির জন্মের জন্য জুনাম দামেস্ক আসলেন। বেনজির তার মাকে নিজের প্রভাব বলয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানিয়েছেন। নুসরাত এই কাজ পেতে জীবনপন করেননি। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাকে এই পদ দেয়ার পেছনের কারণ কী? তিনি ওই পদ গ্রহণ না করে আমাদের সাথে একমাস কাটালেন। এসময় বেনজিরের সরকারের পতন ঘটল। আমাদের নূতন পারিবারিক জীবনযাত্রা সুখেই কাটছিল।

* * *

www.pathagar.com

বেনজিরের পতন দুম করে হঠাৎ হয়নি, নানা টানাপড়েনে ধীরে ধীরেই হয়েছে। তার দ্বিতীয়বারের শাসনামলে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত সহিংসতা যে প্রবল আকার ধারণ করে তা' তার প্রথম সরকারের কারণেই হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের। দেশ বিভাগের সময় ভারত থেকে আগত মোহাজিরদের সাথে সিন্ধীদের সংঘর্ষ দেখা দেয় করাচিতে। বিষয়টি এতই প্রবল আকার ধারণ করে যে, সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। তিনি একে একটি ছোট-খাটো বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন।

মুর্তজা তার মায়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে দলের ভেতরে গোলযোগের কথা উল্লেখ করেন। সম্প্রতি পিএসএফ-এর দুইজন নিষ্ঠাবান ছাত্র (পিএসএফ- পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফেডারেশন পিপিপি-এর ছাত্র সংগঠন)কে পুলিশ হত্যা করেছে। তারা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। আমাদের দলের অনেক একনিষ্ঠ কর্মী জিয়ার আমলে জেলে ছিল, তাদেরকে আবার জেলে ঢুকানো হয়েছে। অনেকের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মুর্তজা বেনজিরের আমলে দলের নিষ্ঠাবান যে সমস্ত কর্মীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, তাদের একটি তালিকা ওই চিঠির মধ্যে দেন। পুলিশের নির্যাতন হয়েছে হায়দ্রাবাদ, খাট্টা, করাচি এবং প্রদেশগুলোর অন্যান্য স্থানে অত্যাচার অব্যাহতভাবে চলছে। যে কাউসার আলী শাহ কাবুলে আফগান বিদ্রোহীদের সাথে আমাকে ও শাহকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে জাতীয় নির্মাণ কোম্পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে। যে সাইফুল্লাহ খালেদ নুসরত ও পিংকিকে মিথ্যা ঘটনায় মামলায় জড়িত করতে রাজি হন নাই বলে জিয়ার আমলে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, এখনও তিনি নির্যাতিত হচ্ছেন।

মুর্তজা চিঠিটি লিখেছিলেন লাল কালিতে, বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য।

> জাভেদ ইকবাল ও মোহাম্মদ ইউসুফ নামের পাঞ্জাবের দলের দুই যুবক কর্মী জিয়ার শাসনামলে শত নির্যাতনের মুখেও দল ত্যাগ করে নাই। তারা তখন বলেছিল, তোমরা যত কিছুই কর না কেন, আমরা ভুট্টোর আদর্শ ত্যাগ করবো না। এমনকি ১৯৮৩ সালে সামরিক বাহিনীর একটি মনস্তত্ত্ববিদদের দল তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, কীভাবে পিপিপি তাদের মগজ ধোলাই করেছে, তা বুঝার জন্য। তারা বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেন এই দুই তরুণ এত নির্যাতন সত্ত্বেও পিপিপি ছাড়ছে না। আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় হলো, এই দুই একনিষ্ঠ কর্মী এখনও লাহোর জেলে অবস্থান করছে। আমি জানি যে, আপনার আরও অনেক সমস্যা আছে, তবু আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে এসব বিষয়গুলো দেখার।

মুর্তজা মা ও বোনকে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠিটি শেষ করলেন, তবে এর সঙ্গে একটি পাকিস্তানি সংবাদপত্রের ক্লিপিং যুক্ত করলেন। সংবাদটি ছিল বেনজির সরকারের সংবাদপত্র দমনের উপর মন্তব্য। শেষে যোগ করলেন, *'আমার মনে হয়, আপনি বিষয়টি দেখবেন।'*

ইতোমধ্যে বেনজির ও তার যে চাটুকারের দল তাকে ঘিরে রেখেছে, তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাকিস্তান থেকে বিদেশে সম্পদ পাচারে। দেশীয় রাজনীতির জন্য কোনো পথ খোলা রইল না। সম্পূর্ণরূপে জিয়ার শাসনামলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই চললো সবকিছু। যে

www.pathagar.com

মাহমুদ হারুন জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাকে নিযুক্ত করা হলো সিন্ধুর গভর্নর; যে নিসার খুরো প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'ভুট্টোকে প্রথমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে পরে বিচার করা হোক', তাকে বানানো হয়েছে সিন্ধুর দলনেতা, জিয়ার ক্যাবিনেটে ছিলেন বা তার শাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন এমন অনেককে নির্বাচনে পিপিপির টিকেট দেয়া হয়।

বেনজির সহজেই খোলাখুলিভাবে তার পিতার অনেক কর্মসূচিই পরিবর্তন করেন। জুলফিকার ব্রিটিশ পরিচালিত কমনওয়েলথ থেকে চলে এসেছিলেন, অথচ বেনজির পাকিস্তানকে আবার সেটির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন জানান। যে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির জন্য জুলফিকার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, বেনজির তা সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকলেন। জুলফিকার যে সমস্ত শিল্প কারখানাকে জাতীয়করণের আওতায় এনেছিলেন, বেনজির সেগুলোকে আবার ব্যক্তিমালিকানায় ফেরত দেয়ার প্রক্রিয়া চালালেন। জুলফিকার নাওদেরো চিনি কলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনগণের জন্য; বেনজির সেটিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করার ব্যবস্থা করলেন। এটি কিনে নিলেন আনোয়ার মজিদ, যিনি জারদারির একজন ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বন্ধু। শাদাতকোট কাপড়ের মিলটিও জুলফিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণমালিকানাধীন সিন্ধুর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান, এটিরও মালিকানা চলে গেল বেনজিরের পিপিপির একজন সদস্য নাদির মাগসির মালিকানায়। প্রদেশের গরীব লোকদের জন্যই এটির প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়করণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে জড়িত ছিল জারদারির কুটিল কর্মতৎপরতা। কথিত আছে যে জারদারি এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অর্জন করেছেন, যার জন্য্য তার নাম দেয়া হয়েছিল 'মি. টেন পার্সেন্ট।'

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সরকার জিয়ার নীতিমালাই অনুসরণ করছিল। আফগান অভিযান চলতে থাকল, এখানে গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা দেয়া হলো। বেনজিরের একজন পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ও কূটনীতিবিদ ইকবাল আখন্দ পিপিপির বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন, 'আফগানিস্তান, ইসরাত ও ভারতের বিষয়ে সরকার খুব জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিয়ার আমলের সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা।'

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেনজির সিদ্ধান্ত নিলেন, তার মাথা সাদা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখতে। তিনিই আমাদের পরিবারের প্রথম মহিলা, যিনি হিজাব পরেছেন। তার পিতা ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি। তিনি সনাতন পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন। ফাতিমা জিন্নাহ, যিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার বোন, তিনি আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ষাটের দশকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। তবু তিনি তার চুল ঢেকে রাখতেন না। বেনজিরের মাতা নুসরাত ভুট্টোও তার চুল ঢেকে রাখতেন না। এই প্রথা প্রচলিত ইসলামী দলগুলোর মধ্যে প্রচলিত। জামাতি ওলামা ইসলামীর নেতা, মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন তার নির্বাচনী মিত্র, তার দলের এই প্রথা বেনজির এখন অনুসরণ করেন। বেনজির হুদুদ অধ্যাদেশ বাতিল করেননি। এই আইন অনুযায়ী বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। তিনি সরকারিভাবে মহিলাদের কোনো অধিকারকেই বৃদ্ধি করেননি। পাকিস্তান পিপলস পার্টির দু'বছরের শাসনামলে কোনো

www.pathagar.com

অর্থপূর্ণ আইনই প্রণয়ন করেননি। কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয় নাই, কোনো প্রতিষ্ঠানকেই আরও শক্তিশালী করা হয়নি। ১৯৯০ সালের আগস্টের জুলফিকার জন্মদিবসে প্রেসিডন্ট গোলাম ইসহাক খান ব্যাপক দুর্নীতি ও সিন্ধুর জাতিগত সহিংসতা দমনে ব্যর্থতার কারণে বেনজীর ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ইতিহাসবিদ ইয়ান তালবতের মতে, 'ভুট্টো সরকার তার বিশ মাসের শাসনামলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে একদম ব্যর্থ হয়েছে।'

www.pathagar.com

১৬

মুর্তজা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করায় আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি ওর নাম রাখলেন 'জুলফি', তার পিতার ডাকনাম অনুসারে। পারিবারিকভাবে আমরা তাকে 'জুনিয়ার' বলে ডাকতাম। সে ছিল একটি চমৎকার শিশু। সে কখনো কাঁদত না, হৈ চৈ করত না, প্রচুর পরিমাণে খেত, ভালোভাবে সঙ্গ দিত। বাড়িতে জুলফি আমাকে অনুসরণ করত।

আব্বা মাঝে মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের আরামদায়ক দিনগুলোর কথা স্মরণ করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। আমরা কোন এক বিকেলে নগরীর বাইরে এবলা হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম। সময়টা ছিল বসন্তের প্রথম দিন। আবহাওয়া উষ্ণ ছিল, কিন্তু তখনও দামেস্কর গ্রীষ্মের মত প্রকট হয়ে ওঠেনি। বাগানের মধ্যে আমাদের টেবিলে যাওয়ার পথে এবলার ও সাঁতার পুলটি অতিক্রম করাকালে আব্বার চোখে দুষ্টুমির চিহ্ন দেখলাম। তিনি আমাকে সাঁতার পুলে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাইলেন। আম্মা আমাকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্য আমি গর্ববোধ করছিলাম। আমার বন্ধু নোরা আমাদের সঙ্গে ছিল। আমার মনের অবস্থা তখন আব্বার উচ্ছ্বাসে সাড়া দেয়ার মত ছিল না। তাই আমি তাকে অস্বীকৃতি জানালাম। তিনি তার ইচ্ছা দমন করলেন। আমরা চমৎকার একটি লাঞ্চ উপভোগ করলাম।

আমরা পুলের পাশ দিয়ে গাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে নোরার সাথে কথা বলছিলাম। হঠাৎ আব্বা চীৎকার করে আমাকে ডাকলেন। আমি কিছু বুঝবার আগেই তিনি আমাকে জলে নিক্ষেপ করলেন। আমি শীতল বরফজলে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। অনেক কষ্টে উঠে এলাম। আমার খুব রাগ হলো। নোরা ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। আব্বাকে ধন্যবাদ যে তিনি নোরাকে দিয়ে এরূপ কাজ করালেন না। আব্বা বেশ কিছুক্ষণ জোরে হাসলেন। এরপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে আসতে বললেন। প্রথমে আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম। এরপর বিষয়টিকে মেনে নিলাম; ভাবলাম, এরূপ ছোটখাট কৌতুক তো শুধু তার আর আমার মাঝেই হয়ে থাকে। আমার বয়স তখন ছিল নয় বছর। আমি বললাম, আমার বয়স চৌদ্দ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাকে পুলে নিক্ষেপ করতে পারেন না। এবার আব্বার হাসি চলে গেল, তিনি নরম সুরে বললেন, 'ফাতি, তখন যদি আমি বেঁচে না থাকি?'

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। খুব জোরে চেঁচাতে শুরু করলাম। তিনি আমাকে তার কোলে বসালেন। ভিজে কাপড় মুছে দিলেন এবং আদর করলেন। আমার চোখও মুছে দিলেন।

www.pathagar.com

আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, 'চৌদ্দ হতে তো বেশি দেরি নেই। আপনি অবশ্যই বেঁচে থাকবেন। আমার একশত বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন।' তার ঘাড়ে আমি নাক মুছলাম। আব্বা আমাকে চুমু দিলেন এবং দোল খাওয়াতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আমিও তাই মনে করি।'

* * *

আবার পাকিস্তানে আসলাম। বেনজির এখন বিরোধীদলে। তিনি এখন প্রধান বিরোধীদলের প্রধান। পরিকল্পনা করছেন, আবার কীভাবে ক্ষমতায় ফিরে যাওয়া যায়। ড. গোলাম হোসেন ছিলেন বেনজিরের প্রাক্তন রাজনৈতিক শিক্ষক, তিনি তাকে ডাকলেন।

বেনজির তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জুলফিকার আর বেনজিরের মধ্যে পার্থক্য কি দেখছেন? তিনি তাকে বলেছিলেন, 'বাদ দিন।' কিন্তু বেনজিরের বারবার অনুরোধের কারণে তিনি বললেন, 'জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে আমরা দলের কর্মীরা মিথ্যা কথা বলতে ভয় পেতাম। এখন আপনার সামনে সত্য কথা বলতে ভয় পাই।' ড. হোসেন একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। তার ইসলামাবাদের বাড়িতে তার সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তিনি বললেন, 'দলের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে আমাকে একবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ডাকা হয়েছিল। সেখানে দেখতে পেলাম, টেবিলের চারদিকে নবাগত মোসাহেবরা বসে আছে। তাদের সামনেই আমি বেনজিরকে বললাম, 'বেনজির সাহেবা আপনার লোকেরা যে চাকরি, টেন্ডার বিক্রি করছে, তা কি আপনি জানেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'ওহ্ ডক্টর। আপনি আগের দিনের মানুষ। এটি নতুন যুগ; আমাদেরকে নেওয়াজ শরীফের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে'। বেনজিরের একসময়ের বড় শত্রু দ্রুত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন, একসময় তিনি ছিলেন জিয়ার লোক, পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বেনজির বললেন, 'তার আছে টন টন টাকা,' তিনি তার দলের অর্থনৈতিক কূট-কৌশল ব্যাখ্যা করলেন।

এরপর ড. হোসেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি মনে করেন যে, অর্থ দিয়ে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতা কিনতে পারবেন? তা আপনি পারবেন না। এর দাম কত?' তিনি তার নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এটি খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তবে ড. হোসেন তার জ্যেষ্ঠতার অধিকারে এরূপ কথা বলতে পেরেছিলেন। তবে এরপর তার জন্য বেনজিরের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। ড. হোসেন চীৎকার করে বললেন, 'আমি বেনজিরকে বললাম, আমার গ্রামে কোনো বিদ্যুৎ নেই, নেই কোনো বিদ্যালয়। আপনি যদি আমার গ্রামে জন্মগ্রহণ করতেন, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও উত্তীর্ণ হতে পারতেন না। আমাদের সমালোচনা করার অধিকার আছে এবং প্রকাশ্যে সত্য কথা বলার জন্য সংগ্রাম করেছি এতদিন।'

পিপিপির শক্তিশালী ছায়ায় যারা জীবন কাটিয়েছেন, তাদের অন্য সবার মত সুহেলও দলের অল্পসময়ের মধ্যে ক্ষমতা হারাবার কারণে হতাশ হলেন।

সুহেল বললেন, '১৯৮৮ সালের নির্বাচনের সময় আমি যখন মীরের সঙ্গে দেখা করি সে সময় বুঝতে পারি মীর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত, সামনে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে

www.pathagar.com

এখনও আনন্দ করার সময় আসেনি। জিয়া চলে গেছে বটে কিন্তু দলকে তো কিছু দিতে হবে। যখন দল ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় তখন মানুষকে দেওয়া ওয়াদা ছাড়া আর কিছু ছিলনা, ছিলনা কোনো নীতি বা আদর্শ। একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠছে আদর্শ ছাড়া এক নড়বড়ে অবস্থায়। বেনজির ক্ষমতাচ্যুত এবং তার স্বামী জেলে, তার স্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুঠ করার অভিযোগে। সে সময় গুজব ছিল যে, তথাকথিত পোলো খেলোয়ার জারদারি তার পোলো খেলার ঘোড়াদের রাখার আস্তাবল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, অবশ্যই তার ঘোড়াগুলো ছিল বিদেশী। এমন একটি দেশে এই ঘটনা যে যেখানে দেশের বাণিজ্য কেন্দ্র করাচির মত শহরে নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে না। এমনও হয় দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকেনা। ঘোড়াদের পেস্তা বাদাম দুধ খাওয়ানো হতো প্রতিদিন। জুলফিকারের চাচাতো ভাই, বেনজিরের চাচা, ভুট্টো গোষ্ঠীর প্রধান ও পিপিপি-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মমতাজ ভুট্টো একেবারে প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের জারদারির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন; এই অপরাধীটি এখন ক্ষমতার আসনে যাওয়ার পথ করে নিয়েছে (২০০৮ সালে জারদারি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে মমতাজ গ্রেফতার হন। 'সে আমাদের নাম, আমাদের ইতিহাস চুরি করেছে, এরপর ভাবছে আমাদের একের পর এক শেষ করে দেওয়ার,' স্থানীয় একটি পত্রিকা উদ্ধৃতি দেয়।

সুহেল বললেন, 'বেনজিরের পর নেওয়াজ শরিফের সরকার উপলব্ধি করে যে পাকিস্তানের জনগণ থেকে মুর্তজার উপর আগ্রহ আসছে। মুর্তজা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব; তিনি সবসময় তা-ই ছিলেন, আর তার পেছনে আছে বিরাট কর্মী বাহিনী। মুর্তজাও অনুভব করলেন, তাকে দেশে ফিরতে হবে, সেখানে তার ভূমিকা রাখতে হবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে।'

আমি যখন মাওলা বক্সের সাথে আলাপ করছিলাম খরচের খাতায় যাওয়া পুত্রের(মুর্তজা) পর্যাপন বিষয়ে, তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন,' আমাদের সংস্কৃতিতে আসল ওয়ারিশ হলো মীর বাবা। বেনজির তার রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছেন জিয়ার শাসনামলে যখন দুই ভাই ছিলেন বিদেশে, তখন তাদের দেশে থাকা ছিল অত্যন্ত বিপদজনক। জুলফিকার তার দুই পুত্রকে নিজেই বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তার উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের গন্য করতেন। মাউলি আরো বললেন, 'এটা ছিল অকথিত বোঝাপড়া, এটা বলার দরকার পড়েনা। বেনজির সেসময় তার পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ব্যাক্তি বেনজিরের নয় বরং ভুট্টোর সন্তান হিসেবে।

মাউলি বুঝতে পেরেছেন, এর মধ্যে কতটা গভীরতা আছে, তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন যে, আমরা একই পরিবারের অন্তর্গত। তিনি বললেন, 'বেলুচ সংস্কৃতি, পাঠান সংস্কৃতি, এমনকি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিবারের পুরুষ সদস্যই তো পিতার কাজের, শিল্প-ব্যবসা কিংবা রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।' মাউলি একটু হেসে আবার বললেন, 'বিবি, ভুট্টোর ওয়ারিশ তো হবে ভুট্টো।' 'বেনজির তো এখন জারদারি'। এটি আমার কাছেও অস্পষ্ট নয়, যদিও মাউলি অস্বস্তি বোধ করছিলেন পরিবারের অন্য এক কন্যাকে এই কথাটা বলতে – যদিও এই ব্যাখ্যায় আমি একটুও অসন্তুষ্ট হইনি।

কথাগুলো আমি সুহেলকে বললাম। সুহেল বললেন, 'বিষয়টি পৈত্রিক বা বংশানুক্রমিক নয়। মীর আর বেনজির একই পরিমণ্ডল থেকে এসেছে– মীর একজন ভুট্টো, তার পিতার

www.pathagar.com

সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনিও একনায়কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এ সমস্ত বিষয় বেনজিরের জন্যও প্রযোজ্য। মুর্তজার হাত পরিষ্কার, দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত রেকর্ড এবং তাত্ত্বিকভাবে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির জ্ঞান আছে। এ সমস্তই তার বোনের জন্য ছিল হুমকি।'

পিপিপি-র কর্মী বাহিনীর বয়স ছিল মোটামুটি ত্রিশের প্রথম দিকের কোঠায়, জিয়ার শাসনামল পাড়ি দিয়ে এদের এখন বয়স হয়েছে, তারাও এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করে। করাচির বিপরীত প্রান্ত মালির অধিবাসি হামিদ বালুচ এমআরডি-এর আমলে বেনজিরের অধীনে কাজ করেছেন এবং তার প্রথম শাসনামলে দলের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বললেন, 'যে সমস্ত যুবক জিয়াবিরোধী সংগ্রামে প্রথম সারির কর্মী ছিলেন, তারা ছিলেন মুর্তজার সমর্থক এবং তারা চাচ্ছিলেন মুর্তজা ফিরে আসুন।' বেনজিরের প্রতি তার মোহমুক্তির কারণ, একই যা অন্যান্য পুরাতন কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। 'দল চলে গেছে জারদারি ও তার দুর্নীতির দখলে– দলের আর কোনো ইতিহাসই এখন নেই, কোনো আদর্শ নেই, এটি এখন হয়েছে অর্থোপার্জনের হাতিয়ার।'

সুহেল বললেন, 'মীর তার বোনের বিশ মাসের শাসনকালে নীরব ছিলেন।' সুহেল আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'যদিও তিনি যা ঘটছিল তা জানেন ও দেখেছেন এবং দ্বিমতও পোষণ করেছেন, তবু তিনি নীরব ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি দেশে ফিরে আসেননি এবং তার পদ দাবি করেননি। তিনি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তুমি আমাকে বল, বিদেশে অবস্থান করে কতজন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে এবং জিতেছে?' সুহেল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি ছিলেন সঠিক। আমি এই একজন লোককেই জানি।

১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মে মুর্তজা তার মন স্থির করলেন, তিনি দেশে ফিরবেন। ঘিনওয়া জুলফিকে নিয়ে তার বড়বোন রাচার কাছে ওকলাহোমায় গিয়েছিলেন; তাকে তিনি চলে আসতে বললেন; তিনি যে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবেন তা জানালেন। ঘিনওয়া আমেরিকায় তার সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরলেন। আমি ছিলাম আমার পিতামহীর সাথে বাইরে। আমিও দেশে রওয়ানা দিলাম। মুর্তজার মাতা তখনও দলের সম্মানিত চেয়ারপার্সন; মুর্তজা তার মা নুসরাতের কাছে দরখাস্তের ফরম চাইলেন নির্বাচনে প্রার্থী মনোয়নের জন্য। কিন্তু দলের সক্রিয় চেয়ারপার্সন ছিলেন বেনজির। তিনি তার স্বামীর সাথে যৌথভাবে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দিচ্ছিলেন।

বেনজির তার ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বললেন এবং নির্বাচনের টিকেট দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি মুর্তজাকে কিছু পরামর্শ দিলেন : যদি মুর্তজা পাকিস্তানে ফিরে আসার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে থাকে, তবে তাকে দামেস্ক ত্যাগ করতে হবে এবং লন্ডনে কয়েক বছর থাকতে হবে এবং সমাজতন্ত্রের চিন্তা মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে। এরপর তাকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। বেনজির ছিলেন খুবই কর্তৃত্বলোভী; তিনি অনেক দিন পর্যন্ত নিজের পথ পরিষ্কার রেখেছেন।

মুর্তজা ছিলেন পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কার্ডধারী সদস্য। তিনি দলকে তার পাওনা দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন দলের জন্য। তারপরও তিনি বারবার তার বোনকে টিকেটের জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি মাত্র নয়টি টিকেট চেয়েছিলেন– সেগুলো দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে জারদারি ও তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে। তিনি মুর্তজাকে উত্তরে বলেন, 'আমি তোমাকে বা তোমার নয় জন লোককে টিকিট দিতে পারি না।' মুর্তজাকে তিনি কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক পরিষদের আসনের টিকেট দিতে চাইলেন। আমাদের মধ্যে কেউ তখন কল্পনা করতে পারিনি, কেন তিনি তার ছোট ভাইকে এতো ভয় পাচ্ছিলেন।

আফতাব শেরপাও পিপিপির একজন প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং এখন তিনি তার নিজস্ব উপদলের প্রধান, তিনি বেনজিরের ভয় পাওয়ার বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করলেন। 'তিনি ছিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ। তার ক্ষমতার লিপ্সা প্রচণ্ড এবং তিনি তা হারাতে চান না। তিনি বেগম ভুট্টোকে দল থেকে বাদ দিয়েছেন এজন্য যে তিনি (বেনজির) তোমার পিতাকে ভয় করেন। তিনি ছিলেন একজন উত্তরাধিকার। ভুট্টোর উত্তরাধিকারিত্ব তোমার পিতার, তার নয়, এটি সব সময় তার চিন্তায় থাকত।' ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে বেনজির তার মাতাকে পদচ্যুত করেন। তিনি সে বছর সম্মানিত চেয়ারপার্সনের পদে থেকে মুর্তজার পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। তাকে আনুষ্ঠানিক আজীবন চেয়ারপার্সন পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

এক সময় শেরপাও ছিলেন বেনজিরের একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। বেনজিরের বিদেশ ভ্রমণের সময় কখনো কখনো তাকে দলের দায়িত্বভারও দেয়া হতো। এ সময় বেনজিরের দু'জন অনুগত লোক তাকে নিশ্চিত করে যে, তিনি (শেরপাও)দলীয় নীতিমালা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। এটি ছিল তার রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা। এই কারণেই তিনি তার অব্যাহতভাবে চেয়ারপার্সন হিসেবে পদ দখলে রাখার ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে পড়েন। বেনজির কখনও পছন্দ করত না যে চেয়ারপার্সন হিসেবে তার নাম উত্থাপিত হলে কেউ তার বিরোধীতা করুক। কেন তার এত ভয়? আমি এ কথা প্রেসকেও বলেছি। এমনকি, যখন তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের দিয়ে তার আজীবন চেয়ারপার্সন থাকার বিষয় নির্ধারণ করেন, তার ফলাফলও দলের কর্মীদেরকে জানানো হয় নাই। দলের জন্য সবারই কম-বেশি অবদান ও ত্যাগ আছে। দলের ইতিহাসের প্রথম দিকে শেরপা-এর ভাই হায়াত নিহত হন। পরে তিনি বেনজিরের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং নিজস্ব পিপিপি গঠন করেন। 'ভোট দিলেই এখন দলের সম্পদ হওয়া যায়,' তার ইসলামাবাদের বাড়িতে বসে সুগন্ধি এলাচ চা পান করা অবস্থায় তিনি আরও বললেন, 'সবার অবদান আছে– যারা চাবুক খায়, জেল খাটে বা ভোট দেয়'। আমার ভাইও দলের জন্য অনেক কিছু করেছিল, আমিও করেছি। এটা কারও ব্যক্তিগত সম্পতি নয়– এটা আমাদের সকলের।'

কিন্তু দলটি পরিণত হয়েছে জমিদারিতে, দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের কোনো স্থান নেই। দলের সভায় জেষ্ঠ্য নেতাদের উপস্থিতিতে বেনজির যখন তার মায়ের সাথে যে আচরণ করেন তাতে তারা মর্মাহত হন, মাথা নিচু করে বিড়বিড় করেন, লজ্জায় মাথা কাটা যায় কিন্তু কিছু বলতে পারেন না।

আম্মা আমাকে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আর আমি নোট নিচ্ছিলাম আমার বইয়ের জন্য। কিভাবে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে থাকা অবস্থায় মুর্তজাকে 'সারা' 'পাকিস্তানে নয়টা আসন' দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। আসলে তিনি মুর্তজাকে বাদ দিয়ে দিলেন– তিনি হয়েছিলেন তার জন্য বোঝাস্বরূপ। তার জন্য কোনো স্থানই ছিল না। মুর্তজা যে আসনটিকে প্রথম নির্বাচনে চেয়েছিলেন, সেই পিএস-২০৪ আসনটি যা ছিল ভুট্টো

www.pathagar.com

পরিবারের লারকানার আসন, সেখানে জুলফিকার নির্মাণ করেছিলেন পরিবারের বাড়ি, যা পরে হয়েছিল মুর্তজার বসতবাটি, সেই আসনটি দেয়া হয়েছিল মুনওয়ার আব্বাসি বলে একজন নবাগতকে। স্থানীয় লোকজন তাকে জমিদার বলে জানে। জেনারেল জিয়া প্রথমবার যখন লারকানা পরিদর্শনে যান, তাকে এই ব্যক্তিই সংবর্ধনা দিয়েছিলেন।

মুর্তজা সিদ্ধান্ত নিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন। তিনি তার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন। একথা সত্য, গোয়েন্দা বাহিনীর ইশারা ছাড়া পাকিস্তানে কিছুই ঘটে না। বেনজির পরিবারে তার ঘনিষ্ঠজন সনাম এবং কিছু বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনকে নিয়োজিত করলেন মুর্তজাকে নির্বাচন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য। গোয়েন্দারাও এবার বুঝে ফেলল ভুট্টো পরিবারের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিষয়টি। তাদের পরিবারের প্রভাব কতটুকু আছে জানি না, তবে তাদের সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে তাদের বিরোধীপক্ষের কাছে। বেনজির মনে করতেন তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে সব সময় উচ্চ রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই বিষয়ে সেই উচ্চ-রাজনৈতিক শক্তি মুর্তজার উপর কোনো প্রভাবই খাটাতে পারল না, আর সেটা তারা কখনো পারেনি। এটি ছিল মূলত তাদের ভুল। মুর্তজা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যদি জয়লাভ করি তবে আমরা পাকিস্তানে যাব, নতুবা দামেস্কতেই থেকে যাব।

১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে ঘিনওয়া পাকিস্তানে গেলেন নির্বাচনে মুর্তজার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত জমা দেয়ার জন্য। আব্বা ও আমি দামেস্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গেলাম মধ্যরাতের করাচির ফ্লাইটে তাকে উঠিয়ে দেয়ার জন্য। আব্বা ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আম্মাকে এ-সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তিনি আলী ছিংগোরো নামের একজন দলীয় পুরাতন কর্মীর সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎ করতে বললেন। এই কর্মী একসময় বেনজিরের নিরাপত্তার কাজে ছিলেন পরে বেনজির তাকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। আব্বা আম্মাকে বললেন যে, তিনি একজন খুবই শক্ত লোক তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

আম্মা সকালবেলা জিন্নাহ বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। তারা সমবেত কণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছিলেন, জুলফি স্লোগানের শব্দে ভয় পেয়েছিল। আমরা টারমাক থেকে জুনামের গাড়িতে চড়ে সরাসরি লেয়ারিতে গেলাম। সেখানে নিহত কর্মীদের পরিবারদের শোক জানালাম:... এটাই ছিল আমার পাকিস্তানের শোক সংস্কৃতির সাথে পরিচয়....(এরপর করুণ হাসি হাসলেন, এরপর একটু থেমে বললেন, আমরা শোকের সংস্কৃতির সাথে আরো গভীরভাবে পরিচিত হলাম।) প্রথমে নির্বাচনের প্রার্থীতার কাগজপত্র লেয়ারিতে জমা দেয়া হলো। স্থানীয় মহিলারা নাচ-গানের মাধ্যমে আম্মাকে সম্মান জানালেন। সেখান থেকে তিনি সিন্ধুর সবচেয়ে গরীব অঞ্চল দাহুবাদিন ও থাট্টা গেলেন এবং তার স্বামীর প্রার্থীতার কথা জানালেন। সারা পথে জনতার ভিড় থাকার কারণে ছয় ঘণ্টার পথ পার হতে সময় লাগল আঠার ঘণ্টা।

দুই সপ্তাহ নির্বাচনী কাজে কঠোর পরিশ্রম করার পর জুলফিকে নিয়ে আম্মা দামেস্ক ফিরে আসলেন। আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পনের দিন পর আমরা আবার মিলিত হলাম। এরপর শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রচারণা। আব্বা আমাকে তার ফটো তুলতে বললেন। আমি সিন্ধুর জন্য নির্বচনী পোস্টারের ছবি তুললাম বিভিন্ন ভঙ্গিতে। কাজটি করতে পেরে আমি বেশ গর্ব বোধ করলাম। বন্ধুদেরকে বললাম যে, আমি দুই

সপ্তাহের জন্য পাকিস্তানে যাচ্ছি আব্বার নির্বাচনে প্রচারণার জন্য। যদি তিনি জয়লাভ করেন তবে আমরা সিরিয়া ত্যাগ করব। ওরা আমার এই কথার কোনো গুরুত্ব দেয়নি, কারণ আমি প্রায়ই বলতাম যে আমাদের দেশ পাকিস্তান এবং আমরা সেখানে চলে যাব (সিরিয়ান উচ্চারণ 'বাকিস্তান')। অবশ্য ওরা সবাই আমাকে সিরীয়ই মনে করত।

পাকিস্তানে আমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে লাগলাম। দিনে একুশ ঘণ্টা গাড়ি চলল, মাঝখানে পথে থামল ছোট শহর বা গ্রামে। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে আমরা বাজার বা জনপদে মানুষের সাথে কথা বলতাম আব্বার পক্ষ হয়ে। সে সময় আমি করাচির শহরতলী এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি লারকানায় গেলেও আমি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কখনো যাইনি। আমি জনতার উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য মাটির ঘরের ছাদে উঠলাম; সান্ত্বনা দিলাম সেই সমস্ত পরিবারকে, যাদের সন্তান বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যা করেছে, আমরা এমন বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলাম, যেখানে কোমো নাচ-গান ছিল না, ছিল রাইফেলের গুলি ছোড়াছুড়ি। আমরা খাবার খেলাম খুবই সাধারণ প্লেটে, আর সেখানে মাছি ছিল। থাট্টায় এক রেস্ট হাউজে যে ঘরটিতে আমাদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছিল সে ঘরের সিলিং-এ টিকটিকি হাঁটছিল। আম্মা ও আমার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো, যাতে আমাদের মুখের ওপর টিকটিকি না পড়ে। যে গোসলখানায় আমি দাঁত ব্রাশ করতে গেলাম, পানির বালতিতে ছোট ব্যাঙাচি। আমি পাশের দরজায় গিয়ে জুনামকে বিষয়টি জানিয়ে তাকে সাবধান করে দিলাম। তিনি বললেন, আমাদের ভাগ্য ভালো যে এখানে পানি আছে।

প্রতিদিন জনসভা ও সমাবেশে জুনাম উর্দুতে বক্তৃতা দিতেন। আম্মাও উর্দুতে লিখিত বক্তৃতা দিতেন। তিনি নিজেই উর্দুতে লিখতেন, কারণ আরবি ও উর্দু বর্ণমালায় কোনো পার্থক্য নেই। তিনি প্রত্যেকটি বক্তৃতা দিতেন সাহসিকতার সঙ্গে এবং নিজে চিন্তা করে। আমাকেও কেউ কেউ উৎসাহিত করলেন বক্তব্য রাখতে। আমি তখন জ্বর, গলাব্যাথা ইত্যাদিতে ভুগছিলাম। তবু একটি সভায় অল্পকথায় কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। পরে তিন বছরের ভুট্টো আমাকে নকল করে 'জয়ভুট্টো' বলতো। আমি তার কাণ্ড দেখে হাসতাম এবং আম্মার দিকে তাকাতাম। এরপর থেকে আমি হয়ে পড়লাম তার অবলম্বন। এরপর থেকে আমি ওকে মঞ্চে উঠিয়ে দিয়ে মাইকের কাছে নিয়ে যেতাম, সে শিশুসুলভ উর্দু ভাষায় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলত। আমি রক্ষা পেতাম।

রাস্তায় আমরা প্রচারণার জন্য সিন্ধী পল্লী সঙ্গীত মুখস্ত করতাম– যা ছিল আব্বার উপর নতুন কথা সংযোজন করা। ওই দীর্ঘ ভ্রমণের সময় আমরা একত্রে জড়াজড়ি করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। একবার আমরা গাড়িতে করে বিভিন্ন সমাবেশে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ জুনামের একটি নির্বাচনী ব্যানারের দিকে নজর পড়ল। তিনি চালককে আদেশ দিলেন গাড়ি থামাতে। তিনি দ্রুত গাড়ি থেকে নামলেন এবং সোজা গেলেন সেই দোকানের মালিকের কাছে, যেখানে গাঢ় নীল রঙ-এর ব্যানার ঝোলানো হয়েছিল। জুনাম চিৎকার করে উঠলেন, এ সমস্ত কি? রাগে তার হাত কাঁপছিল। ব্যানার লাগিয়েছিলেন মুনওয়ার আব্বাসী, যাকে বেনজির তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে লেখা ছিল, জুলফিকার আলী ভুট্টোর সৈনিক মুনওয়ারকে ভোট দিন। সে ভুট্টোর ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেকে ভুট্টোর সৈনিক বলে দাবি করছে? দেখে জুনাম বিবর্ণ হলেন। তিনি দোকান মালিকের কাছে যেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। আমর মনে হয়েছিল যে তিনি তাকে

মারবেন। দোকানদার হতভম্ব হয়ে পড়ল। আসলে সে এর জন্য দায়ি ছিল না; তবু সে চুপ করে রইল। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন তার কন্যার উপর, দলের উপর, কারণ তিনি তার একমাত্র জীবিত পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় মুর্তজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়। পিপিপি তাকে সন্ত্রাসী বলে প্রচার করে। বলা হয় যে, তিনি বিদেশে বিলাসী জীবন-যাপন করছেন এবং নির্বাচনে জিতলেও দেশে ফিরবেন না।

তবে আমাদের প্রচারণা চলছে নির্ভিকভাবে। দল এবং পরিবারের মধ্যে বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও মুর্তজার জয়লাভের সম্ভাবনা বেশ ভালোভাবেই দেখা গেল।

মালিরের একজন দলীয় কর্মীর বাসায় বসে মাওলা স্মৃতিচারণ করছিলেন, 'আমরা টি-শার্ট তৈরি করেছিলাম নির্বাচনী প্রচারের কাজে, এর মাঝখানে ছিল মুর্তজার মুখের ছবি। সেগুলো ছিল সাধারণ সাদা গেঞ্জি, মাঝখানে ছিল ছবি। একদিন যখন করাচির নিস্তার পার্কে পিপিপি'র সমাবেশে যাচ্ছিলাম লোকজন আমাকে থামিয়ে দিল এবং বলল, 'মাওলি, তুমি কি মার খেতে চাও?' 'আমি বললাম, 'কেন, আমি মার খাব কেন? আমরা শুধু তার মুখ দেখাচ্ছি, আজ আমরা এখানে তাকে স্মরণ করছি, সংবাদ মাধ্যম দেখুক যে সাধারণ কর্মীরা মুর্তজাকে সমর্থন করে।' এভাবে আমরা সমাবেশে গেলাম। পার্কের প্রবেশ পথে পুলিশ আমাদেরকে থামিয়ে দিল– তারা বলল যে, আমরা ভিতরে যেতে পারব না, কারণ আমরা 'মুর্তজার লোক। আল-জুলফিকার'। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে পুলিশ ও প্রশাসন আমাদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করছে, যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। তাই, আমরা বেনজিরের অপেক্ষায় পার্কের বাইরে অবস্থান করলাম। তার গাড়ি কাছে আসার পর আমি তার সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম এবং জানালা দিয়ে কথা বলে বিষয়টি তাকে জানালাম। বললাম, 'সাহেবা ওরা তো আমাদেরকে ভিতরে যেতে দিচ্ছে না।' তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং শান্তভাবে বললেন, 'তোমরা যদি এই ছবি ধারণ কর তবে নিজেদের সমাবেশে যাও, আমাদের এখানে এসো না।' মাওলা বক্র মাথা নাড়লেন, 'আমি কখনো তার সেই কথাগুলো ভুলব না, কখনো না।'

নির্বাচনের দিন আব্বা দরজা বন্ধ করে তার দামেস্কর অফিস ঘরে বসেছিলেন। তার সামনে ছিল দুটো ফোন, তিনি সাদা কাগজে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লিখছিলেন। তার মধ্যে ছিল চাপা উত্তেজনা। আমাদেরকে কোনোরূপ শব্দ করতে দেয়া হলো না; বাইরে থেকে কোনোরূপ শব্দ তার কামরায় গেলে তিনি বের হয়ে এসে চোখ রাঙিয়ে আমাদেরকে শান্ত হতে বলছিলেন।

কোনো নির্বাচন কেন্দ্রেই আব্বার কোনো পোলিং বাজেট ছিল না। ভোট কারচুপির বিরুদ্ধে কোনো প্রাথমিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল না, কোনো কর্মীই অনিয়মের বিরুদ্ধে নালিশ করেনি, কোনোরূপ মনিটর করা হয়নি। জুনাম তিনদিন শত শত লোকের বাড়ি যেয়ে তাদেরকে অনুরোধ করেছেন, তারা যেন তার ছেলেকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন, যাতে সে দেশে ফিরতে পারে। বেনজিরের দলের মিথ্যা ও বিভ্রান্তকর প্রচারণার ফলে ভোটের কয়েক দিন আগেও অনেক ভোটার বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, জুনামের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কারণ স্রোত সঠিক পথে দিয়ে আনার।

বিকেলের দিকে আম্মা ও আমি রান্নাঘরে খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলাম। ফলাফল যাই

www.pathagar.com

হোক না কেন কিছু বন্ধু-বান্ধবকে রাতের খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমরা কোনো উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম না, তবে পরাজিত হয়ে ক্ষুধার্ত থাকবো, এমন কোনো কথাও ছিল না। আম্মা চুলার দিকে ঝুঁকে ছিলেন এবং আমি তার কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম এবং উচ্চস্বরে শব্দ শোনার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি জিয়ার বিমান দুর্ঘটনার সময় যেমন জোরে আওয়াজ শুনছিলাম, তেমন আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন চুলা বিস্ফোরিত হয়েছে। মনে হচ্ছিল, আমার হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসেছে। আব্বা দৌড়ে রান্নাঘরে গেলেন। তিনি লারকানা থেকে জিতেছেন, এটি তার পিতার নির্বাচনী এলাকা। এখান থেকে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন। এই আসনের প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র ও উত্তপ্ত। আমরা একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করতে লাগলাম। আমরা এখন স্বদেশে যাচ্ছি। এরপর লোকজন আসা শুরু করল। আমাদের ছোট দুই শোবার ঘরের ফ্ল্যাট গান-বাজনা আর বন্ধুদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি জিতেছেন, এটিই বিষয়।

www.pathagar.com

১৭

ষোল বছর নির্বাসন জীবনে চুপ থাকার পর মুর্তজা এখন সকলের দৃষ্টিতে পিপিপি-র উত্তরাধিকারী হওয়ায় সারা গ্রীস্মকাল তিনি পাকিস্তানের সাংবাদিক যারাই সিরিয়ায় এসেছেন তাদেরকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং তার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি অনেককে ফোনে বলেছেন এবং ফ্যাক্স মারফত জানিয়েছেন। প্রথমদিকে আল-জুলফিকার ও ভুট্টো ভাইদের সংগ্রামের কথা লিখতেই বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যম আকৃষ্ট হতো। এই ছিল একটি শেকলবাধা বলের মত, যা দিয়ে মুর্তজার নাম এবং খ্যাতিকে আটকে রাখা যায়। তার বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের যে সমস্ত অভিযোগ এসেছিল, তিনি সেগুলোর জবাব দেন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে।

'জনগণের সম্মতি ছাড়াই যে শক্তির আগমন ঘটে এবং শাসনতন্ত্রের ব্যত্যয় ঘটায়, সংসদ সদস্যদেরকে কারাগারে আটক করে, জনগণের প্রতিনিধিদেরকে হত্যা করে, সে শক্তিকে জনগণ প্রতিরোধ করবেই। এটি তাদের নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব। যে শক্তি তাদের ইচ্ছাকে নষ্ট করে, তার প্রতিরোধ করা তাদের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব।' বারবার মুর্তজা সাক্ষাৎকারে এ কথা বলতেন।

> 'আমি সব বিষয়েই বলতে প্রস্তুত আছি। আমি কখনো আমার জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি জনগণের সঙ্গে বসবাস করতে ভালোবাসি। তাদের স্বার্থে আমার ভাই মৃত্যুবরণ করেছে। বাধ্য হলে, আমি বরং সিরিয়ায় থাকব এবং মৃত্যুবরণ করব, তবু আপোস করব না। আমি আমার কাজের জন্য লজ্জিত নই। যে তিন ব্যক্তি পিআইএ-র বিমান ছিনতাই করেছিল তারা তা করেছিল রাজনৈতিক কারাবন্দিদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। কাবুলে বিমানের ককপিট থেকে লেজ পর্যন্ত ১০০টি ছোট বিস্ফোরক তার দিয়ে সংযোজিত ছিল। ওরা বিমানটি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল। আমি ছিনতাইয়ের বিপক্ষে, যাত্রী পণবন্দি করার বিপক্ষে। আমি হস্তক্ষেপ করে ১০০ জনের বেশি ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেছি। আপনারা আমাকে এজন্য কৃতিত্ব জানান না কেন? বলা হয় যে, মুর্তজা বিমান ছিনতাই করেছে, কিন্তু কেন বলা হয় না যে সে বিমানে আরোহী ১০০ জনের বেশি নির্দোষ যাত্রীকে রক্ষা করেছে?'

প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তির বিরোধীতা ও সংবাদপত্রগুলোর মুর্তজার বিরুদ্ধে প্রচারণা সত্ত্বেও নির্বাচনে লারকানা থেকে তার জয়লাভ ঠেকাতে পারেনি। ১২ আগস্ট, তিনি পাকিস্তানি

www.pathagar.com

ডেইলি নিউজকে বললেন, 'আমার দেশে ফেরা ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। যদি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করে, আরও একজন ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারে, কিন্তু তারা কি আমার ছেলে জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও ফাঁসিতে ঝুলাবে? সারাদেশের শত শত জুলফিকার আলী ভুট্টোকে কি তারা ফাঁসি দেবে?

যখন তিনি এ ধরনের কথা বলতেন, আমার খুব খারাপ লাগত। এতে মনে হতো ভাগ্যের উপর সবকিছু সমর্পণ করা হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসকে স্মরণ করে। পত্রিকাটি লিখেছে, মুর্তজা যখন কথা বলছিলেন 'তার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। তিনি স্বদেশে ফেরার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব তিনি তার এই স্বপ্নকে সফল করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দুই সপ্তাহ পর আর একটি লেখায়, 'মুর্তজা করাচিতে ফিরবেন, ভাগ্যে যা থাকুক না কেন', এর সাথে ছিল বেনজির সরকারের দুর্নীতির বিষয়ে মুর্তজার অভিযোগ। মুর্তজা বেনজির প্রশাসনের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদের সঙ্গে এটিও মন্তব্য করেছিলেন যে, সিন্ধুর সুবিধা বঞ্চিত জনগণের সংসদে যাওয়া উচিত। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বেনজির সরকার মুর্তজা সম্পর্কে নানারূপ অপপ্রচারমূলক কাহিনী প্রচার করতে শুরু করে। মুর্তজা সাক্ষাৎকারে নিজেকে সম্পূর্ণ সৎ বলে দাবি করেন; সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে, বেনজিরের স্বামী জারদারির অর্থ লিপ্সা তাকে মি. টেন পার্সেন্ট খেতাবে ভূষিত করেছে, এভাবে চলতে থাকলে দ্বিতীয় আমলে তিনি 'মি. ফিফটি পার্সেন্ট' খেতাব পেতে পারেন। মুর্তজা হাসি-তামাশার মাধ্যমে এ সমস্ত কথা বলেন।

সংবাদপত্রগুলো দু'মুখো নীতি অবলম্বন করল, একদিন লিখল যে মুর্তজা ফিরে এসে আবার পাকিস্তানের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করবে; আবার পরের দিন সম্পাদকীয়তে মন্তব্য এলো যে তিনি পাকিস্তানে হারানো স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং পাঠকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, মুর্তজা তের বছর বয়সেই পিপিপি'র চার-আনা সদস্য হয়েছিলেন।

আব্বা ও নভেম্বর সিরিয়া ত্যাগ করলেন এবং আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। একমাস পর যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষা বছর শেষ হয়। সুহেল দীর্ঘ নির্বাসন জীবনে তার স্ত্রীকে হারিয়েছেন। দুই পুত্র বিলাল ও আলীকে নিয়ে তিনি দামেস্ক আসলেন এবং দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিলেন। আমরা একত্রে স্বদেশে ফিরব। আমাদের সবার মধ্যেই একটা উন্মাদনা দেখা দিল। দামেস্কে বসতি স্থাপন করার পর থেকেই আমরা মানসিকভাবে স্বদেশে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। একদিন বিকেলবেলা আম্মা আমাকে একটি স্যুটকেস এনে দিলেন এবং বললেন আমি যেন আমার জিনিসপত্র এর মধ্যে রাখি। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ভাগ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বললেন। আমি বই দিয়ে স্যুটকেসটি ভর্তি করলাম। এরপর আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম কাপড় রাখার জন্য আমি আরও একটি ব্যাগ পেতে পারি কি না। আমি সকল বন্ধুদেরকেই বলতে শুরু করলাম যে, আমরা চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি। তারা খুব দুঃখ পেলেও আমি খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাতাম। 'আমিও দেশে ফিরে যাচ্ছি' আব্বা বলতেন। আমাদের কথা শুনে তার উৎসাহ বেড়ে যেত।

www.pathagar.com

যাবার কয়েকদিন আগে মুর্তজা প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের সঙ্গে দেখা করে তার দেশের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তিনি ছিলেন একজন সহৃদয় অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি এবং ভুট্টো পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু। বেনজির যখন তার প্রথম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছিলেন, তাকে অনেক জাঁকজমকের সঙ্গে অভ্যর্থনা দেয়া হয়েছিল এবং সম্মান দেখানো হয়েছিল। আব্বা ফুফুকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য আমার বার্ষিক বসন্তকালীন কনসার্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন, তাতে আমি মনে কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি ফুফুকে দেখে খুব উৎফুল্ল হয়েছিলাম। এবার তিনি আমাদের ছোট বাসায় ওঠেননি, তিনি অবস্থান করেছিলেন নগরীর উঁচু পাহাড়ে প্রেসিডেন্টের অতিথিশালায়।

ফুফু আসার পর আমি তার সাথে একদম আঠার মত লেগে ছিলাম, তার কোলে যেয়ে বসলাম এবং নাক দিয়ে তার কাঁধে ঘষা দিলাম। তার ঘাড় ও গলায় তিল গুনতে লাগলাম, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হিজাব পরার কারণে কিছুটা অসুবিধা হলো।

ফুফু আমার জন্য একসেট বিশ্বকোষ এনেছেন, যা ছিল একদম উপযুক্ত উপহার। আসিফ আমার জন্য এনেছেন চব্বিশটি বারবি পুতুল, ওই বছরের সম্পূর্ণ সিরিজ। আব্বা জারদারির দেয়া উপহারের তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি বাড়ি এসে আম্মাকে বললেন, সেকি আমার পরিবারকে কিনতে চায়? আমাকে একটি বারবি রাখতে দেয়া হলো। অবশিষ্টগুলো স্থানীয় এতিমখানায় দান করা হলো। আব্বা জারদারিকে এর আগে একবার কিংবা দু'বার দেখেছেন। এবার তিনি তার আসল রূপ দেখতে পেলেন।

প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ বেনজিরের সম্মানে এক রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন। খাবার পরিবেশন করার সময় আমি নিজের আসন ছেড়ে ফুফুর কোলে যেয়ে বসলাম। তার আসন ছিল প্রেসিডেন্টের পাশে, আমার আনুষ্ঠানিকতা ভাঙার কারণে প্রেসিডেন্ট হাসলেন এবং আমার মাথায় হাত রেখে কৌতুক করলেন। তিনি দোভাষির সাহায্যে জেনে নিলেন, আমি কোন গ্রেডে পড়ি এবং আমি তা পছন্দ করি কি না। আম্মা চেয়েছিলেন যে আমি যেন আমেরিকান স্কুলে প্রাচীন আরবী ভাষার ক্লাস করার সুযোগ পাই। কিন্তু আব্বার যুক্তি হলো, আমরা যেহেতু অল্পদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে যাচ্ছি, তাই আরবী শেখার প্রয়োজনীয়তা নেই। (সাধারণভাবে ভুট্টোদের ইংরেজি বাদে অন্য ভাষার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। যদিও আব্বা খুব সুন্দর সিন্ধি ও উর্দু বলতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাকে এই দুটো ভাষার কোনো শব্দই শেখাননি। আমার ফুফুরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলেন শুধুমাত্র ইংরেজিতে। অবশ্য জুনাম তার সন্তানদেরকে প্রাথমিক ফার্সি ভাষা শিখিয়েছেন এবং তিনি নিজে খুব ভালো ফার্সি বলতেন। আম্মা আমার এই পরিস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, আমি যেন স্কুলে অ্যাডভান্স আরবী ক্লাস করি।)

দোভাষী ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেয়ার আগেই আমি প্রেসিডেন্টের প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি এবং সরাসরি উত্তর দিয়েছি। আমাদের সরকারি সাহায্যকারীকে মনে হয়েছে অপ্রস্তুত, অস্থির। আমার পিতামাতা প্রথমদিকে আমার ব্যবহার উপভোগ করছিলেন পরে আমাকে নিজের আসনে আসতে ইশারা করেছেন। কিন্তু আমি তাদের কথা গ্রাহ্য করি নাই। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে খোশগল্প করছিলাম এবং ফুফুর পাউডার মিশ্রিত সুগন্ধযুক্ত ঘাড়ে

www.pathagar.com

নাক ঘসছিলাম। আমার মনে আছে, সে রাতে প্রেসিডেন্ট আসাদ ছিলেন খুব আন্তরিক ও লৌকিকতা বর্জিত। ফুফুও তাই। তিনি অত্যন্ত আদর করে সারা সন্ধ্যাবেলা আমাকে কোলে বসিয়ে রাখলেন।

* * *

প্রেসিডেন্ট আসাদ মুর্তজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি আপনাদেরকে ভালভাবে যত্ন করিনি?' মুর্তজা তাদের বিদায় সংবর্ধনা সভায় একথার জবাবে বললেন যে, তিনি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে প্রয়োজনের সময় যে সহায়তা ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তখন আসাদ বললেন, 'তবে আপনাকে চলে যেতে হবে কেন?' বস্তুত আসাদ মুর্তজাকে পিতৃসুলভ স্নেহ করতেন। মুর্তজা বললেন দেশে তার কর্তব্য আছে, এজন্য তিনি ফিরবেন। আবার আসাদ প্রশ্ন করলেন, 'এত তাড়া কিসের জন্য?' এটি একটি ভালো প্রশ্ন। মুর্তজা বললেন, তাকে তো দেশে ফিরতেই হবে। প্রেসিডেন্ট আবার বললেন, যদি একান্ত ই আপনি থাকতে না পারেন, তবে আপনার ফিরে যাবার সময় আমার কিছু সাহায্য গ্রহণ করুন। তিনি মুর্তজাকে প্রেসিডেন্টের পে-ন ব্যবহার করার অনুরোধ করলেন। কারণ তিনি জানতেন যে সামনের দিনগুলোতে মুর্তজার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

আব্বা উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুহেলের তার এক সহকর্মীর সাথে করাচি যাওয়ার কথা ছিল। পরে এই পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে।

২ নভেম্বর রাতে আমাদের ফ্ল্যাটে লোকজন দ্বারা ভর্তি ছিল। বহু লোক এসেছিলেন তাকে বিদায় দিতে। এটা কোনো দুঃখের সাথে বিদায়ের বিষয় নয়, বিদায়কালে হাসি, গান আর আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। এটি ছিল একটি আবেগঘন রাত। ঘিনওয়া তার স্বামীকে বললেন, 'অবশেষে তুমি পথ করে নিলে?' কিন্তু একথায় মুর্তজা জোরে হেসে উঠলেন না। স্মিত হাসি দিয়ে বললেন, 'না, আমি কিছুই করতে পারিনি। যদি পারতাম, তবে আজ ভিন্ন রূপ হতো।'

পরদিন সকালবেলা আমি কেঁদে উঠলাম। আমার সঙ্গে আমার পিতার ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বেশি। তার প্রতিবারের যাত্রার সময় আমি দুঃখবোধ করি, আর এবার আমার আবেগ শতগুণ বেড়ে গেল। মন ভালো না থাকায় সেদিন স্কুলে গেলাম না। আমি আম্মার সঙ্গে বাসায় থাকতে চাইলাম। সুহেল কাকা খবর শুনতে লাগলেন। যার ফলে আমি জানতে পারলাম যে আব্বা ভালো আছেন। আগের রাতে আব্বা একদম ঘুমাতে পারেননি, আমার চোখের জল মুছে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'সাহসী হও।' 'তুমি তো গ্রেফতার হতে যাচ্ছ,' আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও খবর আমাদেরকে এভাবেই উদ্বিগ্ন করে রাখে।

তিন দিন আগে এমন একটি কথা ছড়িয়ে পড়ছিল যে, মুর্তজা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং তা জামিনযোগ্য হবে না। অন্য একটি নিবন্ধে তার সহায়ক হিসেবে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তিনি একজন সংসদ সদস্য, তাই আগাম জামিন নিয়ে নিতে পারেন, যদি তিনি আবেগের বশে জেলে যেতে না চান।

কাজেই, আব্বা যে গ্রেফতার হবেন, তা আমরা একপ্রকার ধরেই নিয়েছি। তিনি কিছু

www.pathagar.com

ম্যাগাজিন সঙ্গে নিয়ে গেলেন– তার প্রিয় ম্যাগাজিন নিউজ উইক, দ্য-ইকোনোমিস্ট এবং ভ্যানিটি ফেয়ার– সেগুলো তিনি জেলে অবস্থানকালে পাঠ করবেন। তিনি চিঠি লেখার জন্য কলম ও কাগজ সঙ্গে নিলেন। যাতে কারো সাহায্যে ফ্যাক্সের মাধ্যমে আমাকে পাঠাতে পারেন। এটি তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন– এবং সঙ্গে কিছু বই থাকবে তাকে সাহচর্য দেয়ার জন্য। জেলে যাওয়ার বিষয়টিকে তিনি খুব হালকাভাবে নিলেন; আমি নিশ্চিত যে, আমি যেন ভীত হয়ে না পড়ি, সেজন্যই তিনি এরূপ হালকাভাবে বিষয়টিকে দেখালেন।

আব্বা বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর আমি বিদ্যালয়ের পথে রওয়ানা দিলাম। সেদিন ছিল ডিসিএস-এ অবস্থিত আমেরিকান স্কুলগুলোর টুর্নামেন্ট; তাই আমাদের সকালের ক্লাসগুলো বন্ধ ছিল টিমকে উৎসাহ দেয়ার জন্য। আমি ক্যাম্পাস গেইটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠবন্ধু নোরাকে দেখতে পেলাম। সে ছিল চুপচাপ। সে বলল, 'তিনি যেভাবে গেলেন, যেন ঠিক সেভাবে ফিরে আসতে পারেন।' নোরা অর্ধেক মার্কিনী, অর্ধেক সিরিয়ান; সে বলল যে, সনাতন রীতি অনুযায়ী এভাবে বলা হয়। আমার খুব খারাপ লাগছিল। দিনের বেশিরভাগ সময় আমি আনমনা হয়ে স্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ভাবতে চাচ্ছিলাম আমার পিতার প্লেন উড়ে যাওয়ার দৃশ্য, কোথায় আছেন কি ভাবে যাচ্ছেন। একজন শিক্ষক বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে আমার পিতার দেশে ফিরে যাওয়ার সংবাদ শুনেছেন। তিনি বললেন, 'তোমার পিতা তো ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।' আমি নোরার পাশে দাঁড়িয়ে নিরবে তার কথা শুনলাম। তবু আমি সারাদিন অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

হাফেজ আল আসাদের প্রেসিডেনশিয়াল বিমানটি পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশ থেকেই চলাচলের অনুমতি পেল। ইসলামাবাদে অবস্থানরত সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অফিসে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সরকার এই প্লেনকে অবতরণের অনুমতি দিল না। আসাদ জানতেন যে বেনজির একজন ক্ষুদ্র মনের লোক, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন তিনি মুর্তজাকে বিমান দিলেন, এর ফলে সিরিয়ার সঙ্গে বেনজির সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্কের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে জেনেও। হয়তো বা ওই কারণেই বিমানটি দিয়েছিলেন। পরিশেষে বিমানটি দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে আমিরাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুর্তজাকে অভ্যর্থনা জানালেন; ব্যবস্থাটি করে দিলেন প্রেসিডেন্ট আসাদ এবং সেখানে থেকে ইথিয়োপিয়ান এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইটের মাধ্যমে দেশে ফিরলেন মুর্তজা।

সুহেল স্মৃতিচারণ করলেন, 'বিষয়টি ছিল খুবই জটিল। সেদিন আমি চব্বিশ ঘণ্টা ফোনে কথা বলেছিলাম। মুর্তজাকে করাচি যাবার সংযোগকারী ফ্লাইট ধরতে দারুণ প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। তৃতীয় দিন জিন্নাহ বিমানবন্দরে খুব ভিড় জমেছিল। মুর্তজার সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল তখন খুব কঠিন লোকজন সকাল থেকেই তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। আমির রেহমান, একসময় বেনজিরের দলের কর্মকর্তা ছিলেন, সেদিন সকাল থেকেই বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। যেখানে ছিল পাহারারত সৈনিক, পুলিশের গাড়ি, সামরিক বাহিনীর গাড়ি এবং ছিল আমাদের হাজার হাজার কর্মী, যারা বিমানবন্দরে এসেছে মীর বাবাকে অভ্যর্থনা জানাতে। কিছু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী অভ্যর্থনাকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার ভুল সংবাদ প্রচার করতে লাগল– বলা হলো ওই ফ্লাইটটি

www.pathagar.com

পুরানো করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। সেখানে যাওয়ার পর খবর এলো যে, সেটি নতুন বিমানবন্দরে চলে গিয়েছে।

দামেস্কে আমরা শুনতে পেলাম যে, বিমানবন্দরে পুলিশ এসেছে। কেউ ধারণা করেনি যে, রাষ্ট্র এত শক্তি প্রয়োগ করবে। মুর্তজা একজন পাকিস্তানি নাগরিক। তিনি একটি বাণিজ্যিক বিমানে আসছেন এবং তিনি বারবার বলেছেন যে, তিনি তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আছে, তার মোকাবেলা করবেন। সুহেল বললেন, 'আমরা তার দামেস্ক থেকে করাচি যাত্রার বিষয়ে চিন্তিত ছিলাম না, আমরা চিন্তিত ছিলাম তার করাচি পৌঁছার পরের নিরাপত্তা নিয়ে। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মুর্তজার মাতা নুসরাত সারাদিন বিমানবন্দরে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তাকেও দলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। চারঘন্টা তাকে আটকিয়ে রাখা হলো। এরপর তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে পুলিশ কর্মকর্তা তাকে আটকাতে গিয়েছিলেন, তিনি তাকে কষে চড় দিলেন।

নুসরাত ছিলেন একজন শক্ত মহিলা, যিনি জিয়ার সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং একনায়কত্বের অন্ধকার দিনে লাহোর স্টেডিয়ামে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে বিমানবন্দরে ঢুকলেন এবং ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। পুলিশ তাকে আটকাতে ব্যর্থ হলো। যখন আগত কর্মীরা শুনলেন যে, পুলিশ বেগম সাহেবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠার উপক্রম হলো। কিন্তু পুলিশ প্রতিবাদকারীদের লাঠি ও টিয়ার গ্যাসের মাধ্যমে দমন করল। তারা এই বুঝাতে চেষ্টা করল যে মীর বাবা করাচি এসেছেন একা এবং সেখানে অভ্যর্থনাকারী কোনো সমর্থক ছিল না। কিন্তু, জনতা অপেক্ষা করতে থাকল তার দর্শনলাভের জন্য।

মুর্তজা যখন পৌঁছলেন তখন বেশ রাত। পুলিশ তখন আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। কয়েকজন কর্মীকে তাদের হেফাজতে নিয়ে গেল এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাগল, তবে জনতা প্রতিরোধ করল; বিমানবন্দরের দিকে ধাবিত পুলিশের গাড়িগুলোকে আটকাতে চেষ্টা করল। মুর্তজাকে করাচি বিমানবন্দরে নেমে একাই এগিয়ে আসতে হলো। নুসরাত অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আবেগে কেঁদে ফেললেন। মুর্তজা তার মাতাকে আলিঙ্গণ করলেন। এরপর পুলিশ তাকে উত্তর করাচির লান্ধি কারাগারে নিয়ে গেল। সেখানেই তিনি আটমাস থাকলেন।

যে সকল কর্মীরা করাচির প্রখর রোদে সকাল থেকে অপেক্ষা করেছিলেন, তারা কেউ সে রাতে মুর্তজাকে দেখতে পাননি; তাকে গোপনে পেছনের বহির্গমন পথ দিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাতাসের মধ্যে আনন্দোৎসবের সৃষ্টি হলো। অবশেষে তিনি এসেছেন মাতৃভূমিতে।

বেনজির দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে একটি ভিন্ন রকমের বিরোধী পক্ষের মুখোমুখি হলেন, সেটি তার ভাই। তিনি কোনো অস্পষ্ট বিরোধীদলের সদস্য নন; সেটি তার আপন ভাই। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভুট্টোর আসনের স্বীকৃত উত্তরাধিকারী। তার (বেনজিরের) ক্ষমতা হারানোর ঝুঁকি আছে এবং এই হুমকি এসেছে তার নিজের পরিবার থেকে।

মাওলা বক্সও জেলে গেলেন। বেনজিরের দ্বিতীয়বারের শাসনামলে মুর্তজার

www.pathagar.com

সমর্থকদের অনেককেই জেলে ঢুকানো হয়। তারা রাজনৈতিকভাবে এদেরকে ভয় করেন। মাওলা বক্স বললেন, 'আমরা সারাজীবন দলের জন্য লড়াই করেছি, তাই তারা আমাদের শক্তি জানেন। দুর্নীতির কারণে তাদেরকে আমরা ত্যাগ করেছি। তারা এতো বেশি দুর্নীতিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন যে, তাদের পক্ষ হয়ে বলার কিছু অবশিষ্ট ছিল না।'

অনেক বছর থেকে আমি মাওলা বক্স ও শাহনেওয়াজকে একসাথে দেখে আসছি। অনেক বছর জেলে থাকার পরও তারা ছিলেন প্রবল উদ্যমী। তাদের কথাবার্তাও ছিল জোরালো। তারা উভয়েই ছিলেন লম্বা, গর্বদীপ্ত শীদি বংশের অন্তর্গত, দুজনের মধ্যে শাহনেওয়াজ ছিলেন পাতলা এবং শান্ত। মুর্তজার আগমনের সময় পুলিশ যখন তাকে গ্রেফতার করেছিল, তখন তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি বললেন, 'আসলে মুর্তজা ভুট্টোর লোকজনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না।' তিনি আরও বললেন, 'রাজনৈতিক কারণেই আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে।' শাহনেওয়াজ একজন আইনজীবীকে নিয়োগ করলেন; যেহেতু তিনি বেনজিরের পিপিপি ত্যাগ করেছেন, তাই দলের প্রকল্পভুক্ত আইনজীবী থেকে তিনি কোনো সুবিধা পাননি। তাদের সহায়তা পেয়েছে বেনজিরের সমর্থকরা। যারা মূলত মাদক ব্যবসা জাতীয় কাজে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার হয়েছে।

যে সমস্ত ব্যক্তি বেনজিরের ক্ষমতায় আসার পূর্বে একনিষ্ঠতার সঙ্গে দলের কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ সংখ্যকই তার প্রথমবারের ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর দল ত্যাগ করে মুর্তজার পক্ষে কাজ শুরু করেন। এজন্য তাদেরকে কারারুদ্ধও হতে হয়েছে। শাহনেওয়াজ বললেন, 'করাচি সেন্ট্রাল জেল হাসপাতালে যেয়ে আমি আলী সোনারার সঙ্গে দেখা করতাম। আমরা যেন পরস্পর যোগাযোগ করতে না পারি সে কারণে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সেলে রাখা হতো। অসুস্থতার অজুহাতে একটা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে হাসপাতালে যেয়ে কারো সাথে দেখা করা যেত। যারা মীর বাবার বিরোধীতা করতে সম্মত হতো, তাদেরকে মুক্তি দেয়া হতো। অন্যদেরকে পুলিশ পেটাত। একসময় বেনজিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন আলী সোনারা, তিনি একদিন জেল হাসপাতালে আমাকে বললেন সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী গাউস আলী শাহ তাকে মন্ত্রণালয়ের একটি বড় পদ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তবে শর্ত ছিল যে তাকে প্রকাশ্যে মুর্তজা ভুট্টোর বিরুদ্ধে বলতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা, তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

মুর্তজার সমর্থকরা যে হারে কারারুদ্ধ হচ্ছিলেন, সে হিসেবে প্রস্তাবটি ছিল আকর্ষণীয়। শাহনেওয়াজ বললেন, '১৯৯৩ সালে আমাকে যে গ্রেফতার করা হয়, সেটি ছিল বেআইনী– আমাকে গ্রেফতার করার জন্য কোনো পরওয়ানাই ছিল না। পুলিশ জ্বলন্ত সিগারেট আমার সারা শরীরে চেপে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিয়েছে। তিনি কথা বলার সময় তার বাহুতে আমি সেগুলোর চিহ্ন দেখতে পেলাম। সেগুলো ছোট কাল কাল পোড়া দাগ। শাহনেওয়াজ বললেন যে, বেনজিরের দ্বিতীয় আমলে পরোয়ানাহীন গ্রেফতার, বিচারবিহীন আটক ইত্যাদি ছিল ব্যাপকহারে।

পুলিশকে ভাড়াটে বাহিনীর মতো ক্ষমতা দেয়া হয়; তাদের নির্দেশ দেয়া হয় আইন-কানুন বা বিচার-বিবেচনার তোয়াক্কা যেন না করে। আমি এখন বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। আগে আমি ভাবতাম কি কারণে এসমস্ত হচ্ছে? মানবাধিকার লজ্জিত, পুলিশ যাদের ধরে

www.pathagar.com

নিয়ে যায়, তারা আর ফিরে আসে না, পুলিশ নির্যাতন চালায়।

'শেষবার পুলিশ যখন আমাকে হাকিমের কাছে হাজির করেন, আমার চোখ তখন ঢাকা ছিল এবং আমাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল– শেকল দিয়ে আমার দুই পা ও দুই হাত তখন বাঁধা। তারা আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করলে, আমি জবাব দিতে অস্বীকার করে আমার চোখ খুলে দেয়ার দাবি জানালাম। তারা তা করে। আমি দেখলাম যে, বিচারক লম্বা দাঁড়িওয়ালা, কপালে দাগ, বোঝা গেল যে তিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন। আমার হাত দু'টি নির্যাতনের ফলে জর্জরিত। আমার পক্ষে নড়াচড়া করাই খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি মনে করেছিলাম যে, যেহেতু বিচারক একজন ধার্মিক ব্যক্তি তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। তাই আমি তাকে বললাম, 'কিভাবে পুলিশ আমার উপর নির্যাতন চালিয়েছে, জানি না, কতবার, তা গণনা করার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি।' আমি আমার বুকের আঘাত তাকে দেখাবার জন্য শার্ট খুললাম। এই হাকিম ধর্মপ্রাণ বিচারক কি বললেন, জান? তিনি বললেন যে, কোনো পরওয়ানা ছাড়ই বা কোনো অভিযোগ ছাড়াই পুলিশ আমাকে আরও দুইদিন আটক রাখতে পারবে। তিনি পুলিশকে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে বললেন, পরে আপনাকে আবার নিয়ে আসবো। অবশ্য, পুলিশ আর কখনো আমাকে সেখানে নিয়ে যায়নি।

এ সকল কাহিনী শোনার পর আমার কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, আমার সামনের এই লোকগুলো কিভাবে আমার পিতার অনুসারী হওয়ার কারণে আমার ফুফুর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। অল্প বয়সে আমি ভাবতাম, আমি যদি এভাবে নির্যাতিত হই, কীভাবে আমি তা সহ্য করবো। এখন এরূপ কাহিনী আমি শুনে অভ্যস্ত, মনে হয় যেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি এর যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না। আমি শুনেছি, কী কঠোরই না ছিল সেই নির্যাতন, যারা এর শিকার হয়েছিলেন, তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন।

বেনজিরের নতুন সরকারের প্রথম মাসে মাওলা বক্সকেও গ্রেফতার করে জেলে পাঠাল। আমি তাকে তার জেলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি পেছনের সেই বছরগুলোর কথা মনে করে হেসে উঠলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি দাবি করেছেন যে, আমি আমাদের অঞ্চল লেয়ারিতে কোনো এক মধ্যরাতে এক ব্যক্তিকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলাম। যে ব্যক্তিকে আমি আগের মধ্যরাতে রাত বারটায় হত্যার পরিকল্পনা করেছি বলে অভিযোগ, সে মৃত্যুবরণ করে মালিরে, সেই রাতে ১২-১৫ মিনিটে– আমার অবস্থান থেকে দুই ঘণ্টার দূরের পথ, সেই স্থান। আমি কি অতিমানব? কিভাবে আমি তা করলাম?' আমিও এবার তার সঙ্গে হাসলাম।

মাওলি বলতে থাকলেন, 'আমরা মীর বাবার সঙ্গে টাকার জন্য ছিলাম না। আমরা জেলে ছিলাম, আটক ছিলাম, কিন্তু তাকে ত্যাগ করিনি। আমাদের মধ্যে ছিল প্রীতির সম্পর্ক, সেটিই বেনজিরের লোকেরা সহ্য করতে পারত না। আমাদের কেনা যেত না। একদিন নাবিল গাবোল জেলে আমাকে দেখতে আসলেন।' (আমি নাবিল গাবোলকে চিনি। যখন আমি পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত উর্দু সাপ্তাহিকে কলাম লিখতাম, সেখানে আমি কিছু নিবন্ধ লিখেছিলাম তার লেয়ারিতে খাবার জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যর্থতা সম্পর্কে। সে সময়ে লেয়ারি পুরো গ্রীষ্মকাল ছিল বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায়। তিনি ছিলেন লেয়ারি থেকে

www.pathagar.com

নির্বাচিত একজন ব্যর্থ সংসদ সদস্য এবং বেনজিরের প্রথমবারের শাসনামলে তিনি প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছেন। বেনজিরের দ্বিতীয়বারের শাসনামলে গাবোলকে সিন্ধুর সংসদের ডেপুটি স্পিকারের পদে আসীন করা হয়েছিল)। এই ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ মাত্র আমার অস্বস্তি বোধ হয়। মাওলা বক্স আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকলেন এবং বললেন, তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'মাওলি, একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলুন যে, মুর্তজা ভুট্টোর নীতি ভাল নয়, তাই তাকে আমি ত্যাগ করছি।' আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কোন দরজা দিয়ে ঢুকে আপনি আমার সামনে এসেছেন?' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন যে 'ঘরে তো মাত্র একটি দরজাই আছে।' তখন আমি বললাম, 'ঠিক আছে, সেই দরজা দিয়েই বের হয়ে যান।' মাওলি সশব্দে হেসে উঠলেন। আমি তাকে খুব পছন্দ করি। তিনি সাহসী। তিনি সৎসাহসের প্রেরণা ছড়িয়ে দেন। তিনি এবং তার স্ত্রী তাদের অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে সুবিধাবঞ্চিত, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি আরও বললেন, ওরা আমাদের বন্ধু ও সহকর্মীদের অনেক টাকা দিতে চেয়েছে, অনেক নির্যাতন করেছে, কিন্তু তাদেরকে ফেরাতে পারেনি। আমরা সবাই বলেছি যে, মরে গেলে আমরা মুর্তজার জন্যই মরব, বেঁচে থাকলেও তার জন্যই বাঁচব, কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবো না। জেলাররা নিয়মিতই আমাদের গালাগালি করত। তারা বলত, 'আল-জুলফিকার' ছেলেরা সন্ত্রাসী। তারা আমাদের দেহে আঘাত করার সময় বিদ্রূপ করত, বলত 'তোমাদের নেতা মুর্তজা এখন তোমাদের জন্য এখন কি করবে?' এরা ছিল আমাদের পরীক্ষিত কর্মী, ওদের কাছে এই কর্মীদের তালিকা ছিল। যখন তারা দেখল যে, আমরা তাদের এত আঘাতেও যখন সাড়া দিচ্ছি না, তখন আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে কেটে মরিচ লাগিয়ে দিতো ঘায়ের মধ্যে।'

আমি বুঝি, কত কষ্ট হচ্ছে মাওলির, তার নিজের ও শাহনেওয়াজের এ সমস্ত লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করতে। আমি কথার ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো নোটবুকে টুকে নেই। তখন আমি তাদের দিকে তাকাই না। পাকিস্তানি সমাজ খুব সনাতন পন্থি, এ সমস্ত বয়স্ক লোকেরা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী অথচ তাদের অর্দ্ধেক বয়সের এক মহিলার দ্বারা তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আমি এ সমস্ত কাহিনী শোনার সময় নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করতাম, কিন্তু পারিনি, আমার মনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মাউলি ছিলেন সব সময়েই প্রফুল্ল, তিনি প্রায়ই সাক্ষাৎকারের মাঝপথে জেলে আব্বার সঙ্গে তার মুখোমুখি হওয়ার বর্ণনা দিতেন।

তারা উভয়েই ছিলেন লান্ধি জেলে, ৭০ ক্লিফটন থেকে দু'ঘন্টার পথ। আব্বাকে দেয়া হয়েছিল নির্জন-কারাবাস, অন্যদের কাছ থকে দূরে রাখা হয়েছিল এজন্য যাতে তিনি তার দলে অন্যদের ভেরাবার কাজ বা আলাপ-আলোচনা না করতে পারেন। তিনি বারবার চেয়েছেন অন্যদের সঙ্গে থাকতে, কিন্তু প্রতিবারই তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মাউলি বললেন, 'আমরা ছিলাম 'বি' শ্রেণী সেলে আর মীর বাবা ছিলেন নির্জন সেলে। একদিন তিনি তার দায়িত্বে থাকা দূররানী নামক একজন ওয়ার্ডেনকে আমাদের ব্লকে পাঠালেন, আমি ঠিকমত খাবার পাচ্ছি কি না এবং তা ঠিকমত খাচ্ছি কি না খবর নিতে। সেই ব্লকে অন্য দলের লোকেরাও ছিল তারা মুর্তজার এই মানবিক মূল্যবোধ দেখে মুগ্ধ

www.pathagar.com

হলেন। তারা তখন বললেন, 'আমরা তবে মুর্তজা ভুট্টোর দলে যোগ দিব।' আমি তখন বললাম যে, 'মীর বাবা সব সময় আমার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। একবার তিনি ৭০ ক্লিফটন থেকে আমার জন্য কিছু সালওয়ার-কামিজ পাঠিয়েছিলেন, যা তার নিজের জন্য কেনা হয়েছিল। বলা হলো, 'এগুলো মাউলি সাবের জন্য।' উপস্থিত সবাই চমকে উঠল; মুর্তজা ভুট্টোর পক্ষ থেকে আমার জন্য কাপড় ও খাবার পাঠানো হয়েছে; শুধু তাই নয়, আমাকে সাহেব বলা হয়েছে। তারা মনে করল যে আমি বোধহয় কোনো ধর্মীয় নেতা বা সে ধরনের কিছু– তারা বুঝতে পারেনি যে, মুর্তজা ভুট্টো একজন সাধারণ কর্মীর সঙ্গে কিরূপ ভালো আচরণ করেন।' মাউলি হেসে উঠলেন, আমিও তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম।

বেনজির বাইরে দেখাতে চান যে, তার সঙ্গে তার ভাইয়ের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, যদিও তিনি তাকে লাঞ্চির নির্জন কারাবাস ভোগ করাচ্ছেন। বেনজির ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ভান করে তাকে ৭০ ক্লিফটনে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে ঈদ উদযাপনের প্রস্তাব দিলেন। সেক্ষেত্রে ওই বাড়িটিকে সাময়িকভাবে সাবজেল বলে ঘোষণা করা হবে। আব্বা তার বোনের এই খয়রাতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, 'যদি সকল রাজবন্দিকেই এরকম সুযোগ দিয়ে তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের অনুমতি দেয়া হয়, তবে আমি প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সম্মত হব।' স্বভাবতই বেনজির তাতে রাজি হননি। খবরটি শুনে জুলফি, জুনাম ও আমি কিছুটা কৌতুকবোধ করলাম, আবার ভয়ও পেলাম, কারণ ঈদের দিন আমাদের বাড়িটি হবে 'সাব-জেল'। ব্যাপারটি দাঁড়াবে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আমাদের সবাইকে গৃহবন্দি করে রাখা হবে।

* * *

আমরা দামেস্ক থেকে করাচিতে এলাম ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, ৭০ ক্লিফটনে পৌঁছলাম রাতের বেলা। আমরা সব সময় আব্বা জেলে থাকায় চিন্তিত ছিলাম; তিনি ছিলেন নির্জন কারাগারে, ছোট্ট একটা সেলে। তিনি কৌতুক করে বলতেন যে, সেখানে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল টিকটিকি ও আরশোলার। তিনি একটি ম্যাগাজিনকে বলেছিলেন যে, নির্বাসনের পর দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার প্রবল, কিন্তু তিনি অনিশ্চিত ছিলেন সরকার এবং বোনের তার প্রতি প্রতিক্রিয়ার। অবশ্য তা দেখা গিয়েছিল তার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই।

> 'তখন আমার অবস্থা ছিল নিদ্রালু ও পরিশ্রান্ত; আমি ভাবছিলাম যে, এ অবস্থায় আমার উপর নির্যাতন করা হবে না। আমাকে সরাসরি জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে ধাতস্ত হতে কিছু সময় লাগলো। বাইরে রক্ষীরা উর্দুতে কথা বলছিল। অনেক বছর পর আমি অনুভব করি যে, বাইরে পাকিস্তানিরা আছে।
>
> আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে, আমি সিরিয়া বা অন্য কোনো দেশে আছি। পরে আমার মনে হয় যে, আমি তো এখন পাকিস্তানে আছি। অবশ্য পাকিস্তানে তো পাকিস্তানিরাই থাকবে।'

www.pathagar.com

আমরা যখন পৌঁছলাম, ৭০ ক্লিফটনের বাড়িটিকে মনে হলো শূন্য। জুনাম একাই এই বাড়িতে থাকতেন এবং প্রায়ই তিনি বেড়াতে যেতেন। তার একার পক্ষে এত বড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভবই হচ্ছিল না। এটি ছিল এক সময় প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান; এখানে কত অতিথিকেই না আপ্যায়ন করা হতো। আম্মা তার নিজের ও আব্বার জিনিসপত্র নিচতলায় অতিথি ঘরে রাখলেন। আব্বার পুরানো কামরা দেখতে আমি ছুটে উপরতলায় গেলাম। আমার আগ্রহ দেখে জুনাম আমাকে বড় মেয়েদের কামরায় পাঠাতে চাইলেন। আমি বেনজিরের পুরনো কক্ষে থাকতে ইচ্ছুক ছিলাম না। সেটি কাল রঙ দ্বারা রঞ্জিত করা। সেখানে ছিল মাত্র তিনটি বুক শেলফ সেগুলো ভর্তি ছিল মিলস ও বুনের কল্পকাহিনীর উপন্যাস দ্বারা এবং সেখানে আমার জিনিসপত্র রাখার জায়গা ছিল না। আমার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ঘরে পাঠানোর জন্য। আমি জুনামকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুফু এসে এ সমস্ত জিনিস নিয়ে যাবেন কিনা, কারণ আমি এ সমস্ত রাখতে চাচ্ছি না।

আমি করাচি আমেরিকান স্কুলে ভর্তি হলাম ষষ্ঠ গ্রেডের দ্বিতীয় সেমিস্টারে। বিষয়টি এখানে দামেস্কর মত নয়, সবাই এখানে আমার পরিচয় জেনে ফেলেছে। সবাই জানে যে, আমার ফুফু প্রধানমন্ত্রী এবং আমার পিতা জেলে আছেন। আমি আর এখন অখ্যাত কেউ নই। বিদ্যালয়টি ছিল অনেক বড় আকারের। আমার আগের বিদ্যালয়ের মতই এখানেও ছিল সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট এবং ফুটবলের মাঠ। আমি দামেস্কর আমার বন্ধুদের কথা খুব ভাবছিলাম, যতটুকু তাদের জন্য খারাপ লাগবে বলে মনে করেছিলাম, তার চেয়েও বেশি লাগছিল। অবসর সময় আমি সিরিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে প্রচুর কথা বলতাম, ফলে টেলিফোন বিল আসত বড় অঙ্কের।

করাচি পৌঁছবার কয়েকদিন পর অবশেষে আব্বার সঙ্গে দেখা হলো আদালতে। তাকে মার্কিন দূতাবাসের কাছে হাইকোর্টে হাজির করা হলো। নভেম্বরের প্রথম দিকে ভোরে তিনি আমাদের ছেড়ে এসেছেন, এরপর তার সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। আমরা জুনামের সঙ্গে গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। আমরা তখন অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ছিলাম, আম্মা ভালো জামাকাপড় পরেছিলেন, ওখানে আজ আমাদের একটি পারিবারিক মিলন ঘটবে জুনামসহ। কিন্তু আদালতে পৌঁছেই দেখলাম যে, চিত্র ভিন্ন রকমের। চারদিকে সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ ভিড় করেছে আব্বার সঙ্গে দেখা করার জন্য। অনেকে তার সঙ্গে ছবি তোলার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আমাদের জন্য তার কাছে বসার কোনো যায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা তার পেছনে বসে থাকলাম। আদালতের কাজের ধারা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আব্বা পরেছিলেন ধবধবে সাদা শালওয়ার-কামিজ। এরূপ পোশাকে আমি তাকে খুব কম দেখেছি। তিনি তার আইনজীবীর সঙ্গে একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে একই মামলার অন্য আসামিরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের হাত-পা শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি আগে কখনো এরূপ দৃশ্য দেখিনি। আব্বা এগিয়ে যেয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন আদালতের কাজের মধ্যেই। তিনি বাধা অতিক্রম করে তাদের কাছে এগিয়ে যেয়ে হাসি-ঠাট্টা করলেন।

শাহনেওয়াজ বেলুচ পরে আমাকে বলেছেন যে, আব্বাকে দেশে ফিরে আসার পর তিনি প্রথমে দেখতে পান আদালতে। সে সময় তিনিও বেনজির কর্তৃক কারারুদ্ধ ছিলেন,

www.pathagar.com

কোনো পরওয়ানা ছাড়াই এবং তাকেও জিয়ার আমলে ভুট্টো ভাইদের সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। শাহনেওয়াজ বললেন, 'তিনি আমাকে ভল্লুকের মত আঁকড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, শাহনেওয়াজ, আর চিন্তা করো না, আমি পিছনে আছি, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসল মুর্তজাকে দেখতে। এটি ছিল ক্ষণিকের দেখতে পাওয়া; আদালত ছিল অত্যন্ত নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য প্রবেশ সহজ ছিল না। হামিদের স্মরণ আছে যে মুর্তজাকে জিন্নাহ বিমানবন্দরে দেখতে বর্থ হয়ে তিনি এবং তার সঙ্গে অন্য কর্মীরা আদালতে তাকে দেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমরা আমাদের এলাকা মালিরে ছিলাম এবং আমরা গোলাপ ফুলের পাপড়ি কিনে নিয়ে আসলাম। যে রাস্তা দিয়ে তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে রাস্তার মাঝখানে ডান দিকে গাড়ি রাখলাম। আমরা এবার আর ব্যর্থ হতে চাইলাম না। আমরা ফুলগুলো পেছনের আসনে রেখে ঢেকে রাখলাম। যাতে পুলিশ বুঝতে না পারে, আমাদের সেখান থেকে সড়িয়ে না দেয় এবং গাড়ি থেকে নামিয়ে না দেয়। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। মীর বাবা পথ অতিক্রম করার সময় আমরা ফুলের পাপড়ি রাস্তায় ছড়িয়ে দিলাম এবং চীৎকার করে উঠলাম, 'জয় ভুট্টো, এবং তিনি আমাদের দেখলেন। তিনি আমাদের দিকে মুষ্ঠি উঠালেন। আমরা এই সঙ্কেতের অর্থ জানি। এর অর্থ শক্ত হও। এরপর আদালতে দেখা হওয়ার পর তিনি আমাকে আলিঙ্গণ করলেন এবং বললেন, 'হামিদ ভাই, আপনি এখানে কি নাম ব্যবহার করেন?' কথাটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হামিদও হেসে উঠলেন, তারপর আমাকে কাবুলের নামের বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। সেখানে যে তারা ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন।

আমরা সেদিন আদালতে আব্বার সঙ্গে মিলিত হতে পারলাম। আমি তার সঙ্গে একাকী থাকতে চাচ্ছিলাম, তাই লোকজনের ভিড় ঠেলে তার কাছে যেতে চেষ্টা করলাম। এরপর আদালতের ছুটি হলো। আব্বা পাশের কক্ষে গেলেন ধূমপান করতে। এরপর তাকে আলিঙ্গণ করলাম, কাঁদলাম। তাকে এখানে দেখা গেল তিনি আরও বড়, আরও লম্বা, আরও শক্ত। তাকে আরও নিয়মনিষ্ঠ বলে মনে হলো। অন্য সবাই চলে যাবার পর তিনি আমাদের বললেন যে, আমরা দামেস্ক থেকে অনেক মালপত্র এনেছি; একথায় আম্মা ও আমি রাগ করলাম। আমরা মনে আঘাত পেলাম, কারণ দেখা হওয়া মাত্রই তিনি এ কথা কেন বললেন। তিনি তো আমরা এই অবস্থায় কেমন আছ জিজ্ঞাসা করবেন। তবে তা আমরা বেশিক্ষণ মনে রাখিনি। আমরা আব্বাকে দেখে সুখি হলাম, তিনি যে ভালো আছেন, তাই যথেষ্ট। তার অনুপস্থিতিতে ৭০ ক্লিফটনে আমাদের আগন্তুক মনে হয়, যেন আমরা পথে আটকা পড়ে আছি, কোনো ওয়েটিং রুমে তার ফিরে আসার অপেক্ষায়। আব্বা যখন কারাগারে বন্দি আমরা অনেক অদ্ভুত মুহূর্ত কাটিয়েছি। আম্মা ও আমি উভয়েই জন্মদিন কাটিয়েছি আদালত কক্ষে। জামিনের শুনানি স্থগিত হওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছি। আমাদের পারিবারিক ছবি তুলেছি করাচির আদালত কক্ষে। আমরা আব্বাকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রথমে দেখতে পাই সেই কক্ষগুলোতে।

www.pathagar.com

১৮

স্থানীয় 'উইক এন্ড পোস্ট' মুর্তজা ভুট্টোর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। তাদের প্রশ্নগুলো ছিল বেনজিরের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে। তার বোন বলেছেন যে, তাদের দুই ভাইবোনের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। সবকিছুই চমৎকার। তিনি বলেছেন, 'এটি ঠিক যে, সে জেলে আছে। হ্যাঁ, আমিই তাকে গ্রেফতার করিয়েছি। সে আমার ভাই ঠিকই কিন্তু সেতো একজন সন্ত্রাসী; এছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই; তবে ব্যক্তিগত সমস্যা যা আছে তা অতি সামান্য।' তিনি বলতে চেয়েছেন যে, তাদের মধ্যে অমিল খুবই সামান্য। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে মুর্তজা বললেন, 'বেনজিরের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই।' কখনও কখনো তিনি তাকে মিসেস জারদারিও বলে থাকেন, কারণ তার মতে বেনজির অনেক আগেই ভুট্টোর মত আচরণ করা ত্যাগ করেছেন। এর উত্তরে বেনজির বলে থাকেন যে, তিনি একজন নারীবাদী; তার স্বামীর নাম সংযুক্তিতে তিনি ক্ষিপ্ত হন। মুর্তজা বলেন, 'যদি প্রধানমন্ত্রী নারীবাদী হয়ে থাকেন, তবে তিনি হুদুদ অধ্যাদেশ বাতিল করেন না কেন?' মুর্তজা তার বোনের সাথে মতপার্থক্য সম্পর্কে বলেন; 'তবে পার্থক্য যা আছে, রাজনৈতিক দর্শন ও পদ্ধতির প্রশ্নে।'

আবারও প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, 'তবে কি এটা ঠিক নয় যে পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে এরূপ নাটকের সৃষ্টি হয়েছে?' মুর্তজা আগের মতই পরিষ্কার করে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> 'হ্যা বিষয়টি সত্যিই নাটকীয়, নতুবা আমাকে বহনকারী বিমানকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল কেন? আমাকে গ্রেফতারি পরওয়ানা ছাড়াই জেলে ঢুকানো হলো কেন? কোনো অভিযোগ ছাড়াই আমাকে আদালতে না নিয়ে সত্তর ঘণ্টার উপর জেলে রাখা হয়েছিল কেন? আমার প্রয়োজন ছিল পরদিনই আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, অথচ সে সুযোগ আমি পেয়েছি বিশ দিন পর। মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমাকে সঙ্গে সঙ্গে দেয়ার কথা, অথচ এখনও তা আমার আইনজীবীকে দেয়া হয়নি। অবশ্যই এসকল কিছু নাটক হয়েছিল কারণ বলা হয় যে, 'আইন তার নিজস্ব গতিপথেই চলবে' অথচ বিনা অভিযেগে আমার হাজার হাজার কর্মীকে আটক করা হয়েছে, বিমান বন্দরে আমার অভ্যর্থনা ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, আমার সমর্থকদের বাড়ি-ঘর নষ্ট করা হয়েছে। আমি যখন লান্ধি জেলের পূর্ব দিকের সেলে নির্জন কারাবাস করছিলাম, তখন এই কথাগুলো আপনাদের জানানোও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

www.pathagar.com

মুর্তজাকে সিন্ধুর প্রাদেশিক অধিবেশনে নেয়া হয়েছিল শপথ গ্রহণের জন্য। এরপর তিনি প্রাদেশিক পরিষদে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, সে সময়ের বর্ণনা করেছে ডেইলি নেশন পত্রিকা।

'একটি নতুন কণ্ঠে যখন শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল, মীর মুর্তজা ভুট্টো যিনি প্রধানমন্ত্রীর কারারুদ্ধ ভাই, তিনি যখন সিন্ধুর অধিবেশনে নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে পিন-পতন নীরবতা বিরাজ করছিল।'

আমি সেদিন স্কুলে ছিলাম। আমাকে ক্লাস বাদ দিতে দেয়া হতো না। আব্বা একটি বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন, সেটি হলো আমার পড়াশুনা। আমি ফিরে এসে দেখলাম যে, আমার দাদী কাঁদছেন। তিনি বলেছিলেন 'ওর কণ্ঠস্বর ঠিক ওর পিতার মত।' জুনাম আরও বললেন, 'এটি সত্যি যে, তারা তো একই পথের পথিক, তাই যখন তারা প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখে, তখন গলার স্বরের গভীরতা একই রকম হয়ে থাকে। সুহেল আমাকে বলেছেন, 'সেদিন বেনজিরের পক্ষের লোকেরা যাদের মুর্তজার বিরোধী হওয়ার কথা, তাদের চোখেও অশ্রু দেখা গিয়েছিল। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তোমার পিতার হাতে চুমু খেয়েছে তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর। এটি ছিল একটি অদ্ভুত ব্যাপার। এটিই পিংকির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দলের অভ্যন্তরে, বাইরে থেকে নয়, কর্মীরা মুর্তজাকে সমর্থন দিচ্ছিল এটি তার জন্য হয়েছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।'

যদিও মুর্তজা ছিলেন তার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে তার উপযুক্ত প্রতিনিধি, তবু তাকে অনেক কিছুই প্রমাণ করতে হয়েছে। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সবকিছু চিন্তা করেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জাতীয় সংসদে অংশ না নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার।

মুর্তজা ছিলেন তার পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে ব্যতিক্রম। তিনি সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনা ধারণ করতেন না। তিনি দেখেছেন যে তার চাকরির জন্য উদগ্রীব বোন কিভাবে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রীত্বের মত লোভনীয় পদে আসীন হয়েছেন। আবার দু'বছর পরেই চাকরি চলে যায়। তিনি তলা থেকে শুরু করে তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। জনগণকে বুঝতে সুযোগ দিতে হবে, তিনি কে এবং তাকে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। ধীরে ধীরে তাই-ই তিনি করেছেন।

আদালতে অবসরের ফাঁকে তিনি 'ডন'-এর একজন সাংবাদিককে, পিপিপি যে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাচ্ছে সে সম্পর্কে বলেছেন, দলের সুবিধাবাদী অংশ জোরে প্রচার করছে যে মুর্তজা ভুট্টো এখন সময়ের পেছনে আছেন।

> এ সমস্ত কথার অর্থ দাঁড়ায় যে যখন আমি জনগণের চরম দারিদ্র্যের কথা উত্থাপন করি, সেটি হলো অতীতের কথা, বর্তমানে পাকিস্তানে কোনো দারিদ্র্য নেই। যখন আমি দরিদ্র্য জনগণের কথা বলি, তাদের পোশাকের অভাব, খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব, পানীয় জলের অভাব, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্র এবং স্কুলের অভাবের কথা বলি, দুর্নীতি উচ্ছেদের কথা বলি, তখন বলা হয় যে, আমি অতীতে বাস করছি। মনে করা হয় যেন দেশকে একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি

www.pathagar.com

যদি বাস্তবতা বহির্ভূত কথা বলে থাকি, তবে প্রশ্ন, এ সমস্ত কৌতুককারীরা কোথায় বাস করছেন? তারা কি সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী?'

আব্বা কৌতুককর, অথচ তীক্ষ্ণ বক্তব্য রাখতে পারতেন। তিনি বলেছেন, পিপিপি 'ভূমিদস্যুতে পরিণত হয়েছে। কৃষি জমিসহ সকল ক্ষেত্রেই কর ধার্য করেছে। ধনী, সামন্ত ধারা থেকে আগত লোকদের কাছ থেকে কোনো ছোটখাটো পরামর্শও আসেনি এ বিষয়ে। দুর্নীতি উৎপাটনের জন্য 'ওপেন হার্ট সার্জারি'র প্রয়োজন। মুর্তজা সংবাদ মাধ্যমে বেনজির বিরোধী বলে পরিচিত হতেন। তার চিন্তা-চেতনায় আদর্শ ছিল বেনজিরের নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই, স্বাভাবিকভাবেই বেনজির তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আমি তখনও ফুফুর সঙ্গে কথা বলতাম, অনেকটা সঙ্কোচের সাথে। ছোটবেলায় তার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি ছিলাম পরিবারের প্রথম শিশু এবং তিনি ছিলেন আমার 'ওয়াদি বুয়া'। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম এবং সুযোগ পেলেই তার সঙ্গে সময় কাটাতাম। যিনি তার জীবন ও দলের চির সাথী হয়েছেন, তার সঙ্গে বাগদত্তা হওয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন আসিফকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন, লন্ডনের বাইরের এক প্রমোদ উদ্যানে, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বেনজিরের হাতে একটি মৌমাছি কামড় দেয়, আসিফ তার যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য সেখানে আইসক্রিম লাগিয়ে দেন। পরে বেনজির বলেছেন যে, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আসিফকে বিয়ে করার। কিন্তু পাকিস্তানে ফেরার পর আমি ফুফুর চরিত্রের কুৎসিত দিকটি দেখতে পাই।

কোনো এক বিকেলবেলা আমি তাকে শিশুসুলভ প্রশ্ন করলাম যে, আমার পিতার প্রতি কেন তিনি এত বিদ্বেষপরায়ণ। তিনি কথা আড়াল করে বললেন, 'তুমি তো কিছুই জান না, আসলে কী ঘটছে। আমি কিছুই করছি না। তুমি পরিস্থিতিকে ভুল বুঝেছ,' ইত্যাদি।

যে কথাটা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম, এবার আমি তাকে মওকা মত পেয়ে গেলাম। তাকে বললাম 'যদি আপনার কথা সত্য হয়ে থাকে, এবং আমার পিতার সঙ্গে খারাপ আচরণের ব্যাপারে আপনি দায়ি না হয়ে থাকেন, আপনি জেলখানায় আমাদের সঙ্গে যেয়ে আগামীকাল আব্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।' তিনি চুপ করলেন। আমার বয়স তখন এগার বছর। আমি আবার তাকে কথাটা বললাম। আমাকে আগামীকাল বিকেল চারটার সময় সেখানে থাকতে হবে। বেনজির তখন করাচিতে ছিলেন। আমি তার করাচি আসার অপেক্ষায় ছিলাম তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তিনি অস্পষ্টভাবে কিছু বলছিলেন যে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে তার জেলখানায় বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য; তিনি কথা দিলেন যে পরে তিনি আমাকে ফোন করবেন। আমি আম্মা ও জুনামকে বললাম যে, তিনি আসবেন। আমি বলেছিলাম, 'ওয়াদি বলেছেন যে, তিনি আসবেন– তিনি নিশ্চিত করবেন, এটিই শুধু বাকি।' তারা আমার দিকে তাকালেন। বুঝলাম যে, তারা একথা বিশ্বাস করেননি। আমি আবার তাদের নিশ্চয়তা দিলাম, বললাম, 'তিনি আসবেন।' আমি জানি তারা কি ভাবছেন। আমি সরল, বেনজির তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত। তবে আমি মনে করেছিলাম যে, তিনি একবার যদি তার ভাইয়ের মুখোমুখি হতেন, তবে তিনি তার ভুল বুঝতে পারতেন; তারা ঐক্যবদ্ধ হলে শক্তিশালী হতেন, বিভক্তিতে নয়। তিনি বিপথগামী হয়েছেন; মুর্তজার রাজনীতির মূল ভিত্তি

www.pathagar.com

তৈরি করেছিলেন তার পিতা অনেক বছর আগে, যখন তিনি জাতিকে সুগঠিত করেন। ওয়াদিও সেরকম বিশ্বাস করতেন ক্ষমতায় যাওয়ার আগে। আমি মনে করেছিলাম যে, তাদের মধ্যে মিমাংসা হতে পারে। যাহোক তিনি আমাকে ফোন করেননি। আমি সন্ধ্যাবেলা তাকে অনেকবার ফোন করার পর রাতের খাবারের সময় ওয়াদি আমার ফোন ধরলেন। বললেন, 'ফাতি, দুঃখিত আমি আসতে পারব না।' আমি কারণ জিজ্ঞেস করলাম এবং কাঁদতে শুরু করলাম, তবে ঠোঁট চেপে রাখলাম, যাতে তিনি কান্না শুনতে না পান। তিনি বললেন, 'আমি কারাগারে যাওয়ার অনুমতি পাইনি।' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আপনি তো প্রধানমন্ত্রী'। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তারা তো আমাকে অনুমতি দিল না।' এখানেই কথাবার্তা শেষ হলো। আমি তাকে নির্দোষ বলে ভাবতে পারলাম না। তিনিই সবকিছু ঘটিয়ে চলছেন।

আমরা আব্বাকে দেখতে সপ্তাহে একদিন লান্ধি কারাগারে যেতাম। আমার মনে আছে, সেটি ছিল সপ্তাহের মধ্যবর্তী একটি দিন, বুধ অথবা বৃহস্পতিবার। করাচিতে জিন্নাহ বিমানবন্দরের নিকটবর্তী আমাদের বিদ্যালয় থেকে লান্ধি যেতে সময় লাগত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ঠিক ৪টায় আমাদের সাক্ষাৎকার শুরু হতো। যানজট অথবা অন্য কোনো কারণে আমরা দেরিতে উপস্থিত হলেও নির্দিষ্ট সময় থেকে তার হিসাব করা হতো, আমাদেরকে কোনো বাড়তি সময় দেয়া হতো না। মোট সময় ধার্য করা ছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

প্রথম কয়েকবার আমি কিছু বেশি সময় আব্বার সঙ্গে কাটাতে আবেদন জানাতাম। আব্বা কোনো অনুরোধ করতেন না। তিনি জানেন যে, তার তত্ত্বাবধায়ক দুররাণী তার প্রতি সহানুভূতিশীল; যদি প্রকাশ পায় যে তিনি মুর্তজাকে অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছেন, তবে তার চাকরি চলে যাবে। তাই আমি অনুরোধ করতাম আরও এক মিনিট বাড়তি সময়ের জন্য। তত্ত্বাবধায়ক আমার দিকে না তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানাতেন যে, তা সম্ভব নয়। আমি জানি যে, এটি তার অপরাধ নয়, তবু মনে করতাম, অতিরিক্ত ষাট সেকেন্ডে কি ক্ষতি হয়? ওই মাথা নাড়ার মুহূর্তে আমার মনে হতো ওয়াদির নোটবুকের বর্ণনার কথা, তার পিতা জুলফিকার যখন রাওয়ালপিণ্ডি জেলে ছিলেন, তখন তাকে দেখতে যাওয়ার কথা। তিনি তা স্মরণ করলেন না কেন? শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি চিন্তা করতাম, তিনি যেভাবে শাস্তি পেয়েছিলেন, কেন একইভাবে আমাদের তিনি শাস্তি দিচ্ছেন?

আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল যে, আমি আমার পিতার সঙ্গে মাত্র সপ্তাহে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটাচ্ছি। আমরা ফোনেও তার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। তখন তো মোবাইল ফোনও ছিল না, আর থাকলেও তা রাখতে তাকে অনুমতি দেয়া হতো না। আমি সাত বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত আব্বাকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি, আমার সব বিষয়েই তিনি জড়িত থাকতেন। এখন তো তিনি আর আমার সঙ্গে থাকেন না। আমার হোমওয়ার্ক দেখে দেন না, সব কিছুই আমাকে একা করতে হয়; এই এগার বছর বয়সেই আমার নিজের সবকিছুর দেখাশুনা নিজেরই করতে হয়।

তাই, আমি কৈশোরে পৌঁছবার পর আমার সমস্যাগুলো নিয়ে আব্বাকে একটি চিঠি লিখলাম। এটি ছিল পত্রিকায় প্রকাশিত অনুরূপ কিছু চিঠির অনুকরণে লেখা। খামের উপর লিখলাম : আব্বার জন্য : 'শুধুমাত্র আপনি দেখবেন।' আমি দু'পৃষ্ঠা ভরে লিখেছিলাম, তা ছিল আর্তনাদ আর বিলাপে ভর্তি। আমি যখন স্কুলে থাকি, আব্বার তখন আদালতে

www.pathagar.com

অধিবেশনের সভা থাকে, তার সময় সকাল বেলা এবং সপ্তাহের কর্মদিবসে। তাই সে সময়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে না। তিনি জবাবে সাদা খামের উপর লিখলেন 'পাপি কে পাপা', উপরের ডান দিকের কোনায় লিখলেন, 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়' এবং আন্ডারলাইন করে দিলেন। নিচের বাম দিকের কোনায় লিখলেন, 'শুধুমাত্র তুমি দেখবে।' লিখলেন :

'প্রিয় ফাতিমা (অসন্তুষ্ট) ভুট্টো', (তার লেখা তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে হাসিয়েছে)

আমার ছোট সোনামনি, আমি তোমার চিঠি পেয়েছি এবং তোমার অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল। তোমার অবশ্যই যতবার খুশি আমাকে দেখার অধিকার আছে। তুমি তো জান, তোমাকে দেখতে পাওয়া, তোমাকে কোলে নেয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছু আমার কাছে নেই। তবে যেহেতু আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, তাই আমি চাই যে, তোমার শিক্ষা পূর্ণ হোক। তুমি অত্যন্ত মেধাবী সন্তান, তুমি নিজের পথে একদিন বিখ্যাত হয়ে উঠবে। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তোমার পিতামহ বলতেন যে, তুমি কারও কাছ থেকে তার সবকিছু নিতে পার– তার বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা অলঙ্কার, সবকিছু– কিন্তু তার চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-বুদ্ধি সেটি হলো সবচেয়ে নিরাপদ ধনসম্পদ। আমার আদালতের কাজ যদি শনিবার হয় এবং তুমি আস, তবে আমার চেয়ে সুখী আর কে হবে? যে জেলে তোমার ওয়াদি আমাকে রেখেছে, সেখান থেকে আমি ছাড়া পেলেইতো আমরা আবার একত্রিত হবো। ততদিন তুমি অপেক্ষা কর; আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি, কত প্রীতির চোখে দেখি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমি দেখেছি, তুমি যখন আরও ছোট ছিলে, আরও দু'তিন বছর আগেই আমি তোমার কাব্য প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি। সম্প্রতি তুমি আমর সঙ্গে দেখা করতে এলে যে কবিতা শুনিয়েছ, তাও চমৎকার। তুমি ওয়াদিকে নিয়ে যে নিচের ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছ, তা খুব সুন্দর।

কালিমাখা পিংকি পংকি
তার স্বামী হল একটি গাধা
তারা দু'জনে লুটেপুটে দেশকে করেছে আধা,
তার স্বামী হল একটি বানর
ইংকি, পিংকি, পংকি।

আব্বার ওই চিঠির কারণে আমি উজ্জীবিত হলাম এবং হাসি খুশির মধ্যে থাকার চেষ্টা করলাম। এই উদ্ভুত জীবন থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটবে, উজ্জ্বল জীবনে ফিরে যাব, এটি প্রত্যাশা করতে শুরু করলাম। আমি দিন গুণতে শুরু করলাম, কবে আব্বা মুক্তি পাবেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের এই অস্বাভাবিক জীবনের একটি স্বাভাবিক কাজ হলো কারাগারে যাওয়া-আসা করা। আমরা উপস্থিত হই অস্থিরতার মধ্য দিয়ে, একটি সিমেন্টের রঙ-বিহীন ঘরে। অবশ্য কক্ষটি ছিল করাচির গরমের তুলনায় শীতল। সেখানে বসেই

www.pathagar.com

আব্বার জন্য টিফিন বাক্সের মধ্যে নিয়ে আসা খাবারগুলো বের করতাম একসাথে খাবার জন্য; আম্মা ও জুলফি সামান্যই খেত, কারণ তারা বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে যেত তবে আমি থাকতাম ক্ষুধার্ত, আব্বার সঙ্গে বিকেল চারটায় লাঞ্চ খাব বলে স্কুলে কিছুই খেতাম না।

আমরা কাঠের চেয়ারে বসে চারকোনা টেবিলে রাখা খাবার নিয়ে আব্বার জন্য অপেক্ষা করতাম। আব্বার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম বলেই শক্ত কাঠের চেয়ারে বসতে অসুবিধা বোধ করতাম না। জুলফি ও আমি জানালার কাছে যেয়ে দাঁড়াতাম এবং তাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকতাম কখন রক্ষীবেষ্টিত আব্বা আসেন। তাকে দেখা মাত্রই আমরা দৌড়িয়ে যেয়ে তার কাছে পৌছতাম। জেল ওয়ার্ডেন আমাদের দেখে হাসতেন এবং জুলফিকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করতেন।

আমাদের সাক্ষাতের সময় জুলফি প্রায়ই আব্বার কোলে উঠে বসত। সেখানেই কথা বলত, আব্বার অখণ্ড মনোযোগ পেতে চেষ্টা করতো। জুলফির বয়স চার বছরের কাছাকাছি; ইতোমধ্যেই সে বেশ আড্ডাবাজ ও চালাক হয়ে পড়েছে। কখনো কখনো আব্বা আমাদের কাশ্মিরী চা আনতে বলতেন। তিনি কখনো চা বা কফি খেতেন না, কিন্তু কাশ্মিরী 'চা'ই পছন্দ করতেন; এটি এক প্রকার অদ্ভুত পানীয়, গোলাপী রঙের চা, যার সঙ্গে আছে সুস্বাদু মশলা। আমি তেমন পছন্দ করতাম না, তবে এক কাপ পান করতাম। এখন আমি এটি পান করি না। আমার মনে সব সময় ভেসে ওঠে সেই নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ওই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য এখন আমি মরতে রাজি।

* * *

জুলফিকার আলি ভুট্টোর জন্ম দিবস ৫ জানুয়ারি। তার মৃত্যুর পর থেকে এটি পালিত হয়ে আসছে গারহি খুদাবক্সের পরিবারের পূর্বপুরুষদের কবরস্থানে। এটি লারকানার কাছে। ১৯৯৪ সালের ৫ জানুয়ারি মুর্তজার কারাজীবনের দুই মাস পূর্ণ হয়। তিনি জুলফিকারকে সর্বশেষ দেখেছেন ১৯৭৭ সালে যখন তাকে ও শাহনেওয়াজকে তাদের পিতা নির্বাসনে পাঠান। মুর্তজা মুসলমান সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তার পিতার জন্মদিবসে লারকানায় তার কবরে যেয়ে জেয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। দ্রুত তার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলো। ঈদের প্যারোল অন্য কথা, দেশের সবাই ঈদ উদযাপন করেছে। কিন্তু ৫ জানুয়ারির জন্য ভুট্টোর উত্তরাধিকারী পাকিস্তানে আছে মাত্র দু'জন।

আম্মা ও জুনাম এবং মুর্তজার অনেক সমর্থক সেদিন লারকানায় গেলেন। বেনজির সরকার মুর্তজার অনুপস্থিতিকে কাজে লাগাল। তারা সেখানে সরকারের একটি বড় শক্তি প্রদর্শন করল। সেদিন সাদা পোশাক পরিহিত ১০,০০০ পুলিশ লারকানায় নিয়োজিত হলো।

মুর্তজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, 'আমরা জুলফিকার আলী ভুট্টোর মাজারে তার হত্যাকারীদেরকে আসতে দিব না। কিন্তু বাস্তবে তার এই দাবিকে বেনজিরের সরকার নস্যাৎ করে দিল। বেনজিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে পাঁচজন ব্যতিত সবাই এবং তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাগণ সেখানে গেলেন। মুর্তজা এদের লারকানায় যেতে নিষেধ করলেন।

www.pathagar.com

তিনি সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তার কর্মীদের যদি কোনো হুমকি দেয়া হয় অথবা তাদের চলাচলের উপর যদি সেদিন কোনো বাধার সৃষ্টি করা হয়, তবে সেটিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা হবে। ইতোমধ্যে লারকানা ভরে গেল পুলিশ এবং মুর্তজার একনিষ্ঠ কর্মীদের দ্বারা, তাদের মধ্যে ছিলেন ভুট্টোর আমলের অনেক সক্রিয় কর্মী। যাতে সেদিনের জমায়েতে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্য তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অনেককে আটক করা হয়েছে।

আম্মা সেদিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন, 'আমাদের পারিবারিক বাড়ি আল-মুর্তজায় অনেক লোক এসেছিলেন। আমাদের অতিথিদের কামরাগুলোর একটিতে থেকেছেন দশজন করে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অনেক কর্মী আমাদের বাড়িতে থেকেছেন, সেখানে জায়গা খালি ছিল সেখানেই তাদের থাকতে দেয়া হয়েছিল। জুনাম তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। তার জ্বর ও ফ্লু হয়েছিল। তিনি সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে আরও বললেন, সরকারের হিংস্র কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই সেদিন বিক্ষুব্ধ ছিলেন। অনেকেই প্রস্তাব রাখছিলেন পরদিন সকালবেলা মাজারে যেতে। তারা জোর দিয়ে বললেন, আমাদের যেতেই হবে।' আমি মনে করলাম আমাদের যাওয়া উচিত হবে না। বললাম, 'দেখুন আমরা তো এসেছি। আমরা এখানে আছি। আমাদের পক্ষে তো যুক্তি তৈরি হয়েছেই। কিন্তু কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করল না।' পরবর্তীতে যা ঘটেছে, তা কেউ প্রত্যাশা করেনি।

৫ জানুয়ারি ১৯৯৪ সকাল বেলা করাচির পুলিশের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ওয়াজিদ দুররাণীর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ আল-মুর্তজা ভবন ঘেরাও করে রাখল। ভুট্টো ভবনকে নিশ্চল করে ফেললো। নির্দেশ জারি হলো যে, এই বাড়ি থেকে কেউ বের হতে পারবে না, এমনকি জুলফিকারের বিধবা স্ত্রী, যিনি প্রধানমন্ত্রীর আপন মা, তিনিও এই নির্দেশের মধ্যে পড়লেন, তাকে কখনো কেউ তার স্বামীর কবরস্থানে যেতে বাধা দিতে পারেনি, এমনকি জেনারেল জিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষও নয়। পুলিশ এই বাড়িতে কাউকে প্রবেশ করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করল। আম্মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন, 'বড় একটি জনতার ঢল আসছিল এই বাড়ির দিকে; কথা ছিল, তারা আমাদের নিয়ে মাজারে যাবে। পুলিশ তাদের থামিয়ে দিল। বাড়ির ভিতরে যে সমস্ত কর্মী আটকা পড়ে আছে, তারা জোরে স্লোগান দিতে থাকল। পুলিশ ছিল দুই জনতার মধ্যবর্তী স্থানে। সকাল এগারটার দিকে পুলিশ দুই স্থানেই গুলি বর্ষণ করল।'

যখন গুলি বর্ষণ চলছিল, তখন আম্মা ছিলেন বাড়ির ভিতর। মুর্তজার এক চাচাতো ভাই, যার ডাকনাম পোনচো, তিনি তখন পরিবার নিয়ে আল-মুর্তজায় ছিলেন। জুনাম ছিলেন তার শোবার ঘরে বিশ্রামরত; তিনি দ্রুত কামরা থেকে বের হয়ে প্রবেশপথের দিকে গেলেন পুলিশকে থামাতে। পুলিশকে কোনোভাবে খেপানো হয়নি। তারা বাড়িটিকে ঘেরাও করে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। যে কর্মীরা আল-মুর্তজায় আসার চেষ্টা চালাচ্ছিল তাদের পথের মধ্যেই আটকে দেয়। এ কর্মীদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না– তাদের কাছে ছিল পতাকা আর পোস্টার। তারা দিচ্ছিল স্লোগান আর প্রদর্শন করছিল ছবি। পুলিশের আক্রমণ করার কোনো যুক্তিই ছিল না।

জুনাম বাড়ির বাইরে অবস্থান করে চিৎকার করছিলেন, পুলিশের গুলি বর্ষণ থামাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেই অফিসাররা বন্দুক নিচে নামালো না। তারা জুনামের দিকে

www.pathagar.com

বন্দুক তাক করল। এরপর তারা বাড়ির প্রবেশপথের গেট খুলে ভেতরে গুলিবর্ষণ করতে থাকল। আম্মার মনে আছে, অল্পের জন্য জুনামের উপর ছোঁড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। 'সেদিন সকালে দু'জন তরুণ কর্মী গুলিতে নিহত হন। এদের মধ্যে একজন নিহত হয়েছিল জুনামকে রক্ষা করতে যেয়ে। বন্দুকের গুলির লক্ষ্য ছিল জুনাম।' আম্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

কয়েকজন তরুণ আহত হয়েছিলেন। আহতদের হাসপাতালে নেয়ার জন্য অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার বিষয়টি ওয়াজিদ দুররানীর নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী প্রত্যাখ্যান করল। ইধি ট্রাস্ট হেলিকপ্টার, যা ছিল একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান; এরা এগিয়ে আসল আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে– তারা পাঁচ মিনিটেই আহত ব্যক্তিদের লারকানার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু অনুমতি দেয়া হলো না। যে ব্যক্তি জুনামকে রক্ষা করতে যেয়ে আহত হয়েছিলেন, তিনি আল-মুর্তজার সামনে রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন। সময়মত চিকিৎসা করা হলে তিনি বেঁচে যেতেন।

জুনাম ক্ষিপ্ত হলেন। কোনো দিন ভুট্টোর বাড়িতে গোলাগুলি হয়নি; আইয়ুব খানের একনায়কত্বের সময় হয়নি, ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইনের সময় না, এমনকি জিয়াউল হকের নির্যাতনের মধ্যেও না। নুসরাত ভুট্টোকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, তাকে শারীরিক আঘাত করা হয়েছে, কিন্তু কখনো তাকে গুলি করা হয়নি। তিনি বিবিসি, ভারত ও পাকিস্তানের যে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে বললেন যে, মাত্র দু'দিন আগে বেনজির তার মাতাকে ৫ জানুয়ারির মাজারের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এই শর্তে যে, তিনি মুর্তজার কর্মীদের সঙ্গে না থেকে তার সঙ্গে থাকবেন। এখন সে পাঠিয়েছে টিয়ার গ্যাস ও গুলি। তিনি রাগত স্বরে বলতে থাকলেন, 'সে গণতন্ত্রের কথা বলে থাকে, কিন্তু হয়েছে একজন ক্ষুদে একনায়ক। আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না।'

রাত ঘনিয়ে আসল, আর 'বাড়িটি এখনও ঘেরাও অবস্থায় আছে।' আম্মা আমার কাছে স্মৃতিচারণ করছেন : 'আমাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। আমরা জানতাম যে, আমাদের কথাবার্তা তারা শুনছে, তাই পরস্পর কথা বলতাম ফিসফিসিয়ে। তারা শুনেছিল যে, আমরা ৫ জানুয়ারি সকালে মাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম; তাই আমার ঘুম থেকে জেগেই দেখি যে, পুলিশ আমাদের ঘেরাও করে রেখেছে। ফোন সচল ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না, সবাইকে দেয়ার মত পর্যাপ্ত খাবার ছিল না, (যারা বাড়ির ভিতর ও গেটের বাইরে আছে তাদের জন্য) লারকানার প্রচণ্ড শীতকাল ছিল তখন।'

লারকানার স্টেডিয়ামের দিকে রাস্তায় পিপিপি জুলফিকার আলী ভুট্টোর জন্মদিন উৎসব পালন করল। সঙ্গীত ধ্বণিত হলো, লোকজন নাচল, এবং সকলকে রাতের খাবার দেয়া হলো। বেনজির সেখানে ছিলেন তার শক্তি প্রয়োগের জন্য– দু'জন লোকের আহত হওয়ার পরে মৃত্যু এবং অনেক লোক আহত, পুলিশি নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন অনেকে। আমি যখন আম্মাকে বেনজিরের উৎসব পালনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, 'বিষয়টি মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি কোনো সহানুভূতিই দেখালেন না, এতে তার রাজনৈতিক পরিপক্কতাও প্রকাশ পায় না'। তারা উৎসব পালন করলেন হত্যাযজ্ঞ চলার কয়েক ঘণ্টা পর।

www.pathagar.com

জুলফি ও আমি ছিলাম করাচিতে। আমাদের পিতা বা আমরা মাতা বা দাদীর কাছে যেতে পারিনি। আমরা একজন আত্মীয়ের জন্মদিন পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্য করাচিতে থেকে গিয়েছিলাম। আমরা পার্টিতে গেলাম না। সেদিন আমাদের সেই আত্মীয়রা আমার উপর রাগ করেছিল; তারা বলেছিল যে, আমি অনুষ্ঠানটি নষ্ট করেছি। আমি সঠিক কাজই করেছি, বিষয়টি কৌতুক করার মত নয়। আমি বললাম, 'তোমরা আমাদের ছাড়াই কর।' তখনও পুরো বিষয়টি আমার জানা হয়নি, তবে এটি তো ঠিক যে, মানুষ নিহত হচ্ছে এবং আমার পিতা কারাগারে আছেন। যে হোটেলেই তারা উৎসব পালন করুক না কেন, সেখানে যেতে আমি অস্বীকৃতি জানালাম এবং জুলফিকেও পাঠালাম না। সেদিন আমরা কাল ব্যাজ পরলাম। জুলফি তখনও ছোট এবং দিনের বেলা বেশিরভাগ সময় আমি ওকে রাখতাম। আমরা অফিসে বসে অপেক্ষা করতাম খবরের জন্য।

আম্মা পরদিন সকালে উঠে দেখলেন যে, বেস্টনি তখনও তুলে নেয়া হয়নি। জুনাম ফোনে বেনজিরকে জিজ্ঞেস করলেন (বেনজির তখন নাওদেরোতে), 'তুমি কখন মানুষ হত্যা বন্ধ করবে?' তিনি খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বেনজির তার মাকে বললেন যে, 'জনতা আমাদের দিকে গুলি নিক্ষেপ করেছিল' (আমাদের বলতে তিনি পুলিশ বুঝাচ্ছিলেন)। এটি ছিল সম্পূর্ণ অসত্য কথা। বেনজির আরও বললেন, 'ওরা 'র'-এর এজেন্ট।' রাগত স্বরে তার মাকে একথা বলে তিনি ফোন রেখে দিলেন। তার এরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তা সবাই বুঝেছে। তিনিও নিশ্চিত যে, তার ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সংবাদ মাধ্যম বুঝে ফেলেছে। আম্মার মনে আছে 'মীর তার বোনের অভিযোগকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অনৈতিক এবং বিশ্বাসযোগ্যতাহীন' বলে অভিহিত করলেন। তিনি এভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, 'ঠিক 'র'-এর এজেন্ট' কিভাবে তারা প্রধানমন্ত্রীর কড়া নিরাপত্তা এবং দেশের নিরাপত্তা ভেদ করতে পারল? ভারতীয় গুপ্তচরগণ কিভাবে লারকানার এরূপ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করতে পারল?' আসলে এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। নিউইয়র্ক টাইমস এর সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে জুনাম বলেন, 'আমার এই মেয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলে– সে তার ভাই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করে।'

www.pathagar.com

১৯

১৯৯৪ সালের বসন্ত চলল ধীর গতিতে। আমরা আব্বার সঙ্গে সপ্তাহে একদিন লান্ধি কারাগারে সাক্ষাৎ করতে থাকলাম এবং নূতন বাড়িতে জীবন কাটাতে লাগলাম। ৭০ ক্লিফটনকে মনে হলো এমন একটি বাড়ি, যেখানে অনেক বছর কেউ বাস করেনি; কামরাগুলো ড্যাম্প হয়ে পড়েছে, বসবাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের পরিবর্তে অকাজের অব্যাবহৃত জিনিস দিয়ে কামরাগুলো ভর্তি। যেখানে কয়েক পুরুষের ছবির অ্যালবাম ও রাজনৈতিক উপহার ইত্যাদি দ্বারা ভর্তি। মনে হচ্ছিল যেন নিজেদের বাড়িতেই আমরা অতিথি হিসেবে এসেছি।

আম্মা ও আমি উভয়েই মিথুন রাশির জাতক, আদালত কক্ষের যেখানে জামিনের শুনানি হচ্ছিল, সেখানে জন্মদিন পালন করছিলাম। সরকার কর্তৃক যৌক্তিকতা প্রদর্শনের ব্যর্থতার কারণে শুনানির তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছিল। আমার স্কুলের গ্রীষ্মের বন্ধ শুরু হয়েছে, বাড়িতে একাকীত্ব বোধ করছিলাম, একঘেয়েমি লাগছিল এবং কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। তাই জুন মাসের কোনো এক সকালবেলা আম্মা দ্রুত আমার ঘরে প্রবেশ করে লাইট জ্বালিয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুললেন। আমি সোজা হয়ে বিছানায় বসলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কী হয়েছে। আম্মা স্বর উঁচু করে বললেন, 'তিনি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন।' তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তার কণ্ঠস্বর সুখের এবং তা উত্তেজনাপূর্ণ। আব্বা জামিন পেয়েছেন। তিনি বাড়ি আসছেন!

আব্বার যে বড় ছয়টি মামলার বিচার হচ্ছিল– এগুলো ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ ও বিদ্রোহের, এগুলোর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জিয়ার শাসনামলে ভুট্টো ভাইদের বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা রুজ্জু করা হয়েছিল, সেগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে করাচিতেই চলছিল অনিশ্চিত মতামত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে সামরিক সরকার তাদের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোট ১৭৮টি মামলা রুজ্জু করেছে।

যদিও মুর্তজা তার বিরুদ্ধে আনীত অনেকগুলো মামলায় জামিন পেয়েছেন, একটি মামলায় জামিন না হওয়ায় তাকে কারাগারে আটক থাকতে হয়। সম্প্রতি তার আইনজীবী কর্তৃক এই মামলার জামিনের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু সিন্ধু সরকার কর্তৃক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে জামিন না দেয়ার জন্য। যাতে মুর্তজাকে জেলে রাখা যায়। বিচারপতি আলী আহমেদ জুনেজো এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'আমি এই মামলায় ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।' এই ঘোষণাকে আমার কাছে আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে আছে, আব্বা বলেছেন যে, 'হাকিমকে হুমকি দেয়া হচ্ছিল যেন আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে

www.pathagar.com

ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।' তখন আমার বয়স বার বছর, সে সময় আমার মনে হচ্ছিল যে, এটি একটি সতর্ক সঙ্কেত।

আগেই জানা ছিল যে, হাকিম ৫ জুন মুর্তজার জামিনের সিদ্ধান্ত আদালতে দেবেন। কিন্তু আদালতে রায় দেয়ার সময় একজন কেরানী কয়েকবার বিচারপতি আলী আহমেদ জুনেজোকে স্লিপ দিয়ে বাধা দেয় এই বলে যে, তার চেম্বারে একটি জরুরি ফোন কল এসেছে, যা তার এক্ষুণি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি এই সংবাদ অগ্রাহ্য করে কোর্টের কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন, মুর্তজার জামিন সম্পর্কে রায় পাঠ করলেন। বিষয়টি যে গুজব নয়, নিশ্চিত, তা পরের দিনই বিচারপতি আলী আহমেদ জুনেজোকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলে স্পষ্ট হলো। পরবর্তীতে জুনেজো প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, মুর্তজা ভুট্টোর জামিন মঞ্জুর করার জন্য তিনি চাকরি হারিয়েছেন; কিন্তু তিনি মনে করেন যে, তিনি তার আইনগত কর্তব্য পালন করেছেন এবং তার ফলে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু সেদিন আব্বা বাড়ি আসেননি। আমরা সারাদিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু লান্ধি কারাগার থেকে তার মুক্তি পাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। গোলমেলে কোনো ব্যাপার বোধ হয় ঘটেছে; তার মুক্তি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা এক কিংবা দু'ঘণ্টার মধ্যে শেষ হওয়ার কথা- অথচ এত দেরি হওয়ার বিষয়ে কোনো তথ্য আমরা পাচ্ছিলাম না। অবশেষে জুনাম বেনজিরকে বললেন। তিনি যখন ফোনে কথা বলছিলেন, আম্মা ও আমি তার শয়ন কক্ষে বসেছিলাম। তিনি বললেন, 'তুমি মীরকে মুক্তি দিচ্ছ না কেন?' তিনি খুব জোরালো কণ্ঠে কথা বললেন।

প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন, আম্মা ওর বিরুদ্ধে আমাদের আরও মামলা আছে। তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন না, কীভাবে এ সমস্ত মামলা আসল, কোথা থেকে আসল, আইএসআই কর্তৃক আনীত মুর্তজার বিরুদ্ধে অভিযোগের হারানো নথি আবার হঠাৎ করে কিভাবে খুঁজে পাওয়া গেল, এ সমস্ত কথার কোনো জবাব মিলল না। কারাগারে থাকা তার জীবিত একমাত্র ভাইকে আরও দীর্ঘ সময় আটক অবস্থায় রাখার বিষয়টি তাকে দুঃখ দিয়েছে বলে মনে হলো না।

ওয়াদি যা করলেন, তা অত্যন্ত নিচু ধরনের কাজ। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। আমি সেই ৫ জানুয়ারির গুলিবর্ষণের পরও বিশ্বাস করতে পারিনি যে, তিনি এত নিষ্ঠুর হতে পারেন, ক্ষমতার জন্য এত নিচে নামতে পারেন।

জামিনের আদেশ হওয়ার পরদিন, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর, আব্বার মুক্তির আদেশ স্বাক্ষরিত হলো। আমরা শুনেছি যে, সেনা বিভাগের কোনো উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীকে আদেশের সুরে ফোনে বলেছেন যে, 'তাকে বীর বানাবেন না, এক্ষুণি যেতে দিন।' ওই ব্যক্তি যাই বলে থাকুক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মানসিকভাবে আহত হলেন। আব্বা তার মুক্তির আদেশ পেলেন ৬ জুন।

* * *

আমরা নিজেরা সাজতে এবং বাড়ির সাজ-সজ্জা ঠিক করতে ব্যস্ত হলাম। আব্বা ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে নেই সতের বছর। এই বাড়িতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। বাড়িটির

www.pathagar.com

বয়স তার বয়সের সমান। মনে আছে, করাচি থকে ফেরার সময়, শীতের শেষে মেজ্জায় ফেরার সময় আব্বা যখন আমাদেরকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে বাড়ি সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ছবিগুলোকে কি এখনও ভীতিপ্রদ মনে হয়?' (জুলফিকারের পাঠাগারের ক্রুশবিদ্ধ যীশুর আধুনিক ছবি; হ্যাঁ, আসলেই তা ভয়ঙ্কর ছিল)। তিনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন, 'বসার কামরায় কি সেই চাইনিজ কার্পেটটি এখনও আছে? বাগানটি কেমন দেখাচ্ছে? বুগেনভিলা (লতানো গাছ) কিরূপ দেখাচ্ছে? তাদের সকলের এক সঙ্গে হওয়ার সময় যেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকে। আমরা বিবিসিতে আব্বার মুক্তির সংবাদ পেলাম। বিবিসি'র খবরে দেখালো মুর্তজার মুক্তির আদেশের আনন্দে লেয়ারির মহিলারা নাচছে। তিনি মুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অভিনন্দন জানাবার জন্য কোনো ফোন এলো না। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমরা খবর পেলাম তিনি লান্ধি থেকে রওয়ানা দিয়েছেন। জুনাম তাকে আনতে গিয়েছেন। যেখানে এক ঘণ্টায় তার আসার কথা, হাজার হাজার জনতার ভিড়ে ও উল্লাসে সে পথ পাড়ি দিয়ে তিনি ক্লিফটনে ফিরলেন মধ্যরাতে।

উল্লাস ধ্বনি শুনে আম্মা, জুলফি ও আমি ৭০ ক্লিফটনের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। আম্মা ও আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করলাম, জুলফি আম্মার বাহুতে। করাচিতে আসার পর থেকে বাড়ির এরূপ দৃশ্যের স্বপ্নই দেখছিলাম আমরা।

জনতা আব্বাকে শ্লোগান দিতে দিতে বাড়ির ভিতর নিয়ে আসলো। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তারা প্রত্যক্ষ করলেন, তা হলো জুলফিকার আলীর একমাত্র জীবিত পুত্র অবশেষে মুক্ত হলেন এবং তিনি তার পিতার বাড়িতে প্রবেশ করলেন আবেগঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে। তিনি পরেছিলেন সাদা সালওয়ার-কামিজ, যা ছিল করাচির গ্রীষ্মের তাপের জন্য উপযোগী। তার চুলের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল গোলাপফুলের পাপড়ি। তাকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত কিন্তু উজ্জ্বল! আমি পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়েছিলাম তার মুখে চুমু খাওয়ার জন্য। অন্য সময়ের মতই তার মুখে ছিল সুন্দর গন্ধ। তার বাদামি ত্বকে সুগন্ধি ছিল। আব্বা যে বাড়ি তেইশ বছর বয়সে ত্যাগ করেছিলেন, সেখানে হাঁটলেন। অবশেষে যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন তার বয়স হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর। আম্মা, জুনাম ও আমি তাকে লম্বা বারান্দায় একাকী হাঁটতে দিলাম– কল্পনায় দেখলাম তার হৃদয় অতীতের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়েছে। নানা আবেগ দ্বারা তিনি তাড়িত হচ্ছেন। তিনি যে জীবনে ফিরে আসছিলেন, তার মাঝপথে ছিল অনেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, তবে চিত্র ছিল আগের মতই। তবে গ্লাসযুক্ত দরজাগুলো তার কাছে কুৎসিত বোধ হলো। এগুলো এরূপ করেছিলেন জুনাম ও বেনজির, ১৯৮৮-এর দশকে যখন তারা গৃহবন্দি অবস্থায় এখানে বাস করতেন। পরের দিনই এই গ্লাসের দরজাগুলো খুলে ফেলা হলো।

* * *

মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পর প্রথমে তিনি গেলেন লারকানায়, তার পিতা ও ভাইয়ের কবর জিয়ারত করতে। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন ৩০০ কি. মি. রাস্তা গাড়িতে যেতে, যার ফলে তিনি রাস্তায় শহর ও গ্রামের চল্লিশটি স্থানে থেমে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে

www.pathagar.com

পারেন। এটি ছিল লম্বা ও কষ্টকর ভ্রমণ, তবে আবেগ জড়িত, বারবার সরকারি বাধার ফলে তার এবং কর্মীদের সিন্ধু প্রদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক ভ্রমণের বিলম্ব ঘটছিল।

একটি স্থানীয় সংবাদপত্র লিখেছে 'করাচি থেকে জামশোরোর পুরো রাজপথ জুড়ে জুন মাসের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে মানুষ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল একনজর মুর্তজা ভুট্টোকে দেখার জন্য।' এর পরবর্তী পথে ছিল আরও ভীড় এবং যানজটে আক্রান্ত, পাঁচ মিনিটের পথ অতিক্রম করতে লেগেছে কয়েক ঘণ্টা।'

জামশোরোতে মুর্তজা দুঃসাহস নিয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন 'আমার বোন বেনজির এবং শহীদ ভুট্টোর দলকে অবরোধ করে রেখেছে মাফিয়া চক্র, চোর-বাটপার আর জিয়ার এজেন্টরা। আমরা তাদের তাড়িয়ে দিব। আমরাই শহীদের সত্যিকারের দলীয় লোক। আব্বাকে বহনকারী গাড়ি বিভিন্ন বড় ও ছোট নগরীর মধ্য দিয়ে চলছিল, সর্বত্রই জনতার ভিড় ছিল। সিন্ধুর একজন সাংবাদিক এভাবে রিপোর্ট লিখেছেন, 'আমি অবাক হয়েছি দাদু জেলার ছোট একটি গ্রাম কাকার, যার লোকসংখ্যা ২,০০০, সেখানেও ভিড় হয়েছিল ১০,০০০ লোকের।

লারকানার বাড়িতে ফেরার বিষয়টি ছিল বিশেষ ধরনের।

পত্রিকার খবরে প্রকাশিত হয়েছে, 'এটি ছিল রাজপুত্রের জন্য স্বাগতম। মুর্তজার নির্বাচনী এলাকা তার আসন্ন আগমন উপলক্ষে জেগে উঠল। এ অঞ্চলে এরূপ জনসমাগম এর আগে মাত্র দু'বার হয়েছিল– ভুট্টোর মৃতদেহ গারহি খুদাবক্সে আসার পর একবার দ্বিতীয়বার হয়েছিল ১৯৮৬ সালে বেনজির ভুট্টো লন্ডন থেকে আসার পর।'

লারকানার কৃষি জমি ও সিন্ধুর অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের খারাপ রাস্তা পার হওয়ার পর মুর্তজার গাড়ি যখন নগরীতে পৌঁছল, চারদিক থেকে ধ্বনি আসতে শুরু করল, 'হযরত আলীর তলোয়ার চকচক করছে, ভুট্টার উত্তরাধিকারী এসেছে,' এবং পুরুষ ও মহিলারা সমবেত স্বরে চীৎকার করে উঠল, 'এসেছে, মুর্তজা এসেছে', সঙ্গে তার গাড়িতে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে দিল।

সুহেল অবশেষে ত‌্ বিরুদ্ধে জিয়ার আমলের ভুট্টো ভাইদের অনুগত থাকার কারণে যেসব মামলা হয়েছিল, সেগুলোর নিষ্পত্তি হওয়ার পর পাকিস্তানে ফিরে আসলেন। তিনি মুর্তজার সঙ্গে গারহি খুদাবক্সের পারিবারিক গোরস্থানে আসলেন। 'মীর প্রথমে পিতামহের কবরে যেয়ে ফাতেহা পাঠ করলেন। তিনি কবরের উপর গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিলেন এবং তার পিতার কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তার জন্য এটি খুবই আবেগের বিষয়। এরপর তিনি গেলেন শাহের কবরে প্রার্থনা করতে। তিনি তার ভাইয়ের কবরের অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই কবরটি তার পিতার কবরের মত মার্বেল খচিত করা হয়নি। সমতল অবস্থায় আছে। এটি পরিষ্কার ছিল না চারদিকে ছিল ধুলো-বালি এবং ময়লা, চারদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ইট জড়ো করা অবস্থায় ছিল। অথচ মাজারের বাইরে বেনজির তার সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য যে মঞ্চ তৈরি করেছেন, তা অভিজাত ধরনের। আব্বা অবস্থা দেখে বেদনা পেলেন।

শাহের কবর দেখে মুর্তজা লজ্জিত হলেন। চোখে তার জল, অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে রাখলেন।' সুহেল উভয় ভাইকেই ভালোভাবে চিনতেন। তিনি ছিলেন মুর্তজার বন্ধু, সমবয়সী। তবে তিনি শাহকেও ছোট ভাইয়ের মতই মনে করতেন। সুহেল বলতে

www.pathagar.com

থাকলেন, 'বেনজির শাহের সম্পত্তি জবরদখল করেছেন, নওদেরোর বাড়িটি তিনি নিয়ে নিয়েছেন, এটি শাহের কন্যা শশীর জন্য রাখেননি, এবং নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন এম এ ২০৭ আসন থেকে, যেটি তার পিতা চেয়েছিলেন শাহের জন্য রাখতে। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তিনি কি কবরটি সুন্দর করে রাখতে পারতেন না?' সুহেল সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। 'আব্বা মাজারের ব্যবস্থাপককে তখনই ডাকলেন; তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক। তিনি সেখানে প্রাথমিক দেখাশোনা করেন। আব্বা তাকে বললেন, শাহের কবরটিকে সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করতে এবং পরেরবার এসে যেন তিনি সবকিছু সঠিক অবস্থায় দেখতে পান।' সেরূপ করা হয়েছিল। নয় বছর পর সুহেল যখন গারহি খুদাবক্সে যান, তখন তিনি সেটি দেখেছেন।

পারিবারিক কবরস্থানে তার যাওয়াটা ছিল খুবই আবেগতাড়িত। এর পর মুর্তজা তার নিজ বাসভবনে কয়েকদিন পর্যন্ত তার পিতা ও ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য অনেক শোকবাণী পেলেন। সিন্ধুতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শোক প্রকাশ করা হয়, যদিও তাদের তিরোধান হয়েছে অনেক বছর। অনেক লোক এসেছে মুর্তজাকে দেখতে; এরা এসেছে বেলুচিস্তানের কোয়েটা, পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা এবং সীমান্ত প্রদেশের গিলগিট থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এবং সম্মান জানাতে।

বেনজির এবং তার ঘনিষ্ঠ জনেরা এরপর কোনঠাসা হয়ে পড়ে। মুর্তজা যখন কারা অন্তরালে, তার তখনকার হুমকি ছিল নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তখন তার জনগণের সঙ্গে কথা বলার শক্তি ছিল সীমিত। এখন তিনি মুক্ত, তাকে থামানো যাচ্ছে না। তারা যতদূর সম্ভব তার ক্ষতি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আদালতকে নির্দেশ দেয়া হলো তার পাসপোর্ট আটকাতে, যার ফলে তার বিদেশ যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এটি এক ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক শাস্তি। তাকে পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের আদালতে প্রায়ই যেতে হতো শুনানিতে উপস্থিত থাকতে, কারণ তার এবং তার কর্মীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা ছিল, মাঝে মাঝে অনেক কর্মীকে আটক করা হতো, শারীরিক নির্যাতনও চালানো হতো।

করাচিতে আব্বার চলাচলের উপর গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা নজরদারি করা শুরু করে। ৭০ ক্লিফটনের বাইরে একটি গাড়ি পার্ক করা থাকত, যেটি মুর্তজা যেখানেই যেতেন, তাকে অনুসরণ করত। তবে আব্বার কৌতুক বোধের সঙ্গে তারা খাপ খাওইয়ে চলতে পারত না। একবার আমরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আব্বা গোয়েন্দা গাড়িটি থামিয়ে গতিপথ জিজ্ঞেস করলেন।

মুর্তজা পাকিস্তানের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ভ্রমণ করতে লাগলেন। জনতা চাচ্ছিল তার সাথে সাক্ষাৎ করতে, তার কথা শুনতে, তারা দেখতে চাইল, এই নবাগতের কাছ থেকে প্রত্যাশা পূরণের মত কিছু পাওয়া যায় কিনা অথবা তিনিও একজন ভূসম্পত্তির মালিক, অভিজাত সামন্ত, যার জনগণের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ নেই। মুর্তজা সাহসের সঙ্গে বরং সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন। তিনি তাদের বেদনাদায়ক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা বলতেন। জনগণ তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। মনে হচ্ছিল যে মুর্তজাই একমাত্র রাজনীতিবিদ; যিনি বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, সরকারের সঙ্গে যোগ না দিয়ে।

বেনজির তার সরকারের বিরুদ্ধে মুর্তজা যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে অন্য প্রসঙ্গে এসেছেন। তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য,

www.pathagar.com

ভাই-বোনের সম্পর্ক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত ও গুরুত্বহীন, অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দেন। বেনজির তার ভাইয়ের লারকানার বাড়িতে গোলাগুলির পর নিউইয়র্ক টাইমসকে এক সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে লারকানায় তার বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে পুলিশ দিয়ে বাড়িটিকে অবরুদ্ধ করা এবং তার মাকে লক্ষ্য করে গুলি করার ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি বললেন, যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অন্যান্য সামন্ত পরিবারের মত কন্যা হিসেবে তাকে পুত্রের সমান অধিকার দেয়া হবে না, তাকে আটকিয়ে রাখা হবে। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণেই তিনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি একটি আশ্রয়ের জন্য বিয়ে করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জমিদারী বা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়, রেডিলিফ কিংবা অক্সফোর্ডে পড়তে পাঠানো হয় না।

লিঙ্গ বৈষম্যের প্রসঙ্গে মুর্তজা সরাসরি জবাব দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি কখনো দলের চেয়ারম্যান হতে চাইনি। আমি দলের চেয়ারম্যান কিংবা সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইনি (বেনজির অনবরত তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলছেন)। আমি শুধু দলের ভিতর সর্বস্তরে নির্বাচন দাবি করছি। এটি কি অযৌক্তিক দাবি?

আমার ফুফু সম্পর্কে এই সময়ের কথা লিখতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই। ৫ জানুয়ারির গোলাগুলির পর আমি তার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করেছি। তিনি যা করেছেন তা ভাবলে আমি আতঙ্কিত হই। আমি যে নগরীতে বাস করি, সেখানকার রাস্তাগুলো ভাঙা, বর্ষাকালে জলে ভেসে যায়, কারণ সেখানে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। দুর্নীতি সুস্পষ্ট, আমাদের চারদিকে তা বিরাজ করছে। আমি হতাশ ছিলাম। আমাকে একবার কিংবা দু'বার জোর করে তার সাথে দেখা করার জন্য নেয়া হয়েছিল। অবধারিতভাবে ফটো তোলা হয়েছিল। আমাকে ফুফুর সঙ্গে শেরাটন হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে হয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম দাদী জুনামের সঙ্গে; তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে অনেকটা দোটানায় পড়েছিলেন। আকস্মিকভাবে ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুললেন। পত্রিকায় বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশিত হলো 'ভুট্টো পরিবারের দ্বন্দ্ব কৃত্রিম', প্রমাণস্বরূপ ছবিতে ফুফুর সঙ্গে আমাকে দেখা গেল।

আমাদের করাচিতে আসার পর কয়েক মাসের মধ্যে আরো একবার আমি জুনামের সঙ্গে ওয়াদিদের বাড়ি গিয়েছি। তখন সবাই বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলে মনে করতেন, ভাবতেন পিতাকে কারাগারে রাখার পরও ফুফুর সঙ্গে দেখা করার মধ্যে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। আমরা ওয়াদির শোবার ঘরে বসেছিলাম, তিনি ছিলেন বিছানায় এবং আমরা ওয়াদির কামরার ভিতরেই। জুনাম অস্থির বোধ করছিলেন। তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেন, তবে আব্বার বিষয়টিকে যেভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন। জুনাম মোটেই চায়নি যে তার সন্তনেরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকুক। তিনি ওয়াদিকে বললেন, 'তোমাদের এরূপ দ্বন্দ্ব আমি পছন্দ করি না। এটি তোমাদের উত্তরাধিকারের জন্য খারাপ।' জারদারি কামরার আরাম কেদারায় বসেছিলেন, তখন পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। একথার পর তিনি হঠাৎ অবজ্ঞা করে জোরে বলে উঠলেন, 'মনে হয় যেন কোনো উত্তরাধিকার আছে!' তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে জোর গলায় কথাগুলো বললেন।

সবাই নীরব হয়ে গেলেন, ওয়াদিও। জুলফিকার সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্যের সুর, এমন অমার্জিতভাবে কেউ কখনো কথা বলেনি অন্তত। পরিবারের মধ্যে কখনো এরূপ ঘটেনি।

www.pathagar.com

জুনাম শেলবিদ্ধ হওয়ার চেয়ে অধিক ব্যথিত হয়েছেন। তাকে দেখাচ্ছিল গভীরভাবে বেদনাহত।

আমি যা শুনেছি, বাসায় যেয়ে তা আম্মাকে বললাম। তিনি আরবিতে প্রতিজ্ঞা করলেন। আমি বুঝতে পারিনি, আব্বাকে কিভাবে বলব, তাই তাকে বলিনি। তাকে অতিরিক্ত বাজে কথা শুনিয়ে লাভও নেই।

আব্বা প্রায়ই তার বক্তৃতায় বা সাক্ষাৎকারে জারদারিকে 'চোর' বলে আখ্যায়িত করতেন। তিনি একটি উক্তি তৈরি করলেন, 'আসিফ বাবা ও চল্লিশ চোর', যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করা যায় (এই উক্তিটি এখনও ব্যবহৃত হয় : আমি গর্বিত যে, এটি টিকিয়ে রেখেছি। তিনি জেল থেকে বের হওয়ার পর আরও খোলাখুলিভাবে এ সমস্ত কথা বলতেন। জুনাম তাকে থামিয়ে দিতেন, বলতেন, 'থাম, ওরা সন্ত্রাসী, তোমাকে আঘাত করবে।'

করাচিতে কোনো এক সান্ধ্যভোজের সময় সুহেল আমাকে বললেন, 'বেগম সাহেবা জোরালোভাবে মীরের পক্ষে ছিলেন। তিনি বললেন, 'জুলফিকার আলী ভুট্টো '৭৭ সালে কারারুদ্ধ হওয়ার পর তিনি ছিলেন পিপিপি'র প্রাণ। জিয়া চেয়েছিলেন পিপিপিকে টুকরো করতে এবং তোমার পিতামহী প্রথমদিকে ভূমিকা রেখেছিলে এটিকে অখণ্ড রাখতে। তিনি ট্রাকে উঠে বক্তৃতা দিয়েছেন, সারাদেশের সমাবেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন, পুলিশ তাকে আঘাত করেছে এবং আটক করেছে। সেই অন্ধকার সময়ে তিনি ছিলেন পিপিপির জীবনী শক্তি। অথচ মীর আসার সঙ্গে সঙ্গেই দলের ভিতর তার মাকে সম্মানসূচক পদটি থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। বেনজির ভয় পেলেন, হয়তো তার মা তাকে বাদ দিয়ে মীরকে দলের শীর্ষ পদে আনবেন।'

আমি সুহেলকে বললাম, 'আমি আমার পরিবারকে বুঝতে পারি না। আপনি কি নিশ্চিত যে, তারা রাজপুত যোদ্ধা ছিলেন? তাদের মাঝে মাঝে বন্য পশুর মত মনে হয়।' তিনি জোরে শব্দ করলেন এবং হাসলেন, এবং স্বীকার করলেন যে, বিষয়টি অদ্ভুত। তিনি আরও বললেন, 'তোমার পিতামহী কখনো এক সন্তানকে অপর সন্তানের জন্য ত্যাগ করেননি, তিনি যথার্থই স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করছিলেন! তিনি চেয়েছিলেন যে বেনজিরের মত মীরও তার ভূমিকা পালন করুক, তবে তার মেয়ের কাছে ক্ষমতা যাওয়ার পর তিনি জটিল অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন।

যখন আমি তার আমন্ত্রণ রক্ষা করা থেকে বিরত থাকা শুরু করলাম, ওয়াদি আমাকে বাধ্য করার জন্য নতুন পথ অবলম্বন করলেন। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের জন্য তিনি আমাকে ঘুষ দিতে চেষ্টা করলেন। ষষ্ঠ গ্রেডের শেষের দিকে একদিন স্কুল থেকে এসেই শুনলাম যে প্রধানমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে আমাকে কথা বলতে বলেছেন। আমি ফোন করলে তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ফাতি, তুমি ব্যাগ প্যাক কর, আমি তোমাকে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে যাব, নেলসন ম্যান্ডেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। আমরা একঘণ্টার মধ্যে যাত্রা করব।' তিনি জানতেন যে ম্যান্ডেলাকে আমি নায়ক মনে করি, তাকে দেখার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠব। এখন শেরাটনে লাঞ্চেরও সময় নয়। তিনি হিসাব করে দেখেছেন যে, আমার পক্ষ থেকে অসম্মতি জ্ঞাপন করার কোনো কারণই নেই। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না, যদিও আমার যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল। সে সময় আমার পিতা জেলখানায় ছিলেন। আমি

www.pathagar.com

বলেছিলাম, 'যেহেতু আপনি আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন, তাই আপনার সঙ্গে যাব না।' তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। আমি পরিবারের প্রথম বড় নাতনী, আর আমার পিতা আমাকে অনেকটা সাবালিকা বলে মনে করেন। আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মন স্থির করলাম। আমি প্রায়ই এরূপ করি এবং এর ফলে ফুফুর সঙ্গে আরও দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। আমি যত লিখি, যত সময় পার হয়, ফুফুকে আমার কাছে ততই অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

২০

আমার পিতা ১৯৯৪ সালের বাকি দিনগুলো পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থান সফর করে কাটালেন। তিনি বেলুচিস্তানের পর্বত থেকে পাঞ্জাবের ওয়াজিরিস্তান ও সোয়াত গেলেন এবং সিন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ স্থান চষে বেড়ালেন। তিনি আগস্ট মাসে লাহোরে সরকারের বিরুদ্ধে বলেন যে, যে সমস্ত বিচারপতি রাষ্ট্রপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকেন, তাদেরকে এই সরকার বরখাস্ত করেছে। যোগ্য বিচারপতিদের উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতে দিয়ে পিপিপির অনুগতদের প্রয়োগ করে দিচ্ছে, ফলে বিচার ব্যবস্থায় ধ্বস নেমে আসছে। মুর্তজা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের কথাও বলেন, স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত পত্রিকা, যেগুলো সরকারের কড়া সমালোচনা করে, সেগুলোর মালিকানাধীন ছাপাখানাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। মতিন নামের একজন স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিককে একজন অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি সরকারের সমালোচনামূলক বক্তব্য লেখার জন্য নির্যাতন করে।

করাচিতে তিনি ফেডারেশন অব চেম্বার্স অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে বক্তৃতা দিতে যেয়ে সরকারের দুর্নীতির কড়া সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'অর্থনৈতিক অপরাধকে কার্যকরভাবে দমন করতে হবে এবং শক্ত হাতে তা মোকাবেলা করতে হবে। এখন যা চলছে তা হলো লুটপাটের রাজত্ব, অথচ এর জন্য একজনের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কয়েক মাস পর আবার তাকে পাঞ্জাব যেতে হলো আদালতে শুনানির জন্য হাজির হতে। সরকার তার মামলাগুলোকে সচল করেছে। সে সময় তিনি জনতার কাছে কড়া ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেছেন। তিনি বৈদেশিক কোনো লেন-দেনের সঙ্গে দুর্নীতি ও জালিয়াতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। 'দি ফ্রন্টিয়ার পোস্ট' খবরের কাগজ মন্তব্য করে যে মুর্তজা এ সমস্ত বলছেন দুঃখ পেয়ে – কারণ জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্র ৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ৭ বিলিয়ন ডলার আসছে হংকং থেকে, পাকিস্তানের ভোক্তাদের জন্য এগুলোতে খরচ পড়বে ৬ থেকে ৬.৫ সেন্ট, অথচ আন্তর্জাতির দর ৩ থেকে ৩.৫ সেন্ট প্রতি ইউনিট। ভোক্তাদের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করা হবে আন্তর্জাতিক দরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দরে।

ডিসেম্বরের মধ্যে দুর্নীতি তুঙ্গে উঠল। এর সাথে অন্য একটি সঙ্কটের সৃষ্টি হলো। সিন্ধুতে জাতিগত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ল। উর্দুভাষী মোহাজেরদের প্রদেশের সিন্ধি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। সে সময় মোহাজির কওমি আন্দোলন (এমকিউএম) নামক একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দল দাঙ্গার সৃষ্টি করল। তাদের দাবি, তারা উর্দুভাষীরা করাচিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক তাদের উপর

www.pathagar.com

বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। এটি একটি কুৎসিৎ সংঘর্ষ, যার উৎস বেনজিরের প্রথম সরকার।

সিন্ধু আইন পরিষদে একজন সিন্ধী হিসেবে করাচির ক্রমবর্দ্ধমান জাতিগত দ্বন্দ্বের বিষয়টি উত্থাপন করলেন। প্রধানমন্ত্রী একনিঃশ্বাসে বলে ফেললেন যে ৮০টি থানার মধ্যে মাত্র ১১টিতে গোলযোগ হয়েছে এবং তারপরই বললেন, 'করাচিতে একটি ক্ষুদে বিদ্রোহ এবং গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।' সরকার বিভ্রান্ত এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ নয়। প্রধানমন্ত্রীর স্বামী যখন বলেন, এক মাসে মাত্র ১৫০ জন লোক নিহত হয়েছে, তখন মনে হয় না যে ওই নিহত ব্যক্তিদেরকে তিনি মানুষ বলে গণ্য করেন। মুর্তজা বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের জান-মাল রক্ষার মূল দায়িত্ব সরকারের।

> স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যুবকেরা যেখানে কায়িক শ্রমের কাজও পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্তিতির উন্নতি হবে কিভাবে? বেকারত্বের অভিশাপ দূর করা না হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেখানে চাউল, গম, ঘি, চিনির মত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিকহারে বেড়েছে, বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৫০ শতাংশ, সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশ আশা করা বৃথা। মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন সাধারণ জনগণ, আর বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর।

আব্বা এমপিএ হিসেবে যে মাসিক বেতন পেতেন, তা দান করতেন ইধি ফাউন্ডেশনে। তার নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তা জানতাম না।

মুর্তজা মোহাজিরদের উপর সরকারের নির্য্যাতনের এবং করাচির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির সমালোচনা করার পর সরকার আরও একটি সুযোগ পেল তাকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করার। সরকার মুর্তজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া শুরু করল যে, তিনি আলতাফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে করাচিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করছেন। আলতাফ হোসেন এম কিউএমএর নেতা, তিনি একজন নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী হিসেবে কুখ্যাত, সহিংসতার পর করাচি ছেড়ে পালিয়েছেন। ফিরে আসলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তিনি এখন যুক্তরাজ্যের নাগরিক হিসেবে সেখানে বাস করছেন এবং পাকিস্তানের রাজনীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এমকিউএমএর সঙ্গে মুর্তজার কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি বরং তাদের সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার নিন্দা করতেন। তিনি এমকিউএম-এর হয়ে কোনো বক্তব্য রাখেননি, তিনি বলেছেন, উর্দুভাষী মোহাজিরদের পক্ষে, যাদের সঙ্গে এমকিউএম-এর কোনো সম্পর্ক নেই। সরকার মুর্তজার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের উপর সহানুভূতিশীল বলে অপপ্রচার চালাবার পর মুর্তজা তার জবাব দিয়েছিলেন। বৈশিষ্ট্যমত ব্যাঙ্গাত্মক স্টাইলে। তিনি লাহোর ভিত্তিক সাপ্তাহিক ফ্রাইডে টাইমস-এ লিখেছেন :

> স্যার, আমার 'সম্পাদকের কাছে চিঠির' মাধ্যমে পত্রিকায় বক্তব্য রাখার অভ্যাস নেই। এমকিউএম-এর পক্ষ হয়ে কিছু বলার দায়িত্বও আমার নয়।

www.pathagar.com

> তবে আমি আদনান আদিলের 'আলতাফের গোখরাসাপ লিয়াকতাবাদে ছোবল দিচ্ছে' শিরোনামের লেখাটির উপর কিছু মন্তব্য করতে চাই। আমার সঙ্গে একবার আদনান আদিলের দেখা হয়েছিল। আমি তাকে একজন স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন মানুষ বলে ভুল করেছিলাম। কিন্তু তার গোখরা উপাখ্যান (ভদ্র ভাষায় উপস্থাপন করলাম) পড়ার পর আমার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আমি নিবন্ধটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি। বলা হয়ে থাকে যে, এমকিউএম মুর্তজা ভুট্টোর আল-জুলফিকার সংগঠন থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে; এই সংগঠন তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে থাকে। সরকারি সূত্র মতে সাম্প্রতিককালে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্র এসেছে ৭০ ক্লিফটনে।

মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ শাহের কুকুরদের স্বাবাবিক কাজ হলো ৭০ ক্লিফটন যারা আসা যাওয়া করে, তাদেরকে অপহরণ করে নির্যাতন চালানো এবং অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া। (আটদিন আগে আমার একান্ত সচিবকে অপহরণ করা হয়েছিল, সঙ্গে আমার গাড়ি ও চালককেও তারা নিয়ে গিয়েছিল, আমার বাড়ির বাইরে থেকে। মাত্র গতকাল আমরা তাদের খুঁজে পেয়েছি সিআইএ'র সদর কেন্দ্রে। চালক ও সচিব উভয়ে কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছে। ৭০ ক্লিফটনকে তো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের লোকেরা স্থায়ীভাবে অবরোধ করে রেখেছে, তা হলো সেখান থেকে ওয়াগন বোঝাই অস্ত্র কিভাবে বের করা হবে? এ সমস্ত হলো আদিল সাহেবের কল্পনা। আসল কথা হলো, গ্রীষ্মকালের কোনো এক বিকেলবেলা আলতাফ হোসেন ও আমি একটি বনের প্রান্তে বটগাছের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমরা উভয়েই, মীর ও পীর (এমকিউএম-এর নেতার প্রতীক) মনমরা ভাব নিয়ে বসেছিলেন। আমাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হলো :

আলতাফ : আপনি সিন্ধুর অধিকারের কথা বলছেন, আর আমি বলছি মোহাজিরদের অধিকারের কথা। আমরা পরস্পর সহযোগিতা করি না কেন?

মুর্তজা : সমস্যা নেই। আমি আপনার যুক্তি বিবেচনা করে দেখতে পারি।

আলতাফ : আপনি তো জানেন, জেলা কেন্দ্র ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আরপিজি দিয়ে আর হবে না। আমাদের প্রয়োজন ট্যাঙ্ক।

মুর্তজা : আপনি আসল ব্যক্তির সাথেই কথা বলছেন। আমার বেশ কিছু কামান আছে ৭০ ক্লিফটনের ভূগর্ভে। সেগুলো সর্বাধুনিক ও উন্নত। মোড়ক দিয়ে প্যাক করে এ সমস্ত উপহার দেয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখব, যাতে আপনি আপনার মোহাজির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারেন।

আলতাফ : সিন্ধুর জমিদাররা বড় বড় বাড়িতে বাস করেন, সেখানে বড় আকারের মাটির তলায় ঘর আছে। আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, আমার আছে একটি ছোট বাড়ি আমি চাই একটি ছোট ট্যাক্স।

মুর্তজা : আপনার চিন্তা ক্ষুদ্র, চাহিদা ছোট। আমার কাজ সুজুকি শ্রেণীর ট্যাঙ্ক নিয়ে নয়। আমি আপনার সাহায্য করতে পারব না। আমার আছে শুধু যুদ্ধের ট্যাঙ্ক।

আলতাফ : বাদ দেন ছোট ট্যাঙ্কের কথা। আপনার কি যুদ্ধবিমান আছে?

www.pathagar.com

মুর্তজা : আপনি আবার ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছেন, আলতাফ; এ জন্যই তো আপনাকে পীর বলা হয়। আমার গ্যারেজে এক ডজন এফ-১৬ পার্ক করা আছে। সেগুলো চাইলেই পাবেন।

আলতাফ : আমি জানি না, ওরা আপনাকে সন্ত্রাসী বলে কেন? আপনি তো এ সমস্ত কাজের কিছুই জানেন না। এফ-১৬ তো শহর এলাকায় অচল। আমি যা চাচ্ছি, তা হলো পি-৫২ এস, শহরাঞ্চলে বোমাবর্ষণের জন্য এটির প্রয়োজন।

মুর্তজা : ইয়ার, আসলে আমার একটি বি-৫২ আছে, সেটি প্যাকিং করা আছে ৭০ ক্লিফটনের ছাদে। কিন্তু এটি আমার মাত্র একটিই আছে। তাই, এটি আমি আপনাকে দিয়ে দিতে পারি না। অবশ্য আমি আপনাকে কয়েক মাসের জন্য ধার হিসেবে দিতে পারি। তবে আপনাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আপনি এটি দিয়ে লারকানা উড়িয়ে দিবেন না।

আলতাফ : স্কাউটের মর্যাদা নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

মুর্তজা : আরও একটি বিষয় আছে; আল্লাহর কসম, আদিলকে এ সমস্ত বলতে যাবেন না।

আলতাফ : এ বিষয়ে বাজী ধরুন। কিন্তু একটি শর্ত আছে : হক্সবে সৈকতের কুটিরের সামনে রাখা আপনার পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনটি পরীক্ষামূলকভাবে আমাকে চালাতে দিবেন। আমি কাউকে এ সমস্ত কথা বলব না।

বিনীত
মীর মুর্তজা ভুট্টো
করাচি

বছর ঘুরে আসল, তবু মোহাজিরদের উপর সরকারি সহিংসতা ক্রমশ বেড়েই চলল এবং করাচি হয়ে পড়ল রাজনৈতিক বিরোধীদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। বেনজিরের দ্বিতীয়বারের শাসনকালে করাচিতে যে সহিংসতা চলেছে, তার সূত্রপাত ঘটেছে প্রথমবারের শাসনামলে। এমকিউএম-এর সৃষ্টি হয় ১৯৮০'র দশকে, জেনারেল জিয়ার একনায়কত্বের সময়, সিন্ধুর পিপিপিকে ধ্বংস করার জন্য। সন্দেহজনক উৎস থাকা সত্ত্বেও এটি রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে ক্রমশ করাচির মধ্যবিত্তদের সমর্থন লাভ করল এর ধর্মনিরপেক্ষতা নৃতাত্ত্বিক ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী (কিন্তু শিল্পপতিদের পক্ষে এবং গোষ্ঠীগত শাসনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল) আদর্শের কারণে।

১৯৮৮ সালে বেনজির তার প্রাক্তন শত্রুপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন এবং প্রথম সরকার গঠন করলেন এমকিউএম-এর সাহায্য নিয়ে। তার ১৯৮৮ সালের এমকিউএম-এর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন ছিল অস্বস্তিকর বিষয় এবং অবিরামভাবে করাচিতে মোহাজির সিন্ধি সহিংসতার কারণে এই মৈত্রী বন্ধন হালকা হতে থাকল। বেনজির সহিংসতা বন্ধ করতে ব্যর্থ আর এমকিউএম মৈত্রী চুক্তি লঙ্ঘন করল।

এমকিউএম সংসদ থেকে ওয়াকআউট করল এবং অল্পদিন পরই বেনজিরের সরকারের পতন ঘটল। বেনজির বুঝতে পারলেন যে, এমকিউএম তার বড় রকমের ক্ষতি করেছে।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালের নির্বাচনে বেনজিরের তখনকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি নেওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় আসলেন। এবার এমকিউএম মৈত্রী করল নতুন বিজয়ীর সঙ্গে।

১৯৯৩ সালে অবশ্য এমকিউএম ততটা শক্তি অর্জন করতে পারেনি। এটি ছিল সিন্ধু'র দ্বিতীয় প্রধান দল, সরকার গঠন করা বা ভাঙার ব্যাপারে এর কোনো ক্ষমতাই তখন তার ছিল না।

এমকিউএম জোরালোভাবে প্রচেষ্টা চালাল শক্তি না হারাতে এবং পথের জঙ্গি দলে পরিণত হলো তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষমতা ফিরিযে নেয়ার এবং করাচি নগরীতে এর অবস্থানকে দৃঢ় করার জন্য। বেনজিরকে আগেই এমকিউএম বিরোধীতা করেছে। তাই তিনি এই সুযোগে তাদের বিশ্বাসঘাতকদের শোধ নিলেন। তিনি নোংরা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এমকিউএম-এর রায়জানির বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিচারের মাধ্যমে বা রাজনৈতিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল নসরুল্লাহ বাবরকে নির্দেশ দিলেন এমকিউএমকে একটি শিক্ষা দিতে। জেনারেল বাবর একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, তার সঙ্গে আফগান যোগাযোগও আছে, যার জন্য তিনি প্রায়ই তলেবান প্রসঙ্গে বলে থাকেন 'আমার ছেলেরা'। তিনি এমকিউএম-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেন এবং করাচির মোহাজিরদের উপর বর্বর অত্যাচার চালালেন এবং এর নাম দিলেন 'অপারেশন ক্লিন আপ'। রাষ্ট্রের এরূপ কর্মকাণ্ড ছিল সুবিচার পরিপন্থী। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যে কেউ সিন্ধু সরকারের নেতৃত্বাধীন পিপিপির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা না করে চললে সন্ত্রাসী কিংবা অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এমকিউএম দল হিসেবে সন্ত্রাসী বলে পরিচিতি লাভ করল এবং মোহাজিরদের মনে করা হতো 'আলতাফ-এর সমর্থক।' আলতাফ হোসেনের অতীত নিঃসন্দেহে অপরাধপূর্ণ, কিন্তু কোনোভাবেই মোহাজির সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি নন। 'অপারেশন ক্লিনআপ' পদ্ধতির সবচেয়ে খারাপ দিক হলো পুলিশ কর্তৃক আক্রমণ, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। করাচির নিরাপত্তা বাহিনী হত্যা, নির্যাতন, ব্ল্যাকমেল ইত্যাদি কাজ করত নগরীতে 'ক্লিনআপের' নামে।

'অপারেশন ক্লিনআপে এরূপ চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, এক বছর করাচি নগরী নিশ্চল অবস্থায় ছিল। বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল, কিছু কিছু স্থানে যাওয়াই ছিল দুষ্কর, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর, ১৯৯৫ সালের প্রথম তিন মাসের সহিংসতার কারণে দেশীয় পুঁজি বিদেশে চলে গিয়েছে ১০২ বিলিয়ন রুপি। করাচিতে এর আগে এবং এখন পর্যন্ত এরূপ সহিংসতা আর কখনো দেখা যায়নি। এই সহিংসতা ঘটেছে রাষ্ট্র ও পুলিশের অনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরতার কারণে।

মনে পড়ে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ জুলফি ও আমি বাড়িতে আবদ্ধ ছিলাম, নগরীর দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে স্কুল তখন বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর আমরা আবার ক্লাসে ফিরে যেতে থাকলাম। নষ্ট হওয়া সময়গুলো পূরণ করার জন্য আমরা শনি ও রোববার ক্লাস করতাম, আবার নিয়মিত ক্লাসের সঙ্গে অতিরিক্ত সময়ও যোগ করা হতো।

একবার আমি ম্যাডাম হাদির কাছে অষ্টম গ্রেডের ফ্রান্স ক্লাস করতে যাচ্ছিলাম; এই শিক্ষক দশ বছর যাবত ফ্রান্স পড়াচ্ছেন, আমি ভাবছিলাম গতরাতে বাড়িতে 'হোম ওয়ার্ক'

www.pathagar.com

করতে পারিনি, ব্যাংকের গুলির শব্দে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম সবার কথা, এখন ম্যাডাম হাদিকে কি জবাব দেব। চারদিকের পরিবেশ, ছেলেমেয়েদের চলাফেরা, কথাবার্তা, লকার খোলার শব্দ, সবকিছু ছাপিয়ে গুলির শব্দ কানে ভেসে আসলো।

কেএএস-এর প্রাঙ্গণ ছিল একেবারেই খোলামেলা। যে কোনো দিক থেকে গুলি আসতে পারে। আমরা মধ্যম ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা স্থির হয়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে দশম গ্রেডের একটি লম্বা ছেলে, যাকে আমি সে সময় পছন্দ করতাম, আমাদের দিকে চেয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সে চীৎকার করে উঠল, 'মাটিতে শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।'

আমি সেই দশম গ্রেডের ছাত্রের কাছে আমার ভয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না, তাই ধীরে ম্যাডাম হাদির ক্লাস রুমের সামনে মেঝেয় শুয়ে পড়লাম। পনের মিনিট আমরা মেঝের উপর শুয়ে থাকার সময় স্কুলের মূল ফটকের বাইরে থেকে বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলির শব্দ আসছিল। এরপর আমি মেঝের উপর বসেই ফরাসী ভাষার হোম ওয়ার্ক শেষ করলাম। এরপর আমি গুলিবর্ষণের বিষয়টি অগ্রাহ্য করে বের হলাম, যদিও তখন আমার হাত দুটো কাঁপছিল।

বিকেলে যখন আমরা ৭০ ক্লিফটনের বড় খাবার টেবিলে লাঞ্চ করছিলাম, আমি আব্বাকে স্কুলের ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলাম। তিনি আমার এসব কাহিনী শুনতে তখন মনোযোগী ছিলেন না।

স্কুল নিরাপদ ছিল না। কিন্তু তবু এটি খোলা ছিল এবং পড়াশুনা হচ্ছিল। মনে আছে, সে বছরের প্রথম দিকে তিন সপ্তাহ শহরের গোলাগুলি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে আমাকে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। আমি আব্বাকে জানালাম, এই আটক অবস্থা আমার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণার মত লাগছে। করাচির অবস্থা ভয়াবহ হওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই আব্বা, আম্মা, জুলফি ও আমাকে স্কুল বর্ষের এক চতুর্থ সেমিস্টার পড়ার জন্য দামেস্কে পাঠিয়েছিলেন (এজন্য আমি গোপনে খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম, কারণ, এর ফলে আমার সঙ্গে স্কুলের পুরনো বন্ধুদের দেখা হলো।) 'তুমি স্কুলে যেতে চাও', আব্বা বললেন, 'ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করছি।'

পরদিন দেখা গেল, আমাদের গাড়ির পিছনের জানালায় বুলেটপ্রুফ আবরণ টেপ দিয়ে আটকানো। আব্বা জুনামের পুরানো বাদামী রঙের মার্সেডিসকে সাময়িকভাবে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে পরিণত করেছেন। আমার কাছে এটিকে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। আমি আপত্তি জানালাম 'এ অবস্থায় কিভাবে আমি স্কুলে যাব? মানুষ আমার দিকে চেয়ে হাসবে!' আসলে আমি আমাদের জীবনের ভয়াবহতার বাস্তব দিকটি বুঝতে পারিনি। আমি ভাবছিলাম যে, এগুলো শুধু হুমকি বাস্তবে না। 'খারাপ কিছুই না'। আব্বা বললেন যে, তিনি জানালা থেকে পর্দা খুলে ফেলবেন, যদি আমি নিজে তা পরি। আমি বললাম, 'কিন্তু আমার মাথা তো সেক্ষেত্রে খোলা থাকবেই। আমি তো শহীদের বা অন্য কোনো প্রকারে মৃত্যু চাই না। এরপর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল; ওই আবরণটি কিছুক্ষণ আমি পরলাম, কিছুক্ষণ জানালার উপর ঝুলিয়ে রাখা হলো। কেউ আমাকে দেখে হাসেনি। ছেলেরা আবরণ ও বুলেটপ্রুফ জানালার নিরাপত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, এটা কতটা জোরের আঘাত সহ্য করতে পারবে।

* * *

www.pathagar.com

অপারেশন ক্লিনআপ চলার এক বছর পর হেরাল্ড ম্যাগাজিন নামের একটি স্থানীয় ইংরেজি পত্রিকা প্রধানমন্ত্রীর করাচির গণহত্যামূলক সহিংস কর্মসূচির উপর একটি তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করল। বহুল প্রচারিত উর্দু ম্যাগাজিনের তুলনায় ইংরেজি ম্যাগাজিনের বিক্রি তখন কমই হতো। হেরাল্ড তের পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে, এর মধ্যে আছে সুনির্দিষ্ট পুলিশী আক্রমণের কথা। এ সমস্ত লিখেছেন বিশিষ্ট ও সম্মানিত অনুসন্ধানী সাংবাদিক গোলাপ হোসেন, তাকে সাহায্য করেছেন হাসান জায়েদী।

সেই সংখ্যার মলাটে এমকিউএম-এর সন্ত্রাসী নাঈম শারির একটি কাল্পনিক বীভৎস ছবি ছিল; এই ব্যক্তি পুলিশের দ্বারা নিহত হয়েছেন। সময়টা ছিল পুলিশী অভিযানের দ্বিতীয় বছর।

হেরাল্ড ম্যাগাজিন লিখেছে যে বেনজির করাচির একটি রাজনৈতিক সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তাকে সরকার কর্তৃক সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদেরকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর এরূপ বিচারবহির্ভূত কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। গত বছর (১৯৯০) যে ২,০০০-এর উপর মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র ৫৫ জন ছিল 'আলতাফ গ্রুপের' 'সন্ত্রাসী' এবং তাদের সবাইকে বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল যা ওই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর খোড়া যুক্তি এবং তার সরকারি সহিংসতার প্রচণ্ড রকমের প্রশংসা তার ভূমিকাকে নষ্ট করেছে; আসলে কী ঘটে চলছে, সে বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। তিনি জানেন যে, বর্বরতা চারদিকে হত্যার মাঠে পরিণত করেছে।

১৯৯৪ সালে ১,১১৩ জন লোক নিহত হয়েছে; এটিকে হেরাল্ড ম্যাগাজিন অভিহিত করেছে একটি 'রক্তাক্ত বিচার' হিসাবে, যা করাচিকে এক মৃত্যুর নগরীতে পরিণত করেছে। নগরে আগুন জ্বলছিল। পুলিশের কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না এবং তাদের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়াত তাদেরই তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। কোনোরূপ আটক করা হতো না– আইনগতভাবে তো নয়ই বন্দি করার সময়ও কোনো পরওয়ানা উপস্থাপন করা হতো না, নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক আটকৃতদের খুব কম সময়ই আদালতে নেয়া হতো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা হেরাল্ডকে গণহত্যার মাধ্যমে শত্রুকে হত্যার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বলেছেন যে, তারা আটক করে আদালতে চালান দিলে ছাড়া পেয়ে যায়, তাই এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপর একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বলেছেন যে, 'ক্লিনআপ অপারেশন'-এর দ্বারা বিচার বহির্ভূত হত্যার মাধ্যমে 'অপরাধ দমনের বিষয়টি অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ।'

অবশ্য প্রকাশ্যে এরূপ পূর্বপরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক হত্যার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। বন্দুকের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শক্তির সঙ্গে শত্রুর শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এরূপ কর্মকাণ্ড বিচার ব্যবস্থার ওপর অনাস্থার শামিল।

নসরুল্লা বাবর একজন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। তিনি এই অপারেশন পরিচালনা করতেন। তিনি হেরাল্ডকে আক্রমণ করে যুক্তি দেখিয়েছেন, 'আমি বুঝি না, যে সমস্ত লোক নিহত হয়েছে, তাদের নিয়ে আপনারা এত কথা বলেন কেন; ওরা তো নিহত হয়েছে মুখোমুখি যুদ্ধে, এ বিষয়ে রেকর্ড আছে।'

'সম্মুখযুদ্ধ' ছিল পুলিশের এক বিস্তারিত ব্যবস্থা এবং সবসময় একই ধরনের কায়দায়

www.pathagar.com

চলত। পুলিশ কিংবা রেঞ্জার 'এক্স' নামক স্থানে 'ওয়াই'কে ধরার জন্য গেল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আটক করা, কিন্তু ওয়াই গুলি ছোড়ার কারণে তারাও পাল্টা গুলি ছুড়ল, ফলে 'ওয়াই' নিহত হলো। নিহত ব্যক্তিকে সব সময়ই মাথায় অথবা বুকে গুলি করা হয়। তাদের কখনো পিছন দিক থেকে গুলি করা হয় না; সেক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো যেত যে, পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করা হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, তাদের দেহ অন্যান্য গুলির আঘাতে বিকৃত হয়েছে শারিরীক নির্যাতনের চিহ্ন, শরীরের হাড়-গোড় ভাঙা। সাক্ষী থাকে পুলিশের লোকজন, বাইরের কেউ না, তাই প্রকৃতপক্ষে বন্দুকযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল কিনা, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। যে সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তা এরূপ বন্দুকযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ অথবা অন্য কোনো প্রকার তদন্ত খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। এসকল ঘটনার মধ্যে মাত্র বিশটি ক্ষেত্রে পুলিশ কাস্টডিতে ও এনকাউন্টারে মৃত্যুর বিষয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু কখনো তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি এবং কেউই তাদের এরূপ কাজের জন্য শাস্তি পায়নি।

১৯৯৫ সালে করাচির মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে গেল, 'অপারেশন ক্লিনআপ' দ্বারা ২,০৯৫ জন লোক নিহত হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক জুলাই ১৯৯৫ থেকে মার্চ ১৯৯৬-এর মধ্যে যে সমস্ত লোককে হত্যা করা হয়েছে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, প্রতিদিন কয়টি করে খুন সংঘটিত হয়েছে, সবাই পুরুষ, পরিচয় পাওয়া গেলে নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা বিচলিত হওয়ার মত অবস্থা। বলির শিকার যারা হয়েছে, সবাই পুরুষ, জানা গেল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা অজানা 'দুষ্কৃতিকারী' বলে আখ্যায়িত হয়েছে অথবা 'এমকিউএম'-এর লোক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খুব অল্প ক্ষেত্রেই এসকল নিহতদের সম্পর্কে লেখা হয় চোর, ছিনতাইকারী, বাকি সবার ক্ষেত্রে পুলিশ 'এমকিউএম'-এর লোক বলে নিশ্চিত করে। সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত মৃতদেহের সংখ্যার সঙ্গে পুলিশের তৈরি করা তালিকার পার্থক্য বিরাট আকারের হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল বাবর উভয়েই জনগণের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার জন্য বলতেন যে, এ সফল দুষ্কৃতিকারী নিহত হওয়ার জন্য নগরীর পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা যে কতো অপকর্মে জড়িত ছিল, সে ব্যাপারে কিছু গল্পও তৈরি করা হয়। তাদেরকে এরূপভাবে মজা করার বিষয়টিকে তারা নৈতিকতাবিরোধী বলে মনে করেন না। 'যতক্ষণ আমাদেরকে স্পর্শ করে না, ততক্ষণ আমরা আদর্শবাদী হয়ে থাকি, কিন্তু আমরা আক্রান্ত হলে আমাদের মূল্যবোধ হয়ে পড়ে ভিন্ন রকমের।' কথাগুলো বলেছেন, জেনারেল বাবর তার এক সাক্ষাৎকারে।

হাসনাইন ও জায়েদী শবাগারে পর্যন্ত গিয়েছিলেন নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দেখতে। তারা দেখতে পান যে, মারাত্মক নির্যাতনের চিহ্ন মৃতদেহে , 'আটককৃত ব্যক্তিদের জলন্ত সিগারেট কিংবা লোহার রড, রেজার দিয়ে তাদের শারিরীক নির্যাতন করা হয়েছে এবং হাড় ভাঙা হয়েছে। মৃতদেহগুলো বেশিরভাগই ছিল বিকৃত অবস্থায়, এর ব্যাতিক্রম ছিল খুব কম। তাদের তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, পুলিশ আইন বহির্ভূতভাবে অনেক কাজ করেছে। অপারেশন ক্লিনআপ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হত্যাকাণ্ড। পুলিশের নিষ্ঠুরতা এবং বেআইনী কাজকে ক্ষমা করা হয় 'রাজনৈতিক বিবেচনায়।

করাচির পুলিশ খুন করেও পার পেয়ে যাচ্ছিল। রেঞ্জাররা ছিল আরও বেশি স্বাধীন,

www.pathagar.com

তারা আইনের কোনো তোয়াক্কাই করত না। যখন রেঞ্জার কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিয়ে আসত, তখন কোনো রেকর্ডই থাকত না, কারণ তারা কোনো স্টেশন বা এলাকার জন্য নিবন্ধনকৃত ছিল না। হেরাল্ড লিখেছে, 'আসল ব্যাপার হলো যে, পুলিশ যখন কোনো লোককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে, তার সন্ধ্যান পাওয়া অনেকটা সহজ হয়, যদি না তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। আটক করার বিষয়টি পুলিশ তিন/চার দিনের মধ্যে স্বীকার করে থাকে। কিন্তু রেঞ্জারদের কর্মস্থল জনসাধারণের জন্য রুদ্ধ, তাদের কাছে যেয়ে কোনো খোঁজ পাওয়ার সুযোগ নাই।

আইনত রেঞ্জারদের কাউকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা নাই– তাদের দায়িত্ব শুধু আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। হেরাল্ডের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এমকিউএম-এর একজন প্রাক্তন কাউন্সিলর তসলিমুল হাসান ফারুকী সৌভাগ্যবশত রেঞ্জারদের হাত থেকে জীবিত বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। 'তাকে কানে গরম লোহা ঢুকিয়ে এবং পিঠে ও পায়ে ছুরির পোচ দিয়ে চরম নির্যাতনের পর বাণিজ্য এলাকার আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। 'ফারুকী আগে কখনো অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন না; তিনি সন্ত্রাসী বলেও পরিচিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী। মুক্তি পাওয়ার পর ফারুকী করাচির বাইরে চলে যান তার পরিবারের কাছে। তাকে আটক এবং তার উপর অত্যাচার করার জন্য কোনো রেঞ্জারকেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি।'

হাসনাইন ও জায়েদী করাচির জিন্নাহ হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে দেখেছেন পঁচিশ মিনিটে চারটি মৃতদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করতে। এই হাসপাতালটি গুরুত্বপূর্ণ দুটো জরুরি হাসপাতালের একটি, যেখানে পুলিশ কেস নিয়ে কাজ করা হয়। অনেক সময় মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে আনা হয় অনেক পরে, ততক্ষণে তা বিকৃত আকার ধারণ করে এবং ময়না তদন্ত বা আদালতে উপস্থাপনের উপযোগী আলামত নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই সঠিক ময়না তদন্ত করার চেষ্টাও করা হয় না। এমএলও বা মেডিকেল লিগ্যাল অফিসার সাধারণত নিহতের বুকে একটি ছিদ্র করেন এবং তারপর সেলাই করেন, যাতে দেখলে মনে হবে যেন ময়না তদন্ত করা হয়েছে। লেখক তার বক্তব্যের স্বপক্ষে ভয়াবহ আলোকচিত্রও দিয়েছেন।

হেরাল্ডের সাংবাদিক চিকিৎসক সমাজের বিষয়ে কিছু দুর্ভাগ্যজনক তথ্য পান। অপারেশন ক্লিন-আপ চলাকালীন সময় করাচির পঞ্চান্নজন এমএলও এবং আটজন সহকারী সার্জনের মধ্যে কেউই ময়নাতদন্ত বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রশিক্ষিত ছিলেন না– অথচ ময়না তদন্ত করার জন্য এটি হলো প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সিন্ধু প্রদশের যে নয় জন ডাক্তার ময়নাতদন্তের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন করাচির ১৯৯০-এর দশকের হত্যাযজ্ঞের সময় তারা এমএলওর পদে নিযুক্ত হতে পারেননি, কারণ এই পদের ডাক্তারদের অর্থনৈতিক বিশেষ সুবিধা দেয়া হতো, আর ওই ডাক্তাররা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, যেহেতু তাদের কোনো রাজনৈতিক সংযোগ ছিল না। তাছাড়া, সে সময়ের করাচির একমাত্র ফরসেনিক লেবোরেটোরিতে একশ' জন কর্মচারী কাজ করত, অথচ একজনও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিল না।

যখন 'করাচির অপারেশন ক্লিনআপ' সফল সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষিত হলো, তার আগেই ৩,০০০ লোক করাচির রাস্তায় নিহত হয়। এগুলো হলো সরকারি হিসেবে– যাদের

www.pathagar.com

কফিনের উপর নাম লেখা ছিল, যাদের আত্মীয় স্বজনরা সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে এবং কবর দেয়া হয়েছে। এছাড়া অনেকেই রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক হত্যার শিকার হয়েছে, যাদের শনাক্ত করা বা দাবি করা হয়নি। লোকজন বলেছে যে, করাচির কিছু অংশ কোরাঙ্গি ও এর মত জায়গাগুলোতে মৃতদেহ খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হতো, যার দ্বারা জনগণকে এক ধরনের সতর্ক করে দেয়া হতো।

হেরাল্ড এর 'অপারেশন ক্লিনআপ' ইস্যুর মলাটে নয়ীম শাররীর রক্তাক্ত মুখের ছবি ছাপা হয়েছিল। ম্যাগাজিনটি যখন প্রেসে যায়, তখন সেই ছিল রাষ্ট্রের সর্বশেষ ঘৃণ্যতম কাজ। শাররীকে পুলিশকে প্রচণ্ডভাবে খুঁজছিলো, এমকিউএম-এর একজন ভয়াবহ ব্যক্তি; সে ছিল অনেকগুলো হত্যা মামলা ও অন্যান্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৫০ লক্ষ টাকা। ১১ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে শাররী ও তার একজন সহযোগী পুলিশের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হয়। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে যে রেঞ্জাররা ছিল তারা দাবি করল যে, দুই ব্যক্তি গ্রেফতার প্রতিরোধ করেছিল এবং তাদের উপর গুলি বর্ষণ করেছিল– এটি একটি সাধারণ ওজব– এবং এজন্যই রেঞ্জারদের পাল্টা গুলি চালাতে হয়েছে; যার ফলে প্রচণ্ড বন্দুকযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে, যার মধ্যে চারজন রেঞ্জার আহত হয়েছেন। তবে, হেরাল্ড এর সাংবাদিকদের অনুসন্ধানে আরও ভয়াবহ ব্যাপার উন্মোচিত হয়। হাসনাইন ও জায়েদীর অনুসন্ধানী রিপোর্টে জানা যায়, রেঞ্জাররা তাদের শক্তিশালী বুলেট দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফেরত এসে গায়ে লাগায় আহত হয়, আর অন্যদিকে শাররী ও তার সহযোগীরা সরাসরি গুলিতে নিহত হয়। শাররীর মৃত্যু ক্রসফায়ারে হয়েছে বলে রেঞ্জারদের দাবি, তার দেহ এবং ছবি দেখে মনে হয় না। তার শরীর ও চামড়া অনেক স্থানে তুলে ফেলা হয়েছে। শরীরের বাম অংশে বিরাট কাটা এবং হাড় পর্যন্ত দেখা যায়। সাধারণ বন্দুকযুদ্ধে তার মৃত্যু হয়নি।

শাররী ও তার সহযোগী ছিল সবকিছুর বিবেচনায়ই প্রচণ্ড রকমের সন্ত্রাসী, কিন্তু আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও তাদের আছে। আমার ফুফুর বন্ধু ও সমর্থকরা আমি পাকিস্তানের সংবাদপত্রে অপারেশন ক্লিনআপের বিষয় এবং বেনজিরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে লিখেছিলাম বলে আমাকে আক্রমণ করেন। তারা বলেন, 'ওরা হলো দানব প্রকৃতির। তাদের এভাবে দমন করা ঠিকই হয়েছে। আমাদের উচিত এখন সোয়াতে ও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা আরও ক্লিনআপ চাই।' এখন সরকার ঠিক তাই করছে।

একটি নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থার মতে 'নিরাপত্তা বাহিনী অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও প্রতিশোধমূলক আক্রমণ পরিচালনা করেছে।' বিবিসি'র সংবাদে প্রকাশ পায় যে, সোয়াত উপত্যকায় বাইশটি মৃতদেহের কবর দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে মোট রহস্যজনক মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫০। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক পাওয়া গেছে চোখ বাঁধা অবস্থায়, কিছুসংখ্যক হাত-পা বাধা অবস্থায়। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন দাবি করেছেন, সরকার যেন সোয়াতের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

www.pathagar.com

২১

এই ছিল আমার তরুণ বয়সের করাচি। এই নগরীকেই আমরা ভালোবাসতাম এবং ভয় পেতাম। ১৯৯৪ সালের শীতকালে আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলাম করাচি পুলিশ বাহিনীর বর্বরতার, তবে এটিই শেষ ছিল না।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে তা ঘটল। করাচির তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে। আরব সাগর থেকে হালকা বাতাস আসছিল, ঋতু পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। তাপমাত্রা মোটামুটি শীতকাল হিসেবে উষ্ণই ছিল। জুনাম করাচির বিশেষ আদালত থেকে ফিরছিলেন; সেখানে মুর্তজার মামলার শুনানি চলছিল। মুর্তজাকে প্রায়ই হাকিমের সামনে উপস্থিত হতে হয়, যাতে তার জামিন বাতিল না হয়, তবে কখনো কখনো তার আইনজীবীর উপস্থিতিই যথেষ্ট হয়, তখন জুনাম তার সঙ্গে যান, যাতে সবকিছু ঠিক মত হয়। সেদিন তার যান আলী হিঙ্গারো, যিনি আব্বার একজন উপরের স্তরের কর্মী। জুলফিকার আলীর গ্রেফতারের পর তিনি ছিলেন পিপিপির একজন উঁচু স্তরের সক্রিয় কর্মী এই আলীই জুনাম ও আম্মার সঙ্গে আব্বার নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি প্রাণ বাজি রেখে পিপিপির জন্য কাজ করেছেন।

তারা আদালত থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় আসার পর জুনামের গাড়িকে একটি পুলিশের গাড়ি থামালো। পুলিশের গাড়ি জুনামের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসল, পুলিশ পুরানো বাদামী রঙের মার্সিডিজ গাড়িটির দরজা খুলল, আলীর বাহু কষে ধরে তাকে গাড়ি থেকে জোর করে নামাল। তারা তাকে গ্রেফতারি পরোয়ানা না দেখিয়ে এবং কেন তাকে আটক করল তা না জানিয়েই ধরে নিয়ে গেল। বলা হলো যে, মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ শাহ'র আদেশক্রমে তাকে বন্দি করা হলো। আমার পিতার কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক হয়রানি করার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ফ্রাইডে টাইমস-এ অল্প কিছুদিন আগেও এধরনের কিছু ঘটনার বিবরণসহ মুর্তজার এক কৌতুকপূর্ণ চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। জুনাম গাড়ি থেকে নামলেন। তিনি চেষ্টা করলেন, যেন আলীকে নিয়ে না যায়। যে অফিসার আলীকে ধরেছিল, তার আর মোবাইল ইউনিটের মাঝখানে যেয়ে তিনি গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখতে চাইলেন। পুলিশ রূঢ়ভাবে জবাব দিল যে, ওই সমস্ত নেই। আলীকে বেআইনীভাবে গ্রেফতারি পরওয়ানা ছাড়াই করাচি কেন্দ্রীয় জেলে নেয়া হলো। সেটিই ছিল জুনামের জন্য তাকে শেষবারের মত দেখা।

আলী হিঙ্গারো ছিলেন আজীবন পিপিপি ও ভূট্টো পরিবারের সমর্থক। তিনি বড় হন করাচিতে, ছিলেন একজন ভালো খেলোয়াড়, ফুটবল প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার লাভ

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু এরপর তিনি জীবনকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেললেন। জুলফিকারের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর তিনি এমআরডি-এর আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি এমআরডি-এর তৃণমূল পর্যায়ের একনিষ্ঠ কর্মী হন। নুসরাত এবং আলীর ভাই ওসমান স্মরণ করেন যে, আলীর জন্য ৭০ ক্লিফটনের দরজা খোলা থাকত– ৭১ ক্লিফটনের পারিবারিক অফিসের ঠিক অপর দিকে– তাকে নিচতলার সংলগ্ন কক্ষে অফিস হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হতো।

১৯৮৬ সালে বেনজির যখন করাচি ফিরে আসেন, আলীই তার জন্য জিন্নাহ বিমান বন্দরে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজনকে সংগঠিত করেন। লেয়ারিতে আলীর সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোকের জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে তিনি ট্রাকের উপর চড়ে যাচ্ছিলেন, তার নিরাপত্তার সকল প্রকার ব্যবস্থা করেন আলী, তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য। বেনজির আলী সম্পর্কে উৎফুল্ল জনতাকে বলেছেন যে, সে তার সবচেয়ে আদরের ভাই।

* * *

কারাগারে আলীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল। তার পরিবার বিশ্বাস করে যে তাকে প্রতিদিন নির্যাতন করা হতো। তারা বলেন যে, কারাগারে যাওয়ার আগে তার শরীর সুস্থ ছিল, অথচ সেখানে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তার শরীর ভেঙে পড়ল। আলীর ভাই ওসমান মনে করেন যে, তাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল; সে সময়ের করাচির কেন্দ্রীয় জেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে আসিফ জারদারির ঘনিষ্ঠতা ছিল। আলীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার জন্য তার পরিবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও তার স্ত্রীকে দায়ি করেন। আলীকে আঘাত করা হয়েছিল, তার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল, মুর্তজা সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্য রাখার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাকে মুর্তজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়ার জন্য চাপ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

ওসমানের মনে আছে, মীর বাবা তাকে তাই করতে বলেছিলেন। তিনি আলীকে সংবাদ পাঠান– 'ওরা যা বলে তাই কর। আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখ, সাংবাদিক সম্মেলন কর। তোমার জীবনের মূল্য আমাদের কাছে অনেক।' কিন্তু তারপরও আলী অস্বীকৃতি জানালেন।

সম্মানিত বিচারপতি নাসির আসলাম ছিলেন তখন সিন্ধুর প্রধান বিচারপতি। তিনি এখন করাচি জেলের মহিলা ও শিশু বিষয়ের উপর কাজ করেন। আলী হিঙ্গারোর বেআইনী গ্রেফতার ও আটকের বিষয়টি যখন আদালতে আসে, তিনি তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দেন। বিচারপতি নাসির আসলাম জাহিদ রায় দেন যে আলী নির্দোষ ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে মামলাটি অন্য আদালতে স্থানান্তরিত হলো। একজন নূতন বিচারপতি এই মামলাটি গ্রহণ করলেন। ওসমান বললেন, 'আমরা তখন লড়লাম স্বাস্থ্যগত কারণে তার মুক্তির জন্য। কিন্তু কিছুই হলো না।'

আব্বা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ, যিনি মোহাজির না হওয়া সত্ত্বেও সিন্ধুর আইন-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। আলীর ব্যাপারে তিনি ভীত ছিলেন। তিনি পৃথকভাবে কয়েকজন বিচারপতিকে লিখে আবেদন জানিয়েছিলেন আলীর

www.pathagar.com

বেআইনী আটক সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য। তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং আলীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগগুলোও তাদের জানিয়েছিলেন।

২৬ মার্চ আব্বা আলীকে একটি চিঠি লিখলেন, 'তুমি একজন সাহসী ও সম্মানিত তরুণ ব্যক্তি। আমার কাছে তুমি আর আমার ভাই শাহনেওয়াজ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। চূড়ান্ত বিচারক আল্লাহ এবং আমরা তার আদালত থেকে বিচার চাই। তোমার যন্ত্রণাদাতাকেও সেই আদালতের সামনে হাজির হতে হবে।' তিনি চিঠিতে স্বাক্ষর করলেন, 'তোমার ভাই মুর্তজা ভুট্টো।' মৃত্যুর আগে আলীকে জিন্নাহ হাসপাতালের বন্দি শাখায় পাঠানো হয়েছিল। তাকে বলা হলো যে, যদি মুর্তজা ভুট্টো তাকে দেখতে আসে, তবে তাকে আবার জেলে ফেরত পাঠানো হবে এবং সেখানে সে মৃত্যুর অপেক্ষা করবে।

অবশেষে আলীকে আগা খান হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তিনি তখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এবং মুর্তজাকে দেখতে আসতে বললেন। আব্বা গোপনে ২৭ এপ্রিল রাতে তাকে দেখতে গেলেন। হাসপাতালের অনেকগুলো প্রবেশ পথের মধ্য একটির মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি চালানো হলো, আব্বা পিছনের আসনে আড়াল হয়ে বসলেন। গাড়ি থামার পর দ্রুত চলে গেলেন আলীর মৃত্যুশয্যায়। ওসমান তখন সেখানে ছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণ করেন, 'আমরা তখন তাদের একা থাকার সুযোগ করে দিয়ে বাইরে গেলাম।' আলী তখন প্রায় কোমায় ছিলেন। তার পক্ষে তখন কথা বলা ছিল খুব কষ্টকর। কিন্তু আমরা জানালা দিয়ে দেখলাম যে, তিনি মীর বাবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। তারা উভয়েই কাঁদলেন। আব্বা আলীর সঙ্গে একঘন্টারও বেশি সময় কাটিয়েছিলেন।

পরদিন সকাল ৬-৩০ মিনিটে আলী মৃত্যুবরণ করেন। ওসমান বললেন, 'তিনি মীর বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।' সেদিন আমাদের পরিকল্পনা ছিল করাচির হক্সবে সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার। এটি ৭০ ক্লিফটন থেকে একঘন্টার পথ। আম্মা ও আব্বার কিছু কূটনীতিবিদ বন্ধু, যাদের সঙ্গে নতুন বন্ধুত্ব হয়েছে, যেমন ডাচ ও ব্রিটিশ কনসাল, তাদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করার পরিকল্পনা ছিল। সকাল বেলাই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমন সময় এই দুঃসংবাদ আসল। আব্বা শোবার ঘরে আসলেন, বিচলিত বোধ করলেন। তিনি আম্মাকে বললেন, 'বেজন্মারা ওকে হত্যা করল।' আলীর একমাত্র অপরাধ তিনি মুর্তজা ভুট্টোর বিরোধিতা করেননি। এজন্য তাকে জীবন দিতে হলো।

জুলফিকে বাড়িতে রেখে আমরা দাফনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য সরাসরি আলীর পারিবারিক বাড়ি লেয়ারির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। জুলফি তখন খুব ছোট ছিল, তাই ওকে বাড়িতে রেখে যাওয়া হলো। আব্বা পুরুষদের জমায়েতে গেলেন, আম্মা ও আমি গেলাম মহিলাদের অংশে। আমার মনে আছে, আলীর মা তখন সাদা কাপড় বিছানো কোনো কিছুর সামনে বসে কাঁদছিলেন। সেটি ছিল আলীর কফিন। তিনি বার বার একই কথা বলে বিলাপ করছিলেন, 'ওরা আমার সন্তানকে হত্যা করেছে।' তিনি ওই কাপড় হাত দিয়ে আগলিয়ে দিলেন। সেটি যে আলীর কফিন, তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম কাছে যাওয়ার পর। আমি কোনো শবদেহের এত কাছে গেলাম এই প্রথম। দ্বিতীয়বার খুব শিগগিরই আসবে।

* * *

www.pathagar.com

সারা পাকিস্তানব্যাপী জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী 'অপারেশন ক্লিনআপ' করাচির বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছিল, যার ফলে গৃহযুদ্ধের ভীতি এবং করাচি সিন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল। এটি ছিল এমকিউএম থেকে একটি ভয়াবহ হুমকি এবং এর ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক সচলতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখা দিল। শুধু সহিংসতাই বেনজিরের দ্বিতীয় পর্যায়ের সরকারের ভিত্তি নাড়া দিল না, প্রথম দম্পতির দুর্নীতির কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে হিসাব করে দেখা গেছে যে, দ্বিতীয় বারের শাসনামলে তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে চুরি করে কোথাও বাইরে রেখেছেন ২ বিলিয়ন থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার।

'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সংবাদ ছাড়া জন বার্নস 'দুর্নীতির ভবন' শিরোনামের নিবন্ধনে বর্ণনা করেছেন জারদারিদের দুর্নীতির বিষয়। তারা ইংল্যান্ডে বিরাট ভবনসহ জমি কিনেছেন, সেটির ডাক নাম দিয়েছেন 'সুরে প্যালেস'; এর মূল্য আনুমানিক ৪ মিলিয়ন ডলার। পরবর্তীতে এই দম্পতি এটির মালিক যে তারা, তা অস্বীকার করেন যদিও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ওই বাড়ির কিছু শিল্পকর্ম পাকিস্তান সরকারের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন, এজন্য যে এগুলো যে প্রথম দম্পতির দেয়া উপহার, তার নিদর্শন হিসেবে যখন বিলাতের আদালত বাড়িটি বিক্রির জন্য নোটিশ জারি করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাকিস্তান সরকারকে ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল, জারদারি তখন দাবি করলেন যে, আসল মালিক হিসেবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাকে ফেরত দেয়া হোক।

বার্নস বর্ণনা দিয়েছেন যে, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে জারদারি 'কার্টিয়ার ও বুলগারি' নামক অলঙ্কারের দোকানে অর্ধ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। কিন্তু বিষয়টি শুধুমাত্র কেনাকাটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এই দম্পতি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি লেনদেনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৯৫ সালে একজন ফরাসি সামরিক বাহিনীর ঠিকাদার একটি ব্যবসায়ীক লেনদেনে স্বাক্ষরদান করেন, সেখানে জারদারি এবং একজন ব্যবসায়ি সহযোগীকে এক বিলিয়ন যুদ্ধ বিমানের ব্যবসার জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তবে সে ব্যবসাটি আর হয়নি।

বেনজিরের প্রথম সরকারের সময়, যখন আমরা সিরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম, সরকারি সফরে সেখানে গিয়ে জারদারি আব্বাকে একটি মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যস্থতা করে দিতে বলেছিলেন এবং এর পরিবর্তে তাকে লভ্যাংশ দেয়ার প্রস্তাব করেন। আব্বা এতে প্রচণ্ডরূপে বিরক্ত বোধ করছিলেন। তিনি কখনো তার বোনের স্বামীকে পছন্দ করেননি। তার দুর্নীতির কাহিনী শুনে মনে খুব আঘাত পেতেন; তিনি ভেবে দুঃখ পেতেন যে, এরূপ একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি জুলফিকারের নাম এবং স্মৃতিকে পুঁজি করে বিশ্বের অনেক বিনিয়োগকারীদের সুবিধা আদায় করবে। তিনিও বিরক্ত হয়েছেন জারদারি যখন জুলফিকার আলী ভুট্টোর উত্তরাধিকার কী, তার সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না। প্রকাশ করল সে এতই কুটিল যে, একজন শহীদের সন্তান, যিনি একযুগ নির্বাসনে থাকা অবস্থায় সংগ্রাম চালিয়েছেন, যিনি তার বিশ্বাসের সঙ্গে কখনো আপস করেননি; কিভাবে সে ধারণা করে মুর্তজা তার লোভনীয় প্রস্তাবে লাফ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে। 'আমরা এসব করি না জারদারি।' আব্বা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন।

www.pathagar.com

বেনজির দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার মাত্র এক সপ্তাহ পর তার সুইস ব্যাংকার ক্যাপরিকর্ন ট্রেডিং নামের একটি অফশোর কোম্পানি স্থাপন করেন জারদারিকে তার মালিক হিসেবে। নয় মাস পর ট্রেডিংয়ের নামে সিটি ব্যাংকের দুবাই অফিসে একটি হিসাব খোলা হয়। একই দিনে সিটি ব্যাংকের জমা স্লিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এআরওয়াই কর্তৃক পাঁচ মিলিয়ন ডলার জমা করা হয়। এআরওয়াই হলো দুবাই ভিত্তিক পাকিস্তানি সোনার ব্যবসায়ী। তারা খাঁটি সোনার ভারি বৃত্তাকার নেকলেস তৈরির জন্য বিখ্যাত। পরে আরও ৫ লাখ ডলার ওই হিসেবে জমা করা হয়েছিল।

এভাবে দুর্নীতি চলতেই থাকল। পোল্যান্ডের ট্র্যাক্টরের একটি ব্যবসার লেনদেনে সম্পত্তি কেনা সম্পন্ন হয় স্পেনে। খাদ্যের বদলে বিনিময়ে। ওয়েন বেননাটের নেতৃত্বে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে বিবিসির এক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, পেট্রোলাইন এফজেড নামক ইউএই-এর একটি বড় কোম্পানির সঙ্গে বেনজিরের লেনদেন হয়, সেখানে বেনজিরকে চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক করা হয় (তার সঙ্গে ছিল তার কোনো আত্মীয় এবং অন্য একজন রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি) সেখানে বেনজিরের স্বাক্ষর ও তার পাসপোর্টের ফটোকপি ছিল ('পেশা : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী'); বেনেট জোনস দাবি করেন যে 'খাদ্যের পরিবর্তে তেল'-এর লেনদেন কেলেঙ্কারির অনুসন্ধান কাজ করার সময় তিনি এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। জাতিসংঘ এ বিষয়ে স্বাধীন তদন্ত কাজ পরিচালনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল, যার প্রধান করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রিজার্ভের প্রাক্তন প্রধান পল ভোলকারকে। ওই তদন্তে দেখা যায় যে, সাদ্দামের আমলে ১৪৫ মিলিয়ন ডলারের ইরাকী তেল কেনার ব্যবসার জন্য ঘুষ আদান-প্রদান হয় ২ মিলিয়ন ডলার। বেনজিরের প্রাক্তন প্রেস সচিব হোসেন হাক্কানী তার প্রাক্তন বস সম্পর্কে বলেছেন 'তিনি ভুট্টো পরিবার ও পাকিস্তনের মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখতে পান না। তার মনে হয়, তিনিই পাকিস্তান, তাই তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন।' ডিগবাজী খেতে ওস্তাদ হাক্কানী এখন জারদারির ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত।

তবে যে মামলার কারণে এই দম্পতির সম্মান নিচে নেমে গেছে, তা হলো এসজিএস/কোটনা মামলা, যেটিতে জারদারিরা সুইস আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হয়েছিলেন একটি সুইস কোম্পানিকে সরকারি শুল্ক সংশ্লিষ্ট কাজের চুক্তির জন্য ১৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষ গ্রহণ করার কারণে। ২০০৭ সালের বিবিসির অনুসন্ধানের ফলে এই বিচার অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে তারা অভিযুক্ত হন।

১৯৯৭ সালের গ্রীষ্মকালের কোনো এক সময় জারদারি দ্বিতীয়বার কারাগারে আবদ্ধ হন; নতুন দুর্নীতি ও খুনের মামলায় তিনি এবার কারারুদ্ধ। এ সময়ে বেনজির কেনাকাটা করার জন্য লন্ডন গেলেন। বন্ড স্ট্রিটের একটি দোকান থেকে তিনি একটি নীলকান্তমণি ও মুক্তার অলঙ্কারের সেট কিনলেন ১৯০,০০০ ডলার মূল্যে। এক বছর পর– এই অলঙ্কার সেটের অত্যন্ত ব্যয়বহুল নেকলেসটি সুইস হাকিম ড্যানিয়েল ডিভার্ডট বাজেয়াপ্ত করেন। এটি কিনতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তার অনুসন্ধান করতে ব্যাংক দলিল, রশিদ, ইত্যাদির জন্য রিপোর্ট লিখতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ব্যায় করেন। সুইস হাকিমের পক্ষে বিস্তারিতভাবে গবেষণা ও তদন্ত হওয়ার পর বেনজির ও তার স্বামী অর্থ চালাচালি ও ঘুষ গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত হন, তখন বেনজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই অর্থের একটি অংশ ব্যয়

www.pathagar.com

করা হয়েছিল বন্ড স্ট্রিটের অত্যন্ত দামি অলঙ্কারটি কেনার জন্য। ডেভার্ডট বেনজির ও জারদারিকে সমানভাবে দোষী সাব্যস্ত করলেন; যে ব্যাংক একাউন্ট থেকে অলঙ্কারের দাম পরিশোধ করা হয় সে একাউন্টের মালিক ছিলেন বেনজির এবং যে ব্যাংক একাউন্টে ঘুষ গ্রহণ করা হয়েছে সে একাউন্টটি স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ডিভার্ডটের ২০০৩-এর রায়ে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে; 'বেনজির ভুট্টো জানতেন যে, যে রূপ অপরাধমূলক কাজ তিনি করে যাচ্ছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে তার নিজের ও স্বামীর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে, তা ছিল পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।' শুধু বেনজির ও জারদারিই সুইস আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হননি; বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় নুসরাতও এই মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ব্যাংক হিসাবে কন্যা বেনজিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যখন জিয়ার একনায়কত্ব চলছিল, তাদের একে অন্যের আইনসঙ্গত প্রতিনিধি হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রাক্তন প্রথম দম্পতিকে ১১.৯ মিলিয়ন ডলার পাকিস্তান সরকারকে ফেরত দেয়ার আদেশ জারি করা হলো, বন্ড স্ট্রিট নেকলেস রাষ্ট্রের কাছে জমা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাদের ১৮০ দিনের কারাদণ্ড হলো।

তারা এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আবেদন করলেন, তবে ইতোমধ্যে তাদের অনেক সম্মানহানি হয়েছে। ২০০৭ সালে বেনজির একনায়ক জেনারেল মোশাররফের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় রেকনসিলেশন অধ্যাদেশ জারির ব্যবস্থা করেন; এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যাংকার এবং সুইস আদালতের এসজিএস/ কোটিনা মামলার অভিযুক্তদের বিগত বিশ বছরের সমস্ত মামলা থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপরও বেনজির তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বলেছেন, 'গরীব কে আর ধনী কে? যদি আপনি মনে করেন যে, আমি ইউরোপীয় মানের ধনী, না আমি তা নই। আমার কি এক বিলিয়ন ডলার আছে বা এমনকি একশ' মিলিয়ন ডলার, বা তার অর্ধেক? না, আমার নাই। কিন্তু আপনি যদি সাধারণভাবে মনে করেন আমি ধনী, হ্যাঁ আমি ধনী। ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর জারদারি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি ১.৮ বিলিয়ন ডলার সম্পদের অধিকারী। জনগণের ধারণা যে তিনি এবং তার স্ত্রী পাকিস্তান থেকে যা চুরি করেছেন তার একটি ক্ষুদ্র অংশ এটি।

বেনজিরের সরকার রাজনৈতিকভাবে বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতেন। দলীয় আনুগত্যের বিচারে হাকিমদের নিয়োগ ও পদায়ন হতো। যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রায় দিতেন তাদের বরখাস্ত করা হতো। তার আসল স্বরূপ প্রকাশ পায় তার সরকারের 'ভূতের স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্কুল খোলা হয় বিদেশী এনজিও বা ধনী দেশগুলোর আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে, পিপিপির নেতারা ফিতা কাটেন এবং ঘোষণা দেন এই কর্মসূচির অধীনস্থ শততম বিদ্যালয় খোলার, কিন্তু বিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ডেস্ক, বইপত্র, শিক্ষক, ছাত্র কিছুরই ব্যবস্থা করা হয় না। প্রচুর অদক্ষতার নিদর্শন দেখা যায় এবং পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষুব্ধ হতে থাকে।

এক বছর পাকিস্তান ভ্রমণ করার পর, স্থানীয় প্রেসক্লাব কথা বলে, সংসদে সমালোচকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে এবং নিয়মিত উর্দু ও ইংরেজি খবরের কাগজে লিখে মুর্তজা দেখিয়েছেন যে, তিনি একজন ভিন্ন ধরনের পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ। ষোল বছর

www.pathagar.com

নির্বাসনে থাকার পর তিনি এই ধারণা নিয়ে পাকিস্তানে ফেরেননি যে, ভুট্টোর নাম নিয়ে তিনি সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তিনি ফিরে এসেছেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে, তিনি সতর্ক ছিলেন যে, তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে।

মুর্তজার কঠোর পরিশ্রম এবং বেনজিরের ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে জনগণ মুর্তজার দিকে ঝুঁকে পড়ল যারা প্রথমদিকে তাকে অনভিজ্ঞ বলে স্বীকৃতি দেননি, তারাও এখন তাকে সমর্থন করতে শুরু করলেন। জুলফিকারের মৃত্যু দিবস এপ্রিল উপলক্ষে একজন কলম লেখক লিখেছেন : বেনজিরকে ভুট্টোর উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি বেখাপ্পা। একমাত্র উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলা যায় মীর মুর্তজাকে। কিন্তু বেনজিরই এই উত্তরাধিকারিত্ব দখল করে আছেন। কিন্তু বাস্তব প্রশ্ন হলো, তিনি এই উত্তরাধিকারিত্ব দিয়ে কি করেছেন? উপসংহার হতাশাজনক এবং সারাদেশের খবরের কাগজ ও বৈঠকখানার আলোচনার বিষয়।

আব্বা ১৯৯৪ সালের শীতে সেখানে তার রাজনৈতিক কর্মসূচি লেখা শুরু করেন এবং সেখানে রাজনৈতিক অসুস্থতার জন্য পিপিপি যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার প্রতিকার সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। এটি এক ধরনের পারিবারিক প্রচেষ্টা।

আব্বা কর্মসূচী লেখা শুরু করার পর থেকে দীর্ঘদিন পর বাড়িতে অবস্থান করছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আনন্দেই কাটতে থাকল। আব্বা যখন নিচতলার বৈঠকখানায় বসে লিখতে থাকেন, আমরা তাকে সাহচার্য দিতাম।

তিনি বসতেন তার সবুজ রংয়ের আরাম কেদারায়; চার বছর বয়স্ক জুলফি আঁকতে থাকত, আর আমি লম্বা নীল রংয়ের সোফায় বসে পড়তাম। আব্বার লেখা শেষ হওয়ার পর আম্মা তার সঙ্গে বসে সেগুলো টাইপ করতেন। লেখার শিরোনাম ছিল, নতুন নির্দেশনা, পিপিপিতে সংস্কার এবং পাকিস্তানি সমাজ, ১৯৯৪ সালে ছাপানো হয় এবং লেখাটি রাজনৈতিক দল হিসেবে পিপিপির প্রচারণা চালাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

লেখাটি প্রকাশ হওয়ার একমাস আগে এর ভূমিকা লেখা হয়েছিল তা ছিল আবেগজড়িত এবং উত্তপ্ত।

> শহীদ ভুট্টোর শ্লোগান 'খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান।' কিন্তু অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ এবং কুখ্যাত উপদলীয় লোকজন, যারা দলকে ছিনিয়ে নিয়েছে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এবং সবসময় লুটপাট ও চুরিতে ব্যস্ত থাকে, তারা জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করে না, তারা অল্প কিছু লোককে সুবিধা দেয়, সাধারণ জনগণের করের অর্থ দিয়ে পুলিশকে ব্যবহার করে ভাড়াটে বাহিনীর মত, বিরোধী মতকে দমন করার জন্য।

তিনি তার প্রত্যাশার কথা লিখেছেন :

> পিপলস পার্টির বৈশিষ্টের মূল ভিত্তিতে থাকতে হবে শহীদ ভুট্টোর চিন্তাধারা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয়ের কারণে শহীদ ভুট্টোর চিন্তাধারার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটানো যেতে পারে, কিন্তু তা করতে হবে মূল কাঠামো ঠিক রেখে মূল চিন্তা-চেতনার উপর ভিত্তি করে। এই হবে আমার প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

'নতুন নির্দেশনার'র মধ্যে মুর্তজার পাকিস্তান আগমনের পর থেকে সমস্ত বক্তব্যের সার কথাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; সেখানে আছে ক্ষমতার পুনর্বণ্টন এবং রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীকরণ, সিন্ধুর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কৃষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দ্বিপাক্ষিক বিদেশ নীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আরও বিভিন্ন বিষয়।

আব্বা ইস্তেহারের প্রথম মুদ্রণ হাতে পাওয়ার পর আমাকে পড়তে দিলেন এবং আমার মন্তব্য জানতে চাইলেন। আমার ত্রয়োদশতম জন্মদিন পার হয়েছে ছয়মাস আগে এবং আমি মাত্র জানতে পারলাম মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের যুগান্তকারী রায়– রো বনাম ওয়াদে। আমি অনুভব করলাম যে মহিলাদের প্রজন্মের উপর তার অধিকারের এখন বড় হুমকি, আধুনিক জগতে আর কিছু নেই। আমি আব্বাকে বললাম যে, গর্ভপাতের স্বাধীনতা আবার গর্ভনিরোধ প্রকল্প গ্রহণ, দুটো বিষয় তার ইস্তেহারে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ছিল।

আমি আরও পরামর্শ দিয়েছিলাম এইডস সচেতনতা এবং এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন। আমি মাত্র একটি শিক্ষামূলক উপন্যাস পড়া শেষ করেছি, সেখানে একটি অল্প বয়সী মেয়ের এইডস আক্রান্ত হওয়ার কাহিনী আছে। আব্বা আমার পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি আমার ভাবনাগুলোও ইস্তেহারে সংযোজন করলেন। তিনি প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তথাপিও তিনি মেয়ের কোনো ছেলে বন্ধু থাকার বিষয়ে রক্ষণশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অল্পবয়স্কা মেয়ের গর্ভপাত ও এইডস সম্পর্কিত ভাবনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলেন।

১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ আমাদের বাড়ির বাইরের রাস্তাটিকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। সারাদেশ থেকে লোক আসল– মানুষ আসল বেলুচিস্তান থেকে। আলোচনা হলো নতুন দিক নির্দেশনার উপর। খসড়া ইস্তেহারের সঙ্গে কী কী বিষয় সংযোজন করা হবে, সে বিষয়ে আলোচনা চলল। সম্মেলনের শেষে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (শহীদ ভুট্টো) প্রতিষ্ঠিত হলো। আব্বা এখন আর স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকলেন না।

তিনি ধৈর্যের সাথে দল পরিচালনা করা শুরু করলেন এবং দেশব্যাপী সফর করতে লাগলেন এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে মুর্তজা লারকানায় একটি সংবাদ সম্মেলনে করাচিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন এবং বিশেষভবে জোর দিলেন 'অপারেশন ক্লিন আপের' বিষয়ে। 'পুলিশ বাহিনী একদম ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং এটি অপরাধচক্রের অংশে পরিণত হয়েছে।' তিনি আরও বললেন, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার যে, এই আধুনিক জগতে সীমান্তরক্ষীগণ (আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটি শাখা) সারা এলাকা কর্ডন করে রাখে সন্ত্রাসী ধরার জন্য– এভাবে সরকার আরও বেশি সন্ত্রাসীর জন্ম দিচ্ছে।'

জুনাম প্রায়ই আব্বার সঙ্গে সফরে যেতেন এবং তিনিও তার কন্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন। তার সঙ্গত যুক্তি ছিল; বেনজিরের সঙ্গে তিনি যে ব্যাংক হিসাব খুলেছিলেন, সেই এ্যাকাউন্ট প্রথম দম্পতি দুর্নীতির অর্থ জমা রাখার জন্য ব্যবহার করেছে, তার বদনামের অংশীদার হয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেছেন আমার ভয় হয়, তার সরকারের অবসান ঘটার পর বেনজির দায়বদ্ধ হবে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তার নামও এই পঙ্কিলতার মধ্যে টেনে আনা হবে। তিনি বুঝতে পারেননি যে তার কন্যা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দেশের সম্পদ নষ্ট করেছে, কিন্তু তবু সে তার

www.pathagar.com

কন্যা। জুনাম বেনজির ও জারদারির রাজনীতির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কখনো জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য তার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি।

আব্বার জীবনে উন্নতি ঘটছিল। লোকজন প্রথমদিকে তাকে যে অনভিজ্ঞ বলে মনে করত, তার অবসান ঘটেছে। তিনি যখন দেশে ফেরেন, তখন সঠিকই হোক, আর ভুলবশতই হোক অনেকেই তাকে উপযুক্ত মনে করেনি, এখন সবাই তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছে।

আম্মা, জুলফি ও আমি গ্রীষ্মে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দামেস্ক এবং লেবানন গেলাম। আমি তখন আব্বার সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে থাকলাম। করাচির ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে আমরা অতিরিক্ত সময় কাটালাম দামেস্কে। যেহেতু পাকিস্তান আমাদের বসবাসের জন্য খুব কঠিন ও বিপদজনক একটি জায়গা, তাই তিনি আমাদের আরও কিছুদিন দামেস্কে থাকতে বললেন। ১৯৯৫ সালের শীতকালে আমরা করাচি ফেরার আগের লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে একটিতে তিনি লিখেছিলেন :

> ‘তুমি তো জান, আমাদের দেশের রাজনীতিতে মানুষ ভাগ্য গণনাকারীদের উপর, বা আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। আমিও ওই রকম এক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সেই লোকেরা আশা করে যে, আমি তাদের কাছে আমার রাজনীতির ভবিষ্যৎ ক্ষমতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানালাম। কারণ আমার আল্লাহর উপর এবং নিজের ভাগ্য ও যোগ্যতার উপর আস্থা আছে। অবশ্য আমি তখন তোমার ও জুলফির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (তবে এই নয় যে, তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে)। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন যে, আমি যেন সব সময় তোমাদের আমার পাশে রাখি। তিনি আমাকে বললেন যে, যদি আমি কোনো ক্ষমতা বা পদ লাভ করি; তখনও যেন তোমাকে পাশে রাখি। আমি যেন সব সময় তোমার পরামর্শ অনুযায়ী চলি এবং তোমার মতামতের মূল্য দেই। আমি অনুমান করি, সে ক্ষেত্রে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিতে হবে। আমি যে পদেই আসীন হই না কেন, তোমাকে আমার সঙ্গে নিতেই হবে।
>
> আমাদের আগের নির্বাসিত জীবনের কিছু ফটো পেয়ে তা আমি আব্বাকে পাঠালাম, তিনি সেগুলো পেয়ে খুব আবেগপ্রবণ হলেন, তিনি লিখলেন : ‘তোমার শিশু বয়সের কিছু ছবি, যা তুমি পাঠিয়েছ, পেয়ে আমি খুব আনন্দ অনুভব করলাম। আমি তো তোমাকে বলেছি যে, সব সময়ই আমার ছোট শিশুটিই থাকবে। তোমার ও জুলফির চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান আর কিছুই নেই। আল্লাহ তোমাদের দিকে নজর দিবেন এবং তোমরা ১৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আমি তোমাদের দু'জনকেই খুব আদর করি ও ভালোবাসি।

আমরা করাচিতে ফিরে আসলাম এবং একসাথে নববর্ষ উদযাপন করলাম। আমি গাঢ় মেরুণ লিপস্টিক ব্যবহার করে যখন বৈঠকখানায় ঢুকলাম, তিনি বললেন, ‘তুমি কি এখনও ছোট্ট মেয়ে আছ?’ আমার বয়স তখন চৌদ্দ হতে যাচ্ছিল। আমি এখন বড় হয়েছি।

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালে আমি আব্বাকে দল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি। সারাদেশের তরুণ ও বলিষ্ঠ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের প্রেরণা দেয়ার জন্য। তিনি দিন-রাত কাজ করেছেন এবং পরিশেষে দেখা গেছে যে কাজ ভালোভাবেই এগুচ্ছে।

www.pathagar.com

২২

১৯৯৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের দিকে চারটা গাড়ি করাচির প্রান্তে সুরজানি শহর ত্যাগ করে ক্লিফটনের দিকে চলল। গাড়িগুলোর একদম সামনেরটি ছিল একটি লাল রঙের ডবল কেবিন পিক-আপ ট্রাক; ওর মধ্যে আছেন মুর্তজার চারজন রক্ষী– মাহমুদ, কায়সার, রহিম ও সাত্তার। তেইশ বছরের রহিম ছিলেন এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু এবড়োথেবড়ো মুখ ও গোঁফের কারণে তাকে বয়স্ক মনে হয়। তিনি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সব সময় দায়িত্বশীল। অনেক বছর পর তার এক আত্মীয়কে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে, রাজনীতিতে আসার আগে রহিম কী করতেন, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লে। তিনি বললেন, 'রাজনীতিতে আসার আগে তিনি তো সব সময়েই রাজনীতির ভিতরেই ছিলেন।' কিন্তু অল্প বয়সে তিনি খুব হাসিখুশিতে থাকতেন, তার সঙ্গের লোকেরা তাকে খুব ভালো সঙ্গী বলে বিবেচনা করতেন।

সাত্তার লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন, তিনি খয়েরপুর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। যদিও তিনি সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, তিনি ছোটবেলায় কোনো রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনে যোগদান করেননি। তিনি ছিলেন বড় পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান, হতে চেয়েছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি কিছুদিন তার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার স্বপ্নকে আর এগিয়ে নিতে পারেননি। ১৯৯৫ সালে পুলিশ সাত্তারকে গ্রেফতার করে। তিনি পিপিপি (এসবি) এর ইস্তেহার পোস্টার ও পুস্তিকা বহন করছিলেন এজন্য তাকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা বা এ ধরনের কিছুই ছিল না। কারাগারে তাকে নিয়মিত পেটানো হতো। তিনি তিনমাস কারাগারে ছিলেন। সেখানে তিনি কোনো স্বীকারোক্তি প্রদান করেননি। তিনি যে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পেয়েছেন, এটিই ভাগ্যের বিষয়।

কায়সার, যিনি পিকআপের পিছনে রহিমের সঙ্গে বসেছিলেন, স্মরণ করছেন, গাড়িটি ক্লিফটনের দিকে যাচ্ছিল। তিনি জোরালো গলায় বললেন, 'পুলিশ আমাদেরকে অনুষ্ঠান থেকেই অনুসরণ করছিল। কোনো পুলিশের সীমানা শেষ হলে অন্য পুলিশকে বুঝিয়ে দিত, তারা আবার আমাদের অনুসরণ করতে থাকত। সারাপথ তারা এভাবে আমাদের অনুসরণ করতে থাকত। সেই সন্ধ্যায় সুরজানি টাউনে অনেক পুলিশ ছিল। মাহমুদ যখন বললেন যে, জনসভা চলাকালীন সময়ে ৩০টি পুলিশের গাড়ি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, কায়সার সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। তিনি বললেন, মঞ্চের পিছনে, আমাদের সামনে ও পিছনে অনেক পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল জনসভা চলাকালীন সময়। পুলিশ বাহিনী ছাড়াও অন্য

www.pathagar.com

অস্ত্রধারী বাহিনীও ট্রাক নিয়ে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তখন তারা কেউ আমাদের স্পর্শ করেনি।

সেদিন অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে মুর্তজা তার রক্ষীদের বলেছিলেন যে, পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, সামনে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কায়সার বললেন যে, 'তিনি বুঝিয়ে বললেন আমাদের গ্রেফতার করা হতে পারে। তোমরা বাধা দেবে না এবং ভয় পাবে না। তারা আমাদের নিয়ে যাক। আমি তো কারাগারে যেতে প্রস্তুত। আব্বার বই, ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজ ভর্তি কাল ব্রিফকেস তার শোবার ঘরে। কয়েকদিন যাবতই সেগুলো প্রস্তুত। কায়সার বললেন, 'আমরা মীর বাবাকে বললাম যে আমরা তার নির্দেশ মত চলব। বাড়ি ফেরার সময় কায়সার ও রহিম বসেছিল ডবল কেবিনের খোলা পিছন দিকে এবং আব্বার দিকে নজর রাখছিল। কায়সার আমাকে বলেছেন, 'তিনি তখন আনন্দিত ছিলেন, হাসছিলেন। সারাক্ষণ তিনি আশিক জাতোইকে ডাকছিলেন। তাদের খুব সুখী দেখাচ্ছিল। দ্বিতীয় গাড়িটি ছিল আশিকের নীল পাজেরো গাড়ি। এই গাড়িটি তিনি ব্যবহার করতেন সন্তানদের স্কুলে আনা নেয়ার জন্য। ওই সন্ধ্যায় তিনি বসে ছিলেন চালকের আসনে, মুর্তজা ছিলেন তার পাশে। আশিকও তার ছোট ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন, গ্রেফতারের জন্য। পাজেরোর পিছন দিকে ঠিক মুর্তজার পিছনে বসেছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ, আব্বার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। ইয়ার মোহাম্মদ ছিলেন মুর্তজার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এবং এই কাজটি তিনি করতেন মুর্তজার প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধার কারণে। আশিকের মত ইয়ার মোহাম্মদ ও দলের আরও অনেকে ১৯৮০-এর দশকে এসআরডি'র আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তারা জিয়ার আমলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করার কারণে সে সময় কারাগারে আটক ছিলেন। তার বয়স ছিল তখন আটত্রিশ বছর এবং তিনি ছিলেন মুর্তজার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক। ইয়ার মোহাম্মদ ছিলেন লম্বা ও দেখতে চমৎকার, তিনি প্রায়ই কালো সানগ্লাস পরতেন। তার ছিল ছয়টি সন্তান। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার পিতার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতেন।

ইয়ার মোহাম্মদের সঙ্গে ছিলেন আশিকদের পারিবারিক গাড়িচালক আসিফ জাতোই। তার বাড়ি আশিকদের পূর্ব পুরুষদের পারিবারিক গ্রাম ডাদুর বেটোতে। সঙ্গে আরও ছিলেন আসগর, তিনি প্রায়ই আব্বার সফরসঙ্গী হতেন। তার খাবার বন্দোবস্ত করার দায়িত্বে থাকতেন তিনি। আব্বা ঠাট্টা করে বলতেন যে, যে কোনো রকমের আবহাওয়া বা যানবাহনের ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আসগর ফ্লাস্কের মধ্যে গরম চা নিয়ে যাবে। তিনি তার কাজের প্রশংসাও করতেন এবং রাজনৈতিক সফরের সময়ও তাকে সঙ্গে নিতেন।

একটি ছোট সাদা অ্যালটো চালানো হচ্ছিল মুর্তজা ও আশিকের গাড়ির পাশ দিয়ে, তাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। এটি ইয়ার মোহাম্মদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ এবং এতে দলের কয়েকজন সদস্য ছিলেন যারা সেদিনের সুরজানি টাউনের সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে ছিলেন। এদের মধ্যে সাজ্জাদও ছিলেন, তিনি বেনজিরের এমআরডি-এর একজন প্রাক্তন কর্মী এবং মুর্তজা পাকিস্তানে ফিরে আসার পর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সাজ্জাদের বয়স ছিল তখন পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি তার পুত্রের নাম রেখেছেন শাহনেওয়াজ, আমার কাকার নামানুষারে। তিনিও স্বেচ্ছায় আব্বার নিরাপত্তার কাজে অংশ নিয়েছেন, তিনি এখন দলের সিন্ধুর অর্থসচিব হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

চলমান গাড়ির শেষটি ছিল একটি সাদা জিপ, এটির মালিক ছিলেন একজন দলীয় সদস্য, যিনি সেদিন সন্ধ্যায় মুর্তজার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এই গাড়িতে ছিলেন মুর্তজার পাঁচজন রক্ষীর মধ্যে শেষ ব্যক্তি, ওয়াজাহাত। তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ এবং তিনি ছিলেন অবিবাহিত, তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ। আব্বার রক্ষীদের মধ্যে ওয়াজাহাতকে দেখতে দেহরক্ষীর মত মনে হতো না। তার চুল ছিল কোঁকড়ানো এবং পরতেন পুরুগ্লাসের চশমা। তিনি ছিলেন সেদিন রাতে অনেকের মতই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত; তার ভাই স্মরণ করছেন যে, তিনি সব সময়ই সামাজিক কাজে আগ্রহী ছিলেন। ওয়াজাহাতের ভাই কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার বললেন, 'যদিও তিনি সব সময় রাজনীতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন, আমরা বুঝতাম না কিভাবে তিনি সার্থকতা লাভ করবেন, তবে তার রাজনৈতিক দলে যোগদান ছিল অনেক দেরিতে।'

সারিবদ্ধ গাড়িগুলো যখন 'দুই তলোওয়ার'-এর উল্টোদিকে যা মূল রাস্তার নির্দেশক, ৭০ ক্লিফটনের দিকে গিয়েছে, মুর্তজা দেখলেন যে, সেই রেঞ্জাররা ক্যালটেক্স পেট্রোল স্টেশনের কাছে লক্ষ্যণীয়ভাবে মূল ক্লিফটন সড়কে এবং বৃত্তাকারে চারদিকে অবস্থান করছেন।

রাস্তার বাতি নিভে গেছে এবং ক্লিফটন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। রেঞ্জার ও পুলিশ ক্লিফটন রোডের পাশের দূতাবাসগুলো, যেমন ইতালি, ইরানী দূতাবাস, ব্রিটিশ হাইকমিশনে, পরিদর্শনে গিয়েছে এবং সেখানকার পাহারাদারদের ভিতরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে যার ফলে গার্ডপোস্টগুলো হয়ে পড়েছে ভয়ঙ্কররূপে শূন্য।

মুর্তজা ও তার সহযোগীদের ৭০ ক্লিফটনে ফিরে যেতে হবে। দেখা যাচ্ছে, পথে সশস্ত্র পুলিশের গাড়ি ক্রমাগত বেড়ে চলছে। সে রাতে আনুমানিক সত্তর থেকে আশিজন পুলিশ ওই রাস্তায় অবস্থান করছিল। তার ফলে স্বাভাবিক গাড়ি চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। ক্লিফটন পার্কের সামনে আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে পুলিশ আব্বার গাড়ির সামনে আসল এবং সেটিকে বাধা দিল। পার্কের অপর অংশে পুলিশ অফিসার্স ক্লাবের অবস্থান। স্থানটি পুলিশ দ্বারা ঘেরাও করা। সর্বত্রই তারা ছিল।

আসিফ জাতোই দেখলেন যে তাদের গাড়ি, সারিবদ্ধ অন্য গাড়িগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তিনি আমাকে বললেন, 'রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে রাতে অনেক কুখ্যাত পুলিশ কর্মকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ওই রাতের ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন। সেখানে ছিলেন সোহেল সাডডেল, তিনি একজন অপরাধবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, 'অপারেশন ক্লিন আপ' কার্যক্রমের ব্যাপারে তিনি পরিচিতি লাভ করেন, আরও ছিলেন জিনহাস কাজমী, যিনি ছিলেন 'অপারেশন ক্লিন আপ'-এর একজন কুখ্যাত নির্যাতনকারী। ৫ জানুয়ারির আল-মুর্তজার নেতৃত্বদানকারী ওয়াজিদ দূররানীও উপস্থিত ছিলেন; রাত বাড়ার পর তার ভূমিকা আরও গুরুত্ব পেল। সেদিনের অবরুদ্ধ রাস্তায় ছিলেন রাজ তাহির, শহীদ হায়াত, শেখ কোরেশী, মাসুদ শরীফ– যিনি তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন, এরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে খবর পাঠালেন, সাক্ষীদের স্মরণ আছে তাদের কঠোর অবস্থানের কথা এবং যারা ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এখনও জীবিত আছেন, তাদের স্মরণে আছে ওদের মুখ। পুলিশের লোকেরা সব সময়ই সেদিনের ঘটনার জন্য তাদের দায়িত্বের কথা অস্বীকার করে থাকে। তারা বলে থাকে যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির

www.pathagar.com

কারণে ঘটনাগুলো ঘটেছে। পরবর্তীতে পুলিশ দাবি করেছে যে, তারা সেখানে গিয়েছিল মুর্তজাকে গ্রেফতার করতে। তাদের দাবির সপক্ষে কোনো গ্রেফতারি পরওয়ানা দেখানো হয়নি। চৌদ্দ বছর পর আমরা আজও ওই গ্রেফতারি পরওয়ানা দেখার অপেক্ষায় আছি।

মুর্তজা বুঝতে পেরেছিলেন, কী ঘটতে যাচ্ছে। তিনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলার জন্য সামনের জানালা খুললেন। তা দেখে ইয়ার মোহাম্মদ তার দরজা খুলে পেছনের আসন থেকে এসে মুর্তজার জানালার কাছে যেয়ে দাঁড়ালেন, তার দেহের অবস্থান হলো মুর্তজা ও পুলিশের মধ্যবর্তী স্থানে। মুর্তজা তার শরীরের উপরের অংশ জানালার বাইরে নিয়ে হাত উপরে উঠিয়ে উর্দুতে তার রক্ষীদের বললেন, 'গুলি করবে না।' ইয়ার মোহাম্মদ শুধু মুর্তজার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন সিন্ধিতে। সেই সময়ে একটি গুলি এসে আঘাত করল তার কপালে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন।

মুর্তজা গাড়ির দরজা খুললেন এবং বাইরে আসলেন। তিনি বের হওয়ার পর একজন পুলিশ (তার পরিচয় নিয়ে দ্বিমত আছে) চিৎকার করে উঠল, 'গুলি কর!' তারপর সে রাতে বন্দুকের গুলির শব্দ হতে শুরু করল। চারদিক থেকে পুলিশের গুলিবর্ষণ চলতে থাকল। আশিকের হাতে গুলি লাগল। চালকের আসন থেকে তিনি দেখতে পেলেন যে, তারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।

গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাজ্জাদ মুর্তজাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসলেন। তিনি যখন মুর্তজাকে গাড়ির ভিতরে ঢুকানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন, তাকে গুলি করা হলো। চতুর্দিক থেকে গুলি আসছিল। গুলি লাগল তার বুকে, তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গুলি চলল, তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ রক্ষী রহিম ছিলেন লাল পিকআপ গাড়িতে, এটি ছিল মুর্তজার গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি দ্রুত লাফ দিয়ে মুর্তজার গাড়ির দিকে গেলেন এবং সাজ্জাদের পরিবর্তে তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাকে গুলি করা হলো মাথায়, তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

কায়সার আমাকে বললেন, 'তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিলাম আমরা। যে ব্যক্তিই মীর বাবাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন, তাকেই ওরা অব্যর্থভাবে গুলি করেছে। সাত্তার ছিলেন রহিমের সঙ্গে পিকআপে। তাকেও গুলি করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি গুলিতে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচণ্ড আঘাত পান। তিনি রাস্তায় পড়ে যান, রক্ত ঝরতে থাকে। কায়সারের মনে আছে, সাত্তার বেঁচে ছিলেন, পুলিশ লাথি দিয়ে পরীক্ষা করছিল তিনি জীবিত আছেন না মৃত। তারা তার উপর জুতো দিয়ে চাপ দিল। আমরা তা দেখলাম। আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী এটি একটি চরম অপমান। এরূপ ঘটনার বর্ণনা আমি কখনো শুনিনি। ওই ঘটনাগুলোর বিবরণ আমার কাছ থেকে লুকানো হয়েছে কেন? চতুর্থ গাড়িতে সর্বশেষ রক্ষী ওয়াজাহাত। তাকে একটি গুলি করা হয়েছিল পিঠে। আব্বার তিনজন রক্ষীকে সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করা হয়েছে, আর দু'জন আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিলেন, রক্ত ক্ষরণের পর তারা মৃত্যুবরণ করেন। গাড়ি বহরের আরও কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, অন্যরা সামান্য, কিন্তু তারাও ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত। আমার পিতাকে কয়েকবার গুলি করা হয়েছে। তার সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখে আঘাতের দাগ আছে। তার বুক ও হাতে আঘাতের চিহ্ন আছে। এ সমস্ত বন্দুকের গুলিতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হননি। তখনও তিনি জীবিত ছিলেন।

www.pathagar.com

আশিক বসেছিলেন সামনের আসনে। তার হাত ছিল গাড়ির হর্নের উপর। তিনি জোরে চীৎকার করলেন, 'অ্যাম্বুলেন্স ডাক, মুর্তজা ভুট্টো আহত। সাহায্য চাই।' কিন্তু কোনো পুলিশই সাড়া দিল না।

উপস্থিত দু'জন পুলিশের একজন নিজের পায়ে, একজন পায়ের পাতায় গুলি করল। তারা দাবি করল যে, তাদের গুলি করা হয়েছিল– কিন্তু এর দ্বারা সাতজন লোককে খুন করা– পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গে এবং দু'জন পরবর্তীতে নিহত হওয়াকে যৌক্তিক বলে প্রমাণ করা যায় না। তা'ছাড়া কোনো পুলিশই আহত হয়নি। পরে ডাক্তারি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে যে ওই দুইজন পুলিশের লোক নিজেদের গুলিতেই আহত হয়েছিল। আরও বিষয় হলো, ফরেনসিক ও অন্যান্য পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কেনো ক্রসফায়ারই হয়নি। শুধুমাত্র পুলিশের গুলিই ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তীতে এক নেওয়াজ সিয়লের মৃত্যু হয় রহস্যজনকভাবে। পুলিশ জোর দিয়ে বলেছে যে, সেটি ছিল আত্মহত্যা, তবে তার ঘনিষ্ঠজনেরা নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার মৃত্যুর বিষয়ে কোনো তদন্তই করা হয়নি। শহীদ হায়াত কিছুদিন আগেও পুলিশ বাহিনীতে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। তিনি নিজের পায়ে নিজেই গুলি করেছিলেন।

কায়সার মাহমুদ আসিফ জাতোই এবং আসগরের হাতে গুলি লেগেছিল এবং তারা মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়েছিলেন। আসিফ জাতোইর মতে তাদের মধ্যে আটজনের অবস্থা হয়েছিল এরূপ। তিনি আমাকে বললেন, 'আমরা ফুটপাতের মধ্যে শুয়ে পড়েছিলাম।' তিনি আমাকে আরও বললেন, 'পুলিশের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তারা সবাই ছিল সশস্ত্র, রাস্তা পরীক্ষা করার জন্য তাদের একটি গাড়িতে ছিল সন্ধানী বাতি, তারা দেখছিল কারা জীবিত আছে, আর কারা মারা গিয়েছে। 'দো-তলওয়ার' থেকে একটি গাড়ি বের হলো এবং সেখান থেকেও এলাকাটিকে পর্যবেক্ষণ করা হলো। যখন তারা দেখল যে, সব কিছু পরিষ্কার তখন তারা পায়ে হেঁটে আসল। রাজ তাহির, সোকেব কোরায়শি এবং শহীদ হায়াত তখনও সেখানে হাঁটছিলেন– রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত দেহগুলো পরীক্ষা করছিলেন। তারা পা দিয়ে লাথি দিয়ে দেহগুলি পরীক্ষা করছিল, সেগুলো নড়ে কিনা।

'আসিফ জাতোই তখন পর্যন্ত আহত হন নাই। তিনি নীল পাজেরোর মধ্যে পিছনে ছিলেন, কিন্তু তার শরীরে কোনো আঘাত লাগেনি। আসগর বললেন যে, আমার পিতা গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও তিনি তার কথা শুনতে পেরেছিলেন। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, 'তারা আমাদেরকে পেয়েছে জারদারি ও আবদুল্লাহ শাহ– সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী, অবশেষে আমাদেরকে পেয়েছে'– আসিফ বললেন যে, তিনি এ সমস্ত শুনেছেন। আমি আমার পিতার সময়ের কথার ব্যাপারে কখনো সময়োপযোগী ছিলাম না। এগুলো তার শেষ কথা ছিল না, অন্তত আমার জন্য নয়, সেগুলো হতো আরও দীর্ঘ। আসিফ এ সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝাতে চাইলেন যে, তিনি তখনও জীবিত ছিলেন।

আশিক চালকের আসন থেকে নেমে এলেন, যে হাতে আঘাত পাননি, সে হাত দিয়ে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানালেন, কিন্তু বৃথা। তিনি একটি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে বললেন, 'যখন দেখলেন যে, পুলিশের উদ্দেশ্য ভিন্ন, তিনি নিজেই গাড়ির বাইরে আসলেন এবং হেঁটে চললেন।'

অনুসন্ধানী সাংবাদিক গোলাম হাসনেইন 'অপারেশন ক্লিন আপ'-এর উন্মোচন ঘটাতে

www.pathagar.com

যেয়ে আমার পিতার মৃত্যুর দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। করাচি প্রেসক্লাব থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি সরাসরি ক্লিফটনে চলে গেলেন। বার বছর পর যখন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, তখন তিনি বললেন, 'আমরা দেখলাম যে, আপনার পিতাকে পুলিশের গাড়ির প্রহরায় নিয়ে যেতে। গাড়ির ভিতর তার সঙ্গে দুই অথবা তিনজন পুলিশ ছিল এবং তিনি সোজা হয়ে বসেছিলেন গাড়ির পাশে। হাসনেইনের স্মরণ আছে, দেহগুলো রাস্তার মধ্যে পড়েছিল। আমি নোটবুক ও ক্যামেরাসহ এটি চামড়ার ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিলাম, পুলিশ তা দেখতে পেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হাসনেইনের সঙ্গে থাকা একজন সাংবাদিক গোপনে ক্যামেরা রেখেছিলেন, তিনি দ্রুত কিছু ফটো তুলেছিলেন। হাসনেইন করাচির একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সে সময় রাস্তার আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছিল, তাই কনিষ্ঠ অফিসাররা জানতে পারেনি, কে তাদের ওই রাতে হত্যার আদেশ দিয়েছিল। জানি না, এটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা। তিনি আরও বললেন, 'সোয়েব সাডডল একজন অপরাধ বিজ্ঞানী পুলিশ অফিসার। তার উপস্থিতিতে রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার নিশ্চয় কারণ রয়েছে।'

পরবর্তীতে আসিফ জাতোই আমাকে বলেছেন, 'সে সময় মীর বাবা ভালোই ছিলেন। তাকে তখন কারো উপর ভর করে চলতেও হয়নি'। আসিফের স্মরণ আছে, 'পুলিশের দল, যাদের মধ্যে ছিল রাজ তাহির, সোকেব কোরায়শি এবং শহীদ হায়াত, তারা মুর্তজাকে বলেছে যে, তাকে তারা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি হেঁটে পুলিশের গাড়িতে উঠলেন। তিনি পুলিশের পিছনের খোলা স্থানে, যেখানে পুলিশ বসে সেখানে বসলেন এবং এপিসি গাড়ি চালিয়ে নিল। দো-তলওয়ারের কাছে যেয়ে এটি থামল। আমরা একটি গুলির শব্দ শুনলাম। এরপর আবার এটি চলতে লাগল।'

'এটিই ছিল শেষ গুলি, যা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। তিনি আহত হয়েছিলেন, তবে তিনি বাঁচতেন। তিনি হাঁটছিলেন এবং কথা বলছিলেন। তাকে হত্যা করার জন্য একাধিক বুলেটের প্রয়োজন হয়েছিল। পুলিশের লোকেরা নিশ্চিত হয়েছিল যে, শেষ বুলেটে কাজ হয়েছে। আব্বার ময়না তদন্তে দেখা যায় যে, শেষ বুলেটটি চোয়ালের মধ্য দিয়ে ঢুকেছে। আদালতে গৃহীত ডাক্তারি রিপোর্টে দেখা গেছে যে, তিনি যখন পুলিশের গাড়িতে শুয়ে পড়েছিলেন, তখন একজন বন্দুকধারী তার ওপর দাঁড়িয়ে তাকে গুলি করেছে।

আব্বাকে পুলিশ তুলে নেয়ার পরও আশিক গাড়িতে ছিলেন। ওয়াজিদ দুররানী ও সোকেব কোরেশি যখন কথা বলছিল, আসিফ জাতোই রাস্তায় পরে থাকা অবস্থায় তখন তা শুনতে পেয়েছিলেন। তারা খোলাখুলি বলছিল, 'তাকে শেষ করে দিতে হবে'। আসিফের বর্ণনা অনুযায়ী এরপর সোকেব কোরেশি গাড়ির দিকে গেল এবং চালকের আসনের দরজা খুলল আর আশিককে গাড়ির বাইরে নিল।

ওই ঘটনায় যারা বেঁচে গিয়েছেন, তারা সবাই স্বতন্ত্রভাবে আমাকে বছর খানেক পর বলেছেন যে, সোকেব কোরেশি হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ পোশাক পরেছিল। তারা আমাকে বলেছে যে, শুধু এই ব্যক্তিই এরূপ প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরেছিল। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক। জারদারির মত সোকেব কোরেশিও একটি বিচারাধীন মামলায় খালাস পেয়েছিল। সোকেব আদালত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং বার বছর পলাতক হিসেবে ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পর কোরেশি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিল, সেখানে

www.pathagar.com

সে আইনজীবী হিসেবে কাজ করছে। প্রথমে একটি প্রাইভেট আইন ফার্মে, পরে একটি বহুজাতিক সংস্থার পরামর্শক হিসেবে। জারদারি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন, পলাতক আসামি হওয়া সত্ত্বেও তিনি রহস্যজনক কারণে আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি পান। অবশ্য তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন।

আশিককে উঠিয়ে কোথায় নেয়া হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। কেউ জানে না। পরবর্তীতে তাকে দেখা যায় মৃত হিসেবে, মাথার পিছনে গুলি করা হয়েছিল।

৮-৩০ মিনিটের দিকে আমি ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ফোন করার আগের মুহূর্তে আমার পিতা ও আশিক উভয়কে উঠিয়ে নিয়ে হত্যা করা হয়। রাজা তাহির রাস্তায় পড়ে থাকা রক্ত দ্রুত পরিষ্কার করান। আসিফ জাতোই বললেন যে, পুলিশ ইয়ার মোহাম্মদের মুখে একটা লাথি মারে। তারা তাদের জুতা ইয়ার মেহাম্মদ ও কায়সারের মুখে ঘষল। প্রায় চল্লিশ মিনিট যাবত পুলিশ এরূপ কর্মকাণ্ড চালাল।

কায়সার আমাকে বললেন যে, তিনি তখন শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে, 'ছেলেরা আস, কাজ শেষ হয়েছে।' হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ আমাদের নির্যাতন কক্ষে নেয়ার পরও আমরা এরূপ কথা আবার শুনলাম, 'মাহমুদ বললেন, তাদের ক্লিফটন পুলিশ স্টেশনে নেয়া হলো, সকল মৃতদেহই সারিবদ্ধ করা হলো সনাক্তকরণের জন্য। কায়সারকে আদেশ দেয়া হলো দেহগুলো সনাক্ত করতে, এবং তিনি অন্যদের মধ্যে আশিকের মৃতদেহও দেখতে পেলেন। পরদিন বেলা দু'টার পর, অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পর কেউ দেহগুলো আর দেখতে পায়নি। দেহ রেখে দিয়ে প্রমাণ নষ্ট করা ছিল আদর্শ 'অপারেশন ক্লিন আপ।'

আমাদের বাড়ির বাইরের রাস্তা পরিষ্কার করা হলো; রক্ত ও কাঁচ পরিষ্কার করা হলো। আম্মা ও আমি ৮-৪৫ মিনিটে বাড়ির বাইরে আসলাম, পুলিশ সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলার মিনিট পনের পর।

* * *

আশিকের একজন আত্মীয় ছিলেন ক্লিফটনের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মালিক। এর নাম মিডইস্ট এবং অনেক নামি স্থানীয় ডাক্তার সেখানে বহির্বিভাগীয় রোগী দেখেন। আরও অনেক ডাক্তারের মত আমার পরিচিত এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞও এখানে রোগী দেখেন। এখান থেকেই আমরা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র কিনে থাকি। কিন্তু এটি কোনো জরুরি হাসপাতাল নয়, যদিও এটি একটি চমৎকার হাসপাতাল। এর গ্লাসের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে যে, এটি একটি ক্লিনিক, একটি ওষুধের দোকান, একটি আরোগ্য কেন্দ্র, কিন্তু জরুরি হাসপাতাল নয়। আশিকের একমাত্র পুত্র অনীদ গাড়ি চালিয়ে মিডইস্টে এসেছিল কম্পিউটার গেমস খেলতে তার আত্মীয়দের সঙ্গে। সেখানকার অফিসের ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা নগরের অন্যগুলোর চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। অনীদের বয়স তখন আঠার বছর এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অনীদ মনে করে বলল, 'সে রাতে মিডইস্টে ঢোকার সময়গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।' অনীদ তার পিতার মতই লম্বা,

www.pathagar.com

গলার স্বরও তার মতই। সে আরও বলল, 'বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে লোকজন হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল।' কেউ কেউ প্রশ্ন করছিল, 'কিসের গোলাগুলি?' আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন, 'এটা করাচি, এখানে গোলাগুলি তো সাধারণ ঘটনা।' অনীদের চিন্তিত হওয়ার কারণ ঘটল আরও আধাঘণ্টা পর।

আমার পিতার চোয়ালে সর্বনাশা গুলিটি বর্ষণ করার পরই পুলিশ মিডইস্টের কয়েক মিটার দূর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল। করাচির মাত্র দুটো হাসপাতাল, জিন্নাহ ও সিভিল হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ হওয়া আহত ব্যক্তিদের ভর্তি করা হয়। কারণ এ সমস্ত বিষয়ের চিকিৎসা ও কাগজপত্র দেয়ার ক্ষমতা শুধু এ দুটোরই আছে। এগুলো সবাই জানে। তাই, পুলিশ আমার পিতাকে নিয়ে গেল মিডইস্টে। এটি ছিল উদ্দেশ্যমূলক। তার জন্য যতটুকু সেবার প্রয়োজন ছিল, তা তিনি এখানে পাচ্ছিলেন না। তারা আব্বাকে রক্তে ভেজা সালওয়ার কামিজসহ হাসপাতালের বাইরে রেখে চলে গেল।

অনীদ একটি উত্তেজনাকর শব্দ শুনতে পেল এবং জানতে পারল যে, মুর্তজাকে খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মিডইস্টে আনা হয়েছে। সে দৌড়িয়ে হাসপাতালের বারান্দায় গেল। তখন মিডইস্টের কর্মচারীরা তাকে স্ট্রেচারে বহন করে হাসপাতালের ভিতর নিয়ে যাচ্ছিল। অনীদ কখনো আমাকে বলেনি যে, আব্বাকে যখন ওরা মিডইস্টে রেখে গিয়েছিল, তখন সে সেখানে ছিল। আমি কখনো জানতে পারিনি। তের বছর আগের সেই রাতের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমরা যখন আলাপ করছিলাম আমার হাত কাঁপছিল। অনীদ বলছিল যে, সে তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল; সে বলল যে আব্বার মুখ ও শরীর রক্তে ভিজে গিয়েছিল। অনীদ আরও বলল, তার একটি পা স্ট্রেচারের মধ্যে সোজা অবস্থায় ছিল, আর অন্যটি ছিল বাঁকা অবস্থায়, তিনি উঠার চেষ্টা করছিলেন। সে আমার পিতার বাঁচার জন্য যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিল।

অনীদ ও আমার মধ্যে অনেক দিক দিয়ে মিল আছে। পরিবারে আমাদের দেখা যায় একরোখা উদ্ধত ধরনের। আমরা সবাই একত্রিত হলে আমাদের ভাই- বোনদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে, আমরা রাজনীতি ও মাফিয়াচক্র সংক্রান্ত চলচ্চিত্র নিয়ে বেশি কথা বলি। আমি অনীদের সামনে কাঁদতে পারছিলাম না, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার প্রশংসা করে থাকি, কিন্তু আমি জানতে পারিনি যে, যখন তাকে মিডইস্টে আনা হয়েছিল, তখনও তার জ্ঞান ছিল। যদি আম্মা ও আমি আর মাত্র দশ মিনিট আগে মিডইস্টে পৌঁছতে পারতাম তবে আব্বাকে সজ্ঞান অবস্থায় পেতাম। তিনি আমাদের দেখতে পেতেন, তিনি জানতে পারতেন যে, আমরা সেখানে তার সঙ্গে ছিলাম। অনীদ আরও বলল, 'যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন, তখন চেতনা ছিল। তিনি আমার দিকে চোখ মেলে তাকালেন। তিনি হাত দিয়ে তার চোয়াল ও ঘাড় ধরলেন এবং কথা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। প্রচুর রক্ত দেখা গেল। তখন বুঝলাম বিষয়টি গুরুতর। আমি তখন কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলাম, তা বলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।' অনীদের স্মরণ আছে, লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করছিল, তার বাবা কোথায়। সে তা জানত না যে তারা সেই সন্ধ্যায় একত্রে ছিলেন। তাই, সে মিডইস্টের একজন কর্মীকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, সে গোলাগুলি সম্পর্কে জানে কিনা। এক পর্যায়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার বাবা কোন গাড়িতে ছিলেন। তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল

www.pathagar.com

এবং সে অনীদকে বলল যে, 'তোমার পিতা মুর্তজার গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তারা একত্রে ছিলেন। অনীদ বলল, 'তথাপি আমি মনে করেছিলাম যে বিষয়টি ভালের দিকেই যাবে, তারা উভয়েই বেঁচে আছেন।'

* * *

আসিফ জারদারি ছিলেন ফোনে। তিনি আকস্মিকভাবে আমাদের বললেন, 'তুমি জান না যে তোমার পিতাকে গুলি করা হয়েছে?' আমি ফোন রেখে দিলাম। আমার শরীর অবশ ও শীতল হয়ে গেল, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেল, সবকিছুই আমার কাছে ওলট-পালট হয়ে পড়ল। আম্মা ফোনটি ধরলো। তিনি আমার মুখ দেখলেন, আমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে, যা বলার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, এমনকি তার দিকে তাকাতেও পারছি না। তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। আমার মনে নেই, তিনি কী বলেছিলেন। তিনি নিথর হয়ে আমার সঙ্গে চেয়ারে বসলেন, আব্বার সবুজ আরাম কেদারায়।

আমি নিজে নিজে বলতে থাকলাম, হয়তো হাতে লেগেছে, বোধহয় সাংঘাতিক কিছু না, আবার পায়েও লাগতে পারে। যদি সাংঘাতিক কিছুই হয়ে থাকত, তবে জারদারি একটি চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বলতেন যে, 'তোমার পিতাকে গুলি করা হয়েছে?' আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আম্মা নিশ্চয়ই গাড়ি ডেকেছিলেন। পরবর্তীতে যে বিষয়টি আমি বুঝেছি, তা হলো তিনি দরজার দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। আমি উঠলাম এবং তার পিছনে ছুটে গেলাম। তিনি চীৎকার করে বললেন, 'এখানে থাক।' আমিও পাল্টা চিৎকার করে বললাম 'না, আমিও আপনার সঙ্গে আসছি।' সে সময় জুলফি ওর নানীর সঙ্গে বারান্দায় বসে ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই সে তার নানীর সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত। সোফি দরজার দিকের বারান্দায় আম্মা ও আমার চীৎকার লক্ষ্য করছিলেন। তিনি জুলফিকে কাছে টেনে নিলেন এবং চেষ্টা করলেন ওকে আমাদের চীৎকার থেকে দূরে রাখতে। আম্মা চীৎকার করে বললেন, 'ফাতি, বিষয়টি খুব ভয়াবহ!' কিন্তু আমাকে ছাড়া তাকে আমি কিছুতেই যেতে দিব না। আমি চিৎকার করলাম, তার হাত খামছে ধরলাম এবং চীৎকার করলাম, 'তিনি আমার পিতা!' তারপর তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। তিনি আমাকে থামাতে পারলেন না। গাড়ি আমাদের বাড়ির বাইরে চলে যাবার পর তিনি আমাকে ধরে রাখলেন। রাস্তা ছিল পরিষ্কার, খালি। আমি অন্ধকারে রাস্তায় তাকালাম কোনো চিহ্ন দেখা যায় কিনা, তা পরীক্ষা করতে, কিন্তু কিছুই দেখলাম না। তাই মনে করলাম যে, যাই ঘটে থাকুক না কেন, তত সাংঘাতিক কিছু নয়। অবশ্যই হাতে লেগেছে, আমি নিজে নিজে বলতে থাকলাম এবং আম্মাকেও শুনাতে থাকলাম মন্ত্রের মত, আমি জোরপূর্বক এ কথাই বিশ্বাস করতে লাগলাম।

* * *

আশিকের স্ত্রী বদরুননেছা তাদের তিন কন্যাকে নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। তাদের অবস্থান ছিল বন্দুকের গুলির আওয়াজ থেকে অনেক দূরে। আশিক ও বদরুননেছার বড় সন্তান

www.pathagar.com

সাবিনের মনে আছে, 'আমার পিতার খবর জানতে উর্দু সংবাদ মাধ্যম থেকে ফোন আসছিল। আমি তখন তাদের বলছিলাম যে, তিনি মুর্তজা ভুট্টোর সঙ্গে সুজানি টাউনে আছেন। একথা শুনে তারা নীরব হয়ে গিয়েছেন। জাতোইদের একজন পারিবারিক বন্ধু বলেছিলেন যে, ৭০ ক্লিফটনের বাইরে গোলাগুলি হয়েছে, কিন্তু তিনি ঊনিশ বছর বয়সের সাবিনকে বলার সময় বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে বলেননি। সাবিন স্বভাবতই ধীর স্থির। সে শান্ত হয়েই রইল। তার যে আত্মীয়ার স্বামী মিডইস্টের মালিক, তিনি যখন পথেই শুনতে পেয়ে ফোনে জানালেন যে, মুর্তজা ভুট্টোকে গুলি করা হয়েছে এবং তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন, তখন সাবিন চিন্তিত হয়ে পড়ল। সাবিন স্মরণ করছে, 'আমরা আতঙ্কিত হলাম'। 'আমরা জানি যে, মুর্তজা ভুট্টো সব সময় সামনে বসেন এবং বাবা তার পাশেই বসেন চালকের আসনে। যদি তোমার পিতা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থেকে থাকেন, তবে বাবার খবর কি?'

সাবিনও তার গাড়িতে উঠে আশিকের সন্ধানে বের হলো। সাবিন তার ছোট দুই বোন অনুস্কা ও মাহেলাকে পরামর্শ দিল ফোন ধরতে এবং খবর ঠিকমত গ্রহণ করতে। তাদের দাদা-দাদী, অর্থাৎ আশিকের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ঘুমাচ্ছিলেন উপরের তলায়। তাদের খবর না দিতে পরামর্শ দিল। সে আরও বলল, 'আমরা প্রথমে মিডইস্টে গেলাম। বাবা সেখানে ছিলেন না। এরপর আমরা জিন্নাহ হাসপাতালে গেলাম, মনে করলাম, যে কোনো পুলিশ কেসই তো সেখানে যেয়ে থাকে। আম্মা গাড়ির বাইরে যেতে চাইলেন না, তাই আমিই মর্গে গেলাম। জানতে যে, সেখানে তার দেহ আনা হয়েছে কি না। আমি সেখানে যাওয়ার পথে কয়েকজন উর্দু পত্রিকার সাংবাদিক আমাকে জানালেন যে, আমার পিতা ওই মর্গে নেই। আমি স্বস্তি পেলাম। আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করে গাড়িতে ফিরে আসলাম এবং সন্ধান করা অব্যাহত রাখলাম।

সাবিন খুব সাহসী মহিলা। সেই তার পরিবারের প্রথম মহিলা যাকে বিদেশের কলেজে পড়াশুনা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। আশিক তাকে সমর্থন দিতেন; তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার লোক এবং জানতেন যে তার কন্যা খুব বুদ্ধিমতি এবং সে বিয়ের প্রস্তাবের চেয়ে জীবনকে গড়ে তুলতে বেশি আগ্রহী। সাবিন সেই সেপ্টেম্বরে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছিল এবং আইন বিষয়ের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নের জন্য ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে লেয়ারিতে আমাদের দু'জনের পিতা একই সমাবেশে দলের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখন থেকেই দেখেছি পিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি সাবিনকে পছন্দ করতাম। তার স্বভাব উষ্ণ ও সত্যিকারের বন্ধুত্বপূর্ণ। সে তৎক্ষণাৎ ছয় বছর বয়স্ক জুলফিকে বন্ধু বানিয়ে ফেলল। আমি ও জানি যে, সে ছিল একজন বিদ্রোহী, সে রাগলে জ্বলে ওঠে, সেটি আমার ক্ষেত্রে আরও বেশি আকর্ষণীয় ছিল।

সাবিনের চাচা, আশিকের ছোট ভাই জাহিদ গোলাগুলির সংবাদ শুনে দ্রুত অনীদের কাছে গেলেন। আশিকের খবর কেউ জানে না, সে আহত হয়েছে কিনা, তাও জানা নেই। আশিকের পরিবার তাকে খুঁজছে হাসপাতাল ও পুলিশ স্টেশনে। জাহিদের স্ত্রী নুজহাত ও তার স্বামীর মত সে-ও একজন ডাক্তার, তিনিও তার ভগ্নিপতিকে খুঁজছেন। কেউ কোনো সন্ধান পেল না। নুজহাত এক পর্যায়ে বললেন যে তিনি জিন্নাহ হাসপাতাল থেকে খবর

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন যে দু'জন সঙ্কটাপন্ন আহত ব্যক্তিকে সেখানে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে ফেরত নিয়ে গেছে। তারা তাকে আহত ব্যক্তিদের নাম বা অন্য কোনো তথ্য দেয়নি।

সাবিন বলল, 'এরপর আমরা শহরের অপরপ্রান্তে আগাখান হাসপাতালে গেলাম। সেটি ছিল অনেক দূরে, কিন্তু আমরা মরিয়া হয়ে পড়েছিলাম।' সাবিন আরও বলল, 'আম্মা গাড়িতে থাকলেন এবং আমি জরুরি বিভাগে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম জাতোইকে সেখানে নেয়া হয়েছিল কিনা। সেখানকার সবকিছুই অস্পষ্ট, কর্তব্যরত ব্যক্তি আমাকে কোনো স্পষ্ট জবাব দিল না। আমি আমার পিতার গঠন, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদির বর্ণনা দিলাম এবং বললাম যে, তিনি কাল সালওয়ার কামিজ পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মনে হলো তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আমার আত্মীয়া নুজহাত ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আবার মিডইস্টে যেয়ে খবর নিব, আমাদের কোনো আত্মীয় এ বিষয়ে কোনো খবর দিতে পারেন কিনা। আমরা চলে আসার সময় যখন গাড়িতে উঠছিলাম, তখন আমি দেখলাম যে, একটি পুলিশের গাড়ি জরুরি বিভাগের কাছে থামল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অফিসারের কাছে গেলাম, তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না যে, পুলিশ এর মধ্যে জড়িত আছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি আমার পিতা সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা। আমি আমার নাম বললাম এবং বললাম যে, আমার পিতা আশিক জাতোই মুর্তজা ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন। আমি বললাম যে ৭০ ক্লিফটনে কিছু ঘটনা ঘটেছে, তাদের কোথায় নেয়া হয়েছে, তিনি তা জানেন কিনা! আমি ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম, হতাশ হয়েছিলাম, আমি শুধুমাত্র সাহায্য চাচ্ছিলাম। সেই পুলিশ অফিসার, তরুণ গোঁফওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা তাদের ইতোমধ্যে হত্যা করেছি।' সাবিন আর্তনাদ করতে লাগল। সে এতক্ষণ যে শান্ত অবস্থায় ছিল তা থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। যে জন্য তার মাকে নিয়ে আশিককে খুঁজছিল, তাতো বিফলে গেল। সে বলল, 'আমি যত জোরে সম্ভব চীৎকার করতে লাগলাম। আর্তনাদ করে উঠলাম, আপনি কি বলছেন? আপনার কত বড় সাহস।' কিন্তু সে শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার সিনিয়র একজন পুলিশ কর্মকর্তা আসন থেকে উঠে আমাদের কাছে আসল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কেন আমি দৃশ্যের সৃষ্টি করছি। আমি সম্পূর্ণরূপে শোকাচ্ছন্ন। কয়েকজন গাড়িচালক কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন, পুলিশ আমাকে কী বলেছে এবং তারা আমার পক্ষ হয়ে দ্বিতীয় অফিসারকে বলা তার সহকর্মীর বক্তব্যটি শুনলেন।' এই পর্যায়ে সাবিন নীরব হয়ে গেল। জোরে নিঃশ্বাস নিল এবং তার ঠিক হতে মিনিট খানেক সময় লাগল। আমরা গত তের বছর একত্রে কাটিয়েছি, বিচ্ছিন্ন হইনি এবং প্রায়ই সেই রাতের ব্যাপারে আলাপ করেছি। সাবিন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু; আমরা আমাদের পিতাদের সম্পর্কে সব সময় আলাপ করে থাকি। কিন্তু সেই রাতের বেদনা আমরা কখনো বিস্তারিতভাবে ভাগ করে নেইনি। বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। সাবিন বলল, 'আমি কোনো একদিন ওই পুলিশ অফিসারকে দেখে নিব। তার চেহারা আমার পরিষ্কার মনে আছে। শেষে সাবিনের চাচি নুজহাত তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে গাড়িতে উঠালেন। তারা সময় নষ্ট করছিল। তখনও আশিকের কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। তার পরিবার নিশ্চিত হতে পারেনি যে, তিনি নিহত হয়েছেন। তারা গাড়িতে করে আবার মিডইস্টে আসলেন। আমাদের মনে ছিল আতঙ্ক আর ভয়, না জানি কি ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনতে হয়, যদি পুলিশের লোকটির কথা মিথ্যে না হয়ে থাকে। 'যদি

www.pathagar.com

মুর্তজা ভুট্টোর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে থাকে, তবে বাবা কোথায়? সাবিন আবার বলল, তারা তো সব সময় এক সাথেই ছিলেন।'

* * *

কীভাবে আমরা মিডইস্টে গিয়েছিলাম অথবা কীভাবে আমরা বিরাট আরোগ্য কক্ষে গেলাম, যেখানে আব্বাকে রাখা হয়েছিল, তা আমার মনে পড়ছে না। আমার মনে পড়ে, হেঁটে ভিতরে যেয়ে শুধু আব্বার পা দেখতে পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আম্মা দৌড়িয়ে কামরায় ঢুকলেন এবং সরাসরি আব্বার কাছে গেলেন। আব্বা তখন অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের নিচু বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমি তাকে দেখলাম নিশ্চল অবস্থায়। আমি আব্বার কাছে গেলাম, তার শরীর তখন রক্তে ডুবে আছে। অবস্থা দেখে বেদনায় আমার আর্তনাদ করে উঠার অবস্থা হলো, কিন্তু মুখই খুলতে পারলাম না। মানসিক আঘাত পেয়ে আমি বোধশক্তিহীন হয়ে পড়লাম। আমি শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আম্মা সরাসরি আব্বার পাশে গেলেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন, যেন আব্বাকে দেখতে কত ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল, তার মুখ ও বুক যেন রক্তে ডুবে ছিল, তা যেন তিনি বুঝতেই পারেননি। তিনি চীৎকার করলেন, 'মীর উঠে পড়!' আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিছানার পাশে গুটিশুটি মেরে বসলাম। আমি আব্বার মুখ আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলাম, আর আমার আঙ্গুলে রক্ত লাগল, আমি আহত বোধ করলাম। তার মুখ তখনও গরম ছিল, রক্তে ভিজে গিয়েছিল। আমি দ্রুত উঠে পড়লাম এবং কামরার শেষ প্রান্তে গেলাম এবং একটি সাদা ধাতুনির্মিত চেয়ারে বসলাম। আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম না।

আম্মা আব্বার সঙ্গে বসেছিলেন। হাসপাতালের কর্মচারীরা সার্জন খোঁজার জন্য দৌড়াচ্ছিল। আসলে মিডইস্টে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। এই কামরায় দলে দলে লোক আসছিল। মুর্তজা ভুট্টোর মৃত্যু দেখার জন্য তারা ভিড় করছিল। একটি বাজে ম্যাগাজিনের সম্পাদক এসেছিলেন। যিনি পরে রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছিলেন। তাকে আমি চীৎকার করে বললাম, 'এটি কোনো প্রদর্শনী নয়। চলে যান!' সেই মহিলা আমার কাছ থেকে একটু দূরে গেলেন, কিন্তু চলে যাননি। অন্যান্য বন্ধু ও আগন্তুকেরা আসল। আমি তখনও বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারিনি। এই হাসপাতালে কোনো সার্জনই পাওয়া গেল না, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষা করতে পারেন।

আশিকের ভগ্নিপতি ও মিডইস্টের প্রধান মালিক ডা. গাফফার জাতোই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার কর্মচারী খবর দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসেছিলেন। আমি তার সঙ্গে সে রাতের ঘটনা সম্পর্কে আলাপ করলে তিনি বললেন, 'আমার ড্রাইভার ছিল না। তাই আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলাম। এলাকাটি তখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেক পুলিশ ও রেঞ্জার সেখানে ছিল, অন্ধকারে তাদের সংখ্যা বুঝা যাচ্ছিল না। রাস্তায় শুধু আমার গাড়ির বাতিই দেখা যাচ্ছিল। তারা আমাকে থামিয়ে দিল, আমি আসতে পারছিলাম না। আমি জরুরি প্রয়োজনের কথা বলা সত্ত্বেও তারা আমাকে ছেড়ে দিল না। মিডইস্টে এখন

www.pathagar.com

পৌছবার আগে অন্য দুই-তিনটি রাস্তা দিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাই দো-তলওয়ার থেকে দুই মিনিটের পথ গাড়ি চালিয়ে মিডইস্টে আসতে তার লেগেছিল আধাঘন্টা।

আমরা আসার কয়েক মিনিট আগে ড. গাফফার মিডইস্টে পৌছেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে, আমার পিতা জোর করে নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারেননি। তার গলায় এত বেশি রক্ত জমে গিয়েছিল যে, কৃত্তিম উপায়ে তার ফুসফুসে বাতাস ঢুকানো সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি বললেন, আমি দেখতে পেলাম যে, তার জিহ্বা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছে। আমাদের তার শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল, যাতে জমাট বাধা রক্ত সরে যায় এবং তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারেন। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকা অবস্থায় তার হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। আমাদের এ সমস্ত মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

সেই সময়ে আম্মা ও আমি মিডইস্টে পৌছলাম। আম্মা আব্বার কানের কাছে অবস্থান নিলেন এবং ডাক্তাররা উত্তেজনা নিয়ে তার চারদিক ঘুরছিলেন। তিনি এক সেকেন্ডের জন্যও আব্বার পাশ থেকে নড়লেন না। তিনি তার পাশে অনবরত কথা বলতে থাকলেন, আবেদন জানালেন বিপদ কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে। আমার মনে আছে যে আমারও ইচ্ছা হয়েছিল আম্মার মত আব্বার সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু আমি পারিনি। আমি তখন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। আমি ভয়ে জমে গিয়েছিলাম। আম্মা আব্বার কাছে বিলাপ করে বলছিলেন, 'মীর, যেও না! মরে যেওনা তুমি! ফাতি ও জুলফির তোমাকে প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গে থাক। অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে থাক।'

প্রতিবার আম্মা আমার আর জুলফির নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আব্বার হৃৎপিণ্ডের মনিটার সাড়া দিয়েছিল, এটিই আম্মার পর্যবেক্ষণ। আম্মা স্মৃতি থেকে বলছেন, 'তার হৃৎপিণ্ডর স্পন্দন চলছিল শুধু তোমার আর তোমার ভাইয়ের জন্য।'

ড. গাফফার তার বৈঠকখানায় বসে আমাকে বললেন, 'মুর্তজার শরীর থেকে অনেক রক্ত ঝরেছে।' তিনি পরীক্ষা করছিলেন, আমি স্বাভাবিক আছি কিনা। আমি বললাম যে আমি ঠিক আছি। যদিও আমি ঠিক ছিলাম না, তবুও আমি একথা বললাম এজন্য যে, আমি তার থেকে সব কিছু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, তার নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল, তার ঘাড়ে যে মারাত্মক আঘাত লেগেছে সেখান থেকেও প্রচুর রক্ত পড়েছে। রক্তস্রোত মাথা থেকে বয়ে যাচ্ছে, তার দেহ থেকে অত্যাধিক রক্ত বের হয়েছে। তার মুখেও রক্ত ছিল, তার ফুসফুসের ভিতরও হয়তো রক্ত ঢুকেছে। আমি জানি না, সেদিন রাতে মিডইস্টে আসার পথে কত রক্ত বের হয়েছিল তার শরীর থেকে। তার জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল অন্তত পনের ইউনিট রক্তের। যেহেতু আমাদের কাছে প্রচুর রক্ত জমা ছিল না, আমি আমার কর্মচারীদের বললাম রক্ত দান করতে বললাম। আমরা যত দ্রুত রক্ত দিচ্ছিলাম, তারচেয়ে দ্রুতগতিতে মুর্তজার শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছিল।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আব্বার রক্তের প্রয়োজন। আমি একজন ডাক্তারকে বললাম যে,' আমি রক্ত দিব।' তিনি আমাকে আমার রক্তের টাইপ কী তা জিজ্ঞেস করলেন। আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে, তার রক্তের গ্রুপ আর আমার গ্রুপ একই। আমি সেকথাই ডাক্তারকে জানালাম। রক্তের প্রয়োজন ছিল দ্রুত এবং আমি ডাক্তারের সঙ্গে দৌড়াচ্ছিলাম। ডাক্তারের পিছনে দৌড়াবার সময় আমি সাবিনকে দেখতে পেলাম। আমি ভাবছিলাম, সে

www.pathagar.com

এখানে কি করছে? আমার মনে তখন এমন ভাবনা ছিল না যে, আব্বা ছাড়া অন্য কেউ আহত হতে পারে।

সাবিন আমাকে থামাতে চেষ্টা করল, জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আমার পিতাকে দেখেছ?' আমি থামলাম না। আমি বুঝিনি কেন সে তার পিতার কথা জিজ্ঞেস করেছে। আমি মাথা নাড়লাম। সেই বারান্দায় তার সঙ্গে আমার আর কি কথা হয়েছিল, মনে নেই, তবে সাবিন বলেছে যে, আমি তাকে বলেছিলাম, 'আমরা আব্বার জন্য রক্ত চাচ্ছি।' সে জবাব দিয়েছিল, 'আমি রক্ত দিব, তবে তুমি কি জান, আমার পিতা কোথায়?' আমি তার কথার জবাব দেইনি। আমি ততক্ষণে নির্ধারিত কামরায় যেয়ে রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সে রাতে সে সময়ে আমি প্রথম চিন্তা করেছিলাম যে, আমার পিতাকে বাঁচাবার একটি সুযোগ আছে। প্রথমবারের মত, আমার রক্তে থলে ভর্তি করলেন, আমার মাথা পরিষ্কার হলো, আমার উদ্দীপনা বেড়ে গেল। তারা যখন রক্ত নিচ্ছেন, একটা সম্ভাবনা আছে। আমি সর্বশেষ একটা কিছু করছি। আমি কিছু সাহায্য করছি। আমি আবার উপর তলায় গেলাম এবং কামরায় প্রবেশ করলাম। আব্বা সেখানে ছিলেন না। আমি চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আম্মা ও আমি সঙ্গে গেলাম, অপেক্ষমাণ কামরা পর্যন্ত। তিনি ভালো হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বেঁচে উঠবেন। আমি বারবার একথা আম্মা এবং অন্য যারা সেখানে ছিলেন তাদের বললাম। সবকিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে, আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলাম সংবাদের জন্য। আমাদের সঙ্গে অনেকেই যোগ দিলেন; ছোট কার্পেট যুক্ত কক্ষটি লোকজনে ভরে গেল। অনেকেই তসবিহ পড়ে দোয়া করতে লাগলেন। কেউ কেউ আম্মা ও আমার জন্য জল নিয়ে আসল। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা সেখানে একা ছিলাম না। আমি আবার সমস্ত চিন্তা জড়ো করলাম আব্বাকে ঘিরে। তিনি ভালো হয়ে যাচ্ছেন। এটি এমন এক রাত হতে যাচ্ছিল, যার কথা সামনের অনেকগুলো বছর বলে যাব এবং স্কুলের সাপ্তাহিক বন্ধের পরে যখন আবার সেখানে যাব, তখন এই কাহিনী বলব, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবার পর। আমি অন্য কিছু ভাবিনি, নেতিবাচক কিছু চিন্তা করিনি, সেরূপ কিছু আমার মাথায় প্রবেশ করেনি। মনে হচ্ছিল সবকিছুই ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

আব্বার একজন আত্মীয়ের ডাকনাম পিটু। ৫ জানুয়ারি যখন আল মুর্তজায় পুলিশ গুলি বর্ষণ করছিল, তখন তার ভাই আম্মা ও জুনামের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। পিটু হাসপাতালে এসে অপেক্ষা কক্ষ ও ডাক্তারদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে খবর আনতে লাগলেন। তিনি খবর সংগ্রহ করে আম্মা ও আমাকে জানাতে থাকলেন। তার দেয়া সর্বশেষ সংবাদ পেয়ে আমরা আশাবাদী হলাম। মনে করলাম, সবকিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হয়নি।

ড. গাফফারের স্মরণ আছে যে মুর্তজা আরও একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন অস্ত্রোপচার কক্ষে। তিনি বললেন, আমরা তার বুক খুলে এবং ম্যাসেজ করার মাধ্যমে তার হৃৎপিণ্ডকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এবার আমরা ব্যর্থ হলাম।

* * *

www.pathagar.com

পিটু কামরায় আসলেন, তখন প্রায় মধ্যরাত। তিনি আম্মাকে আগে বলেছেন, না আমাদের দু'জনকে একত্রে বলেছেন, জানি না। তিনি কাঁদছিলেন। আমাকে বললেন, 'দুঃখিত, তোমার পিতা ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।' আমি বুঝতে পারলাম না, তিনি কী বলছেন। আমি বুঝতে চেষ্টাও করিনি। আপনি বলেছিলেন 'তিনি বেঁচে উঠছেন। তিনি সাড়া দিচ্ছেন', এই কথাগুলোর আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। এক মুহূর্তের জন্য আমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পিটুর উপর। আমি ভাবতে থাকলাম, তিনি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছেন। আমি ক্ষিপ্ত হতে চাইলাম, আমার চীৎকার করতে ইচ্ছা হলো এবং পিটুর বিরুদ্ধে লড়তে চাইলাম, শুনতে চাইলাম কোনো ভালো খবর, কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত ফাতি, তিনি আর নেই।'

জানি না কিভাবে আমরা অপেক্ষা ঘর থেকে অস্ত্রপচার কক্ষে পৌছেছিলাম। বোধহয় কারো সাহায্য নিয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। মনে হয় আম্মা আমাকে ধরে নিয়েছিলেন। আব্বা কামরার মাঝখানে শুয়েছিলেন। পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তার মুখ সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল, চোয়াল ছিল ঢাকা, চোখ ছিল বন্ধ। তার মুখে শুকনো জমাট বাঁধা রক্ত ছিল, চুলেও রক্ত ছিল। আব্বার চুল সব সময়ই পরিপাটি অবস্থায় থাকত, আমি তার চোখে কখনো চুমু দেইনি; একটি লেবাননের কুসংস্কার অনুযায়ী, কেউ যদি কোনো ঠোঁট কারো চোখের পাতা স্পর্শ করে, তবে সে তার থেকে দূরে চলে যাবে। আমি আব্বার কাছ থেকে পৃথক হতে চাইনি। আমার কান্না আসছিল শরীরের ভিতর থেকে, আমার আত্মা যুদ্ধ করছিল ফুসফুসের বাতাসে জন্য। আমি চাচ্ছিলাম চেতনার বিলুপ্তি এবং সবকিছু শেষ হওয়ার। আমি আমার পিতাকে বিদায় জানাতে পারিনি, আমি মানতে পারিনি যে তিনি আমাকে ছেড়ে গেছেন। আমার গলা জ্বলছিল এবং শরীর কাঁপছিল। তার মুখ ছিল শীতল। তার মুখ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল কেন? ডাক্তার এবং আম্মা আমাকে মেঝে থেকে উঠালেন এবং আমাকে হাঁটিয়ে কামরার বাইরে নিলেন। তারা আমাকে কিছুই বলতে পারলেন না। আমার চারদিকের সবাই কাঁদছিলেন। কারো মুখ থেকেই কোনো সান্ত্বনার বাণী আসেনি, এটি ছিল সকলের জন্য অত্যন্ত বড় একটি আঘাত।

আম্মা ময়নাতদন্ত হওয়ার সময় সেখানে ছিলেন। তিনি আব্বার মৃতদেহের সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন। তিনি পিটুর স্ত্রীকে বললেন, আমাকে নিয়ে বাড়ি যেতে।

আমরা হাসপাতাল ছেড়ে আসার সময় চারদিকে ক্যামেরার ভিড় ছিল; জ্বলে উঠল আমার মুখের উপর। আমি বেদনায় চীৎকার করছিলাম, আমার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মুখ অশ্রুতে ভিজে গিয়েছিল। কাঁদার সময় আমার সমস্ত শরীর ব্যথা করছিল। আমরা গাড়িতে উঠার সময় ক্যামেরা ঘিরে ফেলল এবং আমার ছবি নিল। মীর মুর্তজা ভুট্টো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার হাসপাতাল ত্যাগ করার অর্থই তার বিদায়।

তখনও পুলিশ ছিল সর্বত্র। আমরা বাসায় পৌছানোর সময় দেখলাম ক্লিফটন রোডে পুলিশের লাইন। সোফি জুলফিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন এবং আমাদের জন্য নিচতলার বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দ্রুত আমার কাছে আসলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, সব ঠিক আছে, তাই আমি ফিরে এসেছি। তিনি আব্বার কথা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন? আমার এক মুহূর্ত

www.pathagar.com

সময় লাগল বুঝতে যে তিনি জানেন না যে আব্বা জীবিত নেই। আমি বললাম, 'ওরা তাকে হত্যা করেছে, তিনি মৃত, তিনি চলে গেছেন।' আমার মনে হলো, আমার মুখে রক্ত।

আমার উচিত ছিল আব্বার সঙ্গে থাকা। আমি তার সঙ্গে সুরজানি টাউনে যাইনি কেন? যখন তিনি বললেন যে, আমি তার সঙ্গে যোগ দিতে পারব না, সে কথা আমি শুনলাম কেন? আমি বড় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জুলফির কামরায় গেলাম। আলো জ্বলছিল, কিন্তু সে ছিল গভীর ঘুমে। তার কোনো ধারণাই নেই, সে রাতে সে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় কী ঘটেছে। আমি তার পাশে শুয়ে পড়ছিলাম তাকে রক্ষা করতে। আমি বুঝেছি, আব্বাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। অবশেষে আমি শোবার সময়ে চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি আব্বার কথার মর্মার্থ, যখন তিনি বলতেন যে, আমার কিছু হলে তিনি বাঁচবেন না। আমাকেও মরতে হবে। আমি অনুভব করলাম যেন আমার আত্মা আলাদা হয়ে পড়েছে, যেন কেউ আমার হৃৎপিণ্ড দেহ থেকে নিয়ে গিয়েছে এবং আমার ভিতরটা খালি হয়ে পড়েছে। আমি নীরবে কাঁদলাম, জুলফিকে জাগিয়ে তুলতে চাইলাম না। গলা বন্ধ হয়ে না পড়া পর্যন্ত আমি কাঁদলাম। এরপর আমি উঠে বৈঠকখানায় গেলাম এবং ফোন উঠালাম। যা ঘটেছে তা পৃথিবীর সকল পরিচিত ব্যক্তিকে জানালাম।

* * *

মধ্যরাতে আব্বার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সাবিন মিডইস্ট ত্যাগ করল। সে বলছিল, 'আশঙ্কা করেছিলাম যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হতে পারে। তাই, আমরা বাড়ি ফিরছিলাম আমাদের শক্তি সঞ্চয় করার জন্য, যেহেতু আমার পিতার অনুসন্ধান কাজ তখনও চলছিল।'

এই দুঃসংবাদ যখন প্রচারিত হয়েছিল, অনীদ তখন ছিল রাস্তায়। তার পিতার কোনো সংবাদ তখনও পাওয়া যায়নি। সবার দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল। গাফফার কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আশিক কোথায়? তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কেন?' 'আসলে আমরা কিছুই জানতাম না' – সাবিন বলছিল।

জাহিদ ও অনীদ জিন্নাহ হাসপাতালে আমাদের বেয়ারা আসগরকে দেখেছে, তার হাতে গুলি লেগেছে। সে কাঁদছিল এবং সিন্ধিতে অনীদকে বলছিল, 'ওরা আমার পিতাকে এবং তোমার পিতাকেও হত্যা করেছে।' অনীদ দাঁতে কামড় দিয়ে কথাগুলো স্মরণ করছে। সে আরও বলল, 'আমি তাকে বলেছিলাম, একথা আর না বলতে।' এরপরও আসগর বলল যে, সে নিজে চোখে ঘটনা দেখেছে। আমি তাকে আবার উচ্চকণ্ঠে আর না বলতে বললাম। তবে পরে তার সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার পিতা মৃত। তারা জিন্নাহ হাসপাতালে আশিকের অবস্থান সম্পর্কে কোনো খবর না পেয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল। যাবার সময় অনীদ ক্ষিপ্ত হয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত এক পুলিশ অফিসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সে চীৎকার করে বলে উঠল, 'তোমরা খুনী'। তার কাকা জাহিদ তাকে কোনো ক্রমে শান্ত করেন।

জাতোই ভবনে পরিবারের সবাই অবস্থান নিচ্ছিলেন; বৈঠকখানা, রান্নাঘর এবং বাগানের সুবিধা মত স্থানে এবং যতদূর সম্ভব খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন। সাবিন তার পিতার ডায়েরি বের করল; সেখানে সেদিনই তিনি লিখেছিলেন– 'আমার কি হয়েছে,

www.pathagar.com

সেটি বড় কথা নয়, কথা হলো, আমার উপর যখন কিছু ঘটেছে, তখন আমার আচরণ কিরূপ ছিল তা। থাকতে হবে শান্ত মন, পরিষ্কার হাত, উষ্ণ হৃদয়।'

সাবিন তার পিতার অশুভ লক্ষণ কথাগুলো পড়ে একটু বিরতি নিল এবং নিজেই নিশ্চিত হলো, আমি যেমন মনে করেছিলাম, তেমনি মনে করল যে, সবকিছু ঠিকই আছে। আশিকের ডায়রিতে বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদের যে সমস্ত ফোন নম্বর লেখা ছিল, সে সমস্ত স্থানে ফোন করে সে জিজ্ঞেস করতে থাকল, তারা কোনো সংবাদ জানে কি না। একজন পারিবারিক বন্ধু তাকে জানালেন যে, তিনি শুনেছেন যে, আশিক জাতোই জীবিত আছেন, তবে তিনি আছেন কারাগারে। সাবিন আনন্দের সঙ্গে ফোন রেখে দিল এবং দ্রুত পরিবারের অন্যদেরকে খবরটি দিল। কিন্তু ওই বন্ধু ভুল করেছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল যে, পরিবারের গাড়ি চালক আসিফ জাতোই জীবিত এবং কারারুদ্ধ। তিনি ভাবছিলেন যে, মুর্তজার সঙ্গে একজন জাতোই আছে, তাই এই ভুল হয়েছিল। এটি ছিল একটি নিষ্ঠুর ভুল। সাবিন স্বস্তি পেয়েছিল খুব অল্প সময়ের জন্য।

অনীদ ও জাহিদ তাদের পরিবার চলে গেছে কি-না জানার জন্য মিডইস্টে ফিরে আসল। অনুসন্ধান করার জন্য তারা কয়েকটি ফোন করবে। মিডইস্ট থেকে নতুন কোনো সংবাদ না পেয়ে তারা আবারও জিন্নাহ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে আশিককে আনা হয়েছে কিনা অনুসন্ধান করার জন্য গেল। অনীদ আস্তে আস্তে বলল, 'আমি গাড়ির পিছনের আসনে বসেছিলাম। আমার এখন আর মনে নেই, গাড়িটি কার ছিল। আমার পাশে ছিলেন জাহিদ চাচা এবং সামনে ছিল আমার এক চাচাতো ভাই। গাড়ি যখন মিডইস্ট ছেড়ে যাচ্ছিল, ওই চাচাতো ভাই আমার চাচা ও আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'আমি দুঃখিত, তিনি আর নেই।' এইমাত্র ফোনে খবর পেয়েছেন, তিনি জিন্নাহ হাসপাতালের মর্গে, (জরুরি বিভাগে নয়) সন্ধান পেয়েছেন। অজানা অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া গেল যে, আশিক মৃত।

অনীদ ও জাহিদ যখন জিন্নাহ হাসপাতালে পৌছল, তখন সেখানে অন্ধকার। করাচি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি শহরের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়েছে। তারা অন্ধকারেই আশিকের দেহ সনাক্ত করল এবং অপেক্ষা করতে থাকল মোমবাতির সাহায্যে ময়নাতদন্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার। হাসপাতালে পৌছার আগে কেউ জানতে পারেনি আশিকের মৃতদেহ কোথায় ছিল। ঘটনার তের বছর পর জাহিদ আম্মাকে একথা বলেন। আশিকের মাথার পিছনে গুলি করা হয়েছিল, মৃত্যুর ছয় ঘণ্টা পর, রাত দু'টার সময় তার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেল।

জাহিদ সেখানে থেকে গেলেন আশিকের মৃতদেহ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অনীদ একাই বাড়ি চলে গেল। তাদের জাতোই ভবনে পৌছবার সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের। সাবিন প্রবেশপথ খোলা এবং গাড়ি প্রবেশ করার শব্দ পেল। সে খুব আনন্দে দৌড়ে গেল অনীদ ও চাচা জাহিদের কাছে সুখবরটি দিতে যে, তিনি বেঁচে আছেন। সে তাদের বলল, 'তিনি জীবিত আছেন। জীবিত আছেন।' সে বলল যে একটি ফোন পেয়েছে, তিনি জীবিত আছেন তবে কারাগারে। সাবিন বলল এরপর দেখলাম জাহিদ চাচা মুখে হাত দিয়ে কাঁদছেন এবং কাঁপছেন। তিনি বললেন, 'এইমাত্র আমি তার মৃতদেহ দেখে এসেছি, তিনি আর নাই।' এরপর কী ঘটেছিল, তা আমার কাছে

www.pathagar.com

অস্পষ্ট।

তখন রাত তিনটা, আম্মা হাসপাতালে অপেক্ষা করছিলেন আব্বার মৃতদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন শেষে ছাড়িয়ে আনার জন্য, এমন সময় প্রধানমন্ত্রী মিডইস্টে এসে উপস্থিত হলেন। বেনজির তার ইসলামাবাদের বাসভবন থেকে করাচি এসেছেন। তিনি প্রথমে তার বাড়িতে গেলেন এবং তারপর হাসপাতালে আসলেন। এটি মানুষকে দেখানোর জন্য যে, তিনি শোকাহত। তার সঙ্গে এসেছিলেন ওয়াজিদ দুররানি, যে ব্যক্তি ওই রাতের গুলি বর্ষণকারীদের একজন, তাকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে অভিবাদন জানাতে দেখা গেছে ছবিতে। সঙ্গে ছিল আরও এক ব্যক্তি, সোয়েব সাডডল, যে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ শাহ ছিল আরও একজন অভিযুক্ত, সেও সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিডইস্টে এসেছিল।

আমার ওয়াদি বেনজির তার নিজের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে এক সম্প্রচার মাধ্যমের সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, মুর্তজা তার নিজের ভুলের জন্যই নিহত হয়েছে। তিনি মুর্তজার আহত হওয়ার বিষয়টিকে খেয়ালখুশিমত বিকৃত করে দাবি করেছেন যে, তার নিজের রক্ষীরাই তাকে গুলি করেছে; তারা পুলিশকে গুলি করতে গিয়ে তাকেই হত্যা করেছে তার পেছন থেকে, তিনি তা মৃত্যুর আগে বলে গেছেন। আব্বার কবর হওয়ার পর থেকে বেনজিরের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। যতবারই তিনি আল মুর্তজায় আব্বার কবর জেয়ারতের চেষ্টা করেছেন, লারকানার স্থানীয় লোকেরা তার গাড়ির উপর পাথর ও জুতা নিক্ষেপ করেছে। আমরা আব্বাকে গারহি খোদবক্সে কবর দেয়ার কিছুদিন পরই বেনজির আম্মার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজ্জু করলেন এই মর্মে যে, তিনি ইদদতে যেতে রাজি হননি। এটি একটি অস্পষ্ট ইসলামিক বিধান বিধবাদের জন্য। এই বিধান অনুযায়ী বিধবাকে তার স্বামীর মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত ঘরে আবদ্ধ থাকতে হয়। আম্মার বয়স ছিল তখন মাত্র চৌত্রিশ বছর, তিনি গভীরভাবে শোক-দুঃখে কাতর হয়েছিলেন। তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল, ওজন অনেক কমে গিয়েছিল এবং তিনি পুলিশের মামলা ও আদালতে যাতায়াত করতেন গাড়ি চালিয়ে। তিনি আমাকে বললেন, তোমার ফুফু কেন আমাকে ইদদত পালন করতে বললেন, জান? এর ফলে কেউ তোমার পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করবে না। এভাবে মুর্তজা হারিয়ে যাবে, আর তার খুনিরাও অদৃশ্য হবে।

আম্মা ইদদত পালন না করে ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করেছে বলে যে ব্যক্তি আম্মার নামে আদালতে অভিযোগ করল, সে বেনজিরের লারকানার একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। মামলাটি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়নি। এই ঘটনার বছর পাঁচেক পর, সে পিপিপি ত্যাগ করার পর আম্মার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু বেনজির ছিলেন আম্মার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত এবং আব্বার স্মৃতির প্রতি বিরক্ত।

নববর্ষের প্রথম দিকেই আম্মা আব্বার গঠিত প্রাথমিক অবস্থায় থাকা দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করেন। দলকে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি এর চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, ক্ষমতা হারানোর পর এবং ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে তার বড় শত্রু পিএমএল বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল; সে সময় তিনি একজন সম্মানিত লেবাননের

www.pathagar.com

সাংবাদিক গিসলে মৌড়িকে সাক্ষাৎকার দেন। ওয়াদি তখন আম্মা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, সে একজন 'পেট দেখানো নাচুনী', লেবাননের নিচু সমাজ থেকে সে এসেছে। তিনি এ সমস্ত অশোভন উক্তি করেন সিন্ধু কাউন্সিলের সভায়ও, আব্বার মৃত্যুর পর। তিনি আরও বলেছেন যে, মুর্তজা তার স্ত্রীর সঙ্গে রাতে ঘুমাতেন না, তাকে বিয়ে করেছিল চাকরানী হিসেবে রাখতে, ঘরসংসার ও বাচ্চাদের দেখার জন্য। আম্মা আব্বার মতই শান্তভাবে কৌতুক করে নিজেদের মধ্যে এর জবাবে বললেন, বেনজির যদি মীর মুর্তজার শোবার ঘরের খবর জেনে থাকেন, তবে তিনি তার মৃত্যুর দিন, সেই সেপ্টেম্বরের রাতের বেলা কি ঘটেছিল, তা জানে না কি করে বলেন? আব্বার মৃত্যুর পর আগের সেই ওয়াদিকে আর পাইনি। তিনি বিদায় নিয়েছেন।

* * *

সাত্তার ও ওয়াজাহার পুলিশ তত্ত্বাবধানে মারা যায়, সময়মত চিকিৎসা না পাওয়ার কারণেই তাদের মৃত্যু হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন, আর যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী ছিলেন, তাদের সবাইকে পুলিশী তত্ত্বাবধানে নেয়া হয়েছে। আসিফ জাতোই আমাকে বললেন, 'আমাদের ক্লিফটন থানায় নেয়া হয়েছিল এবং সেখানে প্রশ্ন করা হয়েছিল'। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তাদের গ্রেফতার দেখানো এবং তিন মাস কারাবন্দি থাকা অবস্থায় রিমান্ডে নেয় হয়েছিল কিনা। বেনজির সরকারের পতনের পূর্ব পর্যন্ত তারা আটক অবস্থায় ছিলেন। তিনি অট্টহাসি হাসলেন। তারপর বললেম, 'সরকার তো তাদের, কি আচরণ তাদের কাছে আশা করা যায়?'

বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি ও সাক্ষীদের খেয়ালখুশিমত আটকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এক থানা থেকে অন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা কোথায় ছিলেন, তা আমরা জানতে পারিনি।

আইনগতভাবে আবেদন উপস্থাপন করার জন্য যে সমস্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তার প্রচেষ্টা চালানোর সকল পথ আমাদের জন্য বন্ধ করে রেখেছে বেনজির সরকার। তারা তাদের আইনের আশ্রয় নিতে দেয়নি। আমাদের সিন্ধু হাইকোর্টে যেতে হয়েছে পুলিশী মামলা রুজ্জু করার জন্য।

ইতোমধ্যে তাদের নিজের মত করে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা সাজিয়েছে। তারা অভিযোগ এনেছে যে, এই সমস্ত ব্যক্তি গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এটিই অপারেশন ক্লিনআপ-এর সাধারণ নিয়ম।

কারাগারে জীবিত ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করা হতো এবং তাদের উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে। কায়সার আমাকে বললেন, 'সে রাতে থানায় পুলিশ আমাদের মেরেছে এবং বলেছে, 'আমরা তোমার নেতাকে হত্যা করেছি, এখন আমরা তোদের প্রভু।' সে রাতের একজন বন্দুকধারী রাজ তাহির আসিফকে বলেছে, 'আমরা তোমাদের নেতাদের হত্যা করেছি, তোমাদের কি করব বলে ভাবছ?' পুলিশ নিয়মিত বিদ্রূপ করত প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের। সেই হত্যাকাণ্ডের পরপরই রাতে আসিফ জাতোইকে ক্লিফটন থানার সেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাকে চোখ বেঁধে একটি নম্বর প্লেটবিহীন গাড়িতে উঠানো হয়। চোখ বাঁধার পর একটি সিপাই আমার হাত বাঁধল, এরপর একজন অফিসার

www.pathagar.com

আমাকে বলল, 'তোমার সময় হয়ে এসেছে। আমরা আজ রাতেই তোমাকে হত্যা করব। বিশ মিনট গাড়িতে ঘুরিয়ে তারপর হাসতে হাসতে তাকে সেলের ভিতর নিক্ষেপ করল চোখ ও মুখ বাঁধা অবস্থায়।

জীবন রক্ষা পাওয়া বন্দিরা প্রায়ই কারাগারে পুলিশের লোকের দেখা পেতেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে গোপনে বলেছেন যে, রাজ তাহির, ওয়াজিদ দুররানী ও সাকিব কোরেশী সব সময় উপস্থিত থাকত। তারা প্রশ্ন করত, নির্যাতন কাজের তদারক করত, 'সাচোস' (এটি একটি সিন্ধি বস্তু যা চামড়া দিয়ে তৈরি, তার মধ্যে ধারালো পেরেক থাকে, যার সাহায্যে মাংস থেকে ত্বক আলাদা করা হয়) দিয়ে অত্যাচার করা যায়, সঙ্গে মানসিক নির্যাতনও চালানো হয়। আসিফ জাতোই আমাকে, একজন সিন্ধু পদস্থ কনস্টেবল কিভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অমান্য করে তাকে পানি দিয়েছিল, তার বর্ণনা দিলেন। তাদের উপর নির্দেশ ছিল বন্দিদেরকে খাবার বা পানি সরবরাহ না করতে। রাজ তাহিরের নির্দেশ অমান্য করার কারণে ওই সিপাইকে পেটানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আবার আমাদের পানি সরবরাহ করেন। এরপর তিনি তাহিরের কাছ থেকে আরও কঠিন শাস্তি পান।

আসিফ জাতোইয়ের দেয়া বিবরণ অনুযায়ী আমি সেই কনস্টেবলকে খুঁজে বের করলাম। তিনি একজন সিন্ধী পুলিশের লোক; সেলে তার কাজ থাকত রাতের শেষ দিকে, প্রায়ই তার রাতের পালা শেষ হতো সকাল পাঁচটা থেকে আটটার মধ্যে। আমি কথা বলার সময় সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আমি যদি তার প্রকৃত নাম ব্যবহার করি তবে তার আপত্তি আছে কিনা, জবাবে তিনি বললেন, 'সেটি আপনার ইচ্ছা।' তার চেয়ে অনেক কম স্পর্শকাতর অবস্থানের লোকেরা তাদের নাম ব্যবহারের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে, কিন্তু এই ব্যক্তি তা করেননি। আমি তার নাম উল্লেখ করব না। তিনি এখনও একজন বেতনভোগী পুলিশ কর্মচারী এবং গত বিশ বছর যাবত সেখানে কাজ করছেন। যখন আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তার সঙ্গে ছিল তার অল্প বয়স্ক ছেলে, সে নির্ভর করে তার চাকরির উপর। যখনই চোখ বাঁধা অবস্থায় কোনো আহত ব্যক্তিকে থানায় আনা হতো, তিনি তাদের জন্য কিছু জল আনতেন, পারলে সামান্য খাবারও আনতেন এবং ঘুমাবার ব্যবস্থা করতেন। এজন্য প্রথমে তাকে মেরেছে রাজ তাহির, তারপর জিশান কাজমী একজন নিষ্ঠুর পুলিশের লোক, সে 'অপারেশন ক্লিপ আপ টাস্কফোর্সে' কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে করাচিতে নিহত হয়েছেন। সে যখন দেখল যে স্বাক্ষীদের জল সরবরাহ করা হয়েছে, সে একজন পাঞ্জাবি কনস্টেবলকে মার দিল। তখন সেই কনস্টেবল বলল যে, সে জল দেয় নাই, জল দিয়েছে অন্য একজন; সেই ব্যক্তি আমি, আমার নাম সে বলে দিল। আমি তখন আলী বাবা নামক একটি স্টলে গিয়েছিলাম কিছু খাবার জন্য। জিশান কাওমী সেখান থেকে আমাকে চোখ বেঁধে তুলে থানায় নিয়ে এল। আমাকে পিটাল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, আমার সামনের দাঁত ভেঙে গেল এরপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কেন তাদের সাহায্য করেছি। সে বলল, 'ওরা কারা?' সে আমার বন্দুক নিয়ে গেল এবং আমাকে বিনা বেতনে সাময়িক বরখাস্ত করল শাস্তি হিসেবে।

আব্বার হত্যাকাণ্ডের তিনমাস পর বেনজির সরকারের পতন ঘটে; এর আগে কোনো জীবিত কারাবন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়নি। আমি শেষের দিকে একবার ফোনে ফুফুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার সরকার সে-দিনের জীবিত ব্যক্তিদের আটক করে রাখছেন কেন, যে

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পুলিশের লোকদের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার মাধ্যমে সসম্মানে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, তাদের একদিনের বেতনও কাটা যায়নি। তিনি আমাকে বললেন, 'ফাতি, তুমি অনেক ছোট।' তারপর রাগত স্বরে বললেন, 'এটি সিনেমা নয়, সরকার, কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের নিজস্ব পথ আছে।' তিনি কখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।

আমার পিতার হত্যার কয়েকদিন পর আলী সোনারাকে তার করাচির গোপন আটক স্থান থেকে তিন ঘণ্টার পথ হায়দ্রাবাদের পুলিশের একটি সেলে নেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠিত হয়নি এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা এখনও জারি হয়নি, এবং কোনো হাকিমই তার করাচির বাইরে বেআইনী বদলির অনুমোদন করেননি। সোনারাকে করাচি পুলিশের বন্দি হিসেবে রাখা হয়েছিল ২০০৩ পর্যন্ত। তার মুক্তির এক বছর পর তিনি লেয়ারিতে নিহত হন।

আব্বার মৃতদেহ লারকানায় নেয়া হয় ইধি ফাউন্ডেশনের একটি হেলিকপ্টারে। লারকানায় অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল খুব বড় আকারে এবং নীরবে সারাদেশে তিনদিনের শোক পালিত হয়েছিল। হাজার হাজার লোক, সমর্থক ও শোকাহত একত্রে ৭০ ক্লিফটনে এসেছিল আম্মা, জুলফি ও আমার হেলিকপ্টারে যাত্রার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। আমরা তখন বেনজির, রাষ্ট্র ও পুলিশের চোখে শত্রু। আমরা লারকানায় পৌঁছবার পর সেখানে হাজার হাজার লোক এসেছিল আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তারা আব্বাকে তার অন্তিম সজ্জায় শয়ন করাতে নিয়ে গেলেন গারহি খোদাবক্সে। আব্বাকে কবর দেয়া হয়েছিল আসল পিপলস পার্টির পতাকা দিয়ে। আমার মনে হয়, তিনি তা পছন্দ করতেন।

জুনাম তার দ্বিতীয় ছেলে নিহত হওয়ার সময় বিদেশে ছিলেন; সেখান থেকে ফিরে আসেন। তিনি 'আলযেমিয়ারে' আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাই তার আদরের বড় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ কেউ তাকে দেয়নি। তার গাড়ি ৭০ ক্লিফটনে আসার কয়েক মিনিট আগে তাকে এই খবর দেয়া হয়। হেলিকপ্টার করে লারকানা যাওয়ার পথে তিনি শিয়া রীতিতে বুক চাপড়াতে থাকলেন এবং চীৎকার করে কাঁদলেন। তিনি আর আরোগ্য লাভ করেননি। মীরকে কবর দেয়ার পরদিন তিনি আল-মুর্তজার বারান্দায় ঘুরে ঘুরে তার ছেলেকে ডাকছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'মীরকে বল, তার কফিন বদল করতে' তার কাফনের কাপড় রক্তে ভর্তি। বেনজির শোকের তৃতীয় দিন আল-মুর্তজায় আসলেন গোপনে, রাতের আঁধারে, বিক্ষুব্ধ জনতা এড়িয়ে। তিনি বললেন যে, তার ইচ্ছা, তার মা কয়েকদিন তার কাছে থাকবেন। তিনি জুনামকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। এরপর আমরা আর কখনো আমাদের দাদীকে দেখতে পাইনি। তিনি এখন জারদারির দ্বারা যোগাযোগবিহীন অন্তরীণ অবস্থায় দুবাইয়ের একটি জাঁকালো বাড়িতে আছেন। বেনজির আমাদের তার সঙ্গে একবার মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছিলেন। সময়টা ছিল আব্বার নিহত হওয়ার ছয় মাস পর। জুনামকে দেখাচ্ছিল অস্বাভাবিক ক্ষিণ, ফ্যাকাশে এবং বিশ্রি চেহারার। তাকে ওষুধ দেয়া হচ্ছিল, জানি না কেন। তিনি জুলফি ও আমাকে দেখে কাঁদতে শুরু করলেন। ওয়াদি বললেন যে, আম্মা যদি আসেন, তবে সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দেয়া হবে। তার সঙ্গে আমাদের আলাপ হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হলো, বলা হলো সময় ফুরিয়ে গেছে। তিনিই আমার পিতার পরিবারের একমাত্র সদস্য, যাকে আমরা সত্যিকারের

www.pathagar.com

ভালোবাসি এবং তিনিও আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর আমাদের সেই পিতামহীর সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় নাই, তাকে দেখতে যেতে বা তার যত্ন নিতে অনুমতি দেয়া হয়নি, যদিও তিনি একাকীত্ব বোধ করছিলেন। তার সঙ্গে এখন দেখা হয় দাস-দাসী, অপরিচিত লোক আর জারদারি পরিবারের সদস্যদের। আমার পিতার ছোট বোন সনাম আমার পিতার মৃত্যুর পর রাজনৈতিক চাপে পড়ে নয় বছর বয়সের জুলফি, আম্মু ও আমার (আমার বয়স তখন মাত্র আঠার) বিরুদ্ধে ৭০ ক্লিফটনের মালিকানা নিয়ে মামলা করলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে পাকিস্তানে আসেন আব্বা, আম্মা, আমার ভাই ও আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। আমি এই ফুফুকে খুব ছোট বেলায় দেখেছি, এরপর বহুদিন তাকে আর দেখিনি।

* * *

আব্বার হত্যাকাণ্ডের সাক্ষীদের গ্রেফতার করে, যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাদের মুক্তি দিয়ে বেনজির সরকার সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে আমাদের আইনগত বাধাগ্রস্ত করে। এর পরিবর্তে তারা স্থাপন করে একটি ট্রাইব্যুনাল- যাদের শাস্তি প্রদান করার কোনো আইনগত কর্তৃত্ব নেই মুর্তজা হত্যাকাণ্ডের।

বিচারপতি নাজির আহমেদ ছিলেন আদালত বেঞ্চের একজন মনোনীত বিচারক। তিনি সিন্ধুর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তিনি আমাকে বলেছেন, 'আমাদের দায়িত্ব ছিল কে আক্রমণকারী এবং কার বিরুদ্ধে পুলিশী মামলা করা যেতে পারে। আমরা আমাদের প্রতিবেদনে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছি যে, পুলিশই ছিল আক্রমণকারী। এটা বিচার করার আদালত ছিল না। এটা ছিল তদন্ত করার ট্রাইব্যুনাল।'

এই আদালতকে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়নি; তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয়া হয়েছিল। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, মুর্তজা ভুট্টোর মৃত্যুর পিছনে ছিল গুপ্তহত্যার পূর্ব পরিকল্পনা এবং সেখানে কোনো গোলাগুলি বা পাল্টা আক্রমণের বিষয় ছিল না। বিচারপতি আসলাম জাহিদ প্রশ্ন করেছেন, 'বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল কারা?' পুলিশ বিশেষ করে ওয়াজিদ দুরবানী দাবি করেছে যে, তারা দেখতে পায়নি যে, রাস্তার বাতিগুলো বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এটি করা হয়েছিল বিশেষ উদ্দেশ্যে। কারণ, শুধু একটি রাস্তায়ই বাতি ছিল না এবং গোলাগুলি শেষ হওয়ার পর আবার বাতি এসেছিল।

দ্বিতীয়ত, ট্রাইব্যুনাল আদালতে প্রকাশ করে যে, পুলিশ অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল এবং আহত ব্যক্তিদের রাস্তায় ফেলে রেখেছিল। বিচারপতি আসলাম জাহিদ আরও বললেন যে, 'আমরা সেই সকল পুলিশের নাম উল্লেখ করেছি- ওয়াজিদ দুররানী, সাডল এবং তাদের সহকর্মীরা- তারাই ছিল প্রথম আক্রমণকারী।' তিনি আরও বললেন, 'আমরা যখন আঘাতের তুলনা করলাম, হতবাক হয়ে দেখলাম যে পুলিশ দাবি করেছে যে, মুর্তজা ভুট্টোর পক্ষের লোকেরা আক্রমণ চালিয়েছিল, অথচ তারা সবাই মারা গিয়েছে, আর একজন মাত্র পুলিশ অফিসার শহীদ হায়াতের আঘাত তার উরুতে পেয়েছে নিজের দ্বারা এবং অন্য একজন অফিসার সিয়াল আঘাত পেয়েছে পায়ে। এই ঘটনার পর তারা আপনার পিতাকে মিডইস্টে রেখে এসেছে। মিডইস্ট এমন হাসপাতাল নয়, যেখানে সবসময়

www.pathagar.com

ডাক্তার থাকেন। তারা সেখানে এনে তাকে রেখে গিয়েছে।

এরপর শহীদ হায়াত সরকারি মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর ব্যবস্থা করেন এবং ইতোমধ্যে সেলাই করা উরুর আঘাত পরীক্ষা করে তারা রায় দেয় যে সেটি নিজের তৈরি করা। যে গুলি তার উরুকে আঘাত করে সেটি ছিল পুলিশের অস্ত্রের গুলি।

তৃতীয়ত ট্রাইব্যুনাল মত প্রকাশ করেছে যে, মুর্তজা ভুট্টোর হত্যাকাণ্ডের আদেশ অবশ্যই এসেছে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে।

পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় আসিফ জারদারি এবং আবদুল্লাহ শাহ জড়িয়ে পড়ে ১৯৯৭ সালে। এটি আজও আদালতে বিচারাধীন আছে, যদিও আমাদের ধারণা, দুর্নীতিবাজদের কাছ থেকে আমরা কখনো সুবিচার পাব না, আর এখন তো জারদারির করায়ত্ত পাকিস্তানের আদালত ক্রমাগত বিচারপতিদের বদলি করে, ইতোমধ্যে ষোল জনকে বদলী করা হয়েছে। একজনকে বদলি করা হয়েছে এজন্য যে, তিনি একজন মহিলা এবং পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মনে করেন যে, এরূপ একটি মামলার চাপ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। এদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিচারের মাঝপথেই নির্দোষ সাব্যস্ত হচ্ছেন, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনার আগেই তারা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে।

৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ করাচির সেশন আদালতে মীর মুর্তজা ভুট্টো ও তার ছয় সহযোগীকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। এই রায় বের হওয়ার একমাস পর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারি, যিনি বেনজিরের দ্বিতীয়বারের শাসনামলে ১৯৯৬ সালে শীতকালে তাকে বরখাস্ত করেন– তিনি জাতীয় টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে আমার পিতার নিহত হওয়ার বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। লেঘারি দাবি করেন যে, জারদারি তার স্ত্রীর শাসনামলে একদিন গভীর রাতে তার কাছে এসে বলেন যে, মুর্তজা ভুট্টোকে শেষ করে দেয়া হবে। জারদারি আরও বলেছেন যে, হয় সে থাকবে, নতুবা আমি। প্রেসিডেন্ট লেঘারিকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল এবং বয়সের তুলনায় বেশি বৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন যে, বেনজির ও তার স্বামী উভয়কে তিনি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের পর দুর্নীতি আরও ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বললেন, 'তার হাতে মুর্তজার রক্ত আছে; আল্লাহ জানেন, আরও কতজনকে সে হত্যা করেছে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপসংহার

এপ্রিল ২০০৯

এই বই শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে আমার চারদিকের জগৎ যেন আস্তে আস্তে ধ্বসে যাচ্ছে। আমার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে যখন আমি লিখি, তখন আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়, মনে হয়, আমি নিজেই সেই আক্রান্ত ব্যক্তি। আমরা এখন নিরাপদ নই, একই রকমের বিপদ, একই অনুভূতি বিরাজ করছে আমাদের মনে। সাত মাস আগে আমি আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বিদেশে আমার ভাইকে দিতে যাই।

জুলফি 'এ' লেভেল এর শুরুতে, দ্বাদশ গ্রেডে ভর্তি হয়েছিল একটি প্রাইভেট স্কুলে, এটি আমাদের করাচির বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। তার কিছু বন্ধুও এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তারা পরিকল্পনা করল আরও একটি শিথিল বছর কাটাবে কলেজের ছাত্রদের মত। ২০০৮-এর শরতে জুলফির বয়স হয় ১৮ বছর এবং আসিফ জারদারি নিজেকে আমাদের পিতার হত্যাকারী হিসেবে তার উপর যে অভিযোগ ছিল তা থেকে মুক্ত করলেন; এটি আমাদের জন্য একটি বিপদ সঙ্কেত। সে সচেতন যে এই ব্যক্তির দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে আমরা মোটেই নিরাপদ নই, কোনোভাবে দেশের ভিতর আমরা নিরাপদ নই। যখন জারদারি ঘোষণা করলেন যে, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পিপিপি-এর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থীতা পেয়েছেন তখনই আমরা বুঝেছি যে, তিনি ক্ষমতার শীর্ষে পৌছানোর জন্য সবকিছুই করবেন। তার জন্য ফিরে তাকাবার কিছু নেই। সকল প্রকার বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি পাকিস্তান শাসন করতে যাচ্ছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, জুলফিকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে বেনজির নিহত হওয়ার পর আমরা এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু ভুট্টোর পুরুষ উত্তরাধিকারদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঝুঁকি নিতে পারি না। জুলফি বাদে আমি ও শশী ভুট্টো বংশের উত্তরাধিকার। আমরা মুক্ত সাংবাদিকতার দেশে বাস করছি না, আমরা স্বাধীন বিচার বিভাগযুক্ত দেশে বাস করছি না। এখানে সরকারের কোপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

আমরা জুলফিকে বিদেশের ছাত্রাবাসসহ স্কুলে ভর্তি করার জন্য প্রক্রিয়া চালাতে শুরু করলাম। আমরা সেখানকার প্রশাসন, ফি এবং সময়সূচি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। আব্বার মৃত্যুর বার বছর পর তাকে আমরা বিদেশে পাঠালাম। এটি খুব সহজ কাজ ছিল

www.pathagar.com

না। জুলফি বয়সে আমার চেয়ে আট বছরের ছোট। সে আঠার মত আমাদের ছোট পরিবারটির মধ্যে লেগে থাকত। মীর আলী আমাদের ভাই যাকে আম্মা তার একমাস বয়সের সময় এতিমখানা থেকে এনেছিলেন। সে ছিল খুব উচ্ছল প্রকৃতির ছেলে। করাচির ইধি এতিমখানা থেকে তাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে আম্মা বললেন যে ছোট্ট মীরু তার সুবিচারের প্রতিক। প্রতিশোধের দ্বারা সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। খাঁটি রক্ত দিয়ে হত্যাকারীর আবর্জনাপূর্ণ রক্তকে দূষণমুক্ত করা যায় না। তুমি অন্য একটি খাঁটি প্রাণকে রক্ষা করে এই ক্ষতি পূরণ করতে পার। মীর আলী একটি প্রচণ্ড ঝড়, তার গতিবিধিকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পার। এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু জুলফিকে সহজে বুঝা যায় না। সে কথা বলে খুব শান্তভাবে, কিন্তু আসলে সে খুব তেজস্বী। আমার মাতা ও আমি আস্তে আস্তে কথা বলি যে সে দূরে চলে গেলে তার নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারব।

কিন্তু আমরা আগে কল্পনা করতে পারিনি যে ওই শান্ত স্বরটি বাড়ি ত্যাগ করার পর আমরা কিরূপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ব। প্রতিদিন আম্মা ও আমি মধ্যাহ্নভোজনের সময় টের পাই, সালাদ তৈরি হওয়ার আগেই কেউ তো আর শশা আর টমেটো খেয়ে ফেলছে না। কেউ এসে যখন জুলফি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, মীর আলী মাথা নেড়ে জানায় যে, সে চলে গেছে। আমরা আগে অনুভব করিনি যে জুলফির অভাব আমাদের প্রত্যেকের মনে তীব্রভাবে অনুভূত হবে। আমরা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাকে খুঁজব, কিন্তু কাছে পাব না।

* * *

আমরা জারদারিকে কাছাকাছি পেয়েছিলাম বেনজিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে।

সেটি ছিল আবার নির্বাচনের মৌসুম। আমি লারকানার ঘরে ঘরে প্রচারণা চালাচ্ছিলাম। আম্মা শক্তিশালী পিপিপির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন; তিনি চাচ্ছিলেন মহিলারা ঘর থেকে বের হয়ে যেন ভোট দেয়। কোনো এক সন্ধ্যায় নির্বাচনী প্রচারকালে আম্মা আমাকে ফোন করে বললেন, 'বেনজিরকে আহত করা হয়েছে। ওরা বলছিল সমাবেশে কিছু একটা হয়েছে।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জীবিত আছেন কিনা। আম্মা উত্তরে বললেন, আমার মনে হয় বেঁচে আছেন। এমন সময় কাদির নামের আব্বার একজন রাজনৈতিক কর্মী আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন।

আমরা গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাদির সংবাদ দিলেন যে, ওয়াদি নিহত হয়েছেন। আমার মাথায় তার কথা আংশিকভাবে ঢুকছিল, চিন্তা করলাম, কার কথা বলা হলো? ওয়াদি? আমি আর কারো কথা শুনিনি যে তাকে ওয়াদি বলে ডাকা হয়। আমি বহু বছর ধরে তাকে ওয়াদি বলে সম্বোধন করে আসছি। কাদির আমাকে গাড়ির মাঝখানে বসালেন, আমার দুই পাশে দুইজন বসলেন, জানালার দিকে। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, তিনি কি করছিলেন। আমি ওয়াদির জন্য খুব আঘাত পেলাম। বিষয়টি বুঝতে পারার পর আমি বাম দিকের জানালার কাছের আসনে বসতে চাইলাম। কাদিরকে আমি বললাম যে, এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার, তারা আরও একটি ভুট্টোকে আজ রাতে হত্যা করতে পারে না।

কিন্তু আমার কথাগুলো আমার কানেই বাজছিল। আমার পিতাও অনেকটা এরকম

www.pathagar.com

চিন্তা করতেন; তিনিও বলেছিলেন, তারা আরও একজন ভুট্টোকে হত্যা করতে পারবে না। আমি জুলফি ও আম্মাকে ফোন করার চেষ্টা করলাম, তারাও রাস্তায় ছিল, কিন্তু তাদের ফোন বাজল না।

আমি সাবিনকে ফোন করলাম। সে লারকানায় আম্মার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় সারাক্ষণ ছিল– তাকে প্রচারণার ব্যবস্থাপক হিসেবে মনোনিত করা হয়েছিল। তার সঙ্গেও সংযোগ পাওয়া গেল না। তখন আমার হুঁশ হলো। তখন বুঝতে পারলাম যে তারা আমাদের মধ্য থেকে আরও কাউকে হত্যা করতে পারে। প্রত্যেক দশকেই এই পরিবারের, জুলফিকার ও নুসরতের পরিবারের প্রত্যক্ষ সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ নিহত হচ্ছে।

আমি সবার শেষে আল-মুর্তজায় পৌঁছলাম। আম্মা, জুলফি, সাবিন ও মীর আলী সেখানেই ছিল। আমি তাদেরকে দেখে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে কাছে যেয়ে জাপটে ধরলাম। ব্যাপারটিকে অদ্ভুত মনে হলো। আমি পরিবারের জন্য দুঃখ পাচ্ছিলাম। আমার দুঃখ হচ্ছিল জুলফিকারের জন্য। কিন্তু আমার ফুফুর মৃত্যু আমাকে ততটা আঘাত করেনি পরবর্তী দু'ঘণ্টা পর্যন্ত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। আমি আমার কামরা বন্ধ করে রাখলাম। প্রবেশ পথের লণ্ডভণ্ড অবস্থা ঠিকঠাক করলাম। আমি বৈঠকখানার খোলা দরজা দিয়ে সাবিনকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল এবং ভ্রু কুচকালো, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি করছ?' আমি হেসে বললাম, আমি আব্বার জন্য পরিষ্কার করছি। এরপর জুলফি এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি করছ ফাতি?' আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং কাঁধে হাত রাখলাম। আমি পাগলের মত জবাব দিলাম, 'এখন সব কিছুই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আব্বা আবার ফিরে আসবেন। আমার মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বের হওয়ার পর আমি আমার ভাইয়ের মুখ দেখলাম। সেখান থেকে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি আর ফিরে আসবেন না। কোনো কিছুই আমার পিতাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমি ভেঙে পড়লাম। পরবর্তী পাঁচদিন পর্যন্ত আমি কাঁদতে থাকলাম। সে সময়ে আমার শুধু কান্নারই পালা। আমি সবার জন্যই কাঁদতে থাকলাম। আমি কাঁদলাম আব্বার জন্য, পিতামহের জন্য, শাহ এর জন্য, জুনামের জন্য, ওয়াদির জন্য, যাকে আমি হারিয়েছি সেই শীতকালের অনেক আগেই।

সে রাতে বেনজিরের মৃতদেহ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আনা হয়েছিল, যেখানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেখান থেকে মৃতদেহ নেয়া হয়েছিল গারহি খোদাবক্সে, সেখানে জারদারিকে দেখেছি। আম্মা, জুলফি ও আমি চল্লিশ মিনিট গাড়ির পথে আমাদের লারকানার বাড়ি থেকে নাওদেরোতে গিয়েছিলাম। এক সময় এটির মালিক ছিলেন শাহনেওয়াজ, তিনি নিহত হওয়ার পর এটি দখল করে নেন বেনজির এবং তিনি তার রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে এটি ব্যবহার করতে থাকেন।

আমি আসিফকে দেখে অবাক হয়েছিলাম, ভাবছিলাম, কিভাবে সে আরও একজন ভুট্টোর দাফনে উপস্থিত হলো। হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, তিনি তো বেনজিরের স্বামী; তার তো উপস্থিত থাকতেই হবে। আমি মনে করিনি যে, সে আমাদের মুখোমুখি হতে সক্ষম হবে এবং তার উপর আমার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হবে তা আমার জানা ছিল না। আমি অনুভব করলাম যে, দুঃখ ও রাগে আমার অন্তর ভেঙে যাচ্ছে।

সর্বশেষ একটি মুহূর্তে আমরা দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, কফিন আসার অপেক্ষায় ছিলাম,

www.pathagar.com

এবং তিনি উত্তেজিতভাবে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জারদারিকে যতটুকু খাট বলে আমার স্মরণ আছে, আসলে সে তারচেয়েও খাট। তিনি আমার চেয়ে সামান্য লম্বা, যদিও আমি লম্বা নই। তিনি কাঁপতেছিলেন। আমার মনে হলো, তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন। তিনি এখানে আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। আমি এতে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাইনি।

জুলফি সিদ্ধান্ত নিল যে, বেনজিরকে কবর দেয়ার সময় সে উপস্থিত থাকবে। পরিবারের জীবিত সদস্যদের মধ্যে সেই একমাত্র পুরুষ। সে বলল যে বেনজিরকে কবর দেয়ার সময় পরিবার থেকে কারো থাকা উচিত। দাফনের সময় অন্য যারা ছিল, তারা রাজনৈতিক সহকারী, অপরাধী, চোর ইত্যাদি। সে যুক্তি দেখাল যে ওদের দ্বারা তার কবর দেয়া হতে পারে না। আমি কাঁদলাম এবং আমার ভাইকে হুমকি দিলাম। আমি চাইনি যে সে বেনজিরের শবদেহের কাছে থাক, ছয় ফুট গভীর গর্তে জারদারির সঙ্গে নামুক, যে মানুষটিকে আমরা আমার পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ি বলে বিশ্বাস করি। লোকজনও এই মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ি করে। আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'এটি খুবই ভয়াবহ ব্যাপার, তুমি কি পাগল হয়েছ?' আমি কেঁদে ফেললাম, বললাম যে এটি হবে পাগলামি।

শেষে জুলফি সত্যিই বেনজিরের মৃতদেহ কবর দিল। আমি ততখানি সহৃদয় হতে পারতাম না। সে বেনজিরের মৃতদেহ কবরে স্থাপন করে সুরা ফাতেহা পাঠ করল এবং আমাদের পিতার কবরে গেল। সে নিচু হয়ে কাপড় ও পুরানো গোলাপ ফুলের তোড়ায় চুমু দিল। এরপর স্থান ত্যাগ করল। সেদিন জুলফি একাই ছিল। তার বয়স তখন ছিল মাত্র সতের বছর।

দুই মাস পর আরও একবার আমি জারদারির মুখোমুখি হয়েছিলাম। সময়টা ছিল ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর, যে নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে জারদারি জয়লাভ করেছিল। এর আগে তিনি তার স্ত্রীর মৃত্যুর তিনদিন পর মুসলমানদের জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ শোকের দিন, সেদিন একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে প্রহসনমূলকভাবে তার সন্তানদের নামের শেষ অংশ জারদারি থেকে পরিবর্তন করে ভুট্টো এবং তার জোরপূর্বক বেনজিরের পিপিপি-এর দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং শেষ ভুট্টোকে দাঁড় করলেন। এতে প্রথম মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হলো। এই ঘটনায় আমি তীব্রভাবে আহত বোধ করলাম।

একটি ফরাসী চলচ্চিত্র কর্মীদল করাচি এসেছেন আমাদের পারিবারিক কাহিনীর চলচিত্র তৈরি করতে। সেখানে পারিবারিক রাজনীতিতে আমাকে কুলাঙ্গার হিসেবে দেখানোর প্রস্তুতি চলছে। আমি তাদের বিপরীত মত ধারণ করাতে সমর্থ হলাম। কর্মীদের মধ্যে ছিলেন দু'জন মহিলা এবং তাদের পাকিস্তানি পরিচালক; তারা আমাকে আব্বা যে স্থানে নিহত হয়েছিলেন সেখানে নিয়ে যেতে বললেন। এটি আমাদের বাড়ির সামনের দরজা থেকে দশ সেকেন্ডের পথ এবং এ কাজ আমি এর আগেও সাংবাদিকদের জন্য করেছি। আমি থানার মুখোমুখি ঘটনাস্থলে দাঁড়ালাম, সেখানে আমার পিতাকে গুলি করা হয়েছিল। আমি যখন বিষয়টি ক্যামেরার সামনে বলছিলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, কয়েক ফুট দূরে একটি পাজেরা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এর ভিতর আছে তিনজন লোক, জানালায় আছে বেনজির স্টিকার। আমি কথা বলা বন্ধ করলাম। আমি কাঁপতে থাকলাম। আমি হামিদের কাছে গেলাম, যিনি জুলফি ও আমাকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আমি জানার

www.pathagar.com

চেষ্টা করলাম, গাড়িটির মালিক কে এবং কেনই বা এটি এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফরাসী মহিলাকে বললাম আমাকে এক মিনিট সময় দিতে। আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমি এই দু'জন সাংবাদিকের সামনে আত্মসংযম হারাতে চাইনি। এতে ক্যামেরা এবং কাহিনী তৈরির কাজও ব্যাহত হতো। হামিদ লোকগুলোর সঙ্গে কথা বললেন এবং তারা গাড়ি থেকে নামল, আমি অবাক হলাম। তারা চলে গেল না কেন? তারা হাত উপরে উঠালো, আপস-সূচক ভঙ্গিতে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল। এতে আমি যতটুকু প্রত্যাশা ছিল, তার চেয়ে বেশি আঘাত পেলাম। কয়েক মিনিট পর লোকগুলো গাড়ি নিয়ে চলে গেল। 'কি হয়েছে ওরা কারা?' আমি হামিদকে উর্দুতে জিজ্ঞেস করলাম, যাতে সাংবাদিকরা বুঝতে না পারেন। জবাব এল, 'জারদারি। তিনি সামনের দরজায় অবস্থিত ব্রিটিশ কনস্যুলেটে আছেন। ওরা তার নিরাপত্তা কর্মী। ওরা বলল যে, কোনো সমস্যা তৈরি করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তারা জারদারির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাই টহল দিচ্ছে। হামিদ তাদের বললেন, অন্য কোথাও যেয়ে টহল দিতে। এরপর তারা চলে গেল। এটা ছিল কাফকা'র গল্পের পরিহাসের মতো।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানেই আমার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল। যে ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য আংশিকভাবে দায়ি বলে আমার বিশ্বাস, তিনি অল্পদূরেই অবস্থান করছেন, কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী অভ্যর্থনা পাচ্ছেন। আমার হাঁটু ভেঙে আসছিল। আমি রাস্তার মধ্যে বসে পড়লাম। একজন ফরাসী মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'সমস্যা কি?' আমি অস্পষ্টভাবে বললাম, 'কিছু না'। আমি আমার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলতে যেয়ে যেখানে থেমেছিলাম, সেখান থেকে আবার বলতে শুরু করলাম ধাপে ধাপে। তারপর আমি অন্য একটি গাড়ি দেখতে পেলাম রাস্তায়, এটিও সাদা রঙের। হামিদ আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে বললেন যে, 'শহীদ হায়াত গাড়ির ভিতর আছে। সে আসিফের করাচি ভ্রমণের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। শহীদ হায়াত ছিল সেই রাতের উপস্থিত পুলিশদের মধ্যে একজন, যে নিজের উরুতে গুলি বর্ষণ করেছিল, যার বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ এনেছিলাম এবং যে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছিল। এরূপ লোকজনদেরকেই এখানে নিয়োজিত করা হয়েছে। সেই লোক ক্লিফটন রোডে গাড়িতে করে চলাচল করছে আমার সামনে। হঠাৎ ওই দূরবর্তী হুমকি আরও পরিষ্কার এবং ঘনিষ্ঠ হলো। আমরা বিপদগ্রস্থ হলাম। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং কথা বলা অব্যাহত রাখলাম। আমি ধীরে ধীরে কথা বলছিলাম, তাই আমাদের দীর্ঘ সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে! আমি ফরাসি চলচ্চিত্রকারকে ঘটনা খুলে বললাম। আমি চলে যাচ্ছিলাম না। এভাবে আধঘণ্টা সময় অতিবাহিত হলো : আমার আর কিছু বলার রইল না। আমি কয়েক ফুট দূরে বাড়িতে পৌছলাম।

বোধগম্য কারণেই আমার মনে ভয় রয়ে গেল। রাতে যখন লেখার জন্য আমার কামরায় পৌছলাম, আমি তখন বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম। যখন লোকজন আমাকে ফোন করে, ই-মেইল করে, যখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে, শত্রু আছে অনেক উপরের স্তরে আবার নতুন করে, তখন বুঝলাম যে, আমাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ওই দিনের দু'মাস পর, এপ্রিল মাসে আমি লারকানায় গিয়েছিলাম আমার পিতামহের উনত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে। আসিফ ও বেনজিরের পিপিপি সত্যিকারের মৃত্যু

www.pathagar.com

দিবস ৪ তারিখে পালন না করে তার আগের রাতে পালন করার ব্যবস্থা করে। তারা তাবু তৈরি করেছে এবং বাসে করে লোক এনেছে। তাদের জনসভা শুরু হয়েছে মধ্যেরাতের কিছু আগে, অন্ধকারেও তা দেখা যাচ্ছিল। ২ তারিখের রাতের বেলা আমরা খাবার টেবিলে : সেখানে ছিলাম আমরা পরিবারের লোকজন, পারিবারিক বন্ধু-বান্ধব, আইনজীবী ওমর এবং আব্বার একজন পুরনো বন্ধু এবং দলের একনিষ্ঠ কর্মী ড. জাতোই। আমি গারহি খোদা বক্সের মাজারে যাব না বলে মত প্রকাশ করলাম। আমি বেনজিরের দাফনের পর সেখানে আর যাইনি এজন্য যে সেখানে শুধু ব্যক্তিপূজা বিস্তৃত হয়। আমি আমার পিতার কবরকে কোনো প্রদর্শনী হিসেবে দেখতে চাচ্ছিলাম না। আম্মা আমার কথায় মাথা নাড়লেন এবং বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে নাও যেতে পার।' আমি তার কথার প্রেক্ষিতে তার মুক্তি কী তা জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পরিবেশের কারণেই তিনি একথা বলেছেন কীনা। জবাবে আম্মা জানালেন যে, সেখানে পোস্টারের ছড়াছড়ি, তবে তা বেনজিরের নয়, জারদারির। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জারদারির পোস্টার? সেগুলো কি আব্বার কবরের কাছেই? আম্মা জবাব দেননি। ওমর তার চেয়ার থেকে উঠে আমার কাছে আসলেন। আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে চাচ্ছিলাম না। আমি চেয়ার থেকে উঠে বাইরে গেলাম। আমি বললাম, 'গাড়ি প্রস্তুত কর।' কাকে বলেছিলাম, তা এখন মনে পড়ছে না। আমি জোরে কাঁদছিলাম। আম্মা ও ওমর আমাকে ঘরের ভিতর যাওয়ার জন্য বুঝাচ্ছিলেন। আমি হতাশ হয়েছিলাম। তারা বললেন যে, আমি ভিতরে আসলে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হবে। আমি তাদের কথা শুনলাম না, গাড়িতে উঠলাম। ড. জাতোই এবং তার বিশ বছর বয়স্ক কন্যা জিয়া লাফ দিয়ে আমার সঙ্গে উঠল, তারা বুঝতে পারেননি, আমি কী করতে যাচ্ছি। মাজারটিকে পরের দিনের পিপিপির জাম্বুরির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী জিলানি আসছিলেন। জারদারি একটি ব্যতিক্রমধর্মী জনসভায় যাচ্ছিলেন, তিনি অবশ্য বিদেশ সফরেই বেশি সময় কাটান। একজন স্থানীয় পণ্ডিত ব্যক্তি জারদারি একবছরের প্রেসিডেন্ট পদে থাকার সময় কালের হিসাব করে বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রিচার্ড হলব্রুক, যাকে এখন দুঃখ করে বলা হয় 'আফ-পাক', তিনি প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি সময় পাকিস্তানে কাটিয়েছেন। ভিআইপিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ এবং রেঞ্জারদের হাজার হাজার সদস্য নিয়োজিত আছে।

চালক গারহির দিকে গাড়ি চালালেন। আমার চোখে জল দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগল। তিনি বললেন, 'আমরা তো আগামীকাল যেতে পারি; এখন যাওয়া সুবিধাজনক নয়।' আমি এতো জোরে কাঁদছিলাম যে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি বললাম, 'আমাকে নিয়ে চলুন, নতুবা আমি হেঁটেই যাব।' আমি হুমকি দিলাম। এরূপ হুমকিতে সব সময়ই কাজ হয়। মাজারের দূরত্ব এবং রাস্তাঘাটের অবস্থার বিবেচনায় আমার পক্ষে সেখানে হেঁটে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তবু, আমি ছিলাম ক্রুদ্ধ, আর আমার জিদ বজায় রইল।

আম্মা ড. জাতোইকে বললেন, 'ফিরে আসুন, নতুবা আমি আপনাদের অনুসরণ করব।' আমি জবাবে বললাম, 'তবে আসুন।' আমি পিছনে ফিরলাম না। তারা ভয় পেলেন যে, আমি পোস্টারগুলো খুলে ফেলব, দৃশ্যের অবতারণা হবে, ফলে লোকজনের বিপদ ঘটবে। তবে আমি তা ঘটাতে যাচ্ছিলাম না। আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম লারকানা কেমন দেখাচ্ছে, লোকজন কি দেখছে ভয়ে ভয়ে এবং ক্ষমতার কাছে কতটুকু নত হয়েছে।

www.pathagar.com

জিয়া আমাকে টিস্যু সরবরাহ করছিল। সে আমার নাকও মুছে দিতে চাচ্ছিল। আমি তার হাত সরিয়ে দিলাম। সে আদর করে আমার হাত ধরল শান্ত করার উদ্দেশ্যে। আমরা কবরস্থানে যাওয়ার পর রাস্তায় বাধা পেলাম। গারহিতে এরূপ কখনো ঘটেনি। এটি হলো নতুন জারদারি ব্যবস্থাপনার ফল। সাদা পোশাকের দু'জন লোক আমাদের গাড়ির জানালার কাছে আসল। তারা আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আমি জবাবে বললাম, 'আমি শহীদের কন্যা।' তারা আমাদের স্বীকৃতি দিল এবং যেতে দিল। মাজারের সামনে আসিফের নিরাপত্তার জন্য ধাতুর তৈরি নির্দেশক আছে। ঢালু পথ তৈরি করা হয়েছে যার দ্বারা তিনি গাড়ি চালিয়ে কবরস্থানে যেতে পারেন। তার জন্য গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি যাবেন কবর জেয়ারত করতে। আমি আমার পিতার কবরে গেলাম। এ সময় আমি কান্না থামালাম। মৃত ব্যক্তির কবরের চারদিকে দেখা গেল আসিফ জারদারি, তার সন্তান ও তার বোনের পোস্টার। বেনজিরের 'উইল' অনুযায়ী তার *সিয়াসি ওয়ারিস*, রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী এরা। তার বোনের নাক ছিল চ্যাপ্টা, মাথায় স্কার্ফ দিয়ে চেষ্টা করেছে যাতে বেনজিরের মত দেখায়। আমি মাজারের দরজা বন্ধ করতে বললাম। আমার আব্বা ও চাচার কবর ঘিরে যে পোস্টারগুলো ছিল, সেগুলো আমি সরিয়ে ফেললাম। আমি আব্বার কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমি ফিরে আসলাম। আমি গাড়িতে উঠার সময় তিনটি পুলিশের গাড়ি আমাদের ঘিরে ফেলল। ভুট্টোদের এক কন্যা, দুই সন্তানের মধ্যে একজন, মৃত সন্তানের এক সন্তান তাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এখন, বেনজিরের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর কয়িক মাস পর আসিফ জারদারির সরকার আন্তর্জাতিক দাতা ও ধনী দেশগুলোর কাছে পাকিস্তানের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সাহায্য চাচ্ছে, ৪০০ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করেছে গারহি খোদাবক্সের জন্য। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্য কমপক্ষে চারটি মেটাল ডিটেক্টর চালু করা হয়েছে, পর্যটকদের জন্য দুর্বল ইংরেজিতে সামনের প্রবেশ পথে নিয়মাবলি লেখা হয়েছে এবং শোনা যায় দুটো হোটেল তৈরি হচ্ছে বিদেশী ও স্বদেশী উভয় ধরনের ভক্তদের সুবিধার জন্য।

বেনজির এই উত্তরাধিকার রেখে গেছেন পাকিস্তানের জন্য। তার কারণেই তার দুর্নীতিপরায়ণ স্বামী সহানুভূতি ভোট পেয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছে।

* * *

জারদারির প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থীতার সময় তার বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি হত্যা মামলা বিচারাধীন ছিল, যার মধ্যে অন্যতম বিচারপতি নিজাম হত্যাকাণ্ড। তিনি মৃত্যুর সময় হাইকোর্ট আইনজীবী সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আব্বার মৃত্যুর তিন মাস আগে তাকে তার বাড়ির বাইরে হত্যা করা হয়।

জারদারির নামে একটি মূল্যবান জমির মালিকানার বিষয়ে বিচারপতি নিজাম একটি মামলা দায়ের করেন। জারদারি সেই জমি কিনেন নিলাম ছাড়া, নিজস্ব লোকের সহায়তায়। জনস্বার্থে বিচারপতি নিজাম ওই সম্পত্তি বিক্রির বিষয়ে স্থগিত আদেশের রায় পান এবং নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন আদালতে এর বিরোধীতা করার; তার ভাই নূর আহমেদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি মামলাটি সুপ্রিকোর্টে নেয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের ১০ জুন বেলা দু'টার দিকে বিচারপতি নিজাম তার বাসার পথে যাচ্ছিলেন দুপুরের খাবারের জন্য। পরিবারের গাড়িচালক অনুপস্থিত থাকলে প্রায়ই তার ছেলে নাদিম তাকে অফিস থেকে নিয়ে একত্রে বাসায় আসেন। নাদিম বিদেশ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে করাচি ফিরেছে। তারা যখন বাড়ির প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, দু'জন লোক স্কুটারে করে তাদের গাড়ির কাছে আসল। তাদের মধ্যে একজন বিচারপতি নিজাম ও তার ছেলের দিকে তাকাল এবং গাড়ির জানালা ভেঙে ফেলল। এরপর লোকটি বিচারপতি নিজাম ও তার তরুণ ছেলেকে গুলি করে হত্যা করল। বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে তাদের পরিবারের সদস্যরা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা তাদের সঙ্গে খাবে বলে দুপুরের খাবার নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিচারপতির শ্যালক গুলির শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ঘরের বাইরে আসেন। তিনি গাড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই ওই স্কুটারটি দ্রুত চলে যায়। উভয়েই নিহত হন। নাদিমের বয়স ছিল বিশের ওপর; একমাস আগে তার বিয়ের বাগদান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমি যখন বিচারপতি নিজামের ভাই নূর আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ততদিনে বল ঘুরছিল– ততদিনে জারদারির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত চারটি মামলার মধ্যে তিনটিতেই তিনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। তৃতীয়টি, বিচারপতি নিজামের মামলাটি আদালতের বাইরে নিক্ষেপ করা হয় এবং জারদারিকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। এর পরেরটি ছিল আব্বার খুনের মামলা। নূর আহমেদ একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজের পর। তার পরনে ছিল সাদা সালওয়ার-কামিজ এবং শাদা নামাজের টুপি। আমরা যখন কথা বলছিলাম, তার স্ত্রী আমাদের জন্য চা ও কেক আনলেন। ভাইয়ের আরাম কেদারার উপর বিচারপতি নিজামের একটি আলোকচিত্র ছিল। দুই ভাইকে দেখতে একই রকম, উভয়ের চোখে আছে গভীরতা, চুল সাদা। আমি নূর আহমেদকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি ভাবছেন যে, সুবিচার পাবেন? মৃদুভাবে তিনি জবাব দিলেন, 'আমার সন্দেহ আছে।' তিনি খুব সাহসের সঙ্গে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং প্রকাশ্যে তার ভাইয়ের মামলার বিষয়ে কথা বলেছেন। আমি নূর আহমেদকে ধন্যবাদ জানালাম আমাকে সময় দেয়ার জন্য। তিনি আমাকে জানালেন যে, বিচারপতি নিজাম নিহত হওয়ার পর আমার পিতার সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল 'করাচি বোটক্লাবে'। মুর্তজা তার টেবিলে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। তিনি শোক প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'একই ব্যক্তি আমার পিছনে আছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি নিশ্চিত ছিলেন যে, জারদারিই তার ভাইয়ের হত্যাকারী?' নূর আহমেদ বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি তার মৃত্যুর পর।' তিনি ইংরেজি ও উর্দু মিশিয়ে বললেন যে, প্রত্যেক হাকিম ও প্রত্যেক অ্যাডভোকেট জানেন যে, এটি ছিল জারদারির পরিকল্পনা। জারদারির নাম উচ্চারণের সময় নূর আহমেদের শরীর কাঁপছিল। তিনি বললেন, 'এমনকি গৃহবধূরাও জানে যে জারদারি এর পিছনে ছিল।' তিনি উচ্চকণ্ঠে এ সমস্ত বললেন। আমি তার জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না। চিন্তিত হলাম, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তার স্পষ্টবাদিতার ফল কি হতে পারে, তা ভেবে। কিন্তু তিনি এ সমস্ত কথা বলতে বলতে তখনও ভয় পাননি, এখনও না। নূর আহমেদ বললেন, 'হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয়দিন আসিফ জারদারির পিতা হাকিম জারদারি এসেছিলেন আমাকে সমবেদনা জানাতে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

www.pathagar.com

'কিভাবে এ ঘটনা ঘটল?' আমি তাকে বললাম যে, 'প্রত্যেকে জানে যে, আপনার ছেলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি কোনা জবাব দিয়েছিলেন?' নূর আহমেদ বললেন, 'না, তিনি চুপ করে থাকলেন। তিনি আর কি বলতে পারতেন?' নূর আহমেদের স্ত্রী আমার পাশেই বসে ছিলেন। তিনি এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে বেনজিরের মত দেখায়। আমি কী বলব, তা ঠিক করতে না পেরে একটু হাসলাম। আমার অস্বস্তি বোধ দেখে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার সূরে বললেন, 'এসব আল্লাহর হাতে।' নূর আহমেদ এতক্ষণ দুই হাত কোলে নিয়ে শান্ত হয়ে বসেছিলেন। তিনি আকাশের দিকে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর বরাত দিয়ে এ সমস্ত বলার কি অর্থ আছে?' তারপর অনেকটা আপন মনেই তিনি বলে যেতে থাকলেন, 'এর সম্পূর্ণ পরিবার নিহত হয়েছে।' তিনি যে সময়কালে এবং যে পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গে কথা বললেন, তখন বেশির ভাগ লোকই আমার সঙ্গে কথা না বলাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। নূর আহমেদ আমার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন, 'বেটি তোমার এই বই লিখে লাভ কি হবে? কোনো উপকার হবে কি?' তিনি আমাকে মেয়ে বলে সম্বোধন করলেন। জবাবে আমি বললাম, 'স্মৃতি'।

যেদিন জারদারি আমার পিতার হত্যার দায় থেকে মুক্ত হলো, সেদিন সারা বিশ্ব আমার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আমাকে একটি দায়িত্ব নিয়ে কিউবায় যাওয়ার কথা ছিল। কাস্ট্রোর পঞ্চাশতম বিপ্লব দিবস উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে বিপ্লবের অতীত ও বর্তমান নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখবেন। সেখানে সাংবাদিক হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। খুনের আসামি হিসেবে আটক অবস্থায়ও জারদারি বেশিরভাগ সময় তার ডাক্তার বন্ধুর সহায়তায় হৃদরোগী হিসেবে সেই বন্ধুর প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে বিলাসবহুল স্যুটে স্থানান্তরিত হন। পরবর্তীতে তিনি অলৌকিকভাবে হৃদরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন, দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন এবং সেই ডাক্তার বন্ধুকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য করেন, তেল ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

হাভানায় যেয়ে আমি স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করতে থাকলাম, অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকলাম। আন্তর্জাতিকভাবে আমি পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলাম। একদিন বিকেলবেলা আমি হাভানায় একটি ফোন পেলাম। সময়টা ছিল এপ্রিল, গ্রীষ্মকালীন গরম, কিন্তু আবহাওয়া সেঁতসেঁতে। আমি আমার হোটেলের বিছানায় বারান্দার সামনে বসেছিলাম। দেশ থেকে হামিদ ফোন করেছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন যে, জারদারি আদালত এড়ানোর জন্য তোমার পিতার হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে মুক্তি নিয়েছে। আপিল করার আর কোনো সুযোগও রইল না, তিনি আইনসঙ্গতভাবে বা বেআইনীভাবে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন।

* * *

২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ আব্বার দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী। সেই দিনে আসিফ জারদারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আগের দিন, ১৯ সেপ্টেম্বর এই

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান পালিত হওয়ার কথা ছিল। সময়সূচির এই পরিবর্তন ঘটেছে নতুন প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী। তিনি তার নিজের বড় দিনটি আব্বার মৃত্যুর দিনে নির্ধারণ করলেন। যে সংসদ তাকে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করেছে, তিনি তার সামনে দাঁড়ালেন (যেভাবে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন), তিনি তার শ্যালকের মৃত্যুর জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করে দিনটিকে চিহ্নিত করার কথা বললেন। আমার রক্ত জমে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, জারদারি আমাদের বিদ্রূপ করছে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনার তুলনায় এটি কিছুই না। জারদারি ও তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম পাকিস্তান দিবসে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার শোয়েব সাড্ডলকে সম্মানিত করেন হিলাল-ই-ইমতিয়াজ পদবীতে, এই পদবীটি দেয়া হয় পাকিস্তানের জনগণকে বিশেষ সেবা দেয়ার জন্য বিশেষ স্বীকৃতি স্বরূপ। তাকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান করা হলো। আমার পিতার মত্যুর সঙ্গে যে কয়জন সিনিয়র পুলিশ অফিসার জড়িত ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

এমকিউএম 'অপারেশন ক্লিনআপের' কথা ভুলে গিয়েছে এবং জারদারির সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের অংশীদার হিসেবে খুব উদ্যোগী ভূমিকা রাখছে। আলতাফ হোসেন এখনও লন্ডনে বসবাস করেন এবং অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে জারদারির সঙ্গে ছবি তোলেন।

নিসার খুরোর সভাপতিত্বে সিন্ধুর প্রদেশিক পরিষদে, সোয়াত এবং উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধে ত্রিস লক্ষ পাকিস্তানি গৃহহীন মানুষ এবং ২০০৯-এর গ্রীষ্মে মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে মার্কিনী ও পাকিস্তানি সেনাদের বোমায় নর্থওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের যে অনেক লোক মারা গিয়েছে তার কোনো উল্লেখ সেই শোক প্রস্তাবে নেই।

ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদ 'সাইবার ক্রাইম' বিল অনুমোদন করে। এর ফলে 'ধাপ্পা দেয়া', প্রেসিডেন্টকে বিদ্রূপ করা, ইত্যাদি অপরাধের জন্য ছয়মাস থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মেয়াদের শাস্তি হতে পারে (আমার ধারণা এটি একটি অদ্ভুত ধাপ্পাবাজি)।

* * *

আমার পরিবার সম্পর্কিত এই বইটি একটি পরীক্ষামূলক লেখা। বিভিন্ন চিঠিপত্র, নোটবুক, আলোকচিত্রের এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিষয়গুলো আমার কাছে স্পষ্টরূপ ধারণা করেছে, অনেক রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এখানেই আমি শেষ করছি। তাদের জীবনাচরণ, গৌরব, ভুলত্রুটির বিশ্লেষণ আর করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজনকে আমি ভুলে যেতে পারব না, তিনি আমার আব্বা। আমি এই বই শুরু করেছিলাম পিতার সান্নিধ্যে আমার সুখের বর্ণনা দিয়ে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম যে, তার কাহিনী আমি বর্ণনা করব। তাই এই লেখার অবতারণা। এখন বিদায় তো নিতেই হয়। কিন্তু আমি পারছি না। তিনি ছিলেন আমার কাছে একজন নিখুঁত আদর্শবান ব্যক্তি, আমার সবকিছু, সেভাবেই আমি বেড়ে উঠেছি। তার পছন্দ ছিল উল্লেখযোগ্য এবং ভয়ানক, সম্মানিত এবং বোকামিতে ভরা, আমার মধ্যে তার সবগুলো নেই, কিন্তু এগুলো নিয়েই আমি বাস করেছি। তার মৃত্যুর পর থেকেই আমি আমার পিতার অসম্পূর্ণ ছবি পাচ্ছি নিহত ব্যক্তি হিসেবে– যা আমার চিন্তায়,

www.pathagar.com

আমার মানসপটে, আমার চলাচলে, ভ্রমণে সদা জাগ্রত থাকে, সকালে ঘুম থেকে উঠে সারাদিন যাপনের মধ্যে সকল সময়ই তার কথা আমার মনে আসতে থাকে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার এভাবে চলতে থাকে। এই চৌদ্দ বছরে আমি কখনো মনে করিনি যে একদা তিনি জীবিত ছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্য আমি তার সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। এখনও তাকে আমার জীবিতই মনে হয়। এই চমৎকার চিন্তাকে সরিয়ে রাখতে হয়, তাই আমি বিদায়ের চিন্তাকে বিলম্বিত করছি, যদি একটুও দীর্ঘায়িত করা যায়।

এ সমস্ত পাগলামী, সমস্ত প্রেতাত্মা আর অতীত স্মৃতির মধ্যে মনে হয় আমার চারদিক যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে। কখনো কখনো শেষ রাতে আমার বুকে পরিচিত দুশ্চিন্তা ভর করে। আমার মনে হয়, পাকিস্তানকে নিয়ে চিন্তা করার মত স্থান আমার হৃদয়ে এখন আর নেই। আমি এটিকে আর ভালোবাসতে পারছি না। বাস্তবতার কারণে আমাকে এর বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু মানসিকভাবে আমি এই দেশকে ত্যাগ করতে পারব না। এখনও আমি কল্পনায় মীনাহ্ পাখির ডাক শুনতে পাই।

www.pathagar.com

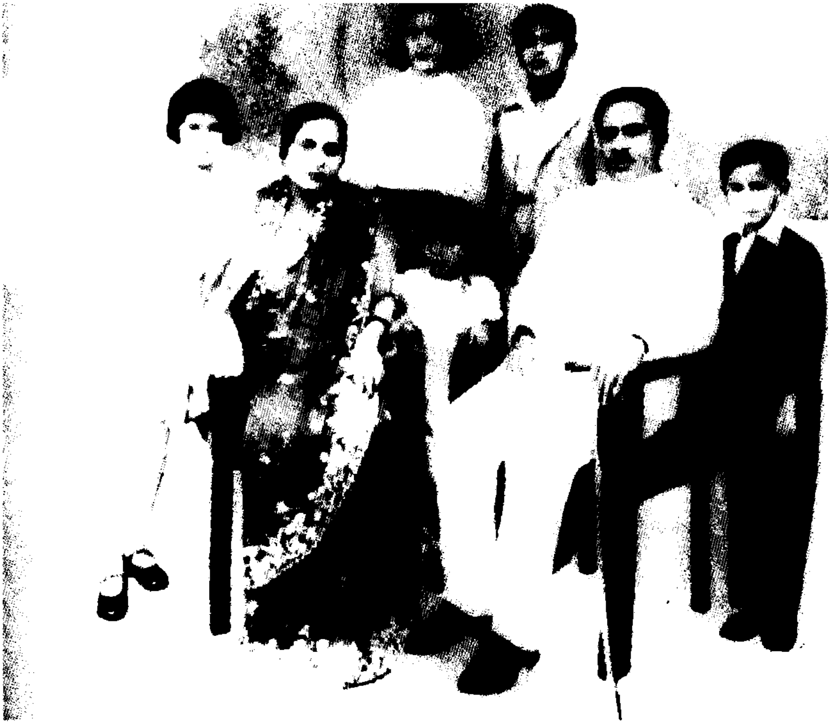

সন্তানদের সাথে খুরশিদ এবং শাহনাওয়াজ ভুট্টো। স্যুট পরিহিত জুলফিকার তাঁর বাবার পাশে দাঁড়ানো

নুসরাত যখন
মোম্বাই-এর এক
তরুণী

www.pathagar.com

হোয়াইট হাউজে জন এফ কেনেডীর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো

চীনের নেতা চৌ এন লাই-এর সাথে ভুট্টোর সন্তানেরা : মুর্তজা, বেনজির, সনম ও শাহনাওয়াজ

www.pathagar.com

উত্তর পাকিস্তানে শাহনাওয়াজ, বেনজির, মুর্তজা, সনম, নুসরাত ও ভুট্টো-পুরো পরিবার এক সাথে

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর প্যারেড প্রদর্শন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন সেনাপ্রঃ জেনারেল জিয়া

জেনারেল জিয়া উল হক

www.pathagar.com

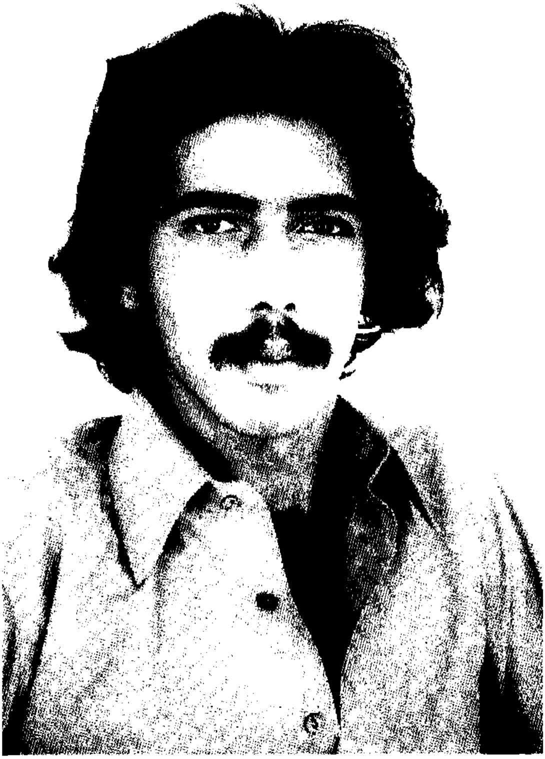

হার্ভার্ডে পড়াকালীন মুর্তজা

করাচিতে কলেজে পড়াকালীন
মুর্তজা তামাশা করছেন

www.pathagar.com

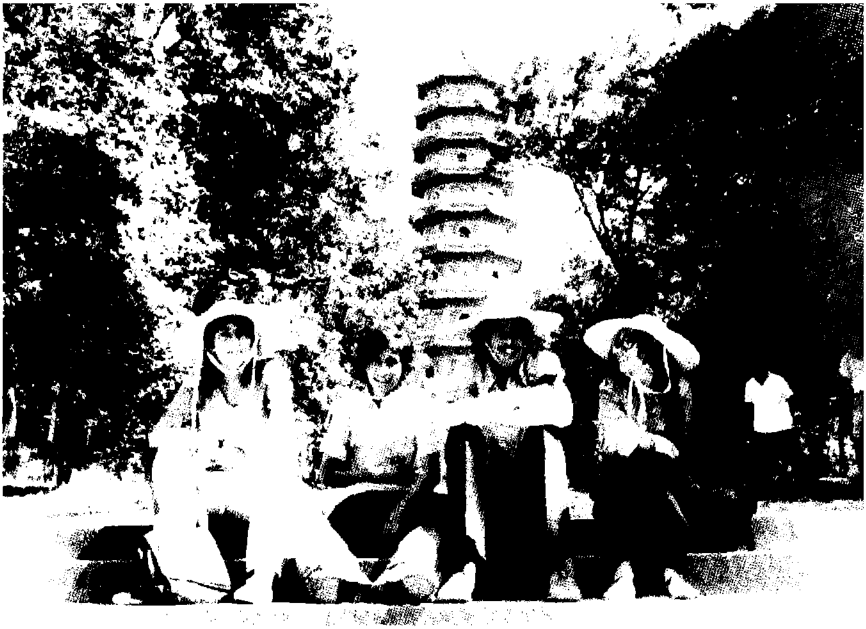

চীনের সাংহাইতে বেনজির, শাহনাওয়াজ, মুর্তজা এবং সনম ভুট্টো

হার্ভাডে গ্রাজুয়েশনের সময় মুর্তজা ও বিল হে

www.pathagar.com

জেনারেল জিয়া উল হকের সামরিক শাসনের সময় পুলিশ এক ছাত্রকে গ্রেফতার করছে

সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় পিপলস পার্টির কর্মিরা ভুট্টোর মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে

জিয়ার স্বৈরশাসনের সময় লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে এক প্রতিবাদ সভায় নুসরাতের ওপর আক্রমণ হয়

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বাবার পক্ষে প্রচারকালে মু

বুলে শাহনাওয়াজ

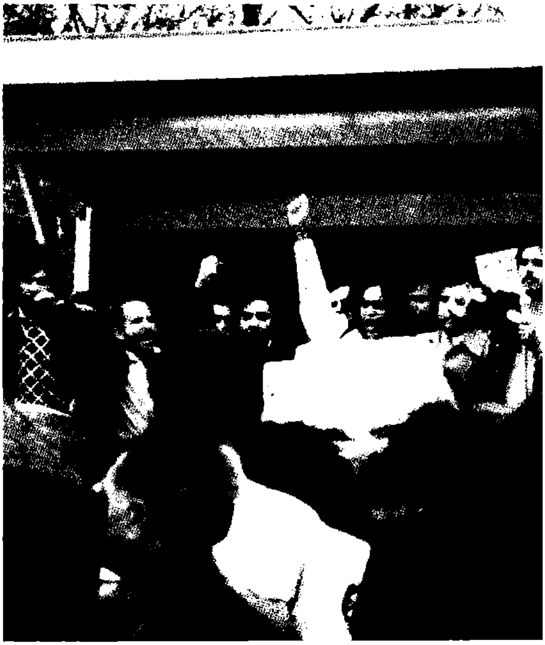

কানাডার টরেন্টোয় ভুট্টোকে বাঁচাও
কমিটির এক সভায় মুর্তজা

www.pathagar.com

আব্বা ও আমি জেনেভায়। তিনি তাঁর হাত ভেঙেছেন, আমিও জেদ করলাম তাঁর মত আমার হাতেও প্ল্যাস্টার ব্যান্ডেজ দেওয়ার জন্য। তাঁর হাতে যতদিন ব্যান্ডেজ ছিল আমার হাতেও ততদিন ছিল

আমাদের ঘরোয়
যেখানে আমি
তোলার জন্য
দিয়ে আছি,
আব্বা মজা কর

www.pathagar.com

গ্রিসে মুর্তজা ও দেল্লা, ১৯৭০-এর শেষদিকে ও
তাদের অনুরাগের প্রথম দিকে

দামেস্কতে আমার স্কুলের বাইরে
আম্মা ঘিনওয়া ও আমি

ওয়াদির সঙ্গে লারকানায়– আমার প্রথম পাকিস্তান সফরের সম
আমার বয়স সা

www.pathagar.com

বিয়ের আগে ঘিনওয়া ও মুর্তজা। ফটোটি আমিই তুলেছিলাম

দামেস্কতে সদ্যজাত শিশুভাই জুলফিকার আলী ভুট্টো জুনিয়রকে কোলে নিয়ে আমি

র পাকিস্তানে প্রথম ভ্রমণের সময় লারকানায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাকে আমার দাদার প্রথম স্ত্রীর কোলে ষ্ঠানিকভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বেশ আনন্দে জুনামের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে ই শুধু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম

www.pathagar.com

মুর্তজা ও জুলফি। আদালতের বিরতির

ঘিনওয়া ও মুর্তজার একটি ছবি। আদালতে

আসিফ ও বেনজির। ৭০ ক্লিফটনে, তাদের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে, ১৯৮৭ সাল

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে উত্তর-প
সীমান্ত প্রদেশে
সমাবেশে বক্তৃতারত মু

১৯৯৪ সালে কারামুক্তির পর করাচি থেকে সিন্ধুর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ট্রেন সফরের সময় মুর্তজা, তার পাশে বসা সোহেল সেথি

ট্রেনে লারকানায় যাওয়ার সময় বিরাট জনতা প্রতিটি স্টেশনে বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। তিনি বক্তব্য দেন প্রতিটি স্টেশনে

www.pathagar.com

নুসরাত ও ঘিনওয়া লারকানায় সিভিল হাসপাতালে শহিদ রিন্দকে দেখতে যান, ৬ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে। আল-মুর্তজায় পুলিশের গুলিতে ৫ জানুয়ারি রিন্দ আহত হয়ে পরে মারা যান

এই সেই ছয় ব্যক্তি যারা মুর্তজার সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন : সাত্তার রাজপার, রহিম ব্রোহি, সাজ্জাদ হায়দার সঙ্গে তার পুত্র শাহনেওয়াজ, ওয়াজাহাত যোখিয়ো, আসিক জাতোইর সঙ্গে তার কন্যা সাবিন এবং ইয়ার মোহাম্মদ বেলুচ

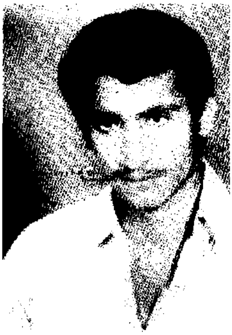

www.pathagar.com

অভিযুক্তদের একজন-পুলিশ অফিসার ওয়াজিদ দুররানী বেনজির মিডইস্টে এসে পৌঁছুলে তাঁকে স্যালুট করছেন, ১৯৯৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রাতে

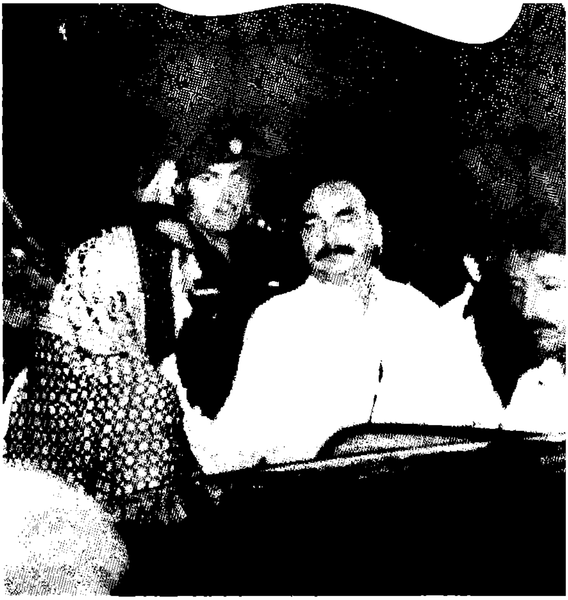

GULF NEWS

Murtaza's death fuels family feud

Mother points finger at Benazir

রাববার, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, গালফ নিউজ-এর প্রথম পাতায় মুদ্রিত ছবি দেখাচ্ছে শোকার্ত জনতার ব
র্তজার মরদেহ হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

মুর্তজা নিহত হওয়ার পর ঘিনওয়া মিডইস্ট ত্যাগ করছেন

াষ্ট ভুট্টোরা : আমি, শশী
ফি ২০০৮ সালে, গারহি
খুদাবক্সে শশী তার পিতা
ওয়াজের কবর জেয়ারত
করতে প্রথমবার আসে।
মামাদের ভাই মীর আলি
আমাদের বা-দিকে

www.pathagar.com
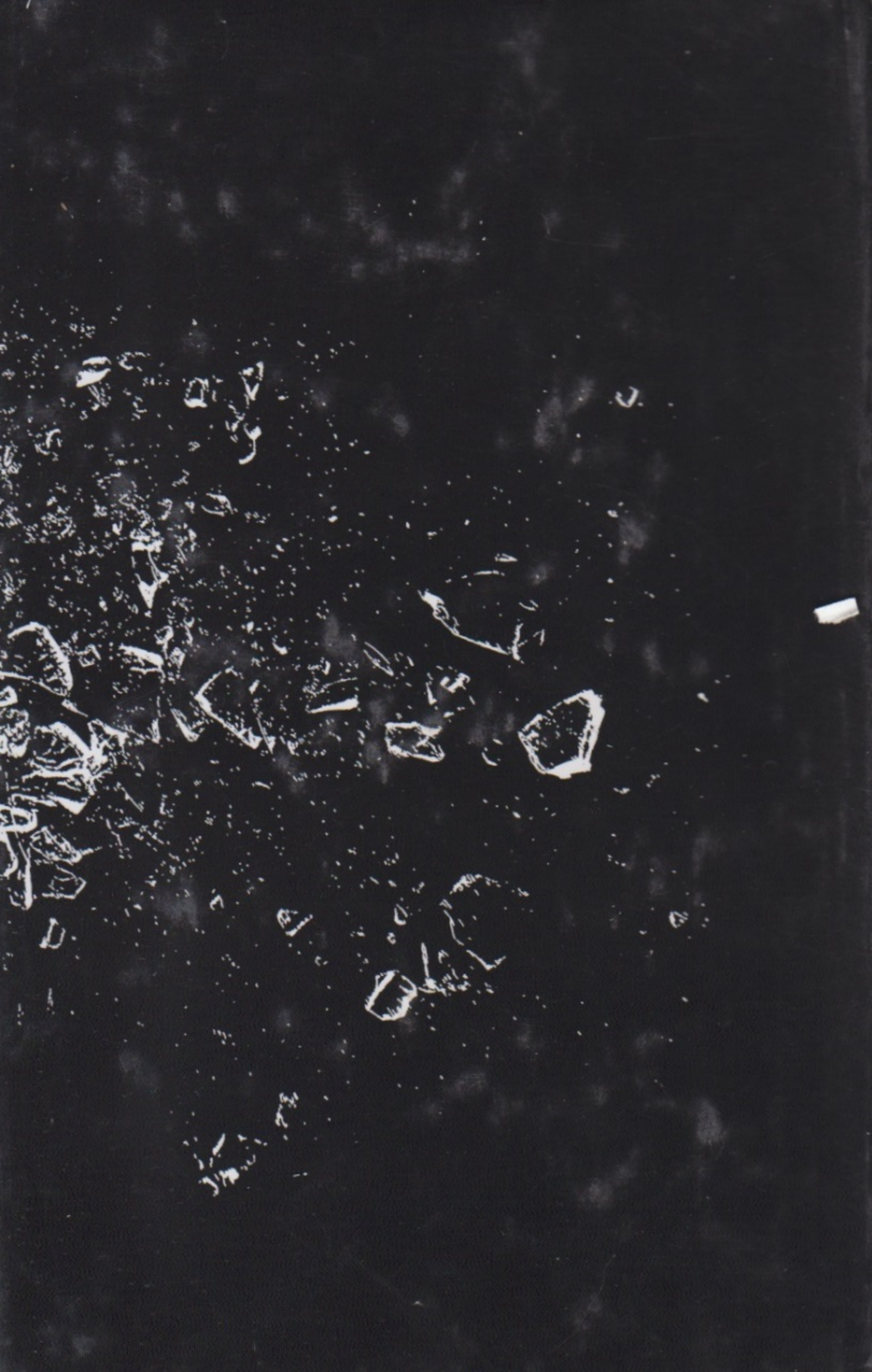
www.pathagar.com